উইলিয়ম কেরী : সাহিত্য সাধনা

শক্তিব্রত ঘোষ
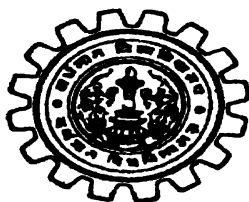
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৬০

বুলু-কে

নিবেদন

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা ভাষাসাহিত্যের ইতিহাসে উইলিয়ম কেরী একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। প্রকৃতপক্ষে, একটি ব্যক্তিত্বরূপে তাঁর আত্মপ্রকাশই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তাঁর ব্যক্তিত্বের স্পর্শে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আধুনিক আবির্ভাব সূচিত হয়েছিল বলা যায়। সাধারণভাবে বাংলা গদ্যসাহিত্যের উন্মেষপর্বের নায়কত্বে তাঁর প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করা হয়ে থাকে; ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করে বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনার ও প্রকাশের যে ঐতিহাসিক আয়োজন হয়েছিল, তিনি তারে নেপথ্য নায়ক। এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে উইলিয়ম কেরী সম্বন্ধে বিবেচনা ইতিমধ্যে চলিত হয়েছে; ডক্টর সুশীলকুমার দে এবং সজনীকান্ত দাসের নাম এই ক্ষেত্রে সম্মানের সংগে উল্লেখ করতে হয়। ডক্টর দে বা সজনীকান্তের পর্যালোচনায় বাংলা গদ্যের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ধারায় কেরী একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থিরূপে উন্মোচিত হয়েছেন; এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে কেরীর ব্যক্তিগত অবদান সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনার সুযোগ সেখানে ছিল না। 'উইলিয়ম কেরীঃ সাহিত্য সাধনা'—এই শিরোনামে কেরীর রচনাবলীর বিস্তৃত পরিচায়নে আমি যে এখানে অগ্রসর হয়েছি, তার প্রধান কারণ এই অভাববোধ।

২·

আমার বিষয়কে মোট দুইটি খণ্ডে বিভক্ত করেছি। প্রথম খণ্ডে উইলিয়ম কেরীর জীবনচরিত কথা; দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁর রচনাবলী সম্বন্ধীয় আলোচনা। পরিশেষে একটি সংক্ষিপ্ত উপসংহার যোগ করা হয়েছে।

প্রথমখণ্ডে সংক্ষেপে কেরীর জীবনী উদ্ধার করা হয়েছে। এই খণ্ড মোট তিনটি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণঃ প্রথম পরিচ্ছেদে 'স্বদেশের দিন', অর্থাৎ ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে পদার্পণের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর ইংলণ্ডীয় জীবনের কথা; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'বঙ্গদেশেঃ শ্রীরামপুরের পূর্ববর্তী', অর্থাৎ ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর বঙ্গদেশীয় জীবনের সূত্র; তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'বঙ্গদেশেঃ শ্রীরামপুর ও পরবর্তী', অর্থাৎ ১৮০০ থেকে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ দিনগুলিতে তাঁর আত্মপ্রকাশের পরিচায়ন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে কেরীর রচনাবলীর পর্যালোচনা ও মূল্যবিচার করা হয়েছে। এখানে রচনাবলী অর্থে ভাষাসাহিত্যের সঙ্গে যেসব রচনার গোত্রজ মিল আছে, তাকেই ধরা হয়েছে। খ্রীষ্টানধর্মের প্রচারমূলক পুস্তিকাদি এই প্রসঙ্গে যে আলোচিত হয় নি তার কারণ এইসব রচনা সারস্বত সাধনার সঙ্গে অনিবার্য যোগে প্রতিষ্ঠিত নয়, এমন কি ভাষাগত বিবেচনার দিক থেকেও এর কোন নূতন তাৎপর্য বা আকর্ষণ নেই। বাইবেলও ধর্মগ্রন্থ বটে, কিন্তু বাইবেল পৃথিবীর সাহিত্য-ইতিহাসের এক অনন্যসাধারণ রচনা; কেরীর বাইবেল অনুবাদ আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সাহিত্য-গ্রন্থ অনুবাদে তাঁর প্রযত্নের বিবেচনায়। খ্রীষ্টসঙ্গীতের মধ্যে প্রচারধর্মী মানসিকতার কিছু কিছু পরিচয় থাকলেও ধার্মিকের অনুভূতিময় গাঢ় উচ্চারণের আকর্ষণ এতে প্রাধান্য পেয়েছে বলে কেরীর সঙ্গীতরচনা স্বভাবতঃই আমাদের পর্যালোচনা করতে হয়েছে। এর বাইরে ব্যাকরণ, অভিধান ইত্যাদি রচনা বা কথোপকথন ও ইতিহাসমালার সংকলন স্পষ্টতঃই ভাষাসাহিত্য সাধনার পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। কেরীর রচনাবলীর পরিচায়নে আমরা দ্বিতীয় খণ্ডকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকেই দুটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে ভাগ করে নিয়েছি। পরিচ্ছেদ দুটির নামকরণেই এই দৃষ্টিকোণটি ধরা পড়ে বলে মনে করি। প্রথম পরিচ্ছেদকে আমরা বলেছি: 'কেরীর রচনা' এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদকে বলেছি: 'কেরীর নামে প্রচলিত রচনা'। কেরীর রচনারূপে আমরা তাঁর বাইবেল অনুবাদ, ব্যাকরণ রচনা, অভিধান সংকলন ও খ্রীষ্টসঙ্গীত রচনাকে নির্দিষ্ট করেছি; আর কথোপকথন ও ইতিহাসমালা যেহেতু সংকলন গ্রন্থ এবং যেহেতু সুনির্দিষ্ট-ভাবে ঐগুলিকে কেরীর রচনা বলে উল্লেখ করা সম্ভব নয়, সেইজন্য সংকলক ও সম্পাদক কেরীর নামে গ্রন্থগুলির পরিচয়ের অভ্যাসকে আহত না করে ঐ গ্রন্থ দুখানিকে 'কেরীর নামে প্রচলিত রচনা' পরিচ্ছেদে আলাদাভাবে উল্লেখ করেছি। সহযোগীদের সহায়তার কথা মনে রেখেও বলা যায় ব্যাকরণ, অভিধান ও খ্রীষ্টসঙ্গীতের রচয়িতা কেরীই; কিন্তু বাইবেল অনুবাদে কেরীর ভূমিকা ঠিক ওইভাবে নিরঙ্কুশ ও নির্দিষ্ট করে লক্ষ্য করা উচিত কিনা, এইরকম প্রশ্ন যে উঠতে পারে, সে সম্পর্কে আমরা সচেতন। সন্দেহ নেই, বাইবেল বহুজনের সাধনার ফসল, এমন কি কেরীর জার্নাল ও চিঠি-পত্রের সাক্ষ্যে বোঝা যায় যে প্রথম সংস্করণেও তাঁর ভূমিকা বহুলাংশে সম্পাদক ও সংশোধকের, তথাপি বাইবেলের অনুবাদে কেরীর ব্যক্তিগত অংশও অনেকখানি। কাজেই বাইবেলের প্রসঙ্গ 'কেরীর রচনা'র অন্তর্ভুক্ত না করে কোন উপায় থাকে না।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদ 'কেরীর রচনা' সম্বন্ধে আলোচনা; এই পরিচ্ছেদের উপবিভাগ চারটিঃ ১। ধর্মপুস্তকঃ বাইবেলের অনুবাদ; ২। ব্যাকরণ রচনা; ৩। অভিধান-সংকলন; ৪। খ্রীষ্টসংগীত। সবগুলি ক্ষেত্রেই আলোচনার সময় একটি সাধারণ রীতি মানতে চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলা দেশে প্রত্যেকটি বিষয়ের পূর্বসূত্র অনুসন্ধান, বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কেরীর উদ্যমের পরিচয় গ্রহণ ইত্যাদি এর মধ্যে পড়ে। এতে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কেরীর আবির্ভাবের পূর্বপটটি যেমন একদিকে বোঝা যায়, তেমনি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বাইবেল অনুবাদ, ব্যাকরণ রচনা বা অভিধান সংকলনে তাঁর উদ্যমের পরিচয় গ্রহণে তাঁর কাজের বিরাটত্ব ধরা পড়ে। একদিক থেকে দেখতে গেলে এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি বর্তমান গ্রন্থের পরিধির মধ্যেই পড়ে, কেননা ভাষাসাহিত্যের ক্ষেত্রে কেরীর উদ্যমের পরিচয়নই আমাদের বিষয়। ভাষাসাহিত্যের ক্ষেত্রে কেরীর এই বিরাট আত্মপ্রকাশের পরিচয় গ্রহণ করেও আমরা তাঁর রচনার ব্যাখ্যা প্রধানভাবে তাঁর বাংলা রচনাকে অবলম্বন করেই করেছি; অর্থাৎ ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাঁর বাংলা বাইবেল, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, বাংলা ইংরাজি অভিধান; কেননা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমীক্ষায় এইরকম হওয়াই সঙ্গত। বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভারতীয় ভাষায় তিনি কোনও খ্রীষ্টসংগীত রচনা করেছিলেন বলে জানা যায় না, কাজেই এক্ষেত্রে নির্বাচনের কোন প্রশ্ন ওঠে নি। বাংলা কথোপকথন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু মারাঠি কথোপকথন আলোচনার বিষয়ীভূত হয়নি; বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় ইতিহাসমালার মত কোন রচনা সম্বন্ধেও তথ্য নেই।

'ধর্মপুস্তকঃ বাইবেলের অনুবাদ' সম্পর্কে আমাদের আলোচনার মূল ভিত্তি ওই 'অনুবাদ' শব্দটি। এই অংশে প্রধানতঃ অনুবাদকের ভূমিকায় স্থাপন করে কেরীকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে অনুবাদক রূপে তাঁর অবস্থানটি বিশেষ ধরনেরঃ এক অর্জিত ভাষা থেকে আর এক অর্জিত ভাষায় অনুবাদ করবার সময় মধ্যস্থ ভাষা রূপে তাঁর মাতৃভাষা ইংরেজির স্বাভাবিক অবস্থান ও তার প্রভাব এই বিশিষ্টতার কারণ। তাঁর অনুবাদ স্বভাবতঃই তাঁর এই বিশিষ্ট অনুবাদক ভূমিকা দ্বারা প্রভাবিত। তিনি গ্রীক ও হিব্রু থেকে অনুবাদ করেছিলেন, তাঁর এই বক্তব্যের সততায় অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই; তাঁর অনুবাদে ইংরেজি বাইবেলের প্রভাবের সাক্ষ্যে অনুবাদ ইংরাজি বাইবেল থেকে করা হয়েছিল মনে না করে, অনুবাদ বিজ্ঞানের ওই সূত্রে তার সমাধান খুঁজতে চেষ্টা করেছি। আমরা আরও লক্ষ্য করেছি যে অনুবাদকের পক্ষে

পালনীয় বহুতর শর্তের মধ্যে তিনি প্রধানতঃ প্রাথমিক শর্ত, অর্থাৎ ভাষান্তরকরণের দায়িত্বটিকেই পালন করে গেছেন। বাংলা ভাষান্তরকরণে তিনি নানা কারণেই উৎকর্ষের পরিচয় দিতে পারেন নি, কিন্তু ভাষার উৎকর্ষ বিধানে তিনি যে সর্বদা সচেতন ও জাগ্রত ছিলেন, তাঁর অনুবাদ সমীক্ষায় এই পরিচয়টি ধরা পড়ে। ভাষা সম্পর্কে সচেতনতা দ্বারা অনুবাদকর্মে তিনি প্রায় আচ্ছন্ন ছিলেন, ফলে উৎকৃষ্ট অনুবাদে প্রত্যাশিত অনেক উপাদানই উপেক্ষিত হয়েছে, এবং এই কারণে তাঁর অনুবাদ একটি সীমা-বদ্ধ দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করাই বাঞ্ছনীয়। ভাষা সম্পর্কে তাঁর জাগ্রত মনস্কতার পরিচয় গ্রহণ করার সংগে বাংলা বাইবেলের ভাষার একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা করা হয়েছে। এই সমীক্ষার সূত্রে দেখা যায় যে, তাঁর বাংলা ভাষারীতিতে সংস্কৃতমনস্কতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল।

'ব্যাকরণ রচনা' অংশে, ব্যাকরণ রচনায় কেরীর দৃষ্টিভংগি যে প্রধানভাবে সংস্কৃতঘনিষ্ঠ, এই পরিচয়টি তাঁর বাংলা ব্যাকরণ সমীক্ষার সূত্রে ধরা পড়ে। বাংলা ভাষার গঠনপদ্ধতির নিজস্বতা সম্বন্ধে তিনি যখন সচেতন, তখনও তিনি শব্দ ভাণ্ডারের উৎসের ওপর নির্ভর করে এবং পদগঠনে বাংলা প্রকৃতি অনুসন্ধানের চেয়ে সংস্কৃতানুগত নিরূপণের প্রতি অধিক উৎসাহ দেখিয়ে বাংলা ভাষা চিন্তায় সংস্কৃতঘনিষ্ঠতার এক ধরনের সংস্কার গড়ে তুলেছিলেন। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে তিনি বাংলা ভাষাপ্রবৃত্তির নিজস্বতার পরিচয় সচেতনভাবে খর্ব করে সংস্কৃতানুগত্যের অনুশাসন ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। বরং বলা উচিত, বাংলা ভাষার নিজস্ব প্রকৃতি নিরূপণে তাঁর মনোযোগ সর্বব্যাপী ছিল না, এবং তাঁর দৃষ্টিভংগির এই অভাবাত্মকতাই তাঁর সংস্কৃতঘনিষ্ঠতা রূপে সচরাচর লক্ষ্য করা হয়ে থাকে। বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতঘনিষ্ঠ রূপে দেখবার তাঁর এই প্রবণতা দিনদিন বৃদ্ধি পেয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে তাঁর বাংলা ব্যাকরণের তৃতীয় সংস্করণে এসে, যেখানে বাংলা ক্রিয়াপদ সংস্কৃত ধাতুমূল থেকে নিষ্পন্ন, এইরকম ঘোষণা করা হয়েছে। 'বাংলা ব্যাকরণ পরিচয়' স্তম্ভে তাঁর ব্যাকরণের দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ অনুসরণ করে পরবর্তী দুটি সংস্করণে তার সংস্কার ধারার পরিচয় গ্রহণ করা হয়েছে; এর মধ্য দিয়ে একদিকে তাঁর ব্যাকরণের পাঠ সম্পর্কে যেমন অবহিত হওয়া যাবে, তেমনি অপরদিকে তাঁর অনলস সংস্কার প্রবৃত্তির সত্যটিও লাভ করা যাবে বলে মনে করি। বস্তুতঃ, বাইবেলের প্রথম সংস্করণের পাঠ বার বার সংস্কার করে কেরী ভাষা বিষয়ে তাঁর মনস্কতার যে পরিচয় রেখেছেন, বাংলা ব্যাকরণের সংস্কারে তাঁর সমর্পিত অভিনিবেশও একই মনস্তত্ত্বের পরিপোষক।

বাইবেলের ভাষা সংস্কারেও একটা বস্তুভিত্তি ছিল, অর্থাৎ সেখানে বাইবেল ছিল; ব্যাকরণের ক্ষেত্রে সেই মনস্কতা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বমার্গে নিবেদিত। সন্দেহ নেই, ব্যাকরণের ক্ষেত্রে তিনি তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের অনুশাসনেই পদচারণা শুরু করেছিলেন; কিন্তু বিষয়টির মধ্যেই জ্ঞানানুশীলনের উপাদান ও আহ্বান নিহিত আছে, এবং কেরী প্রাথমিক প্রয়োজন-সাপেক্ষতার ভূমি থেকে ধীরে ধীরে জ্ঞানচর্চার নিরপেক্ষতায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

অভিধানকার রূপে নিজের আবির্ভাবের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে গিয়েও কেরী তাঁর অভিধান সংকলনের পিছনে প্রয়োজনবোধের উপস্থিতির কথা অকপটভাবেই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু একটু পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কেরীর পরিচিত পরিধির মধ্যেই অভিধান সংকলন বিদ্যোৎসাহের একটি লক্ষণরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল, এবং কেরী সেই আলোতে নিজেকে উদ্ভাসিত করেছিলেন। অর্থাৎ প্রয়োজন সাপেক্ষতার বহিরঙ্গতা অতিক্রম করে অভিধান সংকলনের কাজকে তিনি বিদ্যানুশীলনের দায়িত্বে চরিতার্থ করেছিলেন। ‘অভিধান সংকলন’ অংশে আধুনিক অভিধান চিন্তায় কেরীর আত্মপ্রকাশ আমরা লক্ষ্য করতে চেষ্টা করেছি। কেরীর আগেও বাংলা কোষগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু তিনিই প্রথম বাংলা কোষগ্রন্থকে শব্দসংগ্রহ-গ্রন্থের (vocabulary) সীমাবন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। অভিধান ভাষার শব্দসংগ্রহ-গ্রন্থ মাত্র নয়, সংগৃহীত শব্দ অবলম্বনে ভাষাতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা বা ব্যাকরণ-নিষ্পত্তির প্রসঙ্গও তার অপরিহার্য উপাদান। কেরী অভিধান চৈতন্যের এই পূর্ণতায় আলোকিত ছিলেন, এবং বাংলা অভিধানের প্রথম রূপকার রূপে তাঁর এই আবির্ভাবটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে, অভিধানকার নিজস্ব ভাষাচিন্তার ভিত্তিতেই অভিধানের রূপনির্মাণ করে থাকেন, কেরীর বাংলা অভিধানে স্বভাবতঃই বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মনোভঙ্গি ধরা পড়েছে। বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের অধিকার সম্বন্ধে কেরীর সমর্থনমূলক মনোভাবের সঙ্গে আমরা ইতিমধ্যেই পরিচিত, তাঁর অভিধানে এই মনোভাব একটি প্রত্যয়ে পরিণত হয়েছে। সংগৃহীত শব্দের শতকরা প্রায় পঁচাত্তর ভাগ তৎসম শব্দ, এই তথ্যটি বাংলায় সংস্কৃতের অধিকার সম্পর্কে তাঁর নিশ্চিত ধারণার সমর্থক। উচ্চারণ ব্যাখ্যায়, বানান নিরূপণে অথবা ব্যুৎপত্তি নির্ণয়েও তাঁর সংস্কৃতমনস্কার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। অভিধানের গোড়ায় সংস্কৃত ধাতুর দীর্ঘ তালিকাটির সংযোজনা তাঁর সংস্কৃত সংস্কারের আনুকূল্যই করে মাত্র। কেরীর এই সংস্কৃত-সংস্কার

বাংলা ভাষার পক্ষে শুভ হয়েছিল কিনা, সেটা আলাদা প্রসঙ্গ, কিন্তু তাঁর পক্ষে এই ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করা প্রায় অনিবার্য ছিল। বাংলা ভাষায় সংস্কৃতঘনিষ্ঠতার প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা ও তদনুযায়ী ভাষার প্রকৃতি নিরূপণে কেরীই একমাত্র প্রবক্তা ছিলেন না, এ-কথা এখানে স্পষ্টভাবে মনে রাখা দরকার। কেরীর আগে হালহেড এবং বাংলা ভাষা পথিক রূপে কেরীর আত্মপ্রকাশের আগেই ফরস্টার, এইরকম দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করে গেছেন। বস্তুতঃ, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশে ইংরাজ-পুরুষদের বাংলা ভাষা চর্চায় যে দৃষ্টিভঙ্গিটি উন্মোচিত হয়, কেরী সেই দৃষ্টিভঙ্গিরই উত্তর-পোষক। তাঁর অধিকতর পরিশ্রমী ও নিবিষ্ট উদ্যমে সমকালীন বাংলা ভাষা চিন্তা প্রায় একটি মতবাদরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে অথবা তার তত্ত্বগত পরিণাম পায়। কেরীর অভিধান সমীক্ষায় তাঁর এই ভাষাচিন্তার পোষকতা পাওয়া যাবে; সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে যে একটি বিশেষ ভাষা প্রজাতির দর্পণ রূপে অভিধানের প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করবার যে আধুনিক মানসিকতা, কেরীর অভিধানে তা বহুলাংশে চরিতার্থঃ কেরীর অভিধানে বাংলা ভাষাভাষী গোষ্ঠীর প্রায় একটা সামগ্রিক পরিচয় বিধৃত আছে।

'খ্রীষ্টসঙ্গীত' অংশে আমরা লক্ষ্য করেছি যে শ্রীরামপুর মিশনারীদের হাতেই, পর্তুগীজ মিশনারীদের পূর্ববর্তী প্রচেষ্টার কথা মনে রেখেও, বাংলা খ্রীষ্টসঙ্গীতের স্থায়ী সূচনা হয়েছিল; খ্রীষ্টসঙ্গীত রচনা করে কেরী সেই সূচনায় একটি গুরুতর অংশ গ্রহণ করেছিলেন। অপরদিকে, স্বনামে তাঁর মৌলিক রচনার একমাত্র উদাহরণ রূপে এই গানগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তাঁর লেখা গানগুলিতে ভাষাগত ত্রুটি যাই থাক, তাঁর বিশ্বাসগাঢ় অনুভূতিময় উচ্চারণে গানগুলির মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা 'কেরীর নামে প্রচলিত রচনা' সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এই আলোচনা স্বভাবতঃই বিস্তৃত নয়, কেননা এই রচনায় কেরীর ভূমিকা সংকলক ও সম্পাদকের মাত্র। কাজেই সংকলক ও সম্পাদক রূপে তাঁর ভূমিকা অনুসন্ধান করাই এখানে প্রধান কৃত্য বলে বিবেচনা করা হয়েছে। এই পর্যায়ে আমাদের আলোচ্য দুটি সংকলন গ্রন্থঃ কথোপকথন ও ইতিহাসমালা।

'কথোপকথন' অংশে আমাদের আলোচনার দুই ভাগঃ ক। আমরা দেখেছি যে কথোপকথনের কোনও অংশের লেখকরূপে কেরীকে অভ্রান্তভাবে সনাক্ত করা সঠিক হবে না; ফলে, খ। সংকলক ও সম্পাদক রূপেই কথোপ-কথনে তাঁর উপস্থিতি লক্ষণীয়। সংকলক ও সম্পাদক রূপে তাঁর

উপস্থিতি আবার দুইভাবে দেখা যেতে পারে; এক, মূল পাঠের সংস্কার সাধনে; দুই, মুখবন্ধে গ্রন্থের ভাষারীতি বিষয়ক সমীক্ষায়। কথোপকথনের ভাষাসংস্কারে তিনি বিশুদ্ধ অন্বয় প্রতিষ্ঠায় বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন; ক্রিয়াপদ সহ বিভিন্ন পদকে যথাস্থানে স্থাপন করে এই বিশুদ্ধি তিনি প্রতিশ্রুত করতে চেষ্টা করেছেন; বিশুদ্ধ বানানের প্রতিষ্ঠায় তাঁর মনোযোগও একই সঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সমস্তকে বিশুদ্ধ ভাষারূপ সন্ধানেরই প্রবণতা বলা যায়। মুখবন্ধে কথোপকথনের ভাষারীতি সম্বন্ধে আলোচনায় ব্যক্তি ও প্রসঙ্গভেদে ভাষার প্রকৃতিভেদ সম্পর্কে তাঁর বিবেচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য; প্রকৃতপক্ষে একে সাহিত্যের ভাষাসঙ্গতি সম্পর্কিত আলোচনাই বলা চলে, এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় সাহিত্যের ভাষারীতির সঙ্গতি সম্পর্কে কেরীর এই সচেতনতার সাক্ষ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

'ইতিহাসমালা' কেরীর নামে প্রচারিত গ্রন্থ। কেরী এই গ্রন্থের সংকলক মাত্র; তাঁকে এই গ্রন্থের রচয়িতা রূপে লক্ষ্য করবার কোন উপযুক্ত ভিত্তি নেই। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি বা অন্য কোন সংস্করণের অভাবে ভাষা সংস্কারে তাঁর আদৌ কোন ভূমিকা ছিল কিনা, তা বিবেচনা করারও কোন সুযোগ নেই। কেরী ইতিহাসমালা সংকলন করেছিলেন, এই যোগ ছাড়া এখানে তাঁর অংশভাগ নিরূপিত নয়। 'ইতিহাসমালা' অংশটি আমরা এই যোগসূত্রের সাক্ষ্যে এবং কেরী সম্পর্কিত আলোচনার তথাকথিত সম্পূর্ণতার শর্তে এখানে সংযোজিত করেছি।

৩.

এই কাজের সময় আমি প্রধানতঃ শ্রীরামপুর কলেজের কেরী লাইব্রেরী ও কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে কাজ করেছি। এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী, হুগলী মহসীন কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজের লাইব্রেরী ও দিল্লীর জাতীয় অভিলেখাগার থেকেও যথা-প্রয়োজন সহায়তা গ্রহণ করতে হয়েছে। এইসব প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

এই গ্রন্থরচনায় আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান করেছেন আমার পূজনীয় অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর অপরিসীম স্নেহে আমি ধন্য হয়েছি; এই রচনার মাধ্যমে আমার ওপর ন্যস্ত তাঁর বিশ্বাসের মর্যাদা যদি রক্ষা করতে পেরে থাকি, তাহলে কৃতার্থ বোধ করব।

এই কাজের বিভিন্ন স্তরে ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী, ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র,

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক, ডঃ নির্মল দাস, শ্রীদেবব্রত ঘোষ ও শ্রীঅমল ঘোষ-এর কাছে ঋণ অপরিশোধনীয় হয়ে থেকে গেল।

শ্রীদেবকুমার বসু মহাশয় স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে এই গ্রন্থের 'নির্দেশিকা' অংশটি প্রস্তুত করে দিয়েছেন। তিনি চিরদিনই পরোপকারী, এবং আমি তাঁর গুণমুগ্ধ।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করে আমাকে কৃতজ্ঞতাবদ্ধ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশন বিভাগের প্রত্যেক কর্মী গ্রন্থপ্রকাশে যে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন, তার জন্য তাঁদের অভিনন্দন জানাই।

কিছু ছাপার ভুল নানা কারণে থেকে গেছে, যার জন্য প্রথাগতভাবে দুঃখ প্রকাশ করা যায়। এরই মধ্যে গুরুত্বের বিবেচনায় একটি সংশোধনীর দরকারঃ ৮০ পৃষ্ঠার ৫ম পংক্তিতে 'রচনারীতি সম্পর্কে যে সাধুবাদ বর্ষিত হয়'-এর শেষে উল্লেখ-সংখ্যা হবে ৪২; ভ্রমবশতঃ এই সংখ্যাটি ছাপা হয়নি।

শক্তিব্রত ঘোষ

সূচীপত্র

উইলিয়ম কেরী ১৭৬১—১৮৩৪

প্রথম খণ্ড

কেরী ঃ জীবনচরিত কথা

১। স্বদেশের দিন

(আগস্ট ১৭৬১—১৭৯৩ জুন)

নর্দাম্প্‌টন্‌শায়ারের কাউন্টি টাউসেস্টার, সেখান থেকে তিন মাইল দূরে এক অখ্যাত গ্রাম ঃ পলার্স‍্পিউরী। পলার্স‍্পিউরীর ভিতর কেটে প্রবাহিত ছোট্ট এক নদী, যার ধারে ধারে গ্রামের শিশুরা খেলতে ভালোবাস্‌ত গরমের দিনে; নদীর ধারের ঢালু জমিতে ফুটে থাকত অগণন ডেইজি; প্রান্তর ছিল তৃণাচ্ছন্ন, বিস্তৃত; কোথাও মস্ত গাছ দাঁড়িয়ে থাকত ছায়ায় বিম্বিত হয়ে; এবং অদূরে গির্জা। সব পেরিয়ে উদার আমন্ত্রণে বিশাল হুইট্‌ল্‌বেরী অরণ্য।

ফলতঃ পলার্স‍্পিউরী নিসর্গসমৃদ্ধ; প্রকৃতি তাকে আনন্দের উপহার দিয়েছিল অনেক। কিন্তু এই নিসর্গবাসীদের জীবনযাত্রায় নিরানন্দ ছিল অদৃষ্টের মত। চামড়া আর সুতোর কাজ ছিল তাদের প্রধান জীবিকা, এমনকি ঘরের মেয়েদেরও তাঁতের কাজে বা বালিশের লেস বানিয়ে উপার্জন করতে হতো। নর্দাম্পটনের জুতোর কারিগররা বোধহয় সপ্তাহে দশ শিলিঙের বেশি আয় করতে পারত না, তাঁতীরাও গড়ে সপ্তাহে রোজগার করতো সাড়ে আট শিলিঙের মতো।১ কেরীর বাবা এডমন্ড, সন্ধ্যা-সকাল অতিদ্রুত তাঁত বুনেও সংসারকে সহজ করে তুলতে পারেননি।২ অতি বড় এক অসুখের মত দারিদ্র্য সেখানে সমারোহে উপস্থিত ছিল।

এই অদ্ভুত এক বিষম, তৎকালীন ইংলণ্ডের অন্যান্য অনেক গ্রামের মতই, পলার্স‍্পিউরীরও আত্মপরিচয়। এবং এখানে উইলিয়ম কেরী জন্মেছিলেন ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মাবসানে, আগস্ট মাসের ১৭ তারিখে।

বংশ-পরিচয়

কেরী তাঁর বংশ-পরিচয় সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য জানাতে পারেন নি।৩ তাঁর পিতামহ পিটার কেরী পলার্স‍্পিউরীর লোক ছিলেন না, তবে প্রথম জীবনেই সম্ভবতঃ এই গ্রামে এসেছিলেন তিনি, এবং ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে ভিন্‌গাঁয়ের মেয়ে অ্যান্‌ ফ্লেক্‌নো-কে পলার্স‍্পিউরীতেই বিবাহ করে-ছিলেন। পিটার কেরী জীবিকায় তাঁতী ছিলেন, তবে পলার্স‍্পিউরীতে

যখন প্রথম স্কুল স্থাপিত হয়, তিনি তার প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর পরিশ্রম করার শক্তি ছিল প্রচুর, এবং যোগ্যতাও নির্ভরযোগ্যঃ যার জন্যে এই বহিরাগত নূতন তাঁতী একই সঙ্গে স্কুলের শিক্ষক ও প্যারিশের কেরানীরূপে সহজেই নির্বাচিত হয়েছিলেন। আঠারো বছর ধরে একই সঙ্গে এই দুটো কাজ তিনি সম্মানের সঙ্গে সম্পাদন করেন। তাঁর পাঁচটি সন্তানঃ উইলিয়ম, পিটার, এড্‌মণ্ড, টমাস ও অ্যান্। টমাস ও অ্যানের শৈশবাবস্থায় মৃত্যু হয়।৪ বড় ছেলে উইলিয়মকে আপন প্রাণ, জ্ঞান ও উৎসাহ দিয়ে পিটার কেরী গড়ে তুলেছিলেন। কৃতী সম্ভাবনাপূর্ণ যুবক এই উইলিয়ম যখন টাউসেস্টারে সক্ষম শিক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিলেন, সেই সময় মাত্র কুড়ি-একুশ বছর বয়সে তিনি মারা যান। এই মৃত্যুশোক সহ্য করা পিটার কেরীর পক্ষে কঠিন ছিল, উইলিয়মের মৃত্যুর মাত্র পনের দিনের মধ্যে তাঁরও মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় ছেলে পিটার, কৈশোরেই দেশ-ত্যাগী হন, তিনি কানাডায় পাড়ি দিয়েছিলেন এক পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে। সেখান থেকে তাঁর কোন সংবাদও পাওয়া যাচ্ছিল না। এডমণ্ড তাঁর পিতৃবিয়োগের সময় মাত্র সাত বৎসরের বালক। স্বামী ও জ্যেষ্ঠ-পুত্রের মৃত্যুর পর পিটার কেরীর বিধবা অ্যান বালক এডমণ্ডকে নিয়ে নিঃসহায় ছিলেন। স্থানীয়দের উৎসাহে স্থানীয় স্কুলে এডমণ্ডের লেখা-পড়ার ব্যবস্থা হলো, কিন্তু অ্যানের অসহাযতা অর্থে জীবনধারণের গুরুতর প্রয়োজনে অচিরাৎ এড্‌মণ্ডকে তন্তুবায় বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়। পিতাব এই পুরনো বৃত্তি যথেষ্ট ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শিখে নিলেন তিনি, ক্রমে সংসারকে স্থিতি দিলেন গ্রামের প্রান্তে এক খড়ের ঘর বানিয়ে: অসহায় মা-কে স্বস্তি দিলেন, এবং চব্বিশ বৎসর বয়সে টাউসেস্টারে বিয়ে করলেন এলিজাবেথ উইল্‌স্-কে। এই খড়ের ঘরে নিয়ে এলেন স্ত্রীকে, মায়ের একা সংসারকে ভরে তুললেন। সারাদিন পরিশ্রমসাধ্য তাঁতবোনার কাজ তাঁর, নিজের দারিদ্র্য সম্পর্কে সচেতন, আর তারই মধ্যে রাতের অবকাশ মুহূর্তে তিনি মেলে ধরতেন নির্বাচিত কতকগুলি বই, মনোযোগের সঙ্গে চলতো তাঁর পড়াশুনো। পিটার কেরীর মৃত্যুর পর স্থানীয় স্কুলে যে ব্যক্তি নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁর সহসা মৃত্যু হলে এডমণ্ড সেই স্কুলে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হলেন এবং তার সঙ্গে প্যারিশের কেরানীগিরির কাজটিও, তাঁর বাবার ক্ষেত্রে যেমন হয়েছিল, তেমনি, তাঁর ওপর বর্তালো। কিন্তু তাঁর তাঁতীর খড়ের ঘরেই ইতিমধ্যে জন্মালেন প্রথম সন্তান, ঠাকুরমা তাঁর প্রথম সন্তানের স্মৃতিতে যাঁর নামকরণ করলেনঃ উইলিয়ম। এই উইলিয়ম কেরী। এডমণ্ডের-ও পাঁচটি সন্তানঃ উইলিয়ম, অ্যান্, মেরী, টমাস ও

এলিজাবেথ। শৈশবাবস্থাতেই মায়ের নামে নাম এই এলিজাবেথের মৃত্যু হয়।
উইলিয়ম কেরীর বংশ-তালিকাটি৫ তাহলে এইরকম দাঁড়ায়ঃ
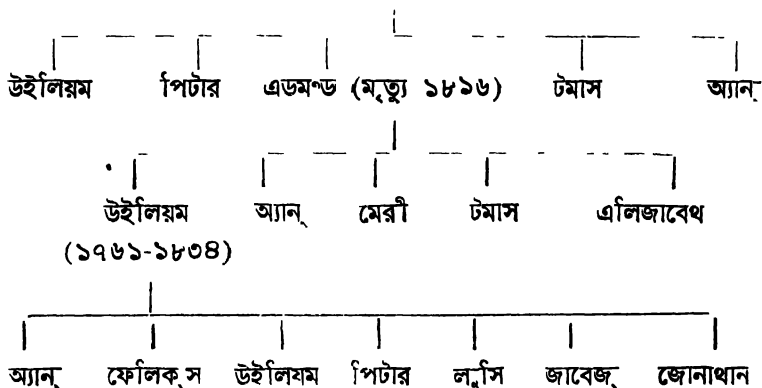
ছেলেবেলা

ঠাকুরমার বুকেই লালিত হয়েছিলেন কেরী; ভালোবাসা ও স্নেহের উত্তাপে ভরা তাঁর শৈশব। পিউরীয়েণ্ডের যে বাড়িতে তাঁর শৈশব অতিবাহিত হচ্ছিল, তার পরিবেশটিও আকর্ষণীয়। বাড়ির পিছনদিক থেকে গ্রামের উদার নিসর্গশোভা দেখা যেত। তবু এডমণ্ডের দরিদ্র-সংসারেরই সন্তান তিনি. কিন্তু শৈশব-চেতনায় দারিদ্র্যের বোধ বোধহয় কখনই শাণিতরূপে ধরা দেয় না। মোটামুটিভাবে সুন্দর ছেলেবেলা তাঁর, হয়তো সমতল ও নিস্তরঙ্গ একটু, তবু এই সময়েরই পর পর দুটো ঘটনা তাঁর বাল্যস্মৃতিতে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, দীর্ঘ প্রবাসযাপন শেষে পিতৃব্য পিটার কেরীর প্রত্যাবর্তন; দ্বিতীয়তঃ, স্থানীয় স্কুলের শিক্ষকতায় পিতা এড্মণ্ডের নির্বাচন ও তাঁর বাসস্থান পরিবর্তন।

প্রায় কুড়ি বছর পর কানাডা থেকে এই সময় ফিরে আসেন পিটার কেরী। তিনি ফিরে আসবার পরই ঠাকুরমা অ্যান মারা গেলেন। পিটার নিঃসন্তান ছিলেন, বালক উইলিয়মকে তিনি সহজেই স্নেহের বন্ধনে বেঁধে নিলেন। ক্রমে ক্রমে উভয়ের ঘনিষ্ঠতা অচ্ছেদ্য হয়ে দাঁড়ালো। পিটার বাগান করতে ভালোবাসতেন. বিভিন্ন উদ্ভিদ তিনি চিনতেন ও তাদের চাষ করতে জানতেন। অনেকদিন পর তিনি ফিরেছেন ইংলণ্ডে, ইংলণ্ড তাঁর এই মধ্যবয়সের হৃৎপিণ্ডকেও স্বাভাবিকভাবে স্পর্শ করল দীর্ঘদিনের ব্যবধানে।

এবং তিনি স্বদেশের প্রকৃতি-সৌন্দর্যের দুয়ার একে একে খুলে দিলেন বালক উইলিয়মের কাছে।৬ শুধু তাই নয়, বালক উইলিয়মের কাছে তিনি প্রায়ই কানাডার গল্প বলতেন; সেখানকার প্রবাসী জনসাধারণের কথা, সেখানকার জল-জঙ্গল, বন্য জন্তু, গাছপালা বা ফুল, পাখির কথা, সেখানকার তীব্র শীতের কথাও হয়তো। এই থেকেই উইলিয়মের শিশু-চিত্তে দেশান্তরের প্রকৃতি ও মানুষ সম্পর্কে প্রথম আগ্রহের সূচনা, এই আগ্রহ থেকেই সম্ভবতঃ তাঁর দূর সমুদ্র-যাত্রার প্রেরণা রক্তের মধ্যে গোপনে সঞ্চারিত হতে থাকে।

উইলিয়মের যখন মাত্র ছ'বছর বয়স, পলার্সপিউরী স্কুলে একজন শিক্ষকের প্রয়োজন দেখা দিল। যে-ব্যক্তি এড্‌মণ্ডের পিতা 'পিটার কেরীর মৃত্যুর পর স্কুলে নিযুক্ত হয়েছিলেন, তিনি সহসা মারা গেলে, গ্রামের লোকেদের ইচ্ছানুযায়ী এড্‌মণ্ড এই শিক্ষকতার পদে বৃত হলেন, সঙ্গে প্যারিশের কেরানীগিরির কাজও তাঁর ওপর এসে বর্তালো। এই চাকরীর সঙ্গে 'পিউরী-য়েণ্ড'-এর খড়ের বাড়ি থেকে স্কুলবাড়িতে উঠে এলেন এডমণ্ড। উইলিয়মের জীবনে এ এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা।৭ বাবাকে তিনি দেখতে শুরু করলেন গণ্যমান্য-রূপে, যাঁকে সবাই সম্মান করে ও যাঁর কথা সবাই শোনে। এবং পিতার অনুশাসনে ধীরে ধীরে তাঁর চরিত্রে বিনম্রতা দেখা দিল।৮ এইখানে এসে উইলিয়মের জীবন-ভিত্তি সুন্দরভাবে গড়ে উঠতে শুরু করল। পিতা নিজে প্রচুর পড়তেন: তাঁর এই বিশেষ বৃত্তিটি তিনি উইলিয়মের মধ্যে সঞ্চারিত করেন, উৎসাহে মনোযোগে পড়াশুনোর অভ্যাস উইলিয়মের এই সময় গড়ে ওঠে। বস্তুতঃ পিতা এডমণ্ডের এই নূতন বৃত্তি উইলিয়মের জ্ঞানচর্চার উন্মেষের ইতিহাসে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

শিক্ষা ও আনুষঙ্গিক

ছেলেবেলায় তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে কেরী নিজেই লিখেছেনঃ

"My education was that which is generally esteemed good in country villages, and my father being a schoolmaster, I had some advantages which other children of my age had not."৯

কেরীর এই উক্তির মধ্যে যথার্থ সত্য নিহিত আছে। সেকালের ইংলণ্ডের গ্রামাঞ্চলে কিছু কিছু যেসব বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, কোন দিক থেকেই তাকে আদর্শ বলা যায় না, তবু এইসব অসম্পূর্ণ উদ্যমগুলির সূত্রেই গ্রামে প্রথম শিক্ষার আলো প্রবেশ করতে শুরু করেছিল।১০ পলার্স-

পিউরীর স্কুলও এইরকম প্রাথমিক স্থূল অবস্থার একটি রূপ মাত্র; নিচু খড়ের বাড়িতে একটি মাত্র ঘর, গোটা দুই জানালা, গাছ-কাটা পাটাতনে বসবার ব্যবস্থা আর একজন মাত্র শিক্ষক,—এই তথাকথিত স্কুল। পাঠ্য-বিষয়ঃ পড়া, লেখা, আর অঙ্ক (Reading, writing and arithmatic বা "three Rs"), এবং কিছু কিছু ধর্মীয় শাস্ত্র। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা প্রসারের সেই প্রাথমিক অবস্থায় গ্রাম্যশিক্ষার্থীর কাছে এই সামান্য সুযোগও অসামান্যরূপে সম্বর্ধিত হয়েছিল। এই স্কুলে কেরীর শিক্ষা। কিন্তু স্কুলের সীমাবদ্ধ সুযোগেই শুধু তাঁর শিক্ষা চালিত হয়নি। শিক্ষক-পিতা ছিলেন তাঁর অভিভাবক; ফলে স্কুলের অন্যান্য ছাত্রদের তুলনায় তাঁর শিক্ষার পরিধি অধিক বিস্তৃত হতে পেরেছিল। তাঁদের ঘরে বাইবেল ছিল; ধর্মপ্রাণ পিতার সঙ্গে স্থানীয় গির্জায় উপস্থিত হতে হতো তাঁকে: সেখানে খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের অনেকাংশের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় হয়েছিল। কেরী জানাচ্ছেনঃ "...accustomed from my infancy to read the scriptures," এবং বাইবেলের ঐতিহাসিক অংশের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠ ছিল। সব মিলে সেই ছেলেবেলাতেই তাঁর "general scripture knowledge" সাধারণভাবে গড়ে উঠতে পেরেছিল।১০

কিন্তু ধর্মীয় পুস্তকাদিতে বোধহয় তাঁর আকর্ষণ বিশেষ ছিল না। বিরক্তিকর নাটক উপন্যাসের মতই এই ধরনের গ্রন্থপাঠ থেকেও তিনি বিরত থাকতে চেষ্টা করতেন;১১ তাঁর প্রধান উৎসাহ ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিন্নতর স্বাদের গ্রন্থে। তিনি নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছেনঃ "I chose to read books of science, history, voyages, &c."১২ বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থাদি বা ইতিহাস বা সামুদ্রিক অভিযানের বিবরণ পড়তে তিনি ভালো-বাসতেন। এবং তাঁর অত্যন্ত প্রিয় বিষয় ছিল কলম্বাসের আবিষ্কার-বৃত্তান্ত। কলম্বাসের জীবনকাহিনী ও ভ্রমণবিবরণে তিনি খুবই নিবিষ্ট ছিলেন, তাঁর কাহিনী তিনি প্রায়ই সহচর ও সহপাঠীদের কাছে উদ্ধার করতেন, এবং তারা তাঁকে কলম্বাস নামে ডেকে ঠাট্টা করতো। এমন কি জেমস কুকের দক্ষিণ-সমুদ্র অভিযান-কাহিনীও তাঁর মনোযোগের অনেক-খানি আকর্ষণ করে নিয়েছিল বলে জানা যায়,১৩ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রোমান্স-ধর্মী রচনায় তিনি আগ্রহ বোধ করতেন, এবং বানিয়ানের 'পিলগ্রিম্‌স্‌ প্রোগ্রেস' তিনি পড়েছিলেন।১৪

কেরীর যে পাঠ-তালিকা মোটামুটিভাবে উদ্ধার করা গেল, তা থেকে স্পষ্টতঃই বোঝা যাবে যে তাঁর জ্ঞানার্জনবৃত্তি ছেলেবেলাতেই বিশেষ সক্রিয় ছিল। তাঁর পাঠাভ্যাস ও জ্ঞানস্পৃহা উন্মেষের পশ্চাতে তাঁর পিতার

প্রতীকটি সম্ভবতঃ কাজ করে থাকবে। এডমণ্ড তাঁকে হাতের লেখা সুন্দর করতে শিখিয়েছিলেন, এবং তিনি একথাও আমাদের জানিয়ে গেছেন যে উইলিয়ম অঙ্কশাস্ত্রে পারঙ্গম ছিলেন।১৫ আর এডমণ্ডের পদাধিকার এমনই ছিল যে, তাঁর কাছে নর্দাম্পটন মার্কারি-র১৬ সাপ্তাহিক কপি আসা খুবই স্বাভাবিক ছিল, এবং উইলিয়ম এই কাগজের মাধ্যমে পলার্সপিউরীর বাইরে যে বহত্তর জগৎ, তার খবরাখবর সহজেই পেতেন। এই পত্রিকার স্তম্ভে যে সমস্ত গ্রন্থের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতো, তার একটি সংক্ষিপ্ত নির্বাচিত তালিকা ওয়াকার উদ্ধার করেছেন,১৭ এবং খুব প্রত্যক্ষ যোগাযোগে না হোক, অন্ততঃ পরোক্ষ প্রেরণায় এই সব বিজ্ঞাপিত গ্রন্থ-বিষয়ে তাঁর আগ্রহ অবশ্যই জন্মেছিল বলে অনুমান করা যায়।১৮

বস্তুতঃ, জ্ঞানার্জন-স্পৃহা কেরীর আবাল্য। এরই মধ্যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি শৈশবাবধি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন বলে জানিয়েছেন। পলার্সপিউরীর মাঠে ঘাটে পথে, অথবা অদূরবর্তী বনভূমির প্রান্তর পর্যন্ত প্রসারিত অবারিত পল্লীবিস্তারে, কোথায় কি আছে, কিছুই তাঁর চোখের অন্তরালে থাকতে পারেনি। পাখি আর উদ্ভিদ, তাদের মুহূর্তে মুহূর্তে বিচিত্র পরিবর্তমান অবস্থান্তরে তাঁর নিবিষ্ট লক্ষ্যের বিষয় হয়েছে,—এইসব গ্রামের সকল বালকের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে ভালোভাবে চিনতেন এবং জানতেন; যেন নূতন কিছু আবিষ্কার করছেন, এইরকম ছিল তাঁর মনোভাব। ১৯ পাখিই হোক বা উদ্ভিদই হোক, বিজ্ঞানীর সহজ কৌতূহলে তিনি তার সংগ্রহে উৎসাহী ছিলেন, পোকা-মাকড় জাতীয় প্রাণীও তিনি কম সংগ্রহ করেন নি। তিনি জীবন্ত প্রাণীই ধরতে ভালোবাসতেন, সব নিয়ে তাঁর নিজস্ব শয়নকক্ষখানি ছোটখাটো একটি যাদুঘর হয়ে উঠেছিল যেন।২০ আর নিজের ঘরের যাদুঘর তাঁর নিজের হাতে পরিচর্যা করতেন তিনি। আর ছিল বাগান। এডমণ্ড তাঁর বাগানের ভার উইলিয়মের ওপরই ছেড়ে দিয়েছিলেন, এবং সেটা ছিল তাঁর উদ্ভিদচর্চার ক্ষেত্র। বস্তুতঃ গাছ আর পাখি ছিল তাঁর উৎসাহের নিবদ্ধকেন্দ্র। এবং এইসব বিষয়ের অনুসন্ধিৎসা থেকেই সম্ভবতঃ, তাঁর ল্যাটিন শিক্ষার সূত্রপাত। পলার্সপিউরী গ্রামেই এক ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষাবিদ ছিলেন, টমাস জোন্স, মাত্র বার বৎসর বয়সে তাঁর কাছ থেকে তিনি ল্যাটিনে পাঠ গ্রহণ শুরু করেন, এবং অচিরাৎ ষাট পৃষ্ঠাব্যাপী একটি সমগ্র ল্যাটিন শব্দকোষ মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। অনেকে মনে করেন যে, প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানে তাঁর গভীর আগ্রহ থেকেই ভাষাবিজ্ঞানে তাঁর প্রথম পাঠ সূচিত হয়েছিল।২১

পলাস´পিউরী ত্যাগ

প্রায় চৌদ্দ বৎসরকাল পলাস´পিউরীর জীবন উইলিয়মের। পল্লীপ্রকৃতি, ভিতর স্বভাব ও পারিবারিক উত্তাপে তাঁর ছেলেবেলার এই দিনগুলি রচিত হয়েছিল। কৈশোরে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কর্মপথের সূচনা।

তথাপি, তাঁর ছেলেবেলা নির্মল ও নিরঙ্কুশ ছিল বলা বোধহয় উচিত হবে না। আত্মকথাকে প্রকাশ্য করে তোলাতে কেরীর আপত্তি ছিল সত্য, কিন্তু আত্মভাষণে তাঁর জীবনের দুর্বলতার প্রসঙ্গকে তিনি কখনো আড়ালও করেন নি। তিনি স্পষ্টতই জানিয়েছেনঃ "My companions were at this time such as could only serve to debase the mind."২২ শিক্ষায় দীক্ষায়, আচার আচরণে বা মনোভাবে তখনকার পল্লীজীবন কোন দিক থেকেই বিশেষ উন্নত ছিল না; তাঁর নিজের পারিবারিক পরিবেশে পরিমার্জনা থাকলেও তাঁকে মিশতে হতো এইসব অনুন্নত পল্লীসহচরদের সঙ্গে। এবং তাদের জীবনের তরল ও মন্দস্বভাবের স্পর্শও তিনি স্বাভাবিকভাবেই এড়িয়ে চলতে পারেন নি। তাঁর জীবনেও সংসর্গদোষজনিত স্বভাবহানি এই সময় ঘটে থাকে।২৩ এইভাবে তাঁর ছেলেবেলার দিনগুলি যেমন আনন্দিত উজ্জ্বল, আবার তেমনি এক পরিপার্শ্বগত অন্ধকার স্পর্শেও তা অংশতঃ কলুষিত।

এইভাবে ধীরে ধীরে তাঁর পলাস´পিউরীর দিন ফুরিয়ে এলো। এডমণ্ডের জীবন খুব সচ্ছল ছিল না, বারো বৎসর বয়সেই তিনি উইলিয়মকে কৃষিকাজ শেখাবার উদ্যোগ করেন। প্রায় দুই বৎসর কাল চাষ আর বাগানের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন উইলিয়ম, কিন্তু রোদ তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। বিশেষ ধরনের এক চর্মরোগ তাঁর ছেলেবেলা থেকেই ছিল, এবং তারই জন্যে রৌদ্রতাপে তিনি কাতর হতেন। ফলে এই কাজ তাঁকে ত্যাগ করতে হয়। বলা যেতে পারে, বারো বৎসর থেকেই উইলিয়মের জীবনে জীবিকাসন্ধানের আয়োজন সূচিত হয়েছিল: চাষের কাজে যখন অসুখের জন্য তিনি অনুপযুক্ত বিবেচিত হলেন, তখন এডমণ্ড তাঁকে হ্যাক্‌ল্‌টনের এক জুতো-নির্মাতার কাছে শিক্ষানবিশী হিসাবে ঢুকিয়ে দেন। চর্মকার বৃত্তিতে অতঃপর তাঁর জীবিকাসন্ধানের সূচনা। তৎকালীন ইংলণ্ডে বাল্যশ্রমের যে ব্যাপক প্রচলন ছিল, উইলিয়মকেও স্বদেশের শক্তি-অপচয়ের সেই অনিবার্যের কাছে এইভাবে আত্মসমর্পণ করতে হলো।

জীবিকা-সন্ধানেঃ হ্যাক্‌ল্‌টন্‌

পলার্সপিউরীর নয়-দশমাইল পূর্বে, হ্যাক্‌ল্‌টনের সম্ভ্রান্ত এক ভদ্রলোক. ক্লার্ক নিকল্‌স্‌, পেশায় জুতা প্রস্তুতকারক, উইলিয়মকে তাঁর সহযোগী হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অধীনে তিনি জুতা সেলাইয়ের কাজ শিখতেন; কিন্তু বছর দুইয়ের মধ্যেই নিকল্‌সের মৃত্যু হয়। এই সময় উইলিয়মের বয়স ষোল বৎসরের মত। এর কিছুকাল পর তিনি মনিব বদল করেন। কিন্তু নিকল্‌সের সহযোগী হিসাবে কাজ শেখবার সময়, তাঁর দোকানে, যে সামান্য গ্রন্থাদি ছিল, সেগুলি তিনি আগ্রহে পড়েছিলেন। এইসব গ্রন্থাবলীর অনেকগুলিই ধর্মগ্রন্থ, যেমন নিউ টেস্টামেণ্ট ছিল একখানি। গ্রন্থভাষ্যে তিনি অপরিচিত গ্রীক শব্দাদির প্রচুর ব্যবহার দেখেছিলেন। কিন্তু গ্রীক তাঁর অজানা, ফলে প্রতি রবিবার যখন তিনি নিজ গ্রাম পলার্সপিউরীতে যেতেন, সেখানকার টমাস জোন্সের কাছে তিনি তখন এসে উপস্থিত হতেন, এবং অপরিচিত গ্রীক শব্দগুলির ইংরেজি তর্জমা করে নিতেন। এই টমাস জোন্সের কাছেই ল্যাটিনে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন তিনি, এবং গ্রীক শব্দের অর্থান্বেষণে তাঁর কাছেই এইভাবে আবার তাঁর গ্রীক শিক্ষার সূচনা। জীবিকাই তাঁর জীবনে পরম বিষয় হয়ে আত্মপ্রকাশ করেনি, তাঁর ভিতরলোকে যে জ্ঞানপিপাসা প্রবল ছিল, এবং তা যে আড়ষ্ট স্তব্ধতায় অবসিত হয় নি, এই দৃষ্টান্তই তার প্রমাণ।

নিকল্‌সের মৃত্যুর পর, তাঁরই আত্মীয় হ্যাক্‌ল্‌টনের টি. ওলডের অধীনে তিনি শিক্ষানবিশীর কাজ গ্রহণ করেন। এখন পর্যন্ত তিনি জুতানির্মাণে দক্ষ হয়ে উঠতে পারেন নি, কাজেই পারিশ্রমিক তাঁর খুবই কম ছিল।[২৪] তদুপরি ওল্‌ডের ব্যবহার ছিল অত্যন্ত কর্কশ; তিনি মদ্যপ, বদমেজাজী, রূঢ়ভাষী ও ধর্মবাতিকগ্রস্তও ছিলেন। যখন তাঁর সমস্ত উপদ্রব কেরীকে নীরবে সহ্য করতে হতো, তখনো কিন্তু তাঁর সম্পর্কে তাঁর ধারণাঃ "a very moral man"। কেরী ও তাঁর সহ-শিক্ষানবিশ জন ওয়ারের সঙ্গে যোগ দিতেন মনিব ওল্‌ড, এবং ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের তর্ক হতো। এই ধর্মবিষয়ক আলোচনা ও তর্কের প্রয়োজনেই বিভিন্ন ধর্মবিষয়ক গ্রন্থপাঠে এই সময় কেরীকে মনোযোগী হতে হয়,[২৫] এবং ল্যাটিন, গ্রীকের সঙ্গে হিব্রুভাষা শিক্ষাতেও তিনি নিবিষ্ট হন। তবু ওল্‌ডের অধীনে কর্মরত থাকা কালেই তাঁর নৈতিক অধঃপাতও ঘটে। ওল্‌ডের ওখানে তিনি ধর্মবিষয়ক চর্চায় অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে-ছিলেন, ফলে তিনি মনে মনে মোটামুটি স্থির করে ফেলেছিলেন যে তাঁর বদভ্যাসগুলি, যেগুলিকে শাস্ত্রীয় নীতিজ্ঞানে পাপ বললে অন্যায় হয় না,—

যেমন lying, swearing ইত্যাদি,—তিনি ত্যাগ করবেন। তবু এক অদ্ভুত পরিবেশে তিনি তাঁর আচরণে সেই পাপের মুখ দেখতে পেলেন একদিন।২৬

সেই থেকে তাঁর মন ভিতরমুখী হয়ে উঠলো। ইতিপূর্বেই সহযোগী-বন্ধু ওয়ারের অনুপ্রেরণায় হ্যাক্‌ল্‌টন্‌ গির্জার প্রার্থনানুষ্ঠানে যোগ দিতে শুরু করেছিলেন তিনি। কিন্তু ভিতরে কোন রকমের ধর্মীয় বিশ্বাস গড়ে উঠছিল না। এই সময়ে একদিন ওল্‌নির প্রার্থনা সভায় টমাস চ্যাটারের অভিভাষণ শুনলেন তিনি, তাতে অংশতঃ তিনি আকর্ষণ বোধ করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে মিলিতভাবে হ্যাক্‌ল্‌টনে নতুন গির্জা স্থাপনেও অংশ গ্রহণ করেন। আর এরই মধ্যে নিকটবর্তী পল্লীতে কয়েকজনের সঙ্গে তাঁর পরিচয়সূত্রে তিনি উইলিয়ম ল'র রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে যান। এই সময়েই আবার চার্চ অব ইংলণ্ডের বিখ্যাত প্রচারক ওলনির টমাস স্কটের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। ওল্‌নি থেকে নর্দাম্পটনে যাতায়াতের পথে বছরে দু-তিনবার তিনি কেরীর মনিব ওল্‌ডের বাড়িতে আসতেন, এবং তখনই ওল্‌ডের এই সামান্য কর্মচারীটির মধ্যে অসামান্য ভবিষ্যতের সম্ভাবনা তিনি দেখতে পেয়েছিলেন।২৭

১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে হ্যাকল্‌টনে নূতন গির্জা স্থাপনের ব্যাপারে কেরী টমাস চ্যাটারের সঙ্গে তাঁর ভাবী শ্বশুর ড্যানিয়েল প্ল্যাকার্ড ও শ্যালকেরও সহযোগী হয়েছিলেন। ঐ বৎসরই ১০ই জুন, তাঁর মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে, মনিব ওল্‌ডের শ্যালিকা ডরোথি প্ল্যাকার্ডের সঙ্গে কেরীর বিবাহ হয়। ডরোথি নিরক্ষরা ছিলেন। বয়সেও কেরী অপেক্ষা তিনি বছর পাঁচেকের বড় ছিলেন।২৮ ওল্‌ডের মৃত্যু হলে তিনি স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে থাকেন। নিজের ছোট্ট পরিচ্ছন্ন গৃহে তাঁর জুতো সেলাইয়ের কাজ চলে, সঙ্গে লেখাপড়া আর বাগান রচনার কাজ। ধর্মবিষয়ে তাঁর অনুসন্ধিৎসার শেষ ছিল না, কপর্দকহীন অবস্থায় ওলনিতে ছুটে গিয়েছেন ডক্টর রাইল্যাণ্ডের অভিভাষণ শুনবার জন্য। এই সময় টাউসেস্টারের জনৈক মিঃ স্কিনারের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ হন, এবং তিনি তাঁকে Hall-এর "Help to Zion's Travellers" নামক গ্রন্থখানি উপহার দেন। এই গ্রন্থখানি কেরীকে ধর্মানুসন্ধানে বিশেষ সহায়তা করে। ধীরে ধীরে ব্যাপ্টিস্ট মতবাদের দিকে তিনি ঝুঁকে পড়েন, এবং ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর তারিখে নর্দাম্পটন গির্জার অনতিদূরে জন রাইল্যাণ্ড তাঁকে ব্যাপ্টিস্ট মতে দীক্ষিত করেন। ওল্‌নির সাটক্লিফের সঙ্গে, এবং রাইল্যাণ্ড, ফুলার ও পীয়র্সের সঙ্গে ইতিমধ্যে তাঁর পরিচয় হয়ে যায়, এঁরা প্রত্যেকেই

পরবর্তীকালে কেরীর সাহায্যকারী, শুভানুধ্যায়ী ও সহযোগীবান্ধব রূপে উল্লিখিত হয়েছেন।

কিন্তু কেরীর জীবিকাসন্ধান কখনোই সন্ধানের সীমা অতিক্রম করে তাঁকে স্থির নিশ্চয়তায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। ছেলেবেলা থেকেই তিনি কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন, মেরী কেরী ও ভাই টমাস কেরীর বিবরণে তাঁর চরিত্রের এই দিকটির প্রসঙ্গ অতি নিশ্চিতরূপে নিরূপিত। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপক পদে বৃত হওয়া পর্যন্ত জীবিকাসন্ধান ও জীবনানুসন্ধানের অতি কঠিন পরীক্ষায় তিনি অগ্রসর হয়েছেন। দারিদ্র্য সত্ত্বেও অদমনীয় প্রাণশক্তি ও পরিশ্রম করবার শক্তি তাঁকে কখনোই স্তব্ধ হতে দেয়নি। হ্যাক্লটনের জীবনেও তাঁর জীবিকা ছিল অনিশ্চিত ও পরিশ্রমসাধ্য, দারিদ্র্য অতি ঘনিষ্ঠ সহচর। স্বাধীন ব্যবসায় নিবিষ্ট হবার কিছুদিনের মধ্যেই ব্যবসায় ভীষণ মন্দা দেখা দেয়, তিনি ক্ষতি স্বীকার করেও তাঁর ব্যবসার প্রায় সব কিছুই বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। সেই পরম অনটনের মধ্যে তাঁর শিশুকন্যা ও তাঁর নিজের ব্যাধি উপস্থিত হয়। কন্যা অ্যানের মৃত্যু হয় ও তিনি অতি কষ্টে রোগ-মুক্ত হন। এই ব্যাধি তাঁর প্রথম সন্তান বিচ্ছেদের কারণ যেমন একদিকে, অন্যদিকে তেমনি মাত্র বাইশ বৎসর বয়েসে এরই ফলে তাঁর মাথার টাক পড়ে। তাঁর সেই পরম দুর্যোগের দিনে পলার্সপিউরীর বান্ধবদের আর্থিক সাহায্যে তিনি কোনক্রমে বেঁচে থাকতে পেরেছিলেন মাত্র।

মোল্‌টনে, ১৭৮৫

কেরীর জীবনের এর পরের পটভূমি মোল্‌টনে স্থানান্তরিত হয়। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দেই তিনি সম্ভবতঃ মোল্‌টনে এসে থাকবেন।২৯ হ্যাক্‌ল্‌টন্‌ থেকে মোল্‌টনে তিনি জীবিকার সন্ধানেই স্থান পরিবর্তন করেছিলেন; এখানে জুতো-সেলাইয়ের কাজের অনিশ্চয়তা থেকে তিনি উদ্ধার পেতে চেয়েছিলেন। মোল্‌টনে এসে তিনি একটি প্রাথমিক ধরনের স্কুল খুলে তার শিক্ষা পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন।৩০ শিক্ষকতার কাজে কিন্তু তিনি নিজেই চরিতার্থ বোধ করতে পারেননি। হ্যাক্‌ল্‌টনে থাকাকালীন ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দেই ক্যাপ্টেন কুকের সাগর অভিযানের কাহিনী তিনি পড়েছিলেন, এবং এই গ্রন্থ তাঁকে তখনই বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিল।৩১ দক্ষিণ সাগরের দেশসমূহে, যেখানে অনন্ত নিগ্রহে মনুষ্য-জাতি অন্ধকারযাপন করে, যেখানে খ্রীষ্টধর্মালোক পৌঁছোয়নি, সেইসব দেশ ও মানুষ সম্পর্কে এই গ্রন্থপাঠেই তাঁর আগ্রহ জন্মে। মোল্‌টনের

স্কুলে, ছাত্রদের কাছে নিজের হাতে তৈরী করা গ্লোব ব্যবহার করে যখন তিনি ভূগোল পড়াতেন, তখনও সেই আলোড়ন তিনি মনের মধ্যে ঢের পেতেন। সেখানে তার নিজের বাড়িতেও বড় বড় কাগজে পৃথিবীর মানচিত্র এঁকে দেয়ালে টাঙিয়ে রেখেছিলেন, এবং সেই মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে বৃহৎ জগৎপরিধি, বৃহৎ অন্ধকার মানবসংসারের উদ্ধারভাবনায় নিবিষ্ট থাকতেন। আর স্কুলশিক্ষক হিসাবে এদিকে দারিদ্র্যের হাতে ধরা না দিয়েও তাঁর উপায় ছিল না। কিন্তু মোল্‌টনে এসে তিনি ধর্মীয় প্রচারণায় বিশেষ উৎসাহী ও সক্রিয় হয়ে ওঠেন, এবং সামান্য দিনমজুরের আয়ের চেয়েও কম পারিশ্রমিকে গ্রামের যাজক বৃত্তি গ্রহণ করেন। সংসার-যাত্রা নির্বাহের পক্ষে এই আয় খুবই নগণ্য ছিল; ফলে তাঁর পুরাতন বৃত্তি, জুতা সেলাইয়ের কাজটিও তাঁকে পাশাপাশি চালাতে হতো। কেটারিঙ ছিল তখন জুতো ব্যবসায়ের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র; প্রতি পনেরো-দিন অন্তর ঝুলি ভর্তি করে তৈরী জুতো নিয়ে তিনি কেটারিঙ যেতেন, এবং ফেরার পথে পরের পনেরোদিনের কাজের প্রয়োজনীয় সামগ্রী, চামড়া ইত্যাদি ক্রয় করে আনতেন। এই অবস্থাতেও তাঁর জ্ঞানপিপাসা স্তব্ধ হয়ে যায়নি। মোল্‌টনে বা নিকটবর্তী স্থানে যেসব গ্রন্থ পাওয়া যেত তা তিনি আগ্রহে পড়তেন, কখনো বা ওই স্বল্প আয়ের মধ্য থেকেও নিজেই দু-একখানা বই কিনতেন। তাঁর পড়াশুনা এখানে অনেকখানি বেড়ে যায়। গির্জায় যাবার আগে মূল গ্রীকে ও হিব্রুতে বা কখনো ল্যাটিন অনুবাদে তিনি শাস্ত্রগ্রন্থের অংশসমূহ পড়ে নিজেকে প্রস্তুত করে নিতেন। আবার এখানেই তিনি এই অবস্থার মধ্যে থেকেও ডাচ, ইটালিয়ান ও ফরাসীভাষা শিখতে থাকেন। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের এক বৃদ্ধা ভদ্র-মহিলার কাছে প্রাপ্ত গ্রন্থ অনুসরণে তিনি ডাচভাষা শেখেন। এই তথ্য থেকে বোঝা যায় যে বিভিন্ন ভাষাশিক্ষায় তিনি যেমন অপরিসীম উৎসাহী ছিলেন, তেমনি নিজের ব্যক্তিগত উদ্যমেই এই শিক্ষা অগ্রসর হয়। তবে এইসব য়ুরোপীয় আধুনিক ভাষাশিক্ষা দ্বারা তিনি কতখানি উপকৃত হয়েছিলেন, তার কোন নির্দিষ্ট তথ্য নেই; কিন্তু ডক্টর রাইল্যান্ডের প্ররোচনায় ডাচভাষার একখানি গ্রন্থ তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন বলে জানা যায়।৩২

এইভাবে দেখা যায় যে কেরীর জীবনে মোল্‌টন বাসের কয়েকটা বছর (১৭৮৫-১৭৮৯), পরম দারিদ্র্যভোগ সত্ত্বেও নানাদিক থেকেই বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ হয়েছিল। ধর্মীয় জীবন ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ, জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে স্থির নিশ্চিত পদক্ষেপ, রাইল্যান্ড-সাটক্লিফ ও প্রধানতঃ ফুলারের সঙ্গে

নিবিড় ঘনিষ্ঠতা, অন্ধকারবাসী হিন্দুদের মুক্তির জন্য অভিলাষ ও প্রথম গ্রন্থানুবাদ—সবদিক থেকেই কেরী এই সময় নিজেকে অনেকখানি সংগঠিত করে নিতে পেরেছিলেন।

এইখানে তাঁর তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলঃ ফেলিক্স, উইলিয়ম ও পিটার।

লেস্টার, ১৭৮৯

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কেরী লেস্টারে চলে আসেন। শহর থেকে বেশ কিছু দূরে হার্ভে লেনে যাজকবৃত্তি গ্রহণ করেন। প্রধানভাবে যাজক পরিচয়ে এখানেই তাঁর প্রথম প্রতিষ্ঠা, এবং যাজকরূপে এখানে প্রথমেই তিনি উপাসকদের সামগ্রিক অভ্যর্থনা লাভ করতে পারেন নি, তবে আপনকার্যে তিনি অবিচল নিষ্ঠা ও স্থৈর্যে অগ্রসর হতে থাকেন। তিনি তাঁর জুতো-সেলাইয়ের কাজ ও শিক্ষকতার কাজও পাশাপাশি সম্পাদন করতেন।৩৩ হার্ভে লেনে উপাসনা-ক্ষেত্রের প্রায় উল্টোদিকেই তিনি থাকতেন, তাঁর বাসস্থানটিও ছোট ছিল। এই বাড়িতেই তাঁর চর্মকারবৃত্তি চর্চা করতেন তিনি, কিন্তু বই থাকতো পাশেই, এবং নিজের বাগানের সুন্দর ফুল সাজানো থাকতো জানালায়। এখানেও তিনি একটি স্কুল খুলেছিলেন, মোল্টনে শিক্ষকতা-কাজে তাঁর মধ্যে যে নৈরাশ্য ছিল, এখানে তা থেকে তিনি অনেকাংশে মুক্ত হতে পেরেছিলেন। লেখাপড়া তথা জ্ঞানার্জনে তাঁর আগ্রহ এমনই প্রবল ছিল যে তা প্রায় সর্ববিদিত হয়ে গিয়েছিল। ডক্টর আর্নল্ড তাঁর সুন্দর লাইব্রেরীটি ব্যবহার করার জন্যে কেরীকে আহ্বান জানান। এই লাইব্রেরীটি কেরীর জ্ঞানার্জনে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল, এবং এখানে সংগৃহীত গ্রন্থসমূহের একটি বড় অংশ ছিল বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে কেরীর যে উৎসাহ ছিল, এখানে তারও পরিচয় প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং সেই সূত্রে রবার্ট ব্রেউইনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মে।

লেস্টারে কেরীর বৈষয়িক অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়েছিল বলা চলে। কিন্তু সপ্তাহের সাতটি দিনই কর্মসূচিতে ভরে থাকত। তাঁর লেস্টারের জীবনধারা সম্পর্কে তিনি পিতা এডমণ্ডকে চিঠি লিখেছিলেন: সেই চিঠির সূত্র ধরে জেমস্ কালরস কেরীর লেস্টারের জীবনের কর্মধারার পরিচয় তুলে ধরেছেন এইভাবেঃ "Monday was devoted to the study of languages; Tuesday to science and history; On Wednesday he lectured; Thursday was set apart for visitation; Friday and Saturday were spent in preparing for the Lord's Day; On that day he preached morning and afternoon,

at home, and evening in a neighbouring village and at home alternately. His school began at nine in the morning, and continued till four in winter and five in summer."৩৪ এই পরিচয়-জ্ঞাপক বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বলা যায় যে, লেস্টারে তিনি অতি কর্মব্যস্ত দিন যাপন করতেন। এখানে জাত তাঁর শিশুকন্যা লুসি-র মৃত্যুও এই সময়ে তাঁকে বিশেষ বিষণ্ণ করে তুলেছিল।

আর এখানেই হিদেনদের মুক্তির জন্য মিশন-প্রতিষ্ঠার আগ্রহ অতি কার্যকরভাবে তাঁর মধ্যে সূচিত হয়। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে, হ্যাক্‌লটনে থাকাকালীন কুকের সাগর-অভিযান কাহিনী পড়েই তিনি অন্ধকারক্লিষ্ট অখ্রীষ্টান অধিবাসীদের জন্য বেদনা অনুভব করেছিলেন; মৌল্‌টনে বাসকালে স্কুলের ছাত্রদের ভূগোল পড়াতে পড়াতে সেই বেদনা আরো ঘনীভূত হয়, এবং তিনি অনালোকিত অখ্রীষ্টান জনসমাজ সম্পর্কে একটি সমীক্ষা করেন। এই সমীক্ষার ফসলই তার বিখ্যাত "An Enquiry...". এই পুস্তিকাটি মৌল্‌টনে থাকতেই তিনি লিখেছিলেন। মিশন ও মিশনারী সম্পর্কে তাঁর তখনকার আগ্রহ বিশেষ সম্বর্ধিত হয়নি। লেস্টারে আসবার পর থেকে তাঁর এই উদ্দেশ্য প্রকাশে আর অকারণ বিলম্ব করেননি। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ক্লিপস্টোনে ব্যাপ্টিস্ট মণ্ডলীর বসন্তকালীন সভায় কেরী সরাসরি নিজের মনোভাব প্রকাশ করলেন মিশন প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ তুলে, এবং জিজ্ঞাসা করলেনঃ "If it were not practicable and our bounden duty to attempt somewhat toward spreading the Gospel in the heathen world...". সমবেতরা তৎক্ষণাৎ এবিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপারগ ছিলেন, তবে যে কিছু করা উচিত সে-বিষয়ে মোটামুটি একমত হয়েছিলেন। সেই সভান্তেই সদস্যরা কেরীকে তাঁর "Enquiry"-র পাণ্ডুলিপিখানি মুদ্রিত করবার জন্য অনুরোধ জানান। পরের বৎসর, অর্থাৎ ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর এই বিখ্যাত পুস্তিকাটি মুদ্রিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে ও প্রচারিত হয়।৩৫ ঐ বৎসরই ৩১শে মে নর্দাম্পটন গির্জার সভ্যরা নটিংহামের ফ্রায়ার লেনে একটি সভায় মিলিত হন। এই সভায় কেরী তাঁর পুস্তিকার দুটি প্রধান প্রসঙ্গ বক্তৃতাকালে উপস্থিত করেনঃ "Expect great things from God" এবং "Attempt great things for God." কেরীর বক্তৃতার ভাবাবেগে উপস্থিতবর্গ মুগ্ধ হলেও মিশন সম্পর্কে সদস্যরা দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারেন না। অবশেষে কেরীর পীড়াপীড়িতে সভার শেষ মুহূর্তে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় "That a plan be

prepared against the next ministers' meeting at Kattering for the establishment of a Society for propagating the Gospel among the heathen."

কেটারিঙের এই সভা বসে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর। এই সভাটিকে ঐতিহাসিক বললে অত্যুক্তি হয় না। সেইদিন সন্ধ্যার আলোচনা-চক্রে হিদেনদের মধ্যে খ্রীষ্টবাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি সমিতি গঠিত হয়।৩৬ এন্‌ড্রু ফুলারকে সম্পাদক করে, এই উদ্দেশ্যে একটি ছোট কমিটিও তৈরী হয়ে যায়; জন্ রাইল্যান্ড, জন্ সাট্‌ক্লিফ, উইলিয়ম কেরী ও পরে স্যামুয়েল পীয়ার্স এই কমিটির সদস্যপদে বৃত হন। সেই ব্যাপ্টিস্ট মিশনারী সমিতির প্রথম সভা এবং সেখানেই সেই রাত্রে সমবেতদের মধ্য থেকে সমিতির তহবিলে তের পাউন্ড আড়াই শিলিং চাঁদা সংগৃহীত হয়। এইভাবে এক গভীর উদ্দীপনায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হলো বটে, কিন্তু সমিতি তাঁদের করণীয় সম্পর্কে তখনও খুব স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারেন নি। অথচ সমিতির সার্থকতা প্রমাণ করতে না পারলে, সমস্ত উদ্যমই নিষ্ফল হয়ে যায়; ফলে অতি দ্রুত সমিতির পরবর্তী সভা আহ্বান করা হয়।৩৭ তৃতীয় সভা বসে ঐ বৎসরই ১৩ই নভেম্বর, ঐ সভায় অনুপস্থিত কেরীর একটি চিঠি পঠিত হয়। ঐ চিঠিতে কেরী জন টমাস নামে জনৈক ডাক্তার ভদ্রলোকের প্রসঙ্গ সমিতির কাছে উত্থাপন করেন।

জন টমাস৩৮

টমাস পেশায় চিকিৎসক, কিন্তু ধর্মপ্রচারে তিনি বিশেষ উদ্দীপনা বোধ করতেন। তিনি ইতিপূর্বে দু'বার বাংলাদেশে গিয়েছিলেন, বাংলাভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন অংশতঃ, এবং সেখানে খ্রীষ্টমাহাত্ম্য প্রচারণায় আগ্রহীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। প্রচারণার জন্য জাহাজের চাকুরি পর্যন্ত তিনি ত্যাগ করেছিলেন। লন্ডনের এব্রাহাম বুথ ও ডক্টর স্টেনেট্‌-এর সঙ্গে ভারতের মিশন স্থাপন প্রসঙ্গে তিনি পত্রালাপও করেছেন। কিন্তু অস্থিরমতি ও দুর্বল-চরিত্র ছিলেন বলে তাঁকে স্বদেশে ফিরে আসতে হয়েছিল, প্রায় কপর্দকহীন অবস্থায়, এবং ইংলন্ডের মাটিতে পৌঁছেও বাংলাদেশে প্রচারকার্যের জন্য যে ব্যাপক প্রস্তুত ক্ষেত্র আছে বলে তাঁর বিশ্বাস, তা তিনি ভুলতে পারেন নি। তাই সেখানে আবার ফিরে যাবার জন্যে যখন তিনি অর্থ সংগ্রহ করছিলেন, ঠিক তখনই নর্দাম্পটন-শায়ারের ব্যাপ্টিস্ট মিশনারীদের আন্দোলন সম্পর্কে তিনি অবহিত হন। টমাস অচিরেই কেরীর সঙ্গে চিঠিতে যোগাযোগ করে তাঁর বাসনা ও

অভিজ্ঞতার কথা তাঁকে জানালেন। বাংলাদেশে ফেরার জন্যে যখন তিনি অর্থ সংগ্রহ করছিলেন, তখন সেখানে প্রচারকার্যের জন্য একজন সঙ্গীও খুঁজছিলেন পাশাপাশি। কেরীকে এই কাজে আত্মনিয়োগ করবার জন্যও তিনি আহ্বান জানান। কেরী সমিতির কাছে টমাসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে পাঠান, এবং বলেন যে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ব্যাপ্টিস্ট মিশনের তহবিলের সঙ্গে টমাসের ব্যক্তিগতভাবে সংগৃহীত অর্থ মিলিয়ে মিশন প্রেরণে সুবিধা অনেক। সমিতি কেরীর চিঠির ওপর ভিত্তি করে টমাস-অনুসন্ধানে ব্রতী হলেন। সমিতির কাছে টমাস আত্মবিবরণী দাখিল করেন। এই বিবরণীতে বাংলাদেশের জীবন ও সেখানে তাঁর প্রাক্তন ক্রিয়া-কলাপের সূত্র বিবৃত হয়। সমিতির পরবর্তী সভায়, কেটারিঙে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী তারিখে, টমাসকে বাংলাদেশে ব্যাপ্টিস্ট মিশনের পক্ষে প্রচারক হিসাবে প্রেরণ করবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, এবং তাঁর সঙ্গী হিসাবে কেরী যখন নিজেই নিজের নাম প্রস্তাব করেন, তখন তা-ও সমিতি গ্রহণ করেন। টমাস কেটারিঙের সেই সভায় স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়ে সমিতির প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন।

যাত্রার আয়োজন

টমাসের সঙ্গে কেরীর যোগাযোগ অনেকটা আকস্মিক, এবং টমাসের সঙ্গে যোগাযোগের ফলেই সম্ভবতঃ সুদূর বাংলাদেশ ব্যাপ্টিস্ট মিশনারীদের কর্মক্ষেত্ররূপে নির্বাচিত হয়েছিল।৩৯ ইতিপূর্বে হিদেনদের মধ্যে ধর্ম-প্রচারের কথা তাঁরা বলেছেন, কিন্তু ভারতবর্ষ বা বাংলাদেশের হিন্দুদের প্রসঙ্গ নির্দিষ্টরূপে কখনোই উচ্চারিত হয়নি। টমাসই বাংলাদেশের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন এবং মিশনারীদের লক্ষ্য সেদিকে নিবদ্ধ হয়।

কর্মক্ষেত্ররূপে বাংলাদেশের নির্বাচন বহিরঙ্গ লক্ষণে খুবই সুবিধাজনক বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। কেননা বাংলাদেশে তখন মোটামুটিভাবে ইংরেজ কম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত। গভর্নর জেনারেল পদের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কম্পানীর শাসন ব্যাপারে অনিশ্চিত মনোভাবের নিরসন ইতিমধ্যেই হয়েছিল। কিন্তু কম্পানী যখন শাসনক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন থেকেই বিদেশের মাটিতে আপন অধিকার নিরুপদ্রব করবার ব্যবস্থা করা প্রাথমিক কৃত্য বলে মনে করেছিলেন। কম্পানী ধর্মপ্রচারক ও পাদ্রীদের কখনোই সহজ দৃষ্টিতে দেখতে পারেননি। এর প্রধান কারণ অবশ্যই নূতন দেশে শাসনের প্রাথমিক অবস্থায় তাঁদের ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণের প্রতি আগ্রহ। কম্পানীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে

তাঁদের এই মনোভাবে বিচক্ষণতারই পরিচয় পাওয়া যাবে। তদুপরি যে-সব যাজকরা বাংলাদেশে এসেছিলেন, তাঁদের আচরণেও মর্যাদা ও সম্ভ্রমের অভাব ছিল বলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মনে করতেন। শুধু মিশনারীদের জন্য নয়, কম্পানীর লাইসেন্স ভিন্ন ভারতবর্ষে যে-কারো আসবার ব্যাপারকে কম্পানী বাধা দিতে চেয়েছেন, এবং সেইভাবে পার্লামেণ্টে আইনও বিধিবদ্ধ হয়েছিল। এই আইনভঙ্গ-কারীদের দণ্ড নির্দিষ্ট হয়েছিল কারাবাস। কিন্তু ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কম্পানীর চার্টারের নবীকরণের সময় এই দণ্ড অংশতঃ শিথিল করা হয়, এবং কারাবাসের বদলে বহিষ্কার দণ্ড নির্দিষ্ট হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে কেরী ও টমাসের বাংলাদেশ গমন খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। কেরীও তাঁদের শেষ পর্যন্ত ভারতযাত্রা সম্ভব হবে কিনা সে-সম্পর্কে সংশয়াচ্ছন্ন ছিলেন। কিন্তু সংকল্প দৃঢ় ছিল, কাজেই যাত্রার আয়োজন চলতে থাকে।

এদিকে কেরীর স্ত্রী তাঁর এই আসন্ন ভারতযাত্রাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। তৎকালে ইংরেজ সমাজে সপরিবারে ভারতযাত্রার রেওয়াজ ছিল না, কিন্তু মিশনারী হিসাবে ভারতযাত্রায় কেরী সপরিবারেই যেতে চেয়েছিলেন। ডরোথি এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন নি। পিতা এডমণ্ডও পুত্রের সুদূর প্রবাসযাত্রার কথা শুনে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। পারিবারিক দিক থেকে এই নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির জন্য সম্ভবতঃ কেরী প্রস্তুত ছিলেন না, কিন্তু সিদ্ধান্তে ও প্রত্যয়ে কেরীর ভিতরলোক তখন প্রদীপ্ত, ব্যাপ্টিস্ট বন্ধুদের শুভকামনাও তিনি পাচ্ছিলেন। এই অবস্থায় পিডিংটনের শ্বশুরালয়ে কেরী তাঁর স্ত্রী ও পুত্রদের পাঠিয়ে দেন। লেস্টারে ২০শে মার্চ তারিখে এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে কেরীর বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। কেটারিঙে জানুয়ারি মাসের সভার পরই লেস্টারের চার্চে কেরী মার্চ মাসে চার্চ ত্যাগ করবার বাসনা জ্ঞাপন করে নোটিশ দিয়েছিলেন; চার্চবুকে ২৪শে মার্চ ১৭৯৩ তারিখে লেখা আছেঃ "Mr. Carey our minister left Leicester to go on a Mission to the East Indies."৪০ অবশেষে ২৬শে মার্চ তারিখে পরিবারের কাছ থেকে তিনি বিদায় গ্রহণ করেন, এবং টমাসের সঙ্গে লণ্ডনের পথে অগ্রসর হন। সেখানে ভারতযাত্রার প্রয়োজনীয় লাইসেন্স সংগ্রহ করে যাত্রারম্ভ করবেন, এই ছিল বাসনা।

কিন্তু লণ্ডনে অনেক চেষ্টাতেও তাঁরা ভারতযাত্রার ছাড়পত্র বা লাইসেন্স সংগ্রহ করতে পারলেন না।৪১ কিন্তু 'আর্ল অব অক্সফোর্ড' জাহাজ ভারতযাত্রার জন্যে তখন প্রস্তুত হচ্ছিল, এবং এই জাহাজেই টমাস ডাক্তার

হিসাবে কার্যরত অবস্থায় ইতিপূর্বে দু'বার ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন। টমাস এই জাহাজের ক্যাপ্টেন হোয়াইট-কে তাঁদের ভারতে নিয়ে যাবার জন্যে আবেদন করেন। হোয়াইট বিনা লাইসেন্সেই তাঁদের নিয়ে যেতে সম্মত হলে তাঁরা জাহাজে আরোহণ করেন। কিন্তু যাত্রার পূর্বে বেশ কিছুদিন, প্রায় দু'মাসের মত নোঙর করে অবস্থান করতে হয় জাহাজের; এই সময় এক উড়ো চিঠি ক্যাপ্টেনের হাতে আসেঃ সেই চিঠিতে তাঁকে এই বলে সতর্ক করে দেওয়া হয় যে, জাহাজে লাইসেন্সহীন কোন ব্যক্তিকে বহন করা হলে কর্তৃপক্ষকে সে-সম্পর্কে অবহিত করে দেওয়া হবে। এই পত্র পেয়ে ক্যাপ্টেন স্বভাবতঃই বিচলিত হন এবং কেরী ও টমাস প্রভৃতিকে বাধ্য হয়েই তিনি জাহাজ ত্যাগের নির্দেশ দেন।

পরম নৈরাশ্যে কেরী-টমাসকে 'আর্ল অব অক্সফোর্ড' ত্যাগ করতে হলো। কিন্তু মিশনারী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ কেরী ও টমাস নতুন উদ্যমে ভারতযাত্রার পথ খুঁজে বার করতে সচেষ্ট হলেন। ইতিমধ্যে ডার্বিশায়ারের জনৈক মুদ্রাকর ওয়ার্ডের সঙ্গে কেরীর পরিচয় হয়েছিল লন্ডনে; মেরী কেরী জানাচ্ছেন যে সেই সাক্ষাৎকারের সময়ই কেরী ওয়ার্ডকে বলেছিলেনঃ "If we go to India, and succeed in our work, of which I have no doubt, we shall have need of your help."৪২ এই সাহায্য যে বাইবেল অনুবাদ ছাপার ব্যাপারেই ওয়ার্ডের কাছ থেকে তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। ১৮০০ খৃষ্টাব্দেই জশুয়া মার্শ-ম্যানের সঙ্গে ওয়ার্ড শ্রীরামপুরে এসে পৌঁছেছিলেন, এবং কেরীর প্রত্যাশা পূরণ করেছিলেন।

ভারতবর্ষে যাত্রার দ্বিতীয় পর্বের প্রচেষ্টায় টমাসের ভূমিকাটি খুবই উজ্জ্বল। তাঁরই বারংবার প্রচেষ্টায় কেরীর স্ত্রী ডরোথি কেরীর সঙ্গে ভারতবর্ষে যেতে এইবার সম্মত হন। এদিকে টমাস ভারতবর্ষে যাবার জন্য জাহাজের খোঁজ করতে থাকেন; বিদেশী জাহাজই এই ব্যাপারে বিশেষ সহায়ক হবে বিবেচনা করে বিদেশী জাহাজের সন্ধান চালান। এই সময় এক দিনেমার জাহাজ, 'ক্রন্ প্রিন্সেসা মারিয়া,' শ্রীরাম-পুর যাত্রার আয়োজন করছিল। এই জাহাজের মালিক ও ক্যাপ্টেন ক্রিস্টমাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে টমাস তাঁকে তাঁদের ভারতযাত্রায় সাহায্য করতে বিশেষ অনুরোধ জানান। ক্যাপ্টেন লাইসেন্স ছাড়াই তাঁদের ভারতে পৌঁছে দিতে রাজি হয়ে তাঁদের অনুগৃহীত করেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জুন বৃহস্পতিবার টমাসের সঙ্গে কেরী সপরিবারে ভারতের পথে স্বদেশের মাটি থেকে প্রথম ও শেষবারের মত প্রবাসযাত্রা করলেন।

২। বঙ্গদেশে : শ্রীরামপুরের পূর্ববর্তী

(নভেম্বর ১৭৯৩—১৭৯৯ ডিসেম্বর)

স্বদেশের তীরভূমি ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। যাত্রাপর্বের সংকটপূর্ণ উত্তেজিত ব্যস্ততার পর, এখন সমুদ্রবক্ষে সুদীর্ঘকালীন অবসর। কিন্তু যে প্রেরণায় কেরী বিদেশের পথে পাড়ি দিয়েছিলেন, তার চরিতার্থতার জন্য তিনি অবসরের কালকে আত্মপ্রস্তুতির কাজে নিবেদন করেন। জাহাজে প্রার্থনা করা ছাড়া, লেখাপড়ার কাজ তিনি আগ্রহের সঙ্গেই চালিয়ে যান। ধর্মবিষয়ক পড়াশুনা ছাড়া৪৩ তিনি বাংলাভাষাও শিখতে আরম্ভ করেন। তিনি যে জাহাজে এইভাবে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন, তার কারণ তিনি নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন : "...because it relates to my great work."৪৪ টমাসের সান্নিধ্যে বাংলাভাষা শিক্ষাকালেই বঙ্গদেশের তথা ভারতবর্ষের ভাষা সম্পর্কে তিনি সাধারণভাবে অবহিত হন; সংস্কৃত ও ফার্সী, এই দুই প্রধান ভাষা সম্পর্কে তিনি এই সময় সশ্রদ্ধ উল্লেখও করেন। আর এই জাহাজেই বাইবেলের বাংলা অনুবাদে টমাসকে তিনি সক্রিয়ভাবে সহায়তা দান করেন। বঙ্গোপসাগরের বক্ষ থেকে সোসাইটির কাছে লিখিত পত্রে কেরী জানাচ্ছেন যে জাহাজে থাকাকালীন টমাস ওল্ড টেস্টামেণ্টের অন্তর্গত 'জেনেসিস্' অংশের বাংলা অনুবাদে বিশেষ শ্রমস্বীকার করেছেন।৪৫ কেরীর এই পত্র লিখিত হয়েছিল, ১৭-১০-১৭৯৩ তারিখে। ২৬-১০-১৭৯৩ তারিখেই দেখা যাচ্ছে যে টমাসও এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তাঁর উচ্চারণ ছিল অকপট ও উচ্ছ্বসিত : "We have finished a translation of the book of Genesis on the passage and brother Carey helped me out in passages which I could have made nothing without him."৪৬ টমাসের এই উক্তি থেকে যদিও স্পষ্ট করে বোঝা যায় না কোন ভাষা থেকে অনুবাদ করা হয়েছিল বা বাংলা ভাষা অনভিজ্ঞ কেরীর সহায়তাই বা কি ধরনের, তথাপি কেরীর হিব্রুভাষা জ্ঞানই যে টমাসকে উপকৃত করেছিল, এই অনুমানে কোন বাধা নেই। মূল ভাষার সঙ্গে অনুবাদের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় কেরী যে পরবর্তীকালে বিশেষ নিবিষ্ট হয়েছিলেন, তার প্রথম প্রচেষ্টার উদাহরণ হিসাবে তাই এই সাক্ষ্যটি খুবই উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে কেরী এখানেই

বাইবেল অনুবাদের বৃহৎ কর্মযজ্ঞের সূচনা করেছিলেন, এবং বাইবেল অনুবাদের ব্যাপারে ইতিমধ্যেই যে তিনি নিবেদিত ও মনোযোগী তার প্রমাণঃ সোসাইটির কাছে জাহাজ থেকেই তিনি 'polyglott Bible' ও প্রাচ্যদেশে প্রাচীন খ্রীষ্টশাস্ত্র অনুবাদের নমুনা 'gospel in Malay' পাঠাবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছেন।৪৭

বঙ্গদেশে

দীর্ঘ পাঁচমাস পরিশ্রম-সাধ্য সমুদ্রযাত্রার শেষে ১১ই নভেম্বর তারিখে তাঁরা কলকাতা এসে পৌঁছলেন। তাঁদের কম্পানীর কাছ থেকে নেওয়া যথাযোগ্য লাইসেন্স ছিল না, তথাপি কলকাতায় পদার্পণে তাঁদের বিশেষ অসুবিধা হয়নি। জাহাজঘাটায় রামরাম বসু উপস্থিত ছিলেন। এই-খানেই কেরীর সঙ্গে রামরাম বসুর ঐতিহাসিক পরিচয় হয়। কেরী সেদিন থেকেই এককালীন টমাসের মুন্সীকে মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে তাঁর মুন্সী নিযুক্ত করেন।৪৮ আগন্তুকদের জন্য রামরাম বসু বাসস্থান ইতিপূর্বেই ঠিক করে রেখেছিলেন, ফলে কলকাতা পৌঁছে বাসস্থান সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁদের কোন সমস্যায় পড়তে হয়নি। সাংসারিকতার ভার টমাসের ওপর ছেড়ে দিয়ে কেরী রামরাম বসুর কাছে বাংলা ভাষায় পাঠ গ্রহণ করতে শুরু করেন।

অনিশ্চিত বিক্ষিপ্ততা

কিন্তু কলকাতায় কেরীর পক্ষে বেশীদিন থাকা সম্ভব হলো না। কলকাতাবাস যে বিশেষ ব্যয়বহুল, এই কথাটা কয়েকদিনের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠলো। সামান্য যে অর্থ তাঁরা স্বদেশ থেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন, তা-ও দ্রুত ফুরিয়ে যেতে থাকলো। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই অল্প খরচে দিনপাত করা যায়, এইরকম জায়গায় স্থানান্তরিত হওয়া তাঁদের পক্ষে জরুরি হয়ে উঠলো। কলকাতা থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল উত্তরে হুগলীর ধারে পর্তুগীজ উপনিবেশ ব্যাণ্ডেলে তাঁরা চলে এলেন নভেম্বর মাসেই। তাঁর ধর্মপ্রচারের কাজে প্রাথমিক কতগুলি সুবিধার জন্যও ব্যাণ্ডেলে স্থানান্তরের বিষয়টি কেরী উপযুক্ত মনে করেছিলেন। কিন্তু এখানেও এই বিষয়ে খুব সুবিধে হয়নি প্রধানতঃ তাঁর দেশীয় ভাষাজ্ঞানের অভাবে।৪৯ ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি ব্যাণ্ডেল ছেড়ে নৌকাযোগে আরও উত্তরে যাত্রা করলেন। ১৬-১২-১৭৯৩ তারিখের তাঁর জার্নালে আছেঃ "...are now going further up the country, perhaps, to

Nuddea, Catwa, Gour or Malda, at persent it is uncertain which."৫০ তাঁর জীবনের অনিশ্চয়তার পরিচয় বোধহয় এই উক্তির মধ্যেই উপ্ত আছে। যাই হোক, এই যাত্রায় তাঁরা আসেন নবদ্বীপে; চৈতন্য-ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে এই স্থান একদিন হিন্দু ধর্ম ও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক কেন্দ্ররূপে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, আর টমাসের সঙ্গেও এই স্থানের পরিচয় প্রাতিষ্ঠিত হয়েছিল অনেক আগেই। এখানে তাঁরা খুব বেশিদিন থাকেননি।৫১ কিন্তু সেই অত্যল্পকাল-মধ্যেই সেখানকার পণ্ডিতসমাজের সঙ্গে অংশতঃ তাঁরা পরিচিত হতে পেরেছিলেন। নবদ্বীপে বাস করবার জন্যও তাঁরা পণ্ডিতদের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন।৫২

কিন্তু কোথাও নিশ্চয়তা প্রতিশ্রুত হচ্ছিল না। আর্থিক সংকটই এর জন্য প্রধানতঃ দায়ী, এবং টমাস দায়ী সেই আর্থিক সংকট তীব্র করে তুলবার জন্য। জুয়াখেলা ও ঋণগ্রহণের বদভ্যাসেই টমাস নিজের ও কেরী পরিবারের এই সময়কার দুঃসহতা সৃষ্টি করেছিল। নবদ্বীপ থেকে ব্যাণ্ডেল হয়ে বৎসরান্তে তাঁরা আবার কলকাতায় ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। কলকাতায় ফিরে টমাস ডাক্তারী চাকরী অনুসন্ধান করতে থাকেন, আর কেরী সপরিবারে ব্যবসায়ী নেলু দত্তের বদান্যতায় তাঁর মানিকতলার বাগানবাড়িতে এসে ওঠেন। এখানে টমাস তাঁর সঙ্গে থাকতেন না, এবং তাঁর দিনগুলি অসহায় কষ্টকরতায় কঠিন হয়ে ওঠে। এই বাড়িটি ছিল ছোট, আলো হাওয়া কম, হাতে টাকা নেই অথচ ব্যাধির উপক্রম সূচিত হচ্ছিল। আর এই অবস্থায় পত্নী ডরোথি এই দুর্দশার জন্য দায়ী করে প্রতি মুহূর্তে কেরীকে অভিযুক্ত করছিলেন। যখন ঘরে এই অবস্থা, বাইরেও তখন কোন ভরসা ছিল না। টমাসের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগই সম্ভবতঃ তার কারণ। টমাসের চরিত্র শহরে বিশেষ নিন্দিত ছিল, তাঁর সঙ্গে কেরী ঘনিষ্ঠ ছিলেন বলে য়ুরোপীয় মহলেও তাঁর প্রতি কোন বিশেষ সহানুভূতির সৃষ্টি হয়নি। ডেভিড ব্রাউনের সঙ্গে কেরীর সাক্ষাৎকারের ঘটনাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।৫৩

কলকাতায় ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই, সম্ভবতঃ মুন্সী রামরাম বসুর সহায়তায়, কেরী কলকাতা থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল পূর্বে দেবহাট্টায় কিছু জমি নেবার ব্যাপারে মনস্থির করেছিলেন। দেবহাট্টা রামরাম বসুর পিতৃব্যের জমিদারীভুক্ত ছিল। এই সময়ে কলকাতায় টমাসের কাছ থেকে কিছু আর্থিক সাহায্য পেলে, অচিরাৎ রামরাম বসু সহ কেরী সপরিবারে কলকাতা ত্যাগ করে দেবহাট্টা অভিমুখে যাত্রা করেন। সুন্দরবন সীমান্তে দেবহাট্টা জল-জঙ্গলের দেশ, কাদামাটিতে অস্বস্তিকর তার পরিবেশ এবং

শ্বাপদ-সংকুল। নৌকাযোগে এখানে এসে পৌঁছবার পর কেরীর প্রায় কপর্দকহীন অবস্থা। এই স্থানান্তর কোন দিক থেকেই আকর্ষণীয় ছিল না; ভিতর উৎসাহে কেরী এরই মধ্যে উজ্জ্বলতা ও সম্ভাবনা দেখতে চেষ্টা করে থাকতে পারেন, কিন্তু তাঁর পরিবারের পক্ষে এই নির্বাসন মানসিক বিপর্যয়ের কারণ হয়েছিল। নৈরাশ্যে ও মানসিক কষ্টে পত্নী ডরোথি এই সময় মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। কিন্তু এই অবস্থাতেও দুটি বিষয় সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করে; প্রথমতঃ কেরী ভাষাশিক্ষা ও অনুবাদের কাজে যত্নশীল এবং বাংলাদেশ ও বাঙালী জনসাধারণ সম্পর্কে মনোযোগী, দ্বিতীয়তঃ, এই সংকটকালেও রামরাম বসু কেরীর সঙ্গ পরিত্যাগ করেন নি।

এদিকে টমাস বিভ্রান্তির চরম সীমায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। অবশেষে তিনি তাঁর প্রাক্তন আশ্রয়দাতা জর্জ উডনীর শরণাপন্ন হন এবং ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে মালদহের মহীপালদীঘি নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়করূপে সেখানে কাজে যোগ দেন। টমাস নিজের কাজ সংগ্রহ করেই ক্ষান্ত থাকলেন না, উডনীর কাছে কেরীর জন্যেও চাকরী প্রার্থনা করেন। উডনী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, মালদহের মদনাবাটি নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়কের কাজটি তিনি কেরীর জন্য নির্দিষ্ট করেন। এই সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেরী সুন্দরবনের অসুন্দর জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এলেন; রামরাম বসু সহ সপরিবারে সুদীর্ঘ নদীপথ অতিক্রম করে জুন মাসের ১৫ তারিখে মদনাবাটিতে পদার্পণ করেন। এইভাবে, যে টমাসের মতিচ্ছন্নতায় বঙ্গদেশের প্রথম দিনগুলি কেরীর কাছে নিদারুণ ও অনিশ্চিত হয়ে উঠেছিল, সেই টমাসেরই আনুকূল্যে তাঁর জীবনে আবার সুস্থির দিনের সমাগম সূচিত হয়।

নীলকুঠির দিনঃ মদনাবাটি

মদনাবাটির নীলকুঠিতে কেরীর জীবন নানাদিক থেকেই উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, বঙ্গদেশের জীবনে এখানেই তিনি সর্বপ্রথম নিশ্চয়তার স্বাদ অনুভব করেন; দ্বিতীয়তঃ, বঙ্গদেশে তাঁর বৃহৎ কর্মযজ্ঞের আয়োজন পর্ব এখানেই সূচিত হয়।

মালদার একটি ছোট গ্রাম মদনাবাটি, সামান্য কয়েকঘর দরিদ্র কৃষিজীবির বাস এখানে। এবং এদের মধ্যেই তাঁর প্রথম সক্রিয় জীবনের আরম্ভ। কিন্তু বাংলাদেশের অন্যান্য অনেক জায়গার মতই এখানকার জলহাওয়া স্বাস্থ্যকর নয়; কেরী নিজেই ম্যালেরিয়া রোগের তীব্র আক্রমণে ভগ্নস্বাস্থ্য হয়েছেন, তৃতীয় ছেলে পিটারকে হারিয়েছেন এখানে পৌঁছবার সাড়ে তিন

মাসের মধ্যে, তাছাড়া মানসিক রোগাক্রান্ত ডরোথির অসুস্থতারও কোন উপশম হয়নি। কিন্তু জীবিকার নিশ্চয়তা তাঁকে এই সময় স্বভাবতঃই কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর জীবিকা ছিল পরিশ্রম সাধ্য, তথাপি তিনি বৃহত্তর ক্ষেত্রে এখানে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। তিনি স্থানীয় অধিবাসীদের সাক্ষর করার প্রেরণায় বিদ্যালয় স্থাপন করেন, এবং জীবিকার কাজের বাইরে এই শিক্ষাদানের কাজেও তাঁকে অনেকখানি সময় ব্যয় করতে হতো। প্রতি রবিবার এবং সপ্তাহের অন্যদিনগুলির কোন কোন সন্ধ্যায় পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে বাইবেলের বাণী প্রচার করে বেড়াতেন, এর জন্য শুধু মানসিক পরিশ্রম নয়, যথেষ্ট কায়িক পরিশ্রমও তাঁকে করতে হতো, কেননা কখনো কখনো দশ ক্রোশ পর্যন্ত তাঁকে হাঁটতে হতো। এই ধর্ম প্রচারণার উদ্দেশ্যে ঘোরাফেরার মধ্যদিয়ে এদেশীয় জনসাধারণের জীবনধারা, রীতিনীতি, ধর্মবোধ ও নৈতিকতার অসারতা, কুসংস্কার, জাতি-ভেদ, পৌত্তলিকতা ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে অবহিত হতে পেরেছিলেন। সতীদাহ ও শিশুহত্যা যে বঙ্গদেশীয় হিন্দুসমাজে এক অতি দুর্মর অমানবিক আচরণ, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সে সম্পর্কে এই সময়েই তিনি মানবিকভাবনার আলোকে ক্লিষ্ট বোধ করেন। কেরীর ব্যক্তিত্বের যে বহুত্ব,- শিক্ষার ক্ষেত্রে, মানবহিত সাধনায়, ধর্মপ্রচারণায়, ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসায়—মদনাবাটির দিনগুলিতেই তার উন্মেষ লক্ষ্য করা যায়।

বস্তুতঃ, মদনাবাটির কাল কেরীর জীবনের আত্মপ্রস্তুতির কাল। এখানে অনেক কাজের মধ্যেও তিনি ভাষাশিক্ষার জন্য অনেকখানি সময় নির্দিষ্ট করে রাখতে পেরেছিলেন। রামরাম বসু বন্ধুতার আন্তরিকতায় তাঁর বাংলাভাষা শিক্ষায় এই সময় বিশেষভাবে নিবিষ্ট হয়েছিলেন। এক-দিকে রামরাম বসুর সহায়তায় যখন তিনি বাংলাভাষায় শিক্ষানবিশী করেছেন, তখনই পাশাপাশি তিনি বাইবেলের বাংলা অনুবাদে আত্মনিয়োগ করেছেন। কিন্তু ১৭৯৬ খৃীষ্টাব্দে তাঁর এই অন্তরঙ্গ সুহৃদের এক অতি নিকৃষ্ট নৈতিক অধঃপতনে তিনি বিশেষ মর্মাহত হন ও তাঁকে পরিত্যাগ করেন। এই ঘটনার কয়েকমাসের মধ্যেই, ১৭৯৬ খৃীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে, জন ফাউণ্টেন৫৪ নামক একজন মিশনারী যুবক কেরীর কাছে মদনাবাটিতে এসে পৌঁছান। বিলাত থেকে সোসাইটি স্কুল পরিচালনা ও বাইবেল অনুবাদে সাহায্য করবার জন্যই তাঁকে মিশনারীরূপে কেরীর কাছে পাঠিয়েছিলেন। ফাউণ্টেন অত্যল্প-কালের মধ্যে বাংলাভাষা শিখে নেন ও কেরীকে রামরাম বসুর অনুপস্থিতিতে বাইবেলের বাংলা অনুবাদে বিশেষভাবে সহায়তা

করেন। ইতিপূর্বেই বাংলায় অনূদিত বাইবেল মুদ্রণের ব্যাপারে কেরী উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন, মদনাবাটির জীবনে বাইবেল অনুবাদ প্রকাশে মুদ্রণযন্ত্র সংগ্রহের কাহিনী ফলতঃ এক অতি প্রধান অংশ।

কিন্তু ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কেরীর মদনাবাটির জীবনে ছেদ পড়ে। এই সময় জর্জ উডনী মদনাবাটির কুঠি বন্ধ করে দেন। ফলে কেরী আরেকবার বিশেষ বিপন্ন বোধ করেন। এই অবস্থায় তাঁর যাবতীয় সমস্ত সঞ্চিত অর্থ ব্যয়ে মদনাবাটির অনতিদূরে খিদিরপুর গ্রামে উডনীর কাছ থেকেই একটি নীলকুঠি কেনেন, এবং ফাউণ্টেন ও সদ্য-ক্রীত মুদ্রণযন্ত্রসহ সপরিবারে সেখানে উঠে যান। কিন্তু মদনাবাটি ত্যাগের পূর্বেই তিনি জানতে পারেন যে বিলাত থেকে সোসাইটির উদ্যোগে জশুয়া মার্শম্যান,৫৫ উইলিয়ম ওয়ার্ড,৫৬ ব্রান্সডন,৫৭ ও উইলিয়ম গ্রাণ্ট ও তঁদের পরিবারসহ একটি মিশনারীদল বাংলাদেশে আসছেন। ছাড়পত্রহীন এই মিশনারী দলটির স্বভাবতঃই কলকাতায় অবতরণ করা নিষিদ্ধ ছিল, এবং তাঁরা মাইল পনেরো উত্তরে হুগলী নদীর ধারে দিনেমার উপনিবেশ শ্রীরামপুরে অবতরণ করেন ও শ্রীরামপুরের দিনেমার শাসনকর্তা কর্ণেল বী-র আশ্রয় লাভ করেন। ইতিমধ্যে কেরী ফাউণ্টেনকে এই মিশনারীদলকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে কলকাতা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই দলটি শ্রীরামপুরে পদার্পণ করেন ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর তারিখে। আগন্তুকরা নভেম্বর মাসের ১৪ তারিখে ফাউণ্টেনের সঙ্গে ওয়ার্ডকে খিদিরপুরে পাঠিয়ে দেন অতঃপর তাঁদের করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ করবার জন্যে। কেরী প্রথমে আগন্তুক দের খিদিরপুরেই আসবার জন্যে আহ্বান জানান, কিন্তু পরে, সমস্ত দিক বিবেচনা করে নিজেই শ্রীরামপুরে এই নূতন দলের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে মনস্থির করেন। ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে স্বোপার্জিত অর্থে গড়ে তোলা খিদিরপুরের সম্পত্তি ত্যাগ করে ওয়ার্ড ও ফাউণ্টেনের সঙ্গে শ্রীরামপুর অভিমুখে রওনা হন। বৃহৎ কর্মসাধনার জগতে অনুপ্রবেশের মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে রইল ইতিমধ্যে অর্জিত ভারতীয় ভাষাজ্ঞান ও বাংলায় অনূদিত বাইবেলের পাণ্ডুলিপি আর উডনীর বদান্যতার পরিচয়চিহ্ন বহনকারী মুদ্রণযন্ত্রটি।

ভাষা-সন্ধান

এই সময় কেরীর জীবনের একটি বড় অংশ ভারতবর্ষীয় ভাষাশিক্ষার সাধনায় নিবেদিত ছিল। বাংলাদেশের মাটিতে পদার্পণের পর থেকেই প্রকৃতপক্ষে সাধনার সূচনা, এবং শ্রীরামপুরে আসবার আগেই অন্ততঃ

বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় তিনি যথেষ্ট অধিকার অর্জন করেছিলেন। বাংলাদেশ তাঁর কর্মক্ষেত্র বলেই বাংলা ভাষা শিক্ষায় তিনি প্রথমে যত্নবান হন, এবং বাংলা শিক্ষার অভিজ্ঞতায় ভারতবর্ষীয় ভাষার উৎস সংস্কৃতের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সংস্কৃত শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন।

কেরীর বাংলা ভাষাশিক্ষার ক্রমানুসরণ তাঁর লিখিত চিঠিপত্র ও জার্নালের সূত্রেই করা যেতে পারে:৫৮

৪-১২-১৭৯৩ : 'I am unacquainted with their language.' (p. 125)

৩-১-১৭৯৪ : 'I have already learned so much of the language, as to understand a few phrases, and many words;....The characters are about six hundred.' (p. 137)

২৭-১-১৭৯৪ : 'I have added to my knowledge of the language....This day finished the correction of the first chapter of Genesis, which Moonshi says is rendered into very good Bengali.' (p. 146)

২৯-১-১৭৯৪ : 'Have spent part of it in my study of Bengali.' (p. 147)

২১-৩-১৭৯৪ : 'I however am daily employed in learning the language,.....now begin to see that Bengali is a language which is very copious and abounds with beauties.' (p. 160)

২৯-৩-১৭৯৪ : 'O how long will it be till I shall know so much of the language of the country....But, bless God. I make some progress.' (p. 165)

৩১-৩-১৭৯৪ : 'A day of hard labour at Bengali.' (p. 165)

২৫-৫-১৭৯৪ : '....found myself much at a loss for words; however, I find myself begin to improve in my knowledge of the Hindu language. It is a considerable disadvantage that two languages are spoken all over the country, the Brahmuns and costs or Caests speak Bengali, and the common people Hindostani. I understand a little of both...' (p. 174)

২৬-৫-১৭৯৪ : 'Though imperfect in the knowledge of the language, yet, with the help of Moonshi, I

conversed with two Brahmuns in the presence of about two hundred people.' (p. 174)

৭-৭-১৭৯৪ : 'Had some profitable conversation with Moonshi this evening; and, indeed, he is the only conversable person in this place, all the natives here being very ignorant, and speaking a dialect which differs as much from true Bengali, as the Lancashire dialect does from true English; so that I am hard work to understand them, and to make them understand me.' (p. 187)

৯-৮-১৭৯৪ : 'The language is very copious, and I think beautiful. I begin to converse in it a little; ....Indeed, there are two distinct languages spoken all over the country, viz. the Bengali, spoken by Brahmuns and higher Hindus; and the Hindostani, spoken by the Mussulmans and lower Hindus, which is a mixture of Bengali and Persian.' (p. 195)

২২-২-১৭৯৫ : 'Poverty and perversion of language' (p. 221)

২৯-৫-১৭৯৫ : 'I have also for the purpose of exercising myself in the language, begun translating the gospel by John, which Moonshi afterwards corrects.' (p. 235)

১৩-৮-১৭৯৫ : 'Moonshi and Mohun Chund are now with me....extreme ignorance of the common people, who are not able to understand one of their own countrymen who speaks the language well, without considerable difficulty. They have a confined dialect, composed of a very few words, which they work about, and make them mean almost everything; and their poverty of words to express religious ideas is amazing,.......'Tis far otherwise, however, with them who speak the language well: the language is rich and copious.' (pp. 238-240)

২-১০-১৭৯৫ : 'The language spoken by the natives of this part, though Bengali, is yet so different from the language itself, that, though I can preach an hour with tolerable freedom, so as that all who speak the language well, or can write or read, perfectly understand me, yet the poor labouring people can understand but little; ....They have no word for love, for repent, and a thousand other things; and every idea is expressed, either by quaint phrases, or tedious circumlocutions: a native who speaks the language well, find it a years work to obtain their idiom.' (pp. 242-249)

৩১-১২-১৭৯৫ : 'I have been trying to compose a compendious grammar of the language, which I send you, together with a few pages of the Mahabharata, with a translation, which I wrote out for my own exercise in the Bengalee.'৬০

উদ্ধৃতিগুলি অনুসরণ করলে কেরীর বাংলা ভাষা শিক্ষার ক্রম ও প্রকৃতি বোঝা যায়। তিনি দেশীয় মুন্সীর সহায়তায় বাংলা শেখেন, এবং শিক্ষার উপায় রূপে অনুবাদ চর্চা করেন; অবাংলা বাইবেল থেকে বাংলায়, এবং বাংলা থেকে ইংরেজিতে—দুই দিক থেকেই এই অনুবাদ চলে; বাংলা ভাষার লিখিত ভিত্তি রূপে প্রচলিত বাংলা কাব্যই তাঁকে ব্যবহার করতে হয়, এবং হালহেডের বাংলা ভাষার ব্যাকরণ দ্বারা এই কাজে তিনি বিশেষ উপকৃত হয়েছিলেন।৬১ বাংলা ভাষার ছাত্র হিসাবে ভাষার প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর এইসব পর্যবেক্ষণ সব সময় অভ্রান্ত নয়, তবে তিনি বিশেষভাবেই লক্ষ্য করেছিলেন যে, ব্রাহ্মণ ও উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত ভাষা এবং নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ভাষার মধ্যে ব্যবধান অনেকখানি। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানদের ভাষা উপভাষাগত বিকৃতি ও বিদেশী ভাষার অনুপ্রবেশজনিত বিকৃতির জন্য তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং ব্রাহ্মণ ও উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের ভাষা প্রকৃত বাংলা রূপে তাঁর অনুমোদন লাভ করে। লক্ষণীয় যে, ভাষাশিক্ষায় অগ্রসর হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই যখন তিনি বাংলার ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত, তখন এই ভাষার শক্তির সীমাবন্ধন সম্বন্ধেও তিনি সচেতন।

মদনাবাটিতে উপস্থিত হবার পর বৎসর থেকেই, অর্থাৎ ১৭৯৫ সালেই

সংস্কৃতের প্রতি কেরীর আগ্রহ জন্মে। কিন্তু মদনাবাটিতে যোগ্য সংস্কৃত পণ্ডিতের অভাব ছিল, ফলে অনিশ্চিত ভাবেই তাঁর সংস্কৃত শিক্ষার সূচনা হয়। দুই পণ্ডিতের সহায়তায় তাঁর সংস্কৃত শিক্ষা অগ্রসর হতে থাকে;৬২ ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরের প্রথম দিকে ফাউণ্টেন যখন মদনাবাটিতে এসে পৌঁছান, তখন তিনি তাঁকে সংস্কৃত পণ্ডিতের কাছে শিক্ষারত দেখতে পেয়েছিলেন।৬৩ ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দেখা যায়, তিনি তখনও শিক্ষারত, কিন্তু তখন নিজে নিজেই সংস্কৃতে রচিত হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠে, কখনো বা অনুবাদে উদ্যোগী হতে পেরেছেন।৬৪ তিন বৎসর কাল সংস্কৃতের চর্চা করেও যখন সংস্কৃতে তাঁর অধিকার সম্পর্কে তিনি অনিশ্চিত বোধ করছেন,৬৫ তখনও দেখা যায় তাঁর ওই অসম্পূর্ণ সংস্কৃত জ্ঞান নিয়েই সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনায় বা অভিধান সংকলনে তিনি যত্নশীল। মনে হয় এই উদ্যমগুলি তাঁর নিতান্তই প্রাথমিক ধরণের, অর্থাৎ শিক্ষার্থীর আপন প্রয়োজনে রচিত খসড়াজাতীয় রচনা, পরবর্তীকালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সংস্কৃতের শিক্ষক নিযুক্ত হওয়ার পরই এই প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রন্থরচনার বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনায় সমর্পিত হয়েছিল। মদনাবাটিতে থাকতেই বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত কোলব্রুকের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে এবং এই তথ্য কেরীর সংস্কৃতশিক্ষার পরিচায়নে উল্লেখযোগ্য।

এই সময় হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষায়ও কেরী প্রযত্ন করেছিলেন। হিন্দুস্থানী রাজমহল থেকে দিল্লী পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতের প্রধান ভাষা. স্বভাবতই এই ভাষার প্রতি তিনি উদাসীন থাকেন নি। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে তিনি রাইল্যাণ্ডকে লেখেনঃ 'I have acquired so much of the Hindustani as to converse in it and preach for sometime intelligibly.'৬৬

৩। বঙ্গদেশেঃ শ্রীরামপুর ও পরবর্তী

(জানুয়ারী ১৮০০—১৮৩৪ জুন)

১৮০০ খৃীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি কেরী শ্রীরামপুরে এসে পৌঁছান, এবং নবাগন্তুক দলের সঙ্গে তাঁর এই মিলনেই শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠা সূচিত হয়। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কেরী এই মিশনের স্তম্ভপুরুষ ছিলেন।

কিন্তু এইখানে কেরীর জীবনকথা অনুসরণে যে বিভাগ পরিকল্পনা করা হয়েছে, সে-সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। 'স্বদেশের দিন' বা 'বঙ্গদেশেঃ শ্রীরামপুরের পূর্ববর্তী' বিভাগের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে কোন অস্পষ্টতা নেই, কেননা ওই দুই পর্যায়েই কেরীর জীবনকথা সরল-রেখায় অনুসরণ করা সম্ভব। কিন্তু 'শ্রীরামপুর' ও 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ' পর্যায়ে কেরীকে ওইভাবে লক্ষ্য করা সমীচীন নয়। কেননা, ১৮০০ খৃীষ্টাব্দের জানুয়ারিতে শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠা থেকে ওই বৎসর নভেম্বরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগদানের বিষয়ে ক্লডিয়াস বুকাননের সঙ্গে কেরীর মিলিত হওয়া পর্যন্ত কেরীকে শ্রীরামপুরের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা সম্ভব হলেও ১৮০১ খৃীষ্টাব্দ থেকেই কেরীর জীবন-ধারা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায়। এই সময় থেকে কেরী একদিকে যেমন শ্রীরামপুরের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, অপরদিকে তেমনি তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বিশিষ্ট অধ্যাপক। ১৮০০ থেকে ১৮৩৪ খৃীষ্টাব্দের মধ্যে অন্ততঃ ১৮০১ থেকে ১৮৩০ খৃীষ্টাব্দ পর্যন্ত কেরীর জীবন শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পরস্পরতায় রচিত। ফলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রসঙ্গকে বাতিল করে শ্রীরামপুরের কেরীকে লক্ষ্য করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি শ্রীরামপুরকে অগ্রাহ্য করে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পরিপ্রেক্ষিতেও তাঁকে অনুসরণ করা ভ্রমাত্মক হবে। প্রকৃত-পক্ষে, দুই প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগেই সাহিত্য ও সংস্কৃতির দৃষ্টিতে গৃহীত কেরীর ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বটি গড়ে উঠেছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতেই বর্তমান বিভাগটি লক্ষণীয়।

শ্রীরামপুর মিশন

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি শ্রীরামপুরে ব্যাপ্টিস্ট মিশন স্থাপিত হয়। কিন্তু শ্রীরামপুরের কাছে মিশনারীর অভিজ্ঞতা এই প্রথম ছিল না। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কার্ল ফ্রেড্‌রিখ্‌ স্মিড ও জোহানেস গ্র্যাসম্যানের নেতৃত্বে মোরেভিয়ান মিশনারীদের একটি দল শ্রীরামপুরে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেন। এঁরা বাংলা ভাষা শেখেন এবং বাংলা-মোরেভিয়ান শব্দকোষ প্রস্তুত করে প্রচারকার্যে ব্যাপৃত হন। অনতিকালের মধ্যে তাঁদের কর্মোদ্যোগের বিশালতা ও ক্ষমতার সীমার মধ্যে ব্যবধানটি উপলব্ধি করে তাঁরা অসহায় বোধ করেন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যর্থ মিশনটির অবলুপ্তি ঘটে। ওই ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দেই বিলাতে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারী সোসাইটির পত্তন হয়, ১৭৯৩-এ কেরী ভারতবর্ষে আসেন, এবং ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে, মোরেভিয়ান মিশনের অবলুপ্তির আট বৎসর কাল পরে, শ্রীরামপুরে নূতন উদ্যমে নূতন মিশনের কার্যক্রমের সূচনা হয়।

কিন্তু সূচনায় মিশনের অস্তিত্ব খুব নিরাপদ ছিল না। কথাটা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক থেকেই সত্য। মাত্র তিনশ পঁচাত্তর পাউণ্ড বা তিন হাজার টাকার মূলধন নিয়ে ছ'জন মিশনারী ও তাঁদের পরিবারবর্গের এই সূচনাকালকে সুস্থির ও সন্তোষজনক বলা যায় না। কাজেই প্রথম থেকেই পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা ব্যাপারে তাঁদের বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হয়। মালদহে থাকাকালে মোরেভিয়ান জীবনযাত্রার আদর্শ কেরী খুব কাছের থেকে দেখেছিলেন; বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে ওই আদর্শ কেরীর কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়ায় শ্রীরামপুরেও তা প্রবর্তন করা হয়। ওই আদর্শ অনুসারে স্থির হয়ঃ মিশনারীদের জীবনযাত্রার মান একই রকম হবে, তাঁদের ভবিষ্যতের উপার্জন মিশনের সাধারণ তহবিলে জমা দেওয়া হবে ও তা থেকে তাঁদের জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহ করা হবে; কেউ কোন ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে লিপ্ত হতে পারবেন না।৬৭ জীবনযাত্রার ধারা ও অর্থনৈতিক মীমাংসার সঙ্গে কর্তব্যকর্মের সুষ্ঠু বণ্টনেরও ব্যবস্থা করা হয়। কেরী মিশনের অর্থ ও ঔষধাদি রক্ষণাবেক্ষণের ভার নেন, ফাউণ্টেন হলেন প্রথম গ্রন্থাগারিক, মার্শম্যান ও তাঁর স্ত্রী হানা মার্শম্যান স্কুল খুললেন মিশনের আয়ের কথা ভেবে, ওয়ার্ড প্রেস বসালেন ও ছাপার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন ব্রান্সডন ও ফেলিক্‌স কেরীকে সঙ্গে নিয়ে।৬৮

১১ই জানুয়ারি, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে একটি ভাড়া বাড়িতে মিশনের কাজ সুরু হয়। ঐদিন কেরী শ্রীরামপুরের গভর্ণর বী-র সঙ্গে পরিচিত

হন, এবং বিকেলেই দেশীয়দের মধ্যে প্রচারকার্যে উদ্যোগী হন। কিন্তু ভাড়া বাড়িতে মিশনের কাজ বেশিদিন চলল না। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ব্যাপ্টিস্ট মিশনারী সোসাইটির নামে একটি বড় পাকা বাড়ি কেনা হলো ছ'হাজার টাকায়। মিশনারীরা সঙ্গে সঙ্গে এই বাড়িতে উঠে এলেন, এবং পাশের একটি ঘরে ছাপাখানা স্থাপন করলেন।

মিশন প্রেস

শ্রীরামপুর মিশন প্রেস বাংলাদেশের ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। শতাব্দীর প্রথমার্ধে, জশুয়া মার্শম্যানের মৃত্যুর পর ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেসের সঙ্গে মিলিত হয়ে যাওয়া পর্যন্ত, এই প্রেসটি বাংলাদেশের মুদ্রণের ইতিহাসকে মর্যাদাসম্পন্ন করেছে। ডার্বির মুদ্রাকর উইলিয়ম ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে নূতন বাড়ির পাশে এই প্রেস স্থাপিত হলো, তাঁকে সহায়তা করবার জন্য নিযুক্ত করা হলো ব্রান্সডন ও ফেলিক্স কেরীকে। উডনীর বদান্যতায় কেরী যে কাঠের মুদ্রণযন্ত্রটি ক্রয় করেছিলেন, সেইটিকে নিয়েই মিশন প্রেসের প্রথম কার্যক্রমের সূচনা। কলকাতা থেকে কেনা কিছু টাইপ আর বিলেত থেকে আনা কাগজ নিয়ে ওয়ার্ড অচিরাৎ পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু করে দিলেন। এই সময় দেশীয় সহায়তার পরিমাণ নগণ্য ছিল, ওয়ার্ডই প্রধানতঃ তাঁর মিশন সহকারীদের সঙ্গে মিলিত চেষ্টায় মাত্র তিন মাসের মধ্যে কেরীর নিউ টেস্টামেন্টের ছাপার কাজে অগ্রগতি দেখালেন। এই সময় প্রেসের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়; এর কারণ প্রধানতঃ (ক) কাঠের মুদ্রণযন্ত্রে একবারে এক পৃষ্ঠার বেশি ছাপা সম্ভব ছিল না, (খ) কেনা টাইপের পরিমাণের স্বল্পতা।

মার্চের গোড়ায় বিখ্যাত টাইপ নির্মাতা পঞ্চানন কর্মকার শ্রীরামপুরে এলেন। শ্রীরামপুর প্রেসে পঞ্চাননের যোগদান অবশ্যই কেরীর পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘটেছিল বলে মনে করা যায়। বাইরে থেকে টাইপ কিনে প্রেসের কাজ চালানো অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ বিবেচনায় কেরী প্রেস স্থাপনের সঙ্গে প্রেসের কাজ সহজ করবার জন্য তার পরিপূরক হরফ ঢালাইয়ের একটি বিভাগ স্থাপন করবার কথা ভেবেছিলেন। উত্তরবঙ্গ থেকে বাংলা টাইপের সন্ধানে কলকাতা এসে তিনি পঞ্চানন কর্মকারের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হয়েছিলেন, তিনি উইলকিন্সের সঙ্গে বাংলা হরফ নির্মাণে ইতিপূর্বে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, এবং উইলকিন্স বিলেতে চলে গেলে কলকাতার হরফ ঢালাইয়ের কারখানার তত্ত্বাবধায়করূপে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। কেরী শ্রীরামপুরে

হরফ ঢালাইয়ের কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা করবার পর থেকেই এই কাজে বার বার পঞ্চাননকে শ্রীরামপুরে যোগ দিতে অনুরোধ জানান এবং অবশেষে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথম দিকে পঞ্চানন শ্রীরামপুরে যোগ দেন।

অবশ্য শ্রীরামপুরে আসবার তিন বৎসর কালের মধ্যেই পঞ্চাননের মৃত্যু হয়। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি 'so fully communicated his art to a number of others, that they carry forward the work of type casting, and even of cutting the matrices with a degree of accuracy'.৬৯ এঁদের মধ্যে টাইপ কাটা ও ঢালাইয়ে সবচেয়ে বেশি উৎকর্ষ অর্জন করেন মনোহর কর্মকার।৭০ পঞ্চাননের পর মনোহর শ্রীরামপুর ফাউণ্ড্রির ভারপ্রাপ্ত হন। পঞ্চানন বাংলা ছাড়াও দেবনাগরী, ওড়িয়া টাইপ তৈরী করেছিলেন, মৃত্যুর আগে মারাঠি টাইপ তৈরীর কাজেও হাত দিয়েছিলেন। মনোহর টাইপ কাটার কাজে পঞ্চাননের কৃতিত্বকে অতিক্রম করে যান। চীনা ভাষার টাইপ প্রস্তুত করে তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তিনি বাংলা, দেবনাগরী, হিন্দী, পাঞ্জাবী, মারাঠি, ওড়িয়া প্রভৃতি প্রায় পনেরোটি ভাষার টাইপ প্রস্তুত করেন। মনোহরের পুত্র কৃষ্ণ কর্মকারও একই বৃত্তিতে শ্রীরামপুর প্রেসে আমৃত্যু নৈপুণ্যের সংগে কাজ করেছিলেন। পঞ্চানন যে কাজের সূচনা করেন, মনোহরের তত্ত্বাবধানে সেই কাজ অগ্রসর হয় এবং শ্রীরামপুর মিশন প্রেস ও ফাউণ্ড্রি ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠ মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের রূপ পায়। এরই সঙ্গে, প্রেসের পরিপূরক রূপে, কাগজের কল স্থাপনের চেষ্টা চলে; এবং এখানেই প্রথম পূর্বভারতের মেশিনচালিত কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হয়।৭১

শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রণের কাজ শুরু হলে মিশনারীরা সম্পূর্ণ নিউ টেস্টামেণ্ট প্রকাশ করবার আগেই ম্যাথুর সুসমাচার অংশ আলাদাভাবে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করবার সিদ্ধান্ত নেন। এই পুস্তিকাখানিই বাংলা বাইবেল মুদ্রণের ইতিহাসে প্রথমের সম্মান লাভ করেছে। পুস্তিকাটি 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' নামে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্টের পূর্বেই প্রচারিত হয়েছিল।৭২ ইতিমধ্যে রামরাম বসু শ্রীরামপুরে আসেন মে মাসের শেষের দিকে। মদনাবাটিতে কোন দুষ্কৃতির জন্য কেরী তাঁকে প্রায় চার বৎসর আগে পরিত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু শ্রীরামপুরে তিনি নূতন পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত হলেন। তিনি মিশনে যোগ দিয়ে 'হরকরা' ও 'জ্ঞানোদয়' রচনা করেন। দু'টি রচনাই পদ্যে লেখা, খ্রীষ্টধর্মের মহিমা জ্ঞাপনে হিন্দুধর্মের হীনতা দেখাবার চেষ্টা মাত্র। এই রচনা দু'টি

মিশন প্রেসের মুদ্রণের ইতিহাসের আদি দৃষ্টান্ত। কিন্তু মিশন প্রেস 'হরকরা'-র সঙ্গে খ্রীষ্টমণ্ডলীতে গেয় গীতের একটি সংকলনও প্রকাশ করেছিলেন। এই সংকলনের গানগুলির কয়েকটি কেরীর রচনা, রামরাম বসুর খ্রীষ্টসঙ্গীতও এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবে। এইসব মুদ্রণ ম্যাথুর সুসমাচার প্রকাশের পূর্ববর্তী।

কিন্তু বাংলা নিউ টেস্টামেণ্ট মুদ্রণেই মিশন প্রেস এই সময় সবচেয়ে বেশি নিবিষ্ট ছিল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই আগস্ট তারিখে রাইল্যাণ্ডের কাছে লেখা কেরীর চিঠির সূত্রে অবশ্য জানা যায় যে, ইতিমধ্যে তাঁরা বাংলায় অনেকগুলি পুস্তিকাই প্রচারিত করেছিলেন। তিনি এই সময় ব্যাপ্টিস্ট মিশনারী সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্যামুয়েল পীয়ার্সের 'A Letter to the Laskars' নামক পুস্তিকার অনুবাদ করছিলেন।[৭২] এই অনুবাদ কিছু দিনের মধ্যেই এখান থেকে ছাপা হয়েছিল। রাইল্যাণ্ডের 'A message from God unto Thee'-র অনুবাদ ছাপার ইচ্ছাও কেরী এই সময় প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু আদৌ তা অনূদিত ও মুদ্রিত হয়েছিল কিনা জানা যায় না।

বাইবেলের অনুবাদ ছাড়া শ্রীরামপুর প্রেস থেকে কেরীর কতগুলি অনুবাদ রচনাও প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে আছে ওয়ার্ডের 'The Missionaries' Address to the Hindoos'। 'A short summary of the Gospel'-ও কেরীর রচনা। ওয়াটের Historical catechism-এর কাব্যানুবাদের কথাও মার্ডকের ক্যাটালগে আছে। প্রকৃতপক্ষে, মিশন প্রেস ধীরে ধীরে একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের রূপ নিতে শুরু করে, এবং শুধু মিশনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগে রচনা প্রকাশে এই প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা আর রক্ষা করা সম্ভবপর হয় না। বাইরের বই ছাপার কাজও প্রেসের নিতে হয়। প্রকাশনায় এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের পরিধি কতদূর বিস্তৃত ছিল, মুহাম্মদ সিদ্দিক খানের 'বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনে কেরী যুগ' প্রবন্ধের অন্তর্গত গ্রন্থপঞ্জী অংশ থেকে সে-সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা গ্রহণ করা যায়।[৭৩]

শ্রীরামপুরের মুদ্রণের ইতিহাসের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে মিশনের জীবনে নবীন প্রাণ সঞ্চারিত হয়। কিন্তু প্রথম দিকে মিশনের আর্থিক অবস্থা ভাল চলছিল না। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময় থেকে প্রেসে এক-জন কম্পোজিটর, পাঁচজন কর্মী, এবং বাঁধাইকারী ইত্যাদি আরও দু'জনকে নিয়োগ করা হয়েছিল। প্রত্যেক সপ্তাহে চার হাজার পৃষ্ঠা করে ছাপার কাজ চলছিল।[৭৪] ফলে নূতন করে অর্থসঙ্গতির চেষ্টা করতে হলো।

কলকাতার কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো যন্ত্রস্থ বাংলা বাইবেলের জন্য গ্রাহকচাঁদা চেয়ে। গভর্ণর-জেনারেল ওয়েলেসলি এই বিজ্ঞাপনকে সুনজরে দেখলেন না, প্রকৃতপক্ষে ছাপাখানার ওপর তাঁর এক ধরনের অবিশ্বাস ছিল। শ্রীরামপুরের গভর্ণরকে মিশন প্রেস সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করবার জন্য তিনি চিঠি লিখবেন বলেও স্থির করেছিলেন, কিন্তু চিঠি লেখার আগে তিনি তাঁর বিশ্বাসভাজন রেভারেণ্ড ডেভিড ব্রাউনের সঙ্গে এ-বিষয়ে আলোচনা করলেন। ব্রাউন ইতিপূর্বে কেরীর সঙ্গে সুব্যবহার করেন নি, কিন্তু এই ক্ষেত্রে তিনি গভর্ণর জেনারেলকে আশ্বস্ত করেন ও কেরীর উদ্যমকে প্রশংসা করেন। এই বিজ্ঞাপন থেকে ফলে দুই রকমের ফল পাওয়া গেলঃ এক, বাংলা বাইবেলের গ্রাহক-চাঁদা থেকে কিছু টাকা পাওয়া গেল যা ছাপাখানাকে সমূহ আর্থিক সংকট থেকে মুক্ত করে; দুই, গভর্ণর-জেনারেল ওয়েলেসলি কেরী ও শ্রীরামপুর মিশনারীদের সম্পর্কে নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেন, যার ফল কেরী ও মিশনের পক্ষে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা বিষয়ক প্রস্তাব রচিত হয় ১০ই জুলাই ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে, এর সঙ্গে কলেজ বিষয়ক Regulation-ও জুড়ে দেওয়া হয়। Regulation IX, 1800 বলে সচরাচর পরিচিত এই রেগুলেশন ১০ই জুলাই ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল অনুমোদন করেন, কিন্তু তিনি 'dated the law for the foundation of the college on the 4th of May, 1800, the first anniversary of the reduction of Seringapatam.'৭৫ কিন্তু কলেজের কাজ ঐ বৎসর নভেম্বর মাসের আগে শুরু হয়নি।৭৬

রেগুলেশনের দুই নম্বর ধারায় আছেঃ 'A college is hereby founded at Fort William in Bengal for the better instruction of the junior civil servants of the company, in such branches of literature, science, and knowledge, as may be deemed necessary to qualify them for the discharge of the duties of the different offices constituted for the administration of the government.'৭৭ পনের নম্বর ধারায় শিক্ষণীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছেঃ 'Languages.—Arabic, Persian, Shanscrit, Hindoostanee, Bengal, Telinga, Mahratta, Tamul, Canara;

Mahomedan law, Hindoo law, ethics, civil jurisprudence, and the law of nations; English law; the regulations and laws enacted by the Governor-General in Council, or by the Governors in Council at Fort St. George and Bombay respectively, for the civil government of the British territories in India; political Oeconomy, and particularly the commercial institutions and interests of the East India Company; geography and mathematics; modern languages of Europe; Greek, Latin and English Classics; general history, ancient and modern; the history and antiquities of Hindoostan and the Deccan; natural history; botany, chemistry, and astronomy.'৭৮ এই শিক্ষণীয় বিষয়সূচীকে প্রধান পাঁচটি ভাগে লক্ষ্য করা যেতে পারে—(১) Oriental languages, (২) Oriental laws and ethics, (৩) Government Regulations, (৪) European studies, (৫) Science. এর প্রথম চারটি ভাগের শিক্ষাক্রম কলেজে প্রথমাবধিই চালু হয়েছিল।৭৯ জি· এইচ· বার্লোর ওপর গভর্ণর-জেনারেলের বিধিবদ্ধ ভারতীয় আইন; এইচ· টি· কোলব্রুকের ওপর হিন্দু আইন এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য; জন বেলী-র ওপর আরবী, ফার্সী ও মুসলমানী আইন; এবং ক্লডিয়াস বুকাননের ওপর গ্রীক, ল্যাটিন ও ইংরেজি ক্লাসিক্স অধ্যাপনার দায়িত্ব অর্পিত হয়।৮০ রেভারেণ্ড ডেভিড ব্রাউন ও রেভারেণ্ড ক্লডিয়াস বুকানন যথাক্রমে কলেজের প্রোভোস্ট ও ভাইস-প্রোভোস্ট নিযুক্ত হন; ভিজিটর হন গভর্ণর-জেনারেল স্বয়ং।

কলেজের পরিকল্পনাটি ছিল বিরাট ও উচ্চাশা-পরিপূর্ণ। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ওয়েলেসলির নির্ধারিত পাঠ্যসূচী দীর্ঘ ও ভারবাহী; একে হয়তো অধিকতর বিবেচনা দ্বারা আরও সংহত ও বিশেষ প্রয়োজনের লক্ষ্যে অধিকতর উপযোগী করে তোলা যেত। যে সামান্য সময়কাল একজন সিভিলিয়ন কলেজে শিক্ষাগ্রহণ করবেন, তার মধ্যে তাঁর পক্ষে এতগুলি ও এত বিচিত্র বিষয়ের সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত হওয়া দুঃসাধ্য। এই জন্যই সম্ভবত ওয়েলেসলির এই শিক্ষাসূচী সম্পর্কে ওয়ারেন হেষ্টিংস মন্তব্য করেছিলেন, 'It may on the first view of it, be deemed liable to the objection of embracing too many objects; but this is not so much an objection to the proposition itself, as to the form of it.'৮১ তথাপি তাঁর এই শিক্ষাসূচীর মধ্যেই

ওয়েলেসলির শিক্ষাচিন্তার প্রকৃত রূপটি উদ্ঘাটিত হয়েছে। ওয়েলেসলি ছিলেন একজন বিশিষ্ট Etonian, যিনি বার বার 'liberal education' সম্পর্কে উচ্চকণ্ঠ; তিনি যখন শিক্ষণীয় বিষয়সূচী নির্ণয় করেন, তখন তা এইরকম হওয়াই স্বাভাবিক বলে মনে হয়।

কিন্তু ওয়েলেসলির ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টর্স কখনোই সুনজরে দেখেন নি। এই কলেজের অস্তিত্ব লুপ্ত করবার জন্য তাঁরা প্রথমাবধি সংঘবদ্ধভাবে তৎপর ছিলেন। এর কারণ ইতিহাসে নানাভাবে অনুসন্ধান করা হয়েছে, কিন্তু প্রধান কারণ সম্ভবতঃ এই যে, প্রতিষ্ঠা বিষয়ক প্রস্তাবে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার ওপর হস্তক্ষেপের মনোভাব প্রকাশিত হয়েছিল।৮২ তথাপি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে আপন অস্তিত্ব রক্ষা করেছিল;৮৩ কোর্টের কৃপাবশতঃই তা সম্ভবপর হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবু ওয়েলেসলির উচ্চাদর্শ ও ব্যাপক পরিকল্পনাকে তাঁরা কার্যতঃ বানচাল করে দিতে পেরেছিলেন হেইলিবেরীতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কলেজ ও এ্যাডিস্‌কম্বে মিলিটারী সেমিনারী স্থাপন করে। কিন্তু বাংলাদেশের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির ইতিহাসে ট্যাংক স্কোয়ারে ওয়েলেসলির এই কলেজ এরই মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গেছে।

ট্যাংক স্কোয়ারে কেরী

গার্ডেন রীচে কলেজ স্থাপন করার ইচ্ছায় সেখানে জমি কেনা ইত্যাদি ব্যাপারে ওয়েলেসলি যতই অগ্রসর হোন না কেন, কার্যতঃ ট্যাংক স্কোয়ারের সরকারী বাড়িতেই কলেজ স্থাপিত হলো। কলেজটি অনেকটা আবাসিক ধরনের হওয়ায় ছাত্রদের থাকবার জন্য স্কোয়ারের আশেপাশে কয়েকটি বাড়ি ভাড়া করা হয়। এবং এই কলেজের প্রতিষ্ঠা ও তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে শ্রীরামপুরে বসেই কেরী অবহিত হয়েছিলেন।

এই কলেজে প্রাচ্যভাষা পড়ানো হবে, এই তথ্যটি কেরীর কাছে আকর্ষণীয় বলে মনে হয়ে থাকবে, সার্টক্লিফের কাছে লেখা চিঠিতে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ থেকে এই রকম মনে করা যায়।৮৪ এবং এই কলেজেই বাংলা ভাষার অধ্যাপকরূপে তাঁর নিয়োগের প্রস্তাব যখন এলো, তখন মানসিক-ভাবে তিনি খুবই উদ্দীপ্ত বোধ করেছিলেন। এই উদ্দীপনার মধ্যে উত্তেজনার অংশ কম ছিল না। উত্তেজনার প্রধান কারণ দুইঃ প্রথমতঃ, এই প্রস্তাবে তাঁর যোগ্যতা ও কৃতিত্বের যে স্বীকৃতি আছে, কলেজের অধ্যাপনায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কেরীর পক্ষে তার সম্মান রক্ষা করা সম্ভব

হবে কিনা, এই সম্পর্কে দ্বিধা; দ্বিতীয়তঃ, তিনি নিজেকে প্রধানতঃ মিশনারী রূপে মনে করতেন; এই কাজ গ্রহণ করলে মিশনের কাজ ক্ষতি-গ্রস্ত হবে কিনা অথবা মিশনারী কার্যক্রমে প্রত্যক্ষভাবে তাঁর অংশগ্রহণ করায় কোন বাধা সৃষ্টি হবে কিনা, এই ধরনের কতগুলি সংশয়। অবশ্য সাধারণভাবে মনে হয় যে, ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল কলেজের প্রোভোস্ট ডেভিড ব্রাউনের কাছ থেকে তিনি যখন নিয়োগের প্রস্তাব পান, তখন তার আকস্মিকতা দ্বারাই তিনি অভিভূত হয়েছিলেন।

প্রস্তাব পাওয়ার সংগে সংগে মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের সংগে এই প্রস্তাব গ্রহণ করার সমীচীনতা সম্পর্কে আলোচনা করে সর্বসম্মতিতে তিনি ব্রাউনের সংগে দেখা করলেন। ব্রাউন ও বুকানন তাঁর দুরকম সংশয়ই নিরসন করেন। তাঁরা বোঝান যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কেরীর যোগ-দান মিশনের উদ্দেশ্যকে অধিকতর সফল হতে সহায়তা করবে, এবং কলেজে কেরীর অধীনে দেশীয় পণ্ডিত নিযুক্ত করা হবে যাতে তাঁর কাজ সহজতর হতে পারে। কেরী আশ্বস্ত হয়ে ব্রাউনের প্রস্তাবে সম্মতি দেন।

কিন্তু কলেজের স্ট্যাটুট অনুযায়ী কেরীকে প্রোফেসর রূপে নিয়োগ করার অসুবিধা ছিল।৮৫ ব্রাউনের কাছ থেকে ওয়েলেসলি কেরীর বাংলা নিউ টেস্টামেণ্টের একটি খণ্ড গ্রহণ করেন এবং বাংলা ভাষা শিক্ষাদানে তাঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হন। অবশেষে স্ট্যাটুট বাঁচিয়ে কেরীকে 'শিক্ষক' রূপে নিয়োগ করার কথা স্থির হয়। ফলে তাঁর মাসিক বেতন হাজার টাকার পরিবর্তে পাঁচশ টাকা হয়ে যায়। নিয়োগপত্র ১২ই এপ্রিল তারিখে তাঁর হাতে আসে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলার শিক্ষক রূপে কেরী যোগদান করেন ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখে।৮৬ প্রথম দিকে তিনি সপ্তাহে দুদিন ক্লাশ নিতেন, পরে তিনদিন। মঙ্গলবার বিকেলে তিনি কলকাতা যেতেন ও শুক্রবার বিকেলে শ্রীরামপুরে ফিরে আসতেন।৮৭ অর্থাৎ বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার তিনি কলেজে উপস্থিত থাকতেন বলে মনে হয়।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল-মে কেরীর জীবনের এক স্মরণীয় সময় বলে উল্লেখ করা উচিত। কলেজে তাঁর এই পদাধিকার তাঁর ব্যক্তিগত দিক ও মিশনের দিক থেকে ভবিষ্যৎ চরিতার্থতার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। এরই ফলে বাইবেল অনুবাদের ব্যাপক কর্মযজ্ঞের সূচনা হয়; ভাষা সাহিত্যের নানা শাখায় তাঁর ব্যক্তিগত যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখা সম্ভব হয়, ভারতবর্ষীয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে নিজের নামকে ঐতিহাসিকভাবে যুক্ত করে দেবার সুযোগ আসে। ফোর্ট উইলিয়ম

কলেজের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে তাঁর যে সর্বব্যাপক কর্মোদ্যমের সূচনা হয়, তারই আলোকে শ্রীরামপুরের পাদ্রী কেরী উইলিয়ম কেরীতে উত্তীর্ণ হয়ে যান। ধর্ম-সংকীর্ণতার গণ্ডীকে অতিক্রম করে ধর্ম-নিরপেক্ষ জ্ঞান-বিজ্ঞান-মানবতার পরিপ্রেক্ষিতে আত্মপ্রকাশ করেন।

অধ্যাপক

কেরীর সঙ্গে একই দিনে, অর্থাৎ ৪ঠা মে তারিখে বাংলা বিভাগে কলেজে তাঁর সহকর্মীরূপে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, তারা সংখ্যায় আটজন। এঁদের পদের দায়িত্ব ও বেতন অনুযায়ী তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রধান পণ্ডিতঃ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (২০০৲); দ্বিতীয় পণ্ডিতঃ রামনাথ বাচস্পতি (১০০৲); সহকারী পণ্ডিত (প্রত্যেকে মাসিক চল্লিশ টাকা)ঃ শ্রীপতি রায়, আনন্দচন্দ্র শর্মা, রাজীবলোচন (মুখোপাধ্যায়), কাশীনাথ (তর্কালঙ্কার ?), পদ্মলোচন চূড়ামণি, এবং রামরাম বসু। এঁদের নির্বাচন কারা করেছিলেন এবং কিভাবে হয়েছিল তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না, পরবর্তীকালে পণ্ডিত মুন্সী নির্বাচনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণের যে প্রথা প্রচলিত হয়েছিল, এই সময় সেই বিধিই প্রযুক্ত হয়েছিল বলে মনে হয় না। পরে মৃত্যুঞ্জয় সুপ্রীম কোর্টে চাকরী নিয়ে চলে গেলে কেরীর সুপারিশে দ্বিতীয় পণ্ডিত রামনাথ বাচস্পতিকে প্রধান পণ্ডিত করা হয় ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে, এবং ঐ সময় তাঁর শূন্যপদে মৃত্যুঞ্জয়-পুত্র রামজয় তর্কালঙ্কারকে দ্বিতীয় পণ্ডিত রূপে নিয়োগ করা হয়। রামজয়ের কৃতিত্ব সম্বন্ধে কেরী নিঃসন্দেহ ছিলেন। রোবাক তার গ্রন্থে পরবর্তীকালের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের পণ্ডিতদের একটি নামের তালিকা দিয়েছেন, তাতে পুরণো অনেকের নাম নেই।[৮৮] মৃত্যু, ইস্তফা বা পদচ্যুতি ইত্যাদি কারণে এই সময় (১৮১৮) কলেজের সঙ্গে তাঁদের আর কোন যোগ ছিল না বলে ধরা যায়।

কলেজে অধ্যাপক রূপে কেরীকে দুই দিক থেকে দেখা উচিত; প্রথমতঃ, ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের দিক থেকে; দ্বিতীয়তঃ, সহকর্মী পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের দিক থেকে। ছাত্রদের প্রতি তিনি সাধারণভাবে সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, তাঁদের তিনি গ্রামার স্কুলের ছাত্র রূপে কখনোই দেখতে চাননি। কখনো কোন ছাত্রের অমনোযোগ দেখলে তা কর্তৃপক্ষের গোচরে আনতে যেমন তিনি দ্বিধা করতেন না, তেমনি সেই ছাত্রই যখন ভাষাসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সক্ষমতা দেখাতেন, তখন তাঁর প্রতি আনন্দিত মনোভাব প্রকাশ করতেন। সার্জেণ্ট বা এ্যাণ্ডারসনের সম্বন্ধে ছাত্র হিসাবে

তাঁর অভিযোগ তুচ্ছ হয়ে যায় তাঁদের কৃতিত্বের অনুমোদনে, যখন তাঁরা যথাক্রমে 'ঈনিড' ও 'টেলিমেকাস' অনুবাদ করেন। যদিও কলেজে প্রচারণার কোন সুযোগ ছিল না, তবু তাঁর ধর্মপ্রাণতা কোন কোন ছাত্রকে উদ্বুদ্ধ করেছিল; ল্যাং, কানিংহাম প্রভৃতি খ্রীষ্টধর্মের সাধুত্বের অভিমানে 'ওরিয়েণ্টাল স্টার' পত্রিকায় সোচ্চার আত্মপ্রকাশ করে-ছিলেন। মিশনারী কেরীর মানবহিতসাধনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন মেটকাফ প্রমুখ ছাত্ররা। সহকর্মী পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও সাধারণ-ভাবে ভাল ছিল বলেই মনে হয়। তিনি তাঁর পণ্ডিতদের গ্রন্থরচনায় ও অনুবাদে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন, এবং পণ্ডিতরা সামর্থ্য অনুযায়ী তাঁর প্রত্যাশা পূরণ করেছিলেন। একে শুধু চাকরির সূত্রে লক্ষ্য করা ঠিক হবে না, পরস্পরের সম্পর্কের শুভ যোগই এর প্রধান কারণ। পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র শর্মার সঙ্গে ছাত্র কেনেডি যে দুর্ব্যবহার করেছিলেন, তাতে কেরীই পণ্ডিতকে দিয়ে কাউন্সিলের কাছে অভিযোগপত্র লেখান বলে অনুমান করা হয়।

বাংলা শিক্ষক কেরী অল্পদিনের মধ্যেই কলেজের সংস্কৃতের শিক্ষকও নিযুক্ত হন।৮৯ সংস্কৃতের অধ্যাপক রূপে কোলব্রুকের পদাধিকার ছিল, কিন্তু তিনি খুব কমই ক্লাশ নিতেন। তাঁরই সুপারিশে কেরীকে সংস্কৃত শিক্ষাদানের ভার দেওয়া হয়। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট হৌসে অনুষ্ঠিত কলেজের বার্ষিক সভায় কেরী আগাগোড়া সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করেন, এবং ওয়েলেসলি সংস্কৃত ভাষায় তাঁর যোগ্যতার প্রশংসা করেন। সংস্কৃত শিক্ষাদানের কাজ তাঁর কাছে অতিরিক্ত ও ভারস্বরূপ হলেও এই কাজে তাঁর নিষ্ঠা ও পারদর্শিতা স্বীকৃত হয়েছে। এরই মধ্যে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠি ভাষা বিভাগের দায়িত্ব তাঁর ওপর এসে পড়ে, এবং এক বৎসরকালের মধ্যে পণ্ডিত বৈদ্যনাথের সহযোগিতায় ছাত্রদের মারাঠি ভাষা শিক্ষায় যথেষ্ট অগ্রগতি সম্ভবপর করে তোলেন। এই জন্যও ১৮০৫ সালে ওয়েলেসলি কেরীর প্রশংসা করেছিলেন। তিনটি বিভাগের দায়িত্ব পালনে স্বভাবতঃই কেরীকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়: অবশেষে ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি থেকে বাংলা ও সংস্কৃতের অধ্যাপক পদে বৃত হন। তখন বেতন হয় মাসিক হাজার টাকা।৯০

ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের অভাব কেরীর কাছে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াল। হালহেডের ব্যাকরণ তখন প্রায় পাওয়া যায় না, তবু ওই ব্যাকরণখানি ও ফরস্টারের ইংরেজি-বাংলা শব্দকোষ অবলম্বন করেই এই কাজে তিনি প্রথম অগ্রসর হয়ে থাকবেন। তিনি তাঁর পণ্ডিতদের

পাঠ্যপুস্তক রচনায় উদ্বুদ্ধ করেন, এবং নিজেও আপন সীমায় এই উদ্দেশ্যে কাজ করতে থাকেন। ফলে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দেই তিনি বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশ করেন, কথোপকথন সংকলন করেন। রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত্র প্রকাশিত হয়। একই বৎসরে গোলোকনাথের সংস্কৃত থেকে হিতোপদেশের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়, এবং মৃত্যুঞ্জয়ের বত্রিশ সিংহাসন রচনার কাজ চলতে থাকে, যদিও তার প্রকাশ কাল ১৮০২। অর্থাৎ ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের গোড়া থেকেই সাধারণভাবে বাংলা পাঠ্যপুস্তকের অভাবজনিত গুরুতর বাধা অপসারিত হয়েছিল বলে মনে হয়।৯১ প্রথম বৎসরে গ্রন্থরচনার যে উদ্যোগের সূচনা হলো, তার ধারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।৯২ এই সময় রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে ব্যাকরণ ও অভিধান বাদ দিলে প্রায় সবগুলিই অনুবাদ রচনা, কেবল তিনটি রচনাকে মৌলিক বলা যেতে পারে—প্রতাপাদিত্য চরিত্র, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের চরিত্র, ও রাজাবলী। ব্যাকরণ, অভিধান কেরীর রচনা, আর সবগুলিই পণ্ডিত মুন্সীদের কাজ। মারাঠি বিভাগের পণ্ডিত বৈদ্যনাথ অন্তত একটি মৌলিক রচনা লিখেছিলেন বলে মনে হয়; গ্রন্থটির নাম 'The Genealogy of Rughoojee Bhosla,' ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। মারাঠি ছাত্রদের জন্য কেরী স্বয়ং মারাঠি ভাষায় রচিত পত্রগুচ্ছের একটি সংকলনও প্রকাশ করেন (১৮১৬)। তাছাড়া ঐ সময়ই রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত্রের বৈদ্যনাথ-কৃত মারাঠি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। বৈদ্যনাথের বত্রিশ সিংহাসনের মারাঠি অনুবাদও ইতিপূর্বে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।৯৩ এই অনুবাদ মূল সংস্কৃত থেকে অথবা মৃত্যুঞ্জয় এর রচনা থেকে প্রস্তুত হয়েছিল, নির্দিষ্টভাবে সে-সম্পর্কে কিছু বলা যায় না। এছাড়া কেরী নিজে মারাঠি ভাষায় ব্যাকরণ ও অভিধান প্রস্তুত করেছিলেন যথাক্রমে ১৮০৫ ও ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে। মারাঠি ভাষার এই গ্রন্থাবলী কলেজের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে ধরা যায়; এবং এ-থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে বৈদ্যনাথ বাংলার পণ্ডিতদের মতই কেরীর পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন; কেরীও মারাঠি গ্রন্থরচনায় ও বিষয়-কল্পনায় বাংলা বিভাগীয় সংস্কারেরই পরিচয় দিয়েছেন।

বাল্মীকির অনুবাদঃ এশিয়াটিক সোসাইটি

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে কেরীর যোগাযোগ শ্রীরামপুরের সীমাবদ্ধতা থেকে তাঁকে প্রথম মুক্তি দিয়েছিল; এই যোগাযোগই প্রকৃতপক্ষে আরও বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে উত্তীর্ণ করে দেয়। এশিয়াটিক

সোসাইটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্থাপন তাঁর সাংস্কৃতিক চরিত্রবিকাশের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থি। স্যার উইলিয়ম জোন্স, চার্লস উইলকিন্স প্রভৃতি কলকাতায় ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জোন্স বা উইলকিন্স প্রাচ্যভাষা ও সাহিত্যের ঐশ্বর্য পশ্চিমের কাছে উন্মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, অপরিসীম শ্রদ্ধা ও অধ্যবসায়ে প্রাচ্যবিদ্যায় তাঁদের আত্মনিবেদন এখনো আমাদের চমৎকৃত করে। কিন্তু প্রাচ্যভাষা ও সাহিত্যের ঐশ্বর্য পশ্চিমের কাছে উন্মুক্ত করার যে আয়োজন তাঁদের কার্যক্রমের মধ্যে সূচিত হয়েছিল, পারস্পরিক হৃদয় ও মন বিনিময়ের সেই নিরপেক্ষ ভূমি কেরী দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারেন নি, বা সেই পথে প্রযত্ন করেন নি। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে এই পথে কেরীকে প্রথম অগ্রসরমান দেখা যায়। এতদিন পর্যন্ত তিনি বাইবেলের অনুবাদ করেছেন, প্রাচ্যভাষায় অভিনিবিষ্ট হয়েছেন; কিন্তু ঐ সময়েই তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের কতগুলি চিরন্তন গ্রন্থের সঠিক ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের একটি পরিকল্পনা যুগপৎ এশিয়াটিক সোসাইটি ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করেন। সোসাইটি ও কলেজ কর্তৃপক্ষ দুইই এই পরিকল্পনার জন্য অর্থ সাহায্য অনুমোদন করেন। এই সময়কার সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট স্যার জন আন্সট্রুথার বিদেশে এইরকম গ্রন্থের বিক্রয় এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ যাতে শ্রীরামপুর মিশনে বর্তায়, ইত্যাদি বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হন। কেরী জশুয়া মার্শম্যানকে সঙ্গে নিয়ে এই অনুবাদে অগ্রসর হন, এবং এই কাজে শ্রীরামপুর সোসাইটি ও কলেজের কাছ থেকে মাসিক তিনশ টাকা অনুদান হিসাবে পান। প্রথমেই তাঁরা বাল্মীকির রামায়ণ অনুবাদে মনোনিবেশ করেছিলেন।

এই কর্মব্রতে কেরীর উৎসাহের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা সম্ভবতঃ উচিত হবে না। এটা প্রাথমিকভাবে মনে হতে পারে যে, এই পরিকল্পনার পিছনে কেরীর মনোভাব প্রাচ্যবিদের প্রেরণায় প্রসাধিত ছিল না। বেদ ইত্যাদি ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে তাঁর মতামতগুলি সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচয়ই বহন করে অবশ্য। ভারতীয় ধর্মসাহিত্য, যাকে তিনি 'mysterious sacred nothings' বলে মনে করতেন, কেরী তার ভিতরকার সৌজন্য ও শোভনতার অভাবাত্মক দিক ও মিথ্যাচারের প্রকৃতি ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে পাশ্চাত্য সমাজে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। এই কারণেই তিনি বেদ সংগ্রহ করতে এবং তা অনুবাদ করে ছাপতে এক সময় আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কোলব্রুক কেরীকে তাঁর সংগৃহীত বেদগ্রন্থসমূহ ছাপার জন্য দিতেও প্রস্তুত ছিলেন।[১৪] প্রতি খণ্ড পাঁচশ পৃষ্ঠা হিসাবে কুড়ি খণ্ড

বেদ প্রকাশের পরিকল্পনা স্থির করে এই কাজে তিনি অগ্রসরও হয়েছিলেন। কিন্তু এই কাজে তিনি বেশি দূর অগ্রসর হননি। বলা বাহুল্য, কেরীর এই মনোভাবকে কখনোই শ্রদ্ধেয় বলা চলে না।

কিন্তু রামায়ণের অনুবাদ ও প্রকাশের উদ্যোগে কেরীর এই মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছিল বলে মনে হয়। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত গ্রন্থের সঠিক ইংরেজি অনুবাদের পরিকল্পনা যখন গৃহীত হলো, তখন দেখা যায়. তিনি বেদ প্রকাশে আর উৎসাহী নন, সেখানে বাল্মীকির রামায়ণই অনুবাদের বিষয় রূপে নির্বাচন করা হয়। এর কারণ কেরী নিজেই ব্যাখ্যা করেছেনঃ 'Had we begun with the Vedas, the public would have been wearied at the outset. The Ramayana will furnish the best account of Hindu mythology...and has extravagancy enough to excite a wish to read it through.'[১৫] কেরীর এই বক্তব্যে কোন ধর্ম-সংকীর্ণতা নেই, বরং পরিকল্পনাটি যাতে ফলপ্রসূ হয়. সেদিকেই তিনি বিশেষ লক্ষ্য রেখে-ছিলেন বলে মনে হয়। কেননা, এই পরিকল্পনার সার্থকতার সঙ্গে মিশনের আর্থিক লাভালাভের প্রসঙ্গ জড়িত ছিল।[১৬]

রামায়ণ অনুবাদের কাজে কেরীর সহযোগী ছিলেন জশুয়া মার্শম্যান। ১৮০৫ সালেই রামায়ণের অনুবাদ শুরু হয়েছিল। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়।[১৭] ১৮০৮-এ অযোধ্যাকাণ্ডের প্রথমার্ধ সম্বলিত দ্বিতীয় খণ্ড, ও ১৮১০-এ অযোধ্যাকাণ্ডের উত্তরার্ধ সম্বলিত তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। প্রথমে সপ্তকাণ্ড রামায়ণকে মোট নয়টি খণ্ডে প্রকাশ করবার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, কিন্তু পরে তা দশ খণ্ডে প্রকাশের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের পর কার্যতঃ আর কোনও খণ্ড প্রকাশিত হয়নি। বিলাতে প্রচারণার জন্য রামায়ণের যে খণ্ডগুলি পাঠানো হয়েছিল, তা জাহাজডুবিতে হারিয়ে যায়, এবং ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের শ্রীরামপুরের অগ্নিকাণ্ডে পরবর্তী কয়েকটি অংশের মূল পাঠ ও অনুবাদের পাণ্ডুলিপি ভস্মীভূত হয়। এই কাজে অতঃপর আর কোনও উদ্যোগ দেখা যায় না। ১৮১০ সালের মধ্যে কেরী সাংখ্যদর্শনের কিছু অংশও অনুবাদ করেছিলেন বলে জানা যায়. তবে তা প্রকাশিত হয়নি।[১৮]

বিজ্ঞপ্তিতে য়ুরোপের কাছে ভারতীয় শাস্ত্র পৌঁছে দেওয়া, এবং ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করাই এই গ্রন্থ ও তার অনুবাদ প্রকাশের মূল কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই কাজে সেই জন্য অনুবাদকরা অনুবাদকে মূলানুগ করতে চেয়েছেন, সাহিত্যিক অভি-

ব্যক্তির ঐশ্বর্যের প্রকাশে ততটা যত্নবান হননি। অনুবাদ সহজ ও সরল হওয়া সত্ত্বেও অনুবাদের যথার্থতা সম্বন্ধে তথাপি উইলসন মন্তব্য করেছেন: 'does not adequately or truly represent the original.'৯৯

প্রকৃতপক্ষে এই উদ্যমের সূত্রেই এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে কেরীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠভাবে স্থাপিত হয়। সোসাইটির সঙ্গে কেরীর সম্পর্ক স্থাপনে কোলব্রুকের যোগাযোগ ছিল। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে কেরী সোসাইটির সভ্য হন। বিভিন্ন সভায় তিনি নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন এবং মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে পর্যন্ত সোসাইটির 'কমিটি অব পেপার্স'-এ তিনি যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে গেছেন।

শিক্ষার সঙ্গী

বাংলাদেশে শ্রীরামপুর মিশনের শিক্ষা প্রকল্পে প্রধান পুরুষ জশুয়া মার্শম্যান; কিন্তু শিক্ষা বিষয়ক উদ্যোগ ও পরিকল্পনায় কেরী ও ওয়ার্ড সমান উৎসাহী ও সক্রিয়ভাবে মার্শম্যানের সহযোগী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা বিষয়ক সমস্ত বিজ্ঞপ্তি বা রিপোর্ট তিনজনের নামেই প্রচারিত হতো।

শ্রীরামপুর মিশন যখন প্রতিষ্ঠিত হয়নি, জর্জ উডনীর বদান্যতায় কেরী সুন্দরবনের অনিশ্চিত জীবন থেকে মদনাবাটিতে নিশ্চিত হয়েছেন মাত্র, তখনই ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেখানে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই স্কুলের ছাত্ররা ছিল প্রত্যেকেই স্থানীয়, এবং পড়া, হাতের লেখা, গণিত, হিসাব ইত্যাদি, ইংলণ্ডের প্রাথমিক ধরনের স্কুলের মত, তিনি তাদের শিক্ষা দিতেন। সঙ্গে অবশ্যই খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কিত কিছু পাঠ দেবার চেষ্টা ছিল। এখানে শিক্ষাদানের কাজে তিনি দেশীয় পণ্ডিতও নিযুক্ত করেছিলেন। এই প্রাথমিক ধরনের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেই কেরী সন্তুষ্ট ছিলেন না; এক বৎসরের মধ্যে দেশীয় ছাত্রদের শিক্ষা বিষয়ে তিনি বিস্তৃত একটি পরিকল্পনাও তৈরী করে ফেলেন। এই পরিকল্পনায় তিনি দু'টি কলেজ প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেছেন, যার প্রত্যেকটিতে ছ'জন হিন্দু, ছ'জন মুসলমান, মোট বারোজন করে ছাত্রকে শিক্ষাদান করা হবে। একজন পণ্ডিতের অধীনে তাদের রাখা হবে। শিক্ষাক্রম সম্বন্ধে তাঁর পরিকল্পনা: 'they are to be taught the Sanskrit, Bengalee and Persian languages. The Bible is to be introduced there, and perhaps a little philosophy and geography. The time of their education is to be seven years...'১০০ এই শিক্ষাক্রম

পরীক্ষা করলেই বোঝা যায় তিনি শিক্ষা পরিকল্পনাকে প্রাথমিক স্তর অতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা মদনাবাটিতে রূপায়িত করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। তথাপি তাঁর এই শিক্ষা-পরিকল্পনার মধ্যেই ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠার বীজসূত্র নিহিত ছিল বলে মনে করা যেতে পারে।

শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হলে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দেই সেখানে মার্শম্যান তথা মিশনের উদ্যোগে প্রাথমিক বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মিশনের উদ্যোগে গ্রাম বাংলায় নানা স্থানে আরও অনেকগুলি স্কুল বছরের পর বছর প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এইসব স্কুলের শিক্ষার উপযোগিতা পাঠশালা জাতীয় দেশীয় স্কুলের চেয়ে বেশি ছিল, এবং মিশনারীরা মাতৃভাষা শিক্ষার ওপর প্রধান লক্ষ্য রেখেছিলেন। এই সবকিছুর পিছনেই মার্শম্যানের উদ্যোগ ছিল প্রধান; কিন্তু কেরীও যে এইসব প্রকল্পের নেপথ্যে অনুমোদনকারী এক উৎসাহী ব্যক্তিত্ব রূপে উপস্থিত ছিলেন, পাশাপাশি সে কথাও স্মরণযোগ্য।

বস্তুতঃ, ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের নূতন চার্টার এ্যাক্টে দেশীয়দের শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকার বরাদ্দ নির্ধারিত হলে, বাংলাদেশে শিক্ষার জগতে নূতন রক্ত প্রবাহিত হলো। উইলিয়ম কেরী এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের কাছে দেশীয় লোকের শিক্ষা সম্পর্কে নূতন পরিকল্পনা পেশ করেন। সেখানে তাঁর অন্যতম প্রস্তাব ছিল যে, এই আর্থিক অনুদানে ভারতীয়দের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষা দান করা হোক।[১০১] এই প্রস্তাব অবশ্য অনুগৃহীত হয়নি। কিন্তু শ্রীরামপুর মিশনারীরা দেশীয়দের শিক্ষা বিষয়ে চুপ করে থাকলেন না। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে মার্শম্যান 'Hints relative to Native Schools etc.' প্রকাশ করলেন; এবং তাঁদের আবেদনে য়ুরোপীয় ও ভারতীয় উভয় শ্রেণীর কাছ থেকে প্রচুর আর্থিক সাহায্য এলো; তাতে পরবর্তী দুই বৎসরে তাঁরা শতাধিক প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন, যার ছাত্রসংখ্যা মোট ছ' হাজারের বেশি হয়েছিল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলা, বিজ্ঞান ও ধর্মতত্ত্ব শিক্ষার জন্য শ্রীরামপুর কলেজের প্রতিষ্ঠা হলে মিশনারীদের শিক্ষা-বিষয়ক উদ্যোগের চূড়ান্ত রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই মিশনারীরা তাঁদের কলেজ প্রতিষ্ঠা বিষয়ক প্রসপেক্টাস প্রচার করেন। এই কলেজটি হবে 'A college for the instruction of Asiatic christian and other youth in Eastern Literature and European science.' মার্শম্যান শিক্ষাক্রম সম্পর্কে

জানালেন যে, সংস্কৃত, আরবী, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও ইংরাজি পড়ানো হবে। ইংরাজিকে প্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় বিষয় বলে ঘোষণা করেও বলা হলো, শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা। কলেজে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য একটি শাখা থাকবে এবং খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়নের একটি সম্পূর্ণ শিক্ষাক্রমও প্রচলিত হবে।১০২ শ্রীরামপুর কলেজে প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতের ওপর বেশি জোর দেবার প্রবণতা ছিল, কেরীর প্রভাব এর পিছনে থাকতে পারে, কিন্তু মার্শম্যানও সংস্কৃত শিক্ষার ওপর জোর দিতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু সংস্কৃতের জন্য শ্রীরামপুর কলেজে শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ সাধারণের মধ্যে জাগেনি, কাজেই সমকালে ইংরাজি শিক্ষার প্রতি যে আগ্রহ কলকাতা ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলে বর্ধমান ছিল, তার প্রতি কলেজ উদাসীন থাকতে পারল না। ধীরে ধীরে কলেজে ইংরাজি বাইবেল, ইতিহাস, ভূগোল, অংক, কেমিস্ট্রি ইংরাজিতে পড়া শুরু হয়। আর বিজ্ঞান শাখার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। শ্রীরামপুর কলেজের এই প্রাচ্যমুখী চরিত্রের বদল লক্ষণীয়। এখানে কেরী উদ্ভিদবিজ্ঞান ও কৃষি বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। সমকালীন ইংলণ্ডের চাষাবাদের পদ্ধতি গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য তিনি এদেশে প্রয়োগ করতে চাইলেন। এমন কি, 'Method of rearing domestic animals, the nature of piggery and the process of a Dairy'১০৩ সম্পর্কেও তাঁর নূতন দৃষ্টিভঙ্গি এইসব বক্তৃতায় ধরা পড়ে। প্রকৃতপক্ষে, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান ও কৃষিবিদ্যা তাঁর মনের অনেকখানি অংশ অধিকার করেছিল, কলকাতায় এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতে তা প্রমাণিত হয়েছে। মার্শম্যানের উদ্যোগে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে ডেনমার্কের রাজা ষষ্ঠ ফ্রেডারিকের কাছ থেকে শ্রীরামপুর কলেজ ছাত্রদের ডিগ্রি দান করবার অধিকার পায়।

বস্তুত কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটির (১৮১৭) সঙ্গে কেরীর যোগা-যোগটি লক্ষ্য না করলে বাংলাদেশের শিক্ষা বিষয়ে কেরীর ভূমিকা সম্পূর্ণ-ভাবে দেখা হয় না। পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনায় শ্রীরামপুরের উদ্যোগ ও পরিশ্রম সোসাইটির কাছে বিশেষ পরিচিত ছিল, এবং প্রথম পরিচালক সমিতিতে কেরী অন্যতম সম্মানিত সদস্য ছিলেন। সোসাইটি বাংলা দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের জন্য পাঠ্যপুস্তক সংকলন ও প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, এবং এই প্রতিষ্ঠানটির চরিত্র ছিল সাধারণভাবে ধর্ম-নিরপেক্ষ। তাঁরা তিন-চার বছরের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ হাজারের কাছাকাছি কপি বিভিন্ন ধরনের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করেছিলেন, এবং এইসব গ্রন্থের ভাষামাধ্যম ছিল বাংলা। প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠা ও প্রচারণায়

কেরী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকরূপে যে কাজের সূচনা করেছিলেন, সোসাইটিও সেই পথটিই অনুসরণ করেছিলেন। এবং এই সোসাইটির সঙ্গে কেরীর যোগাযোগটি সেইজন্য বিশেষ লক্ষণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ।

স্কুল বুক সোসাইটির নিরপেক্ষ চরিত্রটিও উল্লেখযোগ্য। কেরী, শ্রীরামপুরের মিশনারী, তাঁর ধর্মসাপেক্ষ মানসিকতা নিয়েও এই সোসাইটির নিরপেক্ষতার সঙ্গে সহযোগিতা করে গেছেন। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ধীরে ধীরে য়ুরোপীয় ও দেশীয়দের যে পরস্পর নির্ভরতা গড়ে উঠছিল, কেরী তাকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে লক্ষ্য করেছিলেন এবং তার প্রতি অনুমোদন জানিয়েছিলেন। তিনি ১৮২২ খৃীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই রাইল্যাণ্ডকে লিখেছিলেন, ভারতীয়রা 'now unite with Europeans, and Europeans with them in promoting benevolent undertakings, without servility on their part or domination on ours. God is doing great things for India.'১০৪ বাংলাদেশের শিক্ষার পটরেখায় কেরীর ভূমিকায় যে নিরপেক্ষতা ও ভারত-ভাবনার প্রকাশ, নানা দিক থেকেই তা উল্লেখযোগ্য।

হিতব্রত

মানুষের মধ্যে মানবীয় বোধের যখন অভাব ঘটে, কেবল তখনই সম্ভবতঃ সমাজে ধর্মের নামে কিছু কিছু কলঙ্কিত আচরণ চরিতার্থ হয়ে থাকে। শিশু হত্যা, সাগরে সন্তান বিসর্জন, সতীদাহ, বা কুষ্ঠরোগীদের প্রতি নির্মমতার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশে এইরকম কতকগুলি অমানবিক অন্ধকার সংস্কারের দাসত্ব যে কোনও বিদেশীর কাছে মর্মান্তিক বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কেরীও এইসব আচরণের অভিজ্ঞতায় বিচলিত হয়েছিলেন, অন্ধকারমুক্তির বাসনায় নিজেকে উচ্চারিত হতে দিয়েছিলেন, এবং সক্রিয়ভাবে এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর এই মানবীয় বোধের অধিকারটি তিনি সম্ভবতঃ অর্জন করেছিলেন তাঁর খৃীষ্ট-ধর্ম-বিশ্বাসের অধিকার থেকেই। তাঁর সমকালীন স্বদেশেও তিনি মানবভাবনার অভাবাত্মক দিক লক্ষ্য করেছেন; ক্রীতদাস প্রথা, দণ্ডাদেশের নির্মমতা, রুগ্নের প্রতি উপেক্ষা ইত্যাদি দৃষ্টান্ত বিভিন্ন সময়ে সেখানে তাঁর মানসিক পীড়ার কারণ হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের অন্যতম এক সামান্য লক্ষণ যে মানবহিতবাদ, কেরী তার উত্তরাধিকার নিয়েই এদেশে এসেছিলেন, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সৎ খৃীষ্টানের মানবতাবোধ। ফলে বাংলাদেশে সংস্কারমূলক কর্মধারায়

খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকের উদ্দেশ্যবাদের উপরে তাঁর মানব হিতাকাঙ্ক্ষার প্রাধান্যই সূচিত হয়েছিল বলে মনে করা যায়।

১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল কেরী লিখছেনঃ 'I have, since I have been here, through a different medium, presented three petitions or representations, to Government for the purpose of having the burning of women and other modes of murder abolished, and have succeeded in the case of infanticide and voluntary drowning in the river'.১০৫ এই উদ্ধৃতিটি সংস্কার ব্রতে কেরীর আগ্রহ ও তৎপরতার সাক্ষ্য বহন করে। এই কাজে কেরী আংশিকভাবে সার্থকতা অর্জন করতে পেরেছিলেন সরকারের সমমর্মিতার জন্যই। মিশনারী হয়েও সরকারের উদ্যোগকে তিনি যে সংস্কারমুখী করে তুলতে পেরেছিলেন, তার কারণ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তাঁর পদাধিকার; অবশ্য তাঁর পুরাতন সুহৃদ জর্জ উডনীর পুনরভ্যুত্থানের ঘটনাটিও তাঁর পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল, তা স্বীকার-যোগ্য। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে উডনী গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্য হন, তাঁর এই পদাধিকার কেরীর উদ্যমকে কার্যকর করার পক্ষে সহায়ক হয়, অথবা বলা যায়, কেরী উডনীর এই পদাধিকারের সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন।

বঙ্গদেশে পদার্পণের অনতিকালের মধ্যেই কেরী এদেশে শিশু হত্যা-জনিত লোক-সংস্কারের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন।১০৬ যখন তিনি মদনাবাটির নীলকুঠিতে কর্মরত, তখন একদিন টমাসের সঙ্গে নিকটবর্তী অঞ্চলে ঘুরবার সময় গাছে ঝোলানো ঝুড়িতে একটি শিশু-কংকাল দেখতে পান।১০৭ শিশুহত্যা যে এদেশে এক অতি নিকৃষ্ট সংস্কার, এ থেকে প্রত্যক্ষভাবেই তিনি তা জানতে পেরেছিলেন। শিশুহত্যার সবচেয়ে করুণ ইতিহাস সম্ভবতঃ গঙ্গাসাগরে রচিত হয়েছিল। এখানে মায়ের হাতে সন্তান বিসর্জনই শুধু হতো না, অনেক বিধবা বা অন্য লোকেরাও পুণ্য স্বর্গ-কামনায় সঙ্গমে আত্মবিসর্জন করতেন। দেশীয়দের সংস্কার-দৃষ্টি এই অনুষ্ঠানকে 'বিসর্জন' অনুষ্ঠান রূপে দেখতেই অভ্যস্ত ছিল, কিন্তু বিদেশীর চোখে এই বিসর্জন হত্যানুষ্ঠানের নামান্তর বলেই বিবেচিত হলো। এই অমানবিক অনুষ্ঠানে কেরী অত্যন্ত ক্লিষ্ট ছিলেন, উডনী অচিরাৎ গভর্ণর জেনারেলের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করলেন। কিন্তু এই প্রথা হিন্দু-শাস্ত্র অনুমোদন করে কিনা, অর্থাৎ এই অনুষ্ঠান ধর্মীয় অনুষ্ঠান কিনা, এই প্রশ্নের নঙর্থক জবাব না পাওয়া পর্যন্ত

ওয়েলেসলির এ বিষয়ে কার্যকরভাবে কিছু করা তখনই সম্ভব ছিল না। দেশীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও তাঁর সংস্কৃত-জ্ঞান ইত্যাদির কথা বিবেচনা করে তিনি কেরীর ওপর এই অনুসন্ধানের ভার দিলেন।১০৮ কেরীর অনুসন্ধানের ফলশ্রুতি '...a criminal and inhuman practice of sacrificing children, by exposing them to be drowned or devoured by sharks, prevails....This practice is not sanctioned by the Hindoo Law, nor countenanced by the religious orders.'১০৯ কেরী এই রিপোর্টের সঙ্গে এই প্রথা রহিত করার প্রার্থনা করেন। ওয়েলেসলি এই রিপোর্টের ভিত্তিতে অচিরাৎ এই প্রথাকে হত্যাকাণ্ড, এবং যে এই প্রথা আচরণ করবে, হত্যাকারী রূপে তার প্রাণদণ্ড ঘোষণা করলেন। এই নিষেধাজ্ঞা প্রচারের পরের বৎসর ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের সাগর মেলায় কর্তৃপক্ষ কিছু সিপাহী পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু সেই বৎসর কোন প্রাণবিসর্জনের ঘটনা আর ঘটেনি। হিন্দু সমাজ সহজভাবেই এই বিধি বরণ করে নিয়েছিল।

সাগরে সন্তান-বিসর্জন বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হওয়ায় কেরীর মানবহিতব্রত সাধন একটি বড় স্বীকৃতি পেল। এখানে প্রথম প্রয়াসেই তাঁর সার্থকতা। তাঁর কলেজীয় সম্মান ও প্রভাব, এবং সর্বোপরি বান্ধব জর্জ উডনীর পদাধিকার—সতীদাহ-প্রথা রহিত করার কার্যকর প্রয়াসে তাঁকে অনুপ্রেরণা দান করে থাকবে। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার পথে নয়াসরাইর এক বিভীষিকাময় অপরাহ্নে তিনি সতীদাহ অনুষ্ঠান দেখেছিলেন,১১০ শ্রীরামপুর আসবার পর গঙ্গার ধারে তিনি আরও সতীর চিতা জ্বলতে দেখেছেন। মিশনারী হিসাবে এ-বিষয়ে কার্যকরভাবে কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না; কিন্তু এখন মিশনারী হিসাবেই এই বিষয়ে তিনি উদ্যোগী হয়ে উঠলেন। কলকাতাকে ঘিরে তিরিশ মাইল অঞ্চলে সতীদাহ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য তিনি বিশ্বাসভাজন কয়েকজন দেশীয়কে পাঠান। এই অঞ্চলে সতীদাহের সংখ্যা, সতীর বয়স ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ববর্তী এক বৎসরের সমীক্ষা করাই এই অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য। সমীক্ষায় প্রকাশ পেল যে, পূর্ববর্তী বৎসরে ওই সীমাবদ্ধ অঞ্চলেই অন্তত ৪৩৮টি সতীদাহের ঘটনা ঘটেছে, এবং সতীদের অনেকেই বালিকামাত্র। এই সমীক্ষার ফল কেরী জর্জ উডনীর হাতে দিলেন, এবং উডনী এই প্রথা নিষিদ্ধকরণের দাবীসহ সেই তথ্যগুলি সাজিয়ে ওয়েলেসলির কাছে পেশ করেন। ওয়েলেসলি উডনীর স্মারকলিপিটি আপীল আদালতের নিকট তাঁদের মতামতের জন্য পাঠান। সরকারের পক্ষে

যে কোনও পরিবর্তন দেশীয়দের বদ্ধমূল ধর্মমত ও সংস্কারের কথা গুরুতর-ভাবে বিবেচনা করেই করা উচিত বলে আদালত মত প্রকাশ করেন। এর মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই ওয়েলেসলি গভর্ণর জেনারেলের পদ থেকে মুক্ত হয়ে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন, ফলে এই বিষয়ে তিনি কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে যেতে পারেন নি।

কেরী, উডনী ও ওয়েলেসলির এই প্রাথমিক প্রয়াস চরিতার্থ হয়নি। কিন্তু কেরী ও শ্রীরামপুর মিশনারীরা তবু এই সম্পর্কে অবিচলিত থাকতে পারেন নি। Friend of India-র প্রথম সংখ্যাতেই তাঁরা সতীদাহ সম্বন্ধে তথ্যমূলক আলোচনা প্রকাশ করলেন, আবার বিলাতে উইলবারফোর্সের মাধ্যমে সতীদাহ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মনোভাব গড়ে তুলতে প্রয়াস পেলেন। কাজেই শ্রীরামপুর মিশনারীরা তথা কেরী সতীদাহ রহিত করার জন্য মিশনারীর ভূমিকাতেই যথেষ্ট তৎপরতা দেখিয়েছেন বলে মনে করা যেতে পারে। এই বিষয়ে কেরী নিজেকে যে সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত করতে পেরে-ছিলেন, তার কারণঃ (ক) মানবিকতার সহজ সরল সূত্রে সতীদাহ কখনই সমর্থিত হয় না; (খ) এই প্রথা কুসংস্কারমাত্র, কখনই ধর্মীয় শাস্ত্রবিধির অনুসরণধন্য নয়;—এই দুই তথ্য সম্বন্ধে তিনি নিজের মধ্যে নিশ্চিত হয়েছিলেন। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে তিনি কাজ করেছেন, তাঁরা কেউ তাঁকে এই প্রথা যে শাস্ত্রবিধি নির্দেশিত, এ-কথা বলতে পারেন নি; এবং এই পণ্ডিতসমাজের শিরোমণি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের অনুরূপ অভিমত কেরীর কাছে খুবই উৎসাহব্যঞ্জক হওয়া স্বাভাবিক।১১১ তাছাড়া কলেজের শিক্ষক হিসাবে কেরী ছাত্রদের ওপর যে ব্যক্তিত্বের প্রভাব স্বাক্ষরিত করেছিলেন, সতীদাহ নিরোধক আন্দোলনে তারও এক গুরুতর ভূমিকা ছিল। মেটকাফ, বেইলি প্রমুখ কেরীর ছাত্ররা বেণ্টিঙ্কের আমলে কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে সতীদাহ নিরোধক আইন প্রণয়নে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এই আইন প্রণীত হলে, প্রায় পঁচিশ বছর আগে যিনি সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, তখনকার সরকারী অনুবাদক সেই কেরীর কাছেই আইনের বাংলা তর্জমার জন্য পাঠানো হলো। সেদিনকার রবিবারের গির্জার প্রার্থনা সভায় যোগ না দিয়ে তিনি সারাদিনের পরিশ্রমে আইনটির বাংলা অনুবাদ প্রস্তুত করে ফেলেন, ও পরের দিন মিশন প্রেস থেকে ছেপে তা প্রচারিত করেন।

সাগরে সন্তান বিসর্জন, সতীদাহ ইত্যাদি ছাড়াও অন্যবিধ প্রচলিত প্রথা, যেমন কুষ্ঠরোগীদের জীবন্ত কবর দেওয়া বা দাহ করা, শূলবিদ্ধ হয়ে চড়কের সময় মৃত্যুবরণ, বা জগন্নাথের রথের নীচে আত্মোৎসর্গ ইত্যাদি

সম্পর্কেও কেরী স্পষ্টতঃই তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এই প্রচলিত প্রথাগুলির মধ্যে প্রথমটি ধর্মনিরপেক্ষ, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি ধর্মশাসিত। ধর্মশাসিত এই প্রথাগুলি সম্বন্ধে কেরীর মনোভাব অবশ্যই স্বচ্ছ নিরপেক্ষ দৃষ্টির সাক্ষ্য বহন করে না; জগন্নাথের রথের নীচে পড়ে আত্মোৎসর্গকে তিনি পৌত্তলিকতার দুর্মর সংস্কার রূপেই দেখেছিলেন, চড়কের ব্যাপারটিকেও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দিক থেকে তিনি লক্ষ্য করেন নি। তথাপি উভয় ক্ষেত্রেই মানুষের অস্বাভাবিক মৃত্যু তাঁকে গভীরভাবে পীড়া দিয়েছিল বলেই তিনি এমন অকপটভাবে উচ্চারিত। উভয়ক্ষেত্রেই মৃত স্বামীদের অনুগমন করত তাদের সদ্য বিধবারা, এবং একে এক বড় রকমের অপচয় রূপেই তিনি দেখেছিলেন। বস্তুত কেরী তথা শ্রীরামপুর মিশনারীরা এইসব অনুষ্ঠনের নির্মম ফলশ্রুতিটি নিয়েই বিশেষভাবে ভাবিত ছিলেন। এইসব ধর্মীয় অনুষ্ঠান (জগন্নাথের রথ, চড়ক ইত্যাদি) সম্পর্কে কেরী উদার মনোভাবের পরিচয় দিতে পারেন নি সত্য, কিন্তু তাঁর এই মানব-ভাবনার সূত্রটি ধর্মদৃষ্টির সংকীর্ণতা দ্বারা বাতিল হয়ে যায় না।

কুষ্ঠরোগীদের পুড়িয়ে মারার একটি নির্মম অনুষ্ঠান কেরী সম্ভবতঃ পুত্র উইলিয়মের কাছে কাটোয়ায় থাকাকালীন ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ১১২ নয়াসরাইর সতীদাহ অনুষ্ঠান দেখে কেরী বুঝেছিলেন 'it was impossible for her to stir or struggle on account of the bamboos which were held down on her like the levers of the press'; আর কুষ্ঠরোগীর জীবন্ত দাহ-অনুষ্ঠানে তিনি দেখেছেন যে সেই রোগী, 'instantly, on feeling the fire, begged to be taken out, and struggled hard,' কিন্তু 'His mother and sister...thrust him in again.' কেরী এই চিত্রে নিষ্ঠুরতা ও অসহায়তার রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। এই অসহায়তা মানবের সামগ্রী, আর এই নিষ্ঠুরতা তার কারক। মানুষের এই অসহায়তার বোধ থেকেই অসহায়তার হাত থেকে মুক্তির সাধনা সূচিত হয়, তাই হিতব্রত। কলকাতায় কুষ্ঠরোগীদের জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পিছনেও হিতব্রতী কেরীর মানবিক প্রেরণার দায়িত্ববোধ মুদ্রিত আছে।

উদ্ভিদচর্চা

'আমি যখন থাকব না, মার্শম্যান তখন আমার বাগানে গরু চড়াবে।' মৃত্যুর পূর্বে কেরীর এই উক্তিতে ঠাট্টা আছে, কিন্তু ওই উক্তির মধ্যেই দীর্ঘকালের শ্রমে ও তত্ত্বাবধানে তিনি শ্রীরামপুরে যে বাগান গড়ে তুলেছিলেন,

তার প্রতি তাঁর ভালোবাসার তীব্রতা অনুভব করা যায়। কেরী কখনোই নিজেকে উদ্ভিদবিজ্ঞানী বলতে চান নি, উদ্ভিদের সংগ্রাহক রূপেই তিনি আত্মপরিচয় দিয়েছেন বরং;১১৩ কিন্তু উদ্ভিদবিজ্ঞানে তাঁর অপরিসীম আগ্রহ ও প্রযত্ন তাঁকে এই ক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখবার ভূমি প্রস্তুত করে দিয়েছে।

ক্যানাডা থেকে দীর্ঘ অজ্ঞাতজীবন যাপনের শেষে তাঁর পিতৃব্য পিটার যখন পলার্স'পিউরীতে ফিরে এসেছিলেন, তখন তাঁরই হাতে বালক কেরীর উদ্ভিদ বিষয়ে আগ্রহের সূচনা হয়েছিল বলে মনে হয়। স্বদেশে থাকতে তিনি যখন যেখানে থেকেছেন, সেখানেই বাড়ির সঙ্গে বাগান করেছেন। মদনাবাটিতেও তিনি বাগান করেছিলেন; সেখান থেকে কলকাতার বোটানিকের ডক্টর রক্সবার্গের সঙ্গে পত্র বিনিময় করেছেন, উদ্ভিদ বিনিময় করেছেন; কৃষিকাজের উন্নতির বিষয়ে চিন্তা করেছেন।১১৪ মদনাবাটি থেকে যখন তিনি শ্রীরামপুরে চলে আসেন, তখন এই বৃত্তির অনুশীলনে তিনি অধিকতর যত্নবান; এখানে তিনি প্রায় পনের বিঘা জমির ওপর যে বাগান গড়ে তুলেছিলেন, তাকে ভারতবর্ষে কম্পানীর কলকাতার বাগানের পরেই শ্রেষ্ঠ বলে তখন সাধারণভাবে মনে করা হতো। কেরী যখন যেখানে সুযোগ পেতেন, সেখান থেকেই উদ্ভিদের বীজ বা বাল্ব আনতেন, বিলাত থেকে আরম্ভ করে দূর প্রাচ্যের দেশ থেকে। আবার তাঁর শ্রীরামপুর সংগ্রহ থেকে তিনি ইংলণ্ডে বহুরকমের ভারতীয় উদ্ভিদের নমুনা পাঠিয়েছেন, যা সেখানে সযত্নে চর্চা করা হয়েছে। এইভাবে প্রাকৃতিক সম্পদকে অবলম্বন করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিনিময় কেরীর এক অসাধারণ কাজ, দুই দেশের পরস্পরতা গড়ে তোলার একটি পদক্ষেপ রূপে যাকে চিহ্নিত করা যায়।

বোটানিকের কিউরেটর যখন ভগ্নস্বাস্থ্যে ইংলণ্ডে, কেরী তখন তাঁর Hortus Bengalensis সম্পাদনা করেন ও প্রকাশ করেন; এই গ্রন্থে কেরী লিখিত ভূমিকা বিজ্ঞান বিষয়ে কেরীর রচনার পরিচয় বহন করে। রক্সবার্গের মৃত্যুর পর তাঁর Flora Indica-ও তিনখণ্ডে কেরী সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। তাঁর এই সম্পাদনা উদ্ভিদবিজ্ঞানে তাঁর অধিকার প্রমাণ করে।

দীর্ঘকাল যাবতই কেরী ভারতবর্ষের জন্য এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের আগে এই ক্ষেত্রে তিনি কোন কার্যকর অগ্রগতি দেখাতে পারেন নি। ঐ সময় গভর্ণর জেনারেল হেস্টিংসের স্ত্রীর গভীর উৎসাহে তিনি এই কাজে অগ্রসর হন

এবং সোসাইটি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে একটি প্রস্তাব রচনা করে বিতরণ করেন। তাঁর এই প্রস্তাবে যথেষ্ট সাড়া মেলে, এবং ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে কলকাতা টাউন হলে ঐ সোসাইটি গঠিত হয়। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে আলিপুরে এখন যেখানে হর্টিকালচার গার্ডেন, সেই জমিতে স্থায়ীভাবে বাগান প্রতিষ্ঠিত হয়। রামকমল সেনের সঙ্গে তিনি প্রথমে সোসাইটির সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এই বিবেচনায় যে ডক্টর ওয়ালিচ ফিরে এলে এই দায়িত্ব তিনি ছেড়ে দেবেন। আলিপুরে বাগান প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানেও বাগানের ব্যাপারে কেরীর যোগ্যতা সম্পূর্ণভাবেই ব্যবহৃত হয়েছিল। কলকাতার এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি কেরীর এক স্মরণীয় সৃষ্টি।

কম্পানীর বাগানের কিউরেটর ন্যাথানিয়েল ওয়ালিচের সঙ্গে কেরীর যোগাযোগও উল্লেখযোগ্য। কেরী যেমন বাগান করেছিলেন, তেমনি পাখি সংগ্রহেও অনেকখানি এগিয়েছিলেন; বিভিন্ন নমুনার পাথরাদি সংগ্রহে তাঁর উদ্যমও ইতিহাসের দিক থেকে উল্লেখ করা উচিত।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে কেরী ব্রিটেনের রয়্যাল হর্টিকালচারাল সোসাইটির সদস্য হন; এবং ১৮২৩ সালে কোলব্রুকের সুপারিশে লিনীয়ান সোসাইটির ফেলো হন।

ফেরা

কেরীর বিচিত্র ও ব্যস্ত দীর্ঘ কর্মজীবন ধীরে ধীরে একদিন অপরাহ্ণ-বেলার ছায়ায় এসে পৌঁছে গেল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠায় ও ১৮০১-এ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকরূপে যোগদানের পর থেকে তাঁর জীবনের পরিধি যেভাবে রচিত হয়েছে, ধীরে ধীরে তা সঙ্কুচিত হয়ে এল। ব্রহ্মদেশীয় যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে গভর্ণমেন্ট ব্যয়-সঙ্কোচের প্রয়াসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক পদের অবলুপ্তি ঘটালেন; কলেজের সঙ্গে কেরীর দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরকালের সম্পর্ক এইভাবে একদিন ছিন্ন হয়ে গেল (১৮৩০)। তাঁর জন্য বছরে তিনশ-ষাট পাউন্ড অবসরকালীন ভাতা মঞ্জুর হলো; আর কলেজের দীর্ঘকালের সহকর্মী দেশীয় পণ্ডিত মুন্সীদের দেওয়া আবেগময় বিদায় অনুষ্ঠানের শেষে অভিভূত কেরী চোখের জল নিয়ে শ্রীরামপুরে ফিরে এলেন।

বিকেলবেলা মানুষ ঘরে ফিরে আসে, কেরী শ্রীরামপুরে ফিরে এলেন। শ্রীরামপুর তাঁর রূপায়িত স্বপ্ন। এরই স্বপ্নে একদিন তিনি ইংলণ্ড থেকে ভারতবর্ষের পথে যাত্রা করেছিলেন, তাঁর সেই স্বপ্নের যাত্রায় সঙ্গে এসে-

ছিলেন স্ত্রী ডরোথি। বাংলাদেশের আবহাওয়া আর এখানে তখনকার অনিশ্চিত জীবনের চাপে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন, এবং ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। আজ ডরোথি নেই। ডরোথির মৃত্যুর পর স্নেহ-ভালোবাসাপূর্ণ আন্তরিক জীবনের আকাঙ্ক্ষায় ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে কেরী দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। শার্লট রুমর একজন ডাচ মহিলা, প্রায় কেরীর সমবয়সী, কার্যকারণে ভারতবর্ষে এসে তিনি শ্রীরামপুরে বসবাস করছিলেন। শিক্ষায় ও রুচিতে শার্লট আকর্ষণীয় ও মার্জিত; শ্রীরামপুরের প্রধান গুরুতর ব্যক্তিত্ব কেরীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠেছিল। ডরোথি বেঁচে থাকতেই তাঁর সঙ্গে কেরীর ঘনিষ্ঠতা হয়: ডরোথির মৃত্যুর পর কেরী শার্লটকে বিবাহ করেন। কেরীর মানসিক সঙ্গী হওয়ার যোগ্যতা তাঁর ছিল; দুঃখে-সুখে কেরীর সঙ্গে তিনি সমানভাবে আন্দোলিত হয়েছেন, কেরীকে কর্মে উদ্দীপিত করেছেন এবং তাঁর প্রতি আন্তরিক ভালোবাসায় কেরীর এই সময়কার জীবনকে তিনি সৌন্দর্যময় করে তুলেছেন। শার্লটের সঙ্গে কেরীর তের বৎসরের বিবাহিত জীবন বোধহয় তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। ১৮২১-এ শার্লটের মৃত্যু হয়। আজ শার্লট নেই। সেদিনকার সেই সঙ্গীহীন একাকীত্বের বোধ বোধহয় কেরীকে তৃতীয়বার বিবাহে প্রণোদিত করে। এবার তিনি বিবাহ করেন বিধবা গ্রেস হিউজেসকে (১৮২৩)। হিউজেসের বয়স ৪৫-এর মত, কেরীর ৬২। সাহচর্যদানে ও পরিচর্যায় গ্রেস কেরীর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজেকে নিবেদন করে গেছেন।

সেদিনকার স্বপ্নের যাত্রার সময় সঙ্গে ছিল ফেলিক্স, পিটার প্রভৃতি ছেলেরা। মদনাবাটির জীবনের প্রারম্ভেই তিনি পিটারকে হারিয়েছিলেন। বড় ছেলে ফেলিক্স, বড় প্রতিভার অধিকার নিয়ে যাঁর জন্ম, যিনি উদ্দীপনাময়, হয়তো কখনো বা উচ্ছৃঙ্খল, যিনি ব্যক্তিগত বিপর্যয় ও দুঃখের আলোতে আবার আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে পারেন—সেই ফেলিক্স মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে মারা গেলেন। দুই মেয়ে অ্যান আর লুসি শিশুকালেই বিদায় নিয়েছিল, আজ পিটার আর ফেলিক্সও নেই। এখন উইলিয়ম আর জাবেজ মিশনারী জীবনে নিবেদিত হয়ে যথাক্রমে কাটোয়ায় ও রাজপুতনায়; আর জোনাথান, যিনি কলকাতায় সম্পন্ন এ্যাটর্নী, সংসারে রক্তের সম্পর্ক ধারণ করে বৃদ্ধ কেরীর অস্তিত্বের পরিচয় রক্ষা করছেন।

পিতা এডমণ্ডের মৃত্যু হয়েছিল অনেক আগেই, ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮২৫ সালের মধ্যে সেদিনকার ইংলণ্ডে তাঁর ঘনিষ্ঠদের মধ্যে সকলেই গত হয়েছেন,—ফুলার, সাটক্লিফ, পীয়ার্স, রাইল্যাণ্ড প্রত্যেকেই। এখন

ইংলণ্ডেও তাঁর পরিচিত পরিধির মধ্যে শূন্যতা, সেখানে তাঁর দুই বোন ছাড়া কেউ নেই।

ভারতবর্ষেও সেদিনকার স্বপ্নের সাধনায় তিনি যাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কবন্ধনে কর্মযজ্ঞের সূচনা করেছিলেন, সেই টমাস, বা ওয়ার্ড, হুগলির ঘাটে প্রথম অভ্যর্থনাকারী রামরাম বসু বা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে শ্রেষ্ঠ সহযোগী পণ্ডিত-মনীষা মৃত্যুঞ্জয়ও এখন নেই।

চারধার যেন অসম্ভব নিরালা হয়ে গেছে, এবং কেরী সেই নির্জনতায় ফিরে এলেন।

ধীরে ধীরে রোগ প্রবল হলো, ধীরে ধীরে তিনি অশক্ত হয়ে পড়লেন। ঘরে বসে থাকেন, কখনো ঝিমোন; এখন তাঁর জীবনে শুধুই পরিণামের অপেক্ষা।

এই সময় একদিন লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির জর্জ গগারলি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা বন্ধু, আপনি তো মৃত্যুর মুখোমুখি বসে আছেন, এই সময় আপনার কিরকম অনুভূতি হচ্ছে?

কেরীর ঝিমোনো-ভাব যেন হঠাৎ কেটে গেল; বললেন, আমি জানি আমি কার ওপর নির্ভরশীল, আমার ব্যক্তিগত পরিত্রাণে আমার কোন সন্দেহ নেই, 'but when I think I am about to appear in the presence of a holy God, and remember all my sins and manifold imperfections—I tremble.'১১৫

১৮৩৪ খৃীষ্টাব্দের ৯ই জুন প্রত্যুষে উইলিয়ম কেরীর মৃত্যু হয়।

উল্লেখপঞ্জী ও টীকা

১। F. D. Walker: William Carey; London, 1926; p-14.

২। S. P. Carey: William Carey; London 1934; p-19.

৩। দ্রঃ Eustace Carey: Memoirs of William Carey, London, 1836; p-6. Culross প্রশ্ন তুলেছেনঃ "was he a descendant of 'James Carey', curate of the parish from 1624 to 1630?" দ্রঃ James Culross: William Carey, London, 1881; p-3 f. n. S. P. Carey-ও জনৈক জেম্‌স্‌ কেরী, যাঁকে ১৬৬১ সালের ৭ই এপ্রিল সমাহিত করা হয়েছিল, তাঁর বংশোদ্ভূততার প্রসঙ্গ কেরী সম্পর্কে তুলেছেন। দ্রঃ S. P. Carey: p-16.

৪। মেরী কেরীর চিঠি অনুযায়ী; দ্রঃ Eustace: pp-22-23.

৫। মেরী কেরীর বিবরণ ও জেমস কালরসের বিবরণ অনুসরণে প্রস্তুত।

৬। 'He made the Paulerspury hedges and the ridings of the wide Whittlebury forest, close at hand, the best of kindergartens for William. He quickened his spirit'.—S. P. Carey: p-19. পিটারের প্রভাব সম্পর্কে ওয়াকারও মন্তব্য করেছেনঃ 'Thus a natural fondness for flowers was developed, and William became a keen gardener too. Walker: p-20. পাশাপাশি মেরী কেরীর মন্তব্যও লক্ষ্য করা দরকার। দ্রঃ Mary Carey in Eustace s : p-25. তাঁর মন্তব্য থেকে মনে হতে পারে যে প্রবৃত্তিটি উইলিয়মের সহজাত হওয়াও সম্ভব।

৭। দ্রঃ Walker : p-16.

৮। নতুবা, মেরী কেরীর সাক্ষ্য অনুযায়ী 'his manners were rather awkward.' in Eustace's : p-25.

৯। ফুলারকে লেখা কেরীর চিঠি, in Eustace's : p-7.

১০। ঐ। ঐ; এবং রাইল্যান্ডের কাছে লেখা বিবরণ, in Eustace's : p-18.

১১। 'Novels and plays always disgusted me, and I avoided them as much as I did books of religion.' Carey in Eustace's : p-7.

১২। ঐ। ঐ

১৩। দ্রঃ Walker : p-25.

১৪। দ্রঃ Eustace : p-7.

১৫। দ্রঃ Edmund Carey quoted in Eustace's : p-7 f.n.

১৬। প্রথম প্রকাশঃ ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দ।

১৭। দ্রঃ Walker : p-59 f.n.

১৮। দ্রঃ S. P. Carey : p-25 ; Walker : pp-59-60.

১৯। দ্রঃ Mary Carey in Eustace's : pp-24-25.

২০। কেরীর সংগ্রহ-বাসনা ও উৎসাহের পশ্চাতে কয়েক বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত 'ব্রিটিশ মিউজিয়মের' পরোক্ষ প্রেরণা থাকতে পারে বলে ওয়াকার মন্তব্য করেছেন। দ্রঃ Walker : p-19. মনে হয় এটা অত্যুৎসাহ।

২১। দ্রঃ S. P. Carey : p-24.

২২। কেরীর আত্মবিবরণ, ফুলারকে লেখা চিঠি। দ্রঃ Eustace : p-8.

২৩। সজনীকান্ত দাস ওল্ডের কাছে শিক্ষানবিশী করার কালে কেরীর নৈতিক অধঃপতনের ব্যাখ্যায় ফুলারের কাছে লেখা কেরীর ঐ চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। দ্রঃ সজনীকান্ত দাসঃ বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, পৃ-৭৩। কিন্তু এই প্রয়োগ সমীচীন হয় নি, কেননা পলার্সপিউরীর জীবনে তাঁর স্বভাবহানির সূত্রটিই কেরী ঐখানে উদ্ধার করতে চেয়েছেন।

২৪। তৎকালে হ্যাকলটনে প্রচলিত ধারণা ছিল যে কেরী কারিগরী দক্ষতায়

নিপুণ ছিলেন না। কিন্তু কেরী নিজেই বলেছেন 'I was accounted a very good workman.' দ্রঃ Eustace : p-9; Culross : p-8.

২৫। কেরীর সাক্ষ্য অনুযায়ী, ইতিমধ্যে তিনি 'Jeremy Taylor's Sermons.' 'Spinker's Sick Man visited' এবং অন্যান্য কিছু বই পড়েছেন। দ্রঃ Eustace : p-9.

২৬। বড়দিনের চাঁদা আদায় করে তা নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করা, দোষ ঢাকতে গিয়ে মনিবের কাছে মিথ্যে কথা বলা, এবং অবশেষে ধরা পড়ার এক চমকপ্রদ কাহিনী কেরী নিজেই বিবৃত করেছেন। দ্রঃ ঐ। পৃ-১১।

২৭। টমাস স্কটের সঙ্গে কেরী লণ্ডনে আরেকবার দেখা করেছিলেন, তাঁর প্রভাবে কম্পানীর জাহাজে ভারতযাত্রার লাইসেন্স সংগ্রহের আর্জি নিয়ে। দ্রঃ টমাস স্কটের বিবরণ, ঐ। পৃ-৪২।

২৮। 'His marriage was a mistake' বলেছেন জেম্স্ কালরস। দ্রঃ Culross : p-13. এই মন্তব্যের পক্ষে ও বিপক্ষে বহু যুক্তি আছে, তবে সাধারণভাবে প্রায় প্রত্যেকেই মনে করেন যে, ডরোথি ছিলেন 'a good woman.' কেরী ডরোথির প্রতি চিরদিনই সস্নেহ ছিলেন।

২৯। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দ বলে সচরাচর উল্লেখ করা হয়। কিন্তু ওল্নি চার্চবুকে আছে, তাঁরা সদস্যপদের জন্য 'a request from William Carey, of Moulton, in Northamtonshire' পেয়েছেন, এবং তারিখ ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুন। দ্রঃ Culross : p-17.

৩০। সজনীকান্ত দাস 'অবৈতনিক পাঠশালা' লিখেছেন। কিন্তু কালরস কেরীর তখনকার আয়ের হিসাব দেখাতে গিয়ে জানাচ্ছেন যে স্কুল থেকে তাঁর সাপ্তাহিক আয় ছিল সাত শিলিং ছয় পেন্স। দ্রঃ ঐ। পৃঃ ১৯। পাঠশালা অবৈতনিক হলে স্কুল থেকে এই আয় সম্ভবপর হয় না।

৩১। 'I may only observe that reading Cook's voyages was the first thing that engaged my mind to think of Missions.' Eustace : p-18.

৩২। 'A Discourse on the Gospel Offer, by a Minister of the Reformed Church, translated from the Dutch by the Rev. Wm. Carey, of Moulton, near Northamton, 1789.'

ছোট হাতের লেখায় ৪৫ পাতার এই পাণ্ডুলিপিখানি মুদ্রিত হয়নি।

৩৩। সজনীকান্ত দাস লেস্টারে 'জুতা-সেলাই ও শিক্ষকতাবৃত্তি ত্যাগ' করার কথা ভ্রমক্রমে লিখে থাকবেন।

৩৪। Culross : p-40.

৩৫। 'An Enquiry into the Obligation of Christians to use Means for the Conversion of the Heathens. In which the religious state of the different nations of the world, the success of former undertakings, and the practicability

of further undertakings are considered. By William Carey. Licester, 1792. Price one shilling and six pence.'

বার্মিংহামের পট্‌স্‌ নামে জনৈক ভদ্রলোকের দশ পাউন্ড অর্থানুকূল্যে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছিল; গ্রন্থখানির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮৭।

৩৬। 'The Particular Baptist society for propagating the Gospel amongst the Heathen.'

৩৭। ৩১ অক্টোবর, ১৭৯২।

৩৮। ১৭৫৭-১৮০১। আর্ল অব অকসফোর্ড জাহাজের ডাক্তার রূপে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম বাংলাদেশে আসেন। বাংলাদেশে খ্রীষ্টমহিমা প্রচারের আগ্রহ তিনি তখনই ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু ১৭৮৪-র মার্চে তিনি স্বদেশে ফিরে যান। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাইতে আবার ঐ জাহাজেই বাংলাদেশে আসেন। এই সময় উইলিয়ম চেম্বার্স, জর্জ উডনী ও চার্লস্‌ গ্রান্টের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ হন, এবং গ্রান্টের আহ্বানে তিনি জাহাজের চাকরি ত্যাগ করে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য এদেশে থেকে যান। উইলিয়ম চেম্বার্সের ফার্সি মুন্সী রামরাম বসু টমাসের মুন্সী হলে তার বাংলা শিক্ষা সন্তোষজনক ভাবে চলতে থাকে। মুন্সীর সহায়তায় টমাস ম্যাথু, মার্ক, ও জেমসের গসপেল বাংলায় অনুবাদ করেন। এই সব অনুবাদের রূপ পরবর্তীকালে কেরীর প্রয়াসের মধ্যে হারিয়ে গেছে। টমাসের অনুবাদের সামান্য একটু পরিচয় পাওয়া গেছে মাত্রঃ 'গোনার মাহিনা মির্ত্তু কিন্তু খোদার দিয়া চির প্রমাই জিজছ ক্রাইষ্ট হইতে।' নবদ্বীপের পদ্মলোচন পণ্ডিতের কাছে বসে তিনি 'মুগ্ধবোধ'-এ পাঠ গ্রহণ করেন, অবশ্য এই পাঠ তিনি সম্পূর্ণ করেন নি। ১৭৯২-তে তিনি আবার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তৃতীয়বার তিনি বাংলাদেশে আসেন কেরীর সঙ্গে ১৭৯৩-র নভেম্বরে, এই সময় থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, তিনি এদেশেই থেকে গেছেন। উদ্দীপনা ও উচ্ছ্বাসময় চারিত্রিক দৌর্বল্যের কাছে কখনো কখনো আত্মসমর্পিত, জীবনের ও কর্মের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ অথচ উজ্জ্বল এই চরিত্র অতঃপর কেরীর ব্যক্তিত্ব ও উদ্যমশীলতার আড়ালে হারিয়ে গেছে। টমাসের বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্যঃ C. B. Lewis: The life of John Thomas, London, 1873.

৩৯। C. B. Lewis: The life of John Thomas. London 1873. p-iv.

৪০। quoted in Culross: p-51.

৪১। টমাসের প্রতি চার্লস্‌ গ্রান্টের বিরূপতাই এর কারণ; নতুবা কেরীর একা যাবার বোধহয় কোন বাধা হতো না। দ্রঃ টমাস স্কটের বিবরণ, Eustace, p-42.

৪২। দ্রঃ মেরী কেরীর বিবরণ; ঐ। পৃঃ-৩৫।

৪৩। তাঁর অন্যতম প্রিয় কবি কাউপারের কবিতাও তিনি এই সময় পড়ছিলেন।

৪৪। Eustace: p-110.

৪৫। দ্রঃ ঐ। পৃঃ ১১৯।

৪৬। ঐ। পৃঃ ১০১।

৪৭। দ্রঃ ঐ। পৃঃ ১১৯-২০।

৪৮। এই বিষয়ে সজনীকান্ত দাসের সমীক্ষাটি আকর্ষণীয়ঃ 'প্রকৃতপক্ষে টমাসের সহিত বাংলা গদ্যের সম্পর্ক সেই দিন হইতেই ঘুচিয়া যায়, অধিকতর পরিশ্রমী, অধ্যবসায়শীল ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তির হাতে এই ভার অর্পিত হয়।' দ্রঃ সজনীকান্তঃ পৃ-৭৭।

৪৯। ৪-১২-১৭৯৩ তারিখে ব্যাণ্ডেল থেকে কেরী লিখছেনঃ 'I am at present incapable of preaching to the Hindoos. I am unacquainted with their language.' Eustace: p-125.

৫০। সজনীকান্তে উদ্ধৃতঃ পৃ-৭৯।

৫১। দিন দশেক ব্যয় হয়েছিল যাত্রা ও প্রত্যাবর্তনের কাল সহ। কেননা ১৬-১২-১৭৯৩-র জার্নালে যাত্রার কথা আছে ব্যাণ্ডেল থেকে, আবার ২৬-১২-১৭৯৩-এ ব্যাণ্ডেলে লেখা তাঁর জার্নালের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়।

৫২। দ্রঃ J. C. Marshman: The Story of Carey, Marshman and Ward; London, 1864, p-26.

৫৩। ব্রাউনের কাছে কেরী ঠাণ্ডা অভ্যর্থনা লাভ করেছিলেন। দ্রঃ Eustace: pp-144-45.

৫৪। ১৭৬৭-১৮০০। বাংলা বাইবেল অনুবাদে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী। ১৭৯৯-তে মিস টিড্‌কে বিবাহ করেন। শ্রীরামপুরের ছাপাখানার সূচনায় ওয়ার্ডের ঘনিষ্ঠ সহযোগী।

৫৫। ১৭৬০-১৮৩৭। তন্তুবায়ের পুত্র; পিতার ধার্মিকতার প্রভাবে ও আপন জ্ঞানপিপাসা ও অধ্যয়নের প্রতি আগ্রহে তাঁর ভবিষ্যৎ-জীবনের বীজ ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়। ব্যাপ্টিস্ট পরিবারের মেয়ে হানা শেফার্ডের সঙ্গে বিবাহের (১৭৯১) পর তিনিও ব্যাপ্টিস্ট মতবাদে দীক্ষা নেন এবং ১৭৯৪-তে ব্রিস্টলের একটি স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। ভাষা শিক্ষার প্রতি আগ্রহে ল্যাটিন, গ্রীক ও হিব্রু ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। মিশনারী জীবন গ্রহণ করে ১৭৯৯-তে ধর্মপ্রচারের জন্য বাংলাদেশে আসেন, ও ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারিতে শ্রীরামপুরে মিশন প্রতিষ্ঠায় তিনি অন্যতম নায়ক। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মিশনের কাজে আত্মনিবেদিত ছিলেন। মিশনের আয়ের জন্য প্রথমে স্কুল স্থাপন থেকে মিশনের সমস্ত শিক্ষা-প্রকল্পে তাঁর ভূমিকা ছিল মুখ্য। চীনা ভাষা শিখে ওই ভাষায় বাইবেল অনুবাদ ছাড়া ব্যাকরণ-অভিধানও রচনা করেন। সংস্কৃত রামায়ণের ইংরাজী অনুবাদে কেরীর সঙ্গী। সাময়িক পত্র প্রকাশনায় তাঁর উদ্যোগ চরিতার্থ হয়, এবং এই উদ্যোগ ঐতিহাসিক। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া, দিগ্‌দর্শন, সমাচারদর্পণ প্রকাশের পিছনে কেন্দ্রীয় শক্তি তিনি। প্রধানতঃ তাঁরই ব্যক্তিগত চেষ্টায় ডেনমার্কের রাজার অনুমোদনে শ্রীরামপুর কলেজ ডিভিনিটি উপাধিদানের যোগ্যতা অর্জন করে (১৮২৭?)। তিনি কয়েকটি

খ্রীষ্টসংগীতও বাংলায় রচনা করেছিলেন।

৫৬। ১৭৬৯-১৮২৩। ডার্বির একটি স্কুলে পাঠ শেষ করে সেখনকার একটি ছাপাখানায় শিক্ষানবিশী করা কালে পত্রিকা প্রকাশের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। 'ডার্বি মার্কারি' পত্রিকার তত্ত্বাবধায়ক। এখানে থাকাকালে ভারতবর্ষ-যাত্রী কেরীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় ও ভারতীয় ভাষায় বাইবেল মুদ্রণের কাজে তাঁর প্রয়োজন-সম্ভাবনার কথা কেরী তখনই উত্থাপন করেন। ডার্বি থেকে স্টাফোর্ড, স্টাফোর্ড থেকে হাল—সর্বত্রই তিনি পত্রিকা প্রকাশের ও মুদ্রণের কাজে নিয়োজিত। ফরাসী বিপ্লবের মানবতাবাদ, স্বাধীনতা ও সাম্য-আদর্শ দ্বারা তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। পরে ব্যাপ্টিস্ট ধর্মে দীক্ষা নেন ও ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মার্শম্যানের দলের সঙ্গে ধর্মপ্রচারের জন্য বাংলাদেশে আসেন। শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হলে মিশন প্রেসের সমগ্র দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন। ১৮০২-তে ফাউন্টেনের বিধবাকে বিবাহ করেন। শ্রীরামপুরের কাগজের শিল্প প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি সাময়িকপত্র প্রকাশের সমর্থক ছিলেন এবং মার্শম্যানের পক্ষে এ-বিষয়ে তিনি কেরীকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে তিনি ১৮১৮-তে স্বদেশে যান ও সেখান থেকে আমেরিকা হয়ে ১৮২১-এ আবার শ্রীরামপুর ফিরে আসেন। কিন্তু স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে ও ১৮২৩-এর মার্চে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর 'A view of the History, Literature and Mythology of the Hindus' একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। তাঁর বচনা একটি বাংলা খ্রীষ্টসংগীত পাওয়া গেছে।

৫৭। মৃত্যুঃ ১৮০১। ছাপাখানায় ওয়ার্ডের সহকারীরূপে কাজ করেছিলেন।

৫৮। উদ্ধৃতিগুলি ইউস্টেস কেরীর গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র উল্লেখ আছে।

৫৯। টমাসের পর্যবেক্ষণও প্রায় অনুরূপঃ 'The people hereabouts speak a mixed language, part Persian, part Bengali, and part Hindustani,, or the Moor language; so that we do not understand them, nor they us,........but where ever we meet the Brahmuns, the case is different.' Eustace: p-261.

৬০। সজনীকান্তে উদ্ধৃতঃ পৃঃ ৮৪-৮৫।

৬১। হালহেডের ব্যাকরণের উপযোগিতার কথা কেরী ২-১০-১৭৯৫-র একটি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। দ্রঃ Eustace: p-249. মনে করতে বাধা নেই, এই সময়ের অনেক আগে থেকেই ভাষাশিক্ষায় তিনি এই গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। টমাসের কাছে এই গ্রন্থ ছিল।

৬২। কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় ও গোলকনাথ শর্মা।

৬৩। দ্রঃ Fountain in Eustace's: p-286.

৬৪। দ্রঃ Smith: p-165.

৬৫। দ্রঃ Eustace: p-343.

৬৬। quoted in S. P. Carey: p-178.

৬৭। দ্রঃ Walkar : pp-210-11.

৬৮। দ্রঃ Ward's Journal, dated 18.1.1800, quoted in Smith: p-92.

৬৯। quoted in Smith : p-181.

৭০। মনোহর পঞ্চাননের জামাতা; প্রায় চল্লিশ বৎসর শ্রীরামপুরে চাকরি করেছেন।

৭১। ২৭শে মার্চ, ১৮২০।

৭২। দ্রঃ সজনীকান্তঃ পৃঃ ৯৩।

৭৩। দ্রঃ সাহিত্য পত্রিকা, পঞ্চমবর্ষ প্রথম সংখ্যা; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ ২৩৫-২৬৮।

৭৪। কিছুদিনের মধ্যে এই কম্পোজিটর চলে গেলে সপ্তাহে ২০০০ পৃষ্ঠার বেশী ছাপা সম্ভব হতো না। দ্রঃ Ward's Journal, dated 1.8.1800, quoted in Smith : p-93.

৭৫। Sydney J. Owen: A Selection from the Despatches, Treaties, and other papers of the Marquess Wellesly. Oxford, 1877, p-742.

৭৬। ২৪শে নভেম্বর, ১৮০০।

৭৭। Sydney J. Owen : p-748.

৭৮। ঐ। পৃঃ ৭৫০।

৭৯। কেরীর বর্ণনা অনুযায়ী কেমিস্ট্রি শিক্ষাদানের কাজও শুরু হয়েছিল বলে জানা যায়। দ্রঃ সজনীকান্তে উদ্ধৃত কেরীর চিঠি, পৃঃ ১১৯।

৮০। দ্রঃ Thomas Roebuck: Annals of the College of Fort William, Calcutta, 1819. Appendix, pp. 53-54. এ'রা প্রত্যেকেই অধ্যাপক রূপে ১৮০১-এর এপ্রিলে নিযুক্ত হন। মে মাসেই সরকার-বিধিবদ্ধ ভারতীয় আইন অধ্যাপনায় বার্লোর স্থলাভিষিক্ত হন জে· এইচ· হ্যারিংটন।

৮১। A. K. Ghoshal : Civil Service in India, Calcutta, 1944 থেকে উদ্ধৃত; পৃঃ ২৫২।

৮২। ডঃ মিশ্র এই প্রসঙ্গটির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন যে ওয়েলেসলির এই প্রস্তাব প্রকৃতপক্ষে 'Signified a delegation of new authority to the local Government, which meant in effect a consequent transfer of the sense of individual obligation and fidelity of civil servants from the Company to person of the Governor-General. How could the Court extend a willing support to a proposal which aimed to reduce its own influence, authority and patronage?' B. B. Misra : The Central Administration of the East India Company, 1959. p-389.

৮৩। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

৮৪। দ্রঃ Carey quoted in Walker: p-232.

৮৫। অধ্যাপক রূপে নিয়োগের শর্ত ছিলঃ নিযুক্ত ব্যক্তিকে চার্চ অব ইংলণ্ডের অনুগত হতে হবে, কিন্তু কেরী ছিলেন নন্‌-কন্‌ফর্‌মিস্ট্‌।

৮৬। এটাই সাধারণ প্রচলিত অভিমত। কিন্তু কলেজ প্রসিডিংসে কেরীর কলেজে যোগদানের কাল বলা হয়েছে এপ্রিল, ১৮০১। দ্রঃ Home Miscellaneous. Vol. 570. p-490.

৮৭। দ্রঃ S. P. Carey: p-219; Walker: pp-235-36. ২৯-৪-১৮০১-এর কলেজ কাউন্সিলের প্রসিডিংসে বাংলা ক্লাশ বুধ ও শুক্রবার হবে বলে নির্দেশ আছে। দ্রঃ Home Misc. Vol. 559. ১৮২৯-এর অগাস্টেও দেখা যায় বাংলার অধ্যাপকের কাজ মঙ্গল ও শুক্রবার। দ্রঃ ঐ। Vol. 570. pp-490-91. তবে ২৩-৯-১৮০৫-এ কাউন্সিল বাংলা ক্লাশ বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার হবে বলে সিদ্ধান্ত নেন। দ্রঃ ঐ। Vol. 560.

৮৮। দ্রঃ Roebuck: Appendix, pp-49-50.

৮৯। জুন (?) ১৮০১। লক্ষণীয়, বাংলা কখনোই স্বতন্ত্র বিভাগ বলে গণ্য হয় নি, প্রথমাবধি বাংলা ও সংস্কৃত একসঙ্গে একটি বিভাগ রূপে পরিকল্পিত হয়। কেরী এই দুই ভাষার বিভাগেই "শিক্ষক" রূপে যোগ দেন।

৯০। দ্রঃ Home Misc. Vol. 565. ২-৫-১৮১৮-র রিপোর্ট; Roebuck: Appendix, p-54; কিন্তু S. P. Carey অনুযায়ী তিনি ১৮০৬ সালের অগাস্ট মাস থেকেই অধ্যাপকের পদমর্যাদা ও হাজার টাকা বেতন পান। দ্রঃ S. P. Carey: p-224. এর সূত্র কি, জানি না।

৯১। শ্রীরামপুর ১৮০২ সালে যে কাশীরাম দাসের মহাভারত ছাপে, তা কলেজে বাংলা থেকে ইংরাজি অনুবাদ শিক্ষায় ব্যবহৃত হতো। দ্রঃ S. P. Carey: p-226. প্রসঙ্গতঃ, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা পাঠ সম্বন্ধে কেরীর একটি মন্তব্য উল্লেখ করা উচিতঃ 'These (কেরীর বাংলা ব্যাকরণ, রামরামের প্রতাপাদিত্য চরিত্র ও গোলোকনাথের হিতোপদেশ যা গদ্য রচনা) with Foster's (Forster's হবে) Vocabulary will prepare the way to reading their poetical books.' কেরীর ১৫-৬-১৮০১-এর চিঠি। এ-থেকে বোঝা যায়, শুধু গদ্য নয়, কলেজে কাব্যও পাঠ্যরূপে বিবেচিত হতো। কাব্যকে ভাষাশিক্ষার অনুপযোগী বলে কখনোই মনে করা হয়নি।

৯২। এইসব রচনার তালিকার জন্য দ্রষ্টব্যঃ S. K. De: pp-130-31.

৯৩। দ্রঃ Roebuck: Appendix, p-3.

৯৪। দ্রঃ সজনীকান্তে উদ্ধৃত ওয়ার্ডের জার্নাল, পৃঃ ১১৫।

৯৫। quoted in S. P. Carey: pp. 229-30.

৯৬। এই উদ্যোগ থেকে প্রাপ্ত অর্থ সম্পর্কে কেরীঃ 'This will maintain three missionary stations, and we intend to apply it to that purpose.' quoted in Walker: p-276.

৯৭। আখ্যাপত্র এইরকমঃ 'The/Ramayuna/of Valmeeki,/in the/original Sungskrit./with a prose translation,/And explanatory notes,/by William Carey and Joshua Marshman./Vol. I./Containing/the First Book./Serampore,/1806.' ১৮০৬ সালের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ডিস্পিউটেশনে ভিজিটর জি· এইচ· বার্লোর উক্তি দৃষ্টে মনে হয় গ্রন্থখানি মার্চ মাসের পূর্বে প্রকাশিত হয়নি। দ্রঃ Roebuck: p-114.

৯৮। দ্রঃ S. P. Carey: p-230.

৯৯। দ্রঃ Wilson in Eustace's: p-594. প্রথম খণ্ডের প্রথম থেকে অনুবাদের নমুনা এখানে তুলে দেওয়া হলোঃ 'I salute Rama, the beautiful, the elder brother of Lukshmuna, the illustrious Rughoo, the husband of Seeta, the Descendant of Kukootstha, full of clemency, a sea of excellencies, the friend of Brahmas, the virtuous one, the sovereign, devoted to truth, the son of Dusharutha, him whose body is blue, the benign, the delight of the universe, the glory of Rughoo's race Raghuva, the enemy of Ravuna.'

১০০। quoted in M. A. Laird: Missionaries and Education in Bengal, London, 1972, p-63. also, Eustace: p-221.

১০১। দ্রঃ Laird: p-71.

১০২। দ্রঃ Rev. D. A. Chistadoss in 'The Story of Serampore and its College,' 1961; p-21.

১০৩। quoted in Laird: p-145.

১০৪। quoted from Northamton Mss. in Laird: p-119. f. n.

১০৫। quoted in Smith: p-207.

১০৬। ১৭৯৪ থেকেই। দ্রঃ ঐ। পৃঃ ৭।

১০৭। স্মিথ বলেন, যারা দূর সাগরতীর্থে যেতে পারত না, তারা এইভাবে সন্তান উৎসর্গ করত। দ্রঃ ঐ। ঐ; ওয়াকার বুকাননের উক্তি উদ্ধার করে দেখিয়েছেন, বাংলাদেশে এ-ও এক ধরনের শিশু-হত্যার পদ্ধতি, সংস্কারের দাসত্ব। দ্রঃ Walker: pp-243-244.

১০৮। দ্রঃ Carey quoted in S. P. Carey: p-221.

১০৯। quoted in Smith: pp-207-08.

১১০। দ্রঃ Carey quoted in S. P. Carey: pp. 182-83; in Walker: pp.245-46. দুই গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে পাঠসাম্য রক্ষিত নয়।

১১১। "তাঁহারা শাস্ত্র হইতে দেখাইয়াছিলেন, যে মৃত স্বামীর সহিত চিতার আগুনে পুড়িয়া মরা নহে, কিন্তু পরলোকগত স্বামীর জীবন্ত স্মৃতি জ্বলন্ত রূপে অন্তরে অঙ্কিত রাখিয়া আমরণ ব্রহ্মচর্য, সর্বপ্রকার সংযম, ত্যাগ এবং

পরসেবা করাই হিন্দু সতীর আদর্শ।" অমৃতলাল সরকারঃ ভারতবন্ধু উইলিয়ম কেরী, কলিকাতা, ১৯৩৬। পৃঃ ৭১।

১১২। দ্রঃ Carey quoted in Smith: p-214.

১১৩। 'rather a collector of plants than a botanist.'—quoted in S. P. Carey: p-404.

১১৪। এশিয়াটিক সোসাইটির জন্য লিখিত প্রবন্ধে পরবর্তীকালে দিনাজপুরের জেলার কৃষিকাজ সম্বন্ধে আলোচনায় তাঁর জ্ঞান ও আদর্শ পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়।

১১৫। G. Gogerly: The Pioneers. London, p-41.

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ কেরীর রচনা

১। ধর্মপুস্তক ঃ বাইবেলের অনুবাদ

ভারতবর্ষের পথে জাহাজ থেকে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর মালয় ভাষায় গস্‌পেলের অনুবাদের একখণ্ড চেয়ে কেরী 'সোসাইটি ফর দি প্রোপাগেশন অফ দি গস্‌পেল এ্যামাংস্ট দি হিদেন্‌স্‌'-এর কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন।১ মালয় ভাষার গস্‌পেলের কথা উল্লেখ করে তিনি প্রাচ্যভাষায় মালয়ী বাইবেলের পূর্বসূরিত্ব স্বীকার করেছেন, এবং অন্যান্য প্রাচ্যভাষায় বাইবেলের অনুবাদে নিবিষ্ট হওয়ার পূর্বে পূর্বতন রচনার স্বরূপ অনুধাবন করার উপযোগিতার কথাই সম্ভবতঃ এখানে ঘোষণা করেছেন। রবার্ট কাস্ট প্রাচ্যভাষায় অনূদিত বাইবেলের যে একটি বিস্তৃত তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন,২ তাতে মালয় ভাষা গোষ্ঠীতে বাইবেল অনুবাদের একটি স্বতন্ত্র অংশ নির্দিষ্ট আছে। এবং প্রাচ্যভাষায় বাইবেল অনুবাদের কাজে অবতীর্ণ হবার আগে কেরী সে-সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন।

অথচ, অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনায়, দূর প্রাচ্যের ভাষায় কেন, ভারতীয় ভাষায়ও বাইবেল অনুবাদের সূচনা হয়ে গিয়েছিল। দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণরত রেভারেণ্ড ক্লডিয়াস বুকানন ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে যে সীরীয় বাইবেলের সন্ধান পেয়েছিলেন, তা নিতান্তই কৌতূহলের সামগ্রীরূপে উল্লিখিত হয়ে থাকে। বাইবেল ও তার অনুবাদের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তদনুযায়ী অনুবাদে নিবিষ্ট হবার সমস্ত প্রেরণা ও উদ্যম, প্রকৃতপক্ষে, প্রোটেস্টাণ্ট মিশনারীদের জন্যই ভারতবর্ষে অপেক্ষিত ছিল। এঁদের মধ্যে এদেশে প্রথম এসেছিলেন ডাচ মিশনারী জর্মন-ভাষাভাষী বার্থলোমিউ ৎস্‌আইগেনবল্‌গ (Bartholomew Ziegenbalg), তিনি বাইবেলের তামিল অনুবাদ সম্পন্ন করেছিলেন। ভারতীয় ভাষায় বোধহয় এই প্রথম বাইবেল-অনুবাদ। ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজে আসেন ও গ্রুণ্ড্‌লার (Gründler)-এর সহযোগিতায় প্রস্তুত তাঁর নিউ টেস্টামেণ্টের অনুবাদ ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।৩ ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 'রুথ' পর্যন্ত অনূদিত ওল্ড টেস্টামেণ্টের অনুবাদ অসম্পূর্ণ রেখেই তিনি মারা যান। এই অসম্পূর্ণ অনুবাদের কাজ অতঃপর নূতন মিশনারী বেঞ্জামিন শুল্‌ৎস্‌ (Benjamin Schultze)-এর ওপর বর্তেছিল। এই অনুবাদ

সম্পূর্ণ অবস্থায় প্রকাশিত হয় ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে (?)। শুল্‌ৎস্‌ আরও কতকগুলি ভারতীয় ভাষায় বাইবেল অনুবাদের কাজ করেছিলেন। ৎস্‌আইগেনবল্‌গ্‌-এর নিউ টেস্টামেণ্টে বা ৎস্‌আইগেনবল্‌গ্‌ ও শুল্‌ৎস্‌-এর ওল্ড টেস্টামেণ্টের অনুবাদ অবশ্য অনতিবিলম্বেই আবার পরীক্ষিত হয়েছিল।

এর পরের অনুবাদকের নাম ফিলিপ ফেব্রিসিয়াস (Philipp Fabricius)-এর। তামিল ভাষায় অনুবাদকালে তিনি পাশাপাশি তামিল ব্যাকরণ ও অভিধানও প্রণয়ন করেন। তিনি মাদ্রাজে আসেন ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে, এবং দীর্ঘ কুড়ি বৎসরে প্রস্তুত তাঁর নিউ টেস্টামেণ্টের তামিল অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সাম্‌সের পদ্যানুবাদও প্রকাশ করেন। মোট চারখণ্ডে তাঁর ওল্ড টেস্টামেণ্টের অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৭৭৭ থেকে ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। তাছাড়া, অষ্টাদশ শতাব্দী সম্পূর্ণ হবার আগেই ডাচদের আমলে সিংহলী ভাষায় ফিলিপ্‌ৎস (Philips/)-এর নিউ টেস্টামেণ্ট ও ওল্ড টেস্টামেণ্টের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

কাজেই কেরী ভারতবর্ষের মাটিতে পদার্পণের আগেই প্রাচ্যখণ্ডে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভূভাগে বাইবেলের দেশীয় ভাষায় অনুবাদের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। বৃহৎ ভারত-ভূখণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে গেলে একে কোন রকমেই বিরাট আয়োজন বলে উল্লেখ করা চলে না; ভারতবর্ষে বাইবেল অনুবাদের ক্ষেত্রে একে ঊষা-পর্ব বলাই বোধহয় সঙ্গত। বাইবেল অনুবাদের পরবর্তী পর্ব অতঃপর দক্ষিণাপথ থেকে পূর্ব-খণ্ডে কেন্দ্র পরিবর্তন করেছিল; এবং কেরীর অক্লান্ত উদ্যম ও অধ্যবসায়েই সমগ্র ভারতবর্ষে বাইবেলের প্রচার ঘটে।

বাইবেল অনুবাদ ও আনুষঙ্গিক

ভারতবর্ষে বাইবেল অনুবাদের পরবর্তী ইতিহাস ফলতঃ কেরীকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছিল। কেরী ও শ্রীরামপুর মিশন এই ক্ষেত্রে মোটা-মুটিভাবে সমার্থক। কেরী তথা শ্রীরামপুর মিশন প্রায় চল্লিশটি ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেছিলেনঃ এই দিক থেকে সমগ্র ভারত ভূখণ্ড-ই তাঁর প্রভাবক্ষেত্র রূপে চিহ্নিত হতে পারে। ডক্টর গ্রীয়ারসন ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ এ্যাণ্ড ফরেন বাইবেল সোসাইটির শতবার্ষিকী উপলক্ষে এই তথ্য পরিবেশন করেছিলেন। এস· পি· কেরীও তাঁর গ্রন্থে বাইবেল অনুবাদ বিষয়ক অধ্যায়ের নামকরণ করেছিলেনঃ ‘Scriptures in forty

languages.' কিন্তু যেসব তথ্যের ভিত্তিতে চল্লিশটি ভাষায় বাইবেল অনুবাদক হিসাবে কেরীকে প্রতিষ্ঠা দান করবার চেষ্টা হয়েছে, তা অংশতঃ সত্য মাত্র। একটু শিথিল অর্থেই বিষয়টিকে লক্ষ্য করা উচিত। কেরীর নামে প্রচলিত বাইবেল অনুবাদকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে দেখাই সংগত হবে। যেমনঃ (ক) সেই সব অনুবাদ যা তিনি নিজেই সম্পন্ন করেছিলেন, বা যাতে অনুবাদের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকাই ছিল সক্রিয়তার দিক থেকে মুখ্য; যথাঃ বাংলা, হিন্দী, মারাঠি ও সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ; (খ) সেই সমস্ত অনুবাদ যা তাঁর মিশনারী সহযোগীরা সম্পন্ন করেছিলেন; যথাঃ চীনা, ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় অনুবাদ; (গ) সেই সমস্ত অনুবাদ যা প্রধানতঃ তাঁর বিভিন্ন সহযোগী পণ্ডিতদের কাজ, অথচ যা তিনি প্রয়োজনীয় সংস্কার করে সম্পাদনা করেছিলেন; যথাঃ বিভিন্ন হিন্দী উপভাষায় ও ওড়িয়া ভাষায় অনুবাদ; (ঘ) সেই সমস্ত অনুবাদ যাতে তিনি সংশোধকরূপে উপস্থিত ছিলেন এবং যা শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত করেছিলেন। কেরীর নিজস্ব অনুবাদের সংখ্যা যাই হোক না কেন, তিনি কোন না কোন ভূমিকায় যে প্রায় সর্বভারতীয় ভাষায় বাইবেল অনুবাদের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই গৌরব বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য; ডিয়াভিল ওয়াকার অনুবাদক কেরী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তাঁর অনুবাদক ভূমিকাটিকে সুস্পষ্ট করে তুলতে চেষ্টা করেছেনঃ "Carey was a master translator, and what we should to-day call 'the General Editor.'"৪ দক্ষিণ ভাবতে বাইবেল অনুবাদের পূর্বসূত্র নির্দিষ্ট হলেও, শ্রীরামপুর মিশন ও তার কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব কেরীর উদ্যমে পূর্বভারতেই অতঃপর বাইবেল অনুবাদের বিচিত্রতা ও প্রাচুর্য দেখা দিয়েছিল, এবং তার পশ্চাতে যে ভিতর-প্রেরণা ক্রিয়াশীল ছিল, তা হলো খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের আকাঙ্ক্ষা।

খ্রীষ্টধর্ম প্রচারণাকে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারীরা ধর্মীয় দায়িত্বরূপেই গ্রহণ করেছিলেন। রোমান ক্যাথলিক পর্তুগীজ পাদ্রীরা ইতিপূর্বে বঙ্গদেশে এই কাজে নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছিলেন; কিন্তু প্রোটেস্টাণ্ট ইংরেজ মিশনারীরা তথাপি যে প্রথম তাঁদের উদ্দেশ্যকে পারিপার্শ্বিকের কাছে বিশিষ্ট ও লক্ষণীয় করে তুলতে পেরেছিলেন, তার কারণ তাঁদের কর্মধারা। ধর্মপুস্তকই তাঁদের ধর্ম-অভিযানে প্রধানতম উপকরণ ছিল। এই বোধ দ্বারা যে শ্রীরামপুর মিশন উদ্বোধিত হয়েছিল, মিশনের ইতিহাসেই তার সাক্ষ্য আছে; এবং এই বোধটি কেরীর এক আশ্চর্য উপহার। তাঁদের ধর্মশক্তি যেহেতু বাইবেল-উপজীবিত, সেইজন্য ধর্ম-প্রচারণায় সেই ধর্ম-

পুস্তকের উপরই তাঁরা অধিক নির্ভরশীল হয়েছিলেন। বাইবেল নিজেদের ভাষায় পাঠ করে ভারতীয়রা খ্রীষ্টমহিমা বিষয়ে অবগত হবেন, এবং খ্রীষ্টধর্মের প্রতি ধীরে ধীরে অনুগত হয়ে উঠবেন, এই তাঁরা বিশ্বাস করতেন। প্রতি গ্রামে ও জনপদে গিয়ে প্রতিজনের মধ্যে খ্রীষ্ট-মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করা একটি পথ বটে, কিন্তু তা অতি দুরূহ ব্যাপার; অথচ মুদ্রিত গ্রন্থ সর্বত্রগামী, এবং এই অর্থে বোধহয় শ্রেষ্ঠ ধর্মযাজক।৫ কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম প্রচারণা সম্পর্কিত নির্দিষ্ট এই বিশ্বাস ও বঙ্গদেশের তথা ভারতবর্ষের প্রস্তুত পারিপার্শ্বিকের মধ্যে যে গুরুতর বৈষম্য ছিল, তা উপেক্ষা করা যায় না।

মুদ্রিত গ্রন্থ তখনই তার প্রত্যাশিত ফললাভ করতে পারে, যখন উদ্দিষ্ট জনসাধারণের একটি বড় অংশ সাক্ষর হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে সাক্ষর জনসাধারণের সংখ্যা তখন খুবই নগণ্য ছিল। আবার ভারতীয় সংস্কৃতি ধর্মভিত্তিক, এবং তার মধ্যে খ্রীষ্টানধর্মের কার্যতঃ কোন অংশ ছিল না। ভারতীয়রা যে পরিবেশে জন্মায়, যে সামাজিক বা নৈতিক সংস্কারে লালিত হয়, তা প্রধানতঃ হিন্দু ঐতিহ্য পরিপুষ্ট, যাতে বর্ণবিভেদের একটি অতি-নির্দিষ্ট ও অতি-গৃহীত অস্তিত্ব আছে। এই অবস্থাতে কোন অপরিচিত বিধর্ম হয়তো ভারতীয় জীবনে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হতোঃ কিন্তু ভারতবর্ষে ধর্মীয় সাহিত্যের একটি বাঞ্ছিত ইতিহাস আছে, যা মুদ্রিত না হলেও, গানে ও কথায় ও গাথায় প্রতিটি হৃদয়ের সংলগ্ন। এই সংলগ্নতা এত অনিবার্য যে সেখানে নিরক্ষর-সাক্ষরের ভেদরেখাটি পর্যন্ত অনায়াসে উপেক্ষিত, কেননা এই সাহিত্য-ঐতিহ্য বিচিত্র আঙ্গিকে নির্মিত। এই ধর্মাচ্ছন্ন নরনারীর মধ্যে খ্রীষ্ট-মহিমা প্রচারণা যে অতি দুরূহ এক উদ্যোগ, তাতে কোন সন্দেহ থাকে না।

উল্লিখিত প্রসঙ্গগুলি নানা কারণেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। Erasmus যে বাইবেলের অনুবাদ সমস্ত তুচ্ছ ও প্রধান ভাষায় দেখতে চেয়েছিলেন, তার কারণ, সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের প্রতিটি ভাষায় যদি বাইবেলের অনুবাদ হয়, তাহলে খ্রীষ্টধর্মশক্তি অনায়াসে প্রতিটি হৃদয় স্পর্শ করতে পারবে। কেরীও ভারতবর্ষের প্রধান-অপ্রধান অনেক ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করতে চেয়েছিলেন প্রধানতঃ এই কারণেই। চ্যাপলেন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রোভোস্ট রেভারেন্ড ডেভিড ব্রাউন কেরী ও তাঁহার সহযোগীদের বিভিন্ন ভাষায় বাইবেল অনুবাদ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তাঁদের ভাষাজ্ঞান সম্পর্কে কটূক্তি করেছিলেন সত্য,৬ তথাপি Indian Antiquary-তে স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন যে পর্যবেক্ষণ করেছেন,৭

তার সমর্থনমূলক সাক্ষ্যও উপেক্ষা করা চলে না। গ্রীয়ারসন বলেছেন যে, শ্রীরামপুর মিশনারীদের মধ্যেই সম্ভবতঃ ভারতীয় ভাষা বিষয়ক অনুসন্ধান প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। কেরী ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রধান ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করতে চেয়েছিলেন, এবং পনেরো ষোল বৎসরের অক্লান্ত সাধনায় বাস্তবিক অর্থে এই ইচ্ছার গন্ডীকে তিনি অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। পশ্চিমের আফগান ও বালুচি থেকে আরম্ভ করে পূর্বের অসমীয় পর্যন্ত তাঁর অনুবাদের ভাষাপরিধি বিস্তৃত করেছিলেন। এছাড়াও আরেকটি দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা চলে। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাথুর গসপেলের মারাঠি অনুবাদ তিনি দেবনাগরী হরফে প্রকাশ করেন। দেবনাগরী হরফ ইতিমধ্যে ব্যবহার করলেও মোড়ি হরফে মারাঠি বাইবেলের অনুবাদও তিনি ছেপেছিলেন।৮ অতিরিক্ত উদ্যম ও অতিরিক্ত অর্থব্যয় সত্ত্বেও কেরী যে এইরকম করেছিলেন, তার কারণ তাঁর সেই নিবদ্ধ বিশ্বাসঃ তিনি ভারতবাসীর কাছে তাঁদের বিচিত্র নিজস্ব ভাষায় ও হরফে ধর্মপুস্তকের মাহাত্ম্য পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। এবং এই সূত্রে ভারতবর্ষের ধর্মীয় সাহিত্যের ঐতিহ্যের ধারায় তিনি বাইবেলকে প্রতিষ্ঠিত করতেই চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত তাঁর মনোভাব থেকেও তাঁর এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। নবদ্বীপ যেহেতু বাংলাদেশের মনীষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র, তিনি সেইজন্য তাকে তাঁর কর্মস্থলের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেছিলেন একসময়। পুরীতে জগন্নাথের মন্দির ও রথ উপলক্ষ্য করে যে ধর্ম-সংস্কৃতির এক বড় কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল, তা তাঁর লক্ষ্য এড়ায় নি, যার জন্যে তিনি অচিরাৎ সেখানকার ভাষায় অর্থাৎ ওড়িয়ায় বাইবেল অনুবাদে তৎপর হন,—'স্থবির অমানবিক ধর্মসংস্কারাচ্ছন্নরা' যার মাধ্যমে উদার উজ্জ্বল মানবিক করুণাধর্মের পরিচয় পাবে। এসব থেকে স্পষ্টতঃই বোঝা যাচ্ছেঃ কেরীর ভূমিকা বিচ্ছিন্ন ধর্মান্তরকরণ-ক্রিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; তিনি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের ধর্ম-সংস্কৃতির ধারায় খ্রীষ্টধর্মকে স্থাপন করতে, এবং বাইবেলকে ধর্মসাহিত্য-ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত করে তুলতে।৯

কেরীর এই ইচ্ছার ফললাভ কতখানি হয়েছিল, তা স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ। তবে তাঁর ইচ্ছার সার্থকতার পথে যে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল ভারতবর্ষের ধর্মীয় সংস্কৃতি ও সাক্ষরতার অভাব, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর অনূদিত অনেকগুলি ভাষার বাইবেলই প্রত্যাশিত প্রচারণা ও সমাদৃতি লাভ করেনি, আবার অনেকগুলি ভাষানুবাদের বেশ কয়েকটি সংস্করণও প্রস্তুত করতে হয়েছিল। আজ ভারতবর্ষের একটি প্রধান ধর্ম হিসাবে খ্রীষ্টধর্ম পরিচিত,

এতে পাদ্রীদের ধর্মান্তরকরণ-প্রয়াসের অবশ্যই প্রধান একটি ভূমিকা আছে, এবং তার ভিত্তিমূলে আছে ধর্মপুস্তকের সুভাষিতাবলী। ভারতীয় খ্রীষ্টানদের মধ্যে ভারতীয় ভাষার বাইবেলই সর্বাধিক প্রচারিত, এমনকি যীশুখ্রীষ্ট মহৎ মানবিক হিসাবে অখ্রীষ্টান ভারতীয় সংস্কৃতিতেও গৃহীত।

বাইবেল অনুবাদের পরিধি ও অনুবাদ-ধারা

শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে এবং মিশন প্রতিষ্ঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কেরী ও তাঁর সহযোগীরা ভারতবর্ষে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষায় বাইবেল অনুবাদের একটি ব্যাপক কর্মসূচী প্রস্তুত করে ফেলেন। বাংলায় বাইবেল অনুবাদের ক্ষেত্রে কেরী, টমাস ও ফাউণ্টেন শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠার পূর্বেই অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এবং ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নিউ টেস্টামেণ্ট ও ওল্ড টেস্টামেণ্টের অনেকগুলি অংশেরই বঙ্গানুবাদ প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল।১০ এই বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করবার জন্য অতঃপর কেরী বাস্তব উদ্যোগে সক্রিয় হয়ে ওঠেন, ও তারই পাশাপাশি তিনি প্রস্তুত অনুবাদের সংস্কার ও সংশোধনে প্রয়োজনীয় কালক্ষেপ করেন। পাদ্রীদের জীবনেতিহাসের বিচিত্র টানাপোড়েনে তথাপি এই প্রস্তুত অনুবাদ অচিরাৎ মুদ্রিত হতে পারে নি; মিশনের প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কেরীর কর্মক্ষেত্র মদনাবাটি থেকে শ্রীরামপুরে স্থানান্তরিত হয়, এবং এই ঘটনা তাঁর পাদ্রী জীবন ও কর্মোদ্যোগের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ কয়েকটি বছরে কেরী তাঁর অনুবাদের অধিকারকে অনেক বেশি যোগ্য করে তুলতে পেরেছিলেন। এর মধ্যে তিনি ভালো বাংলা শিখেছেন, তখন অনেক লোকের সমাবেশে অনর্গল বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করতেও তাঁর বিশেষ অসুবিধা হয় না। তাছাড়া, দেবভাষা সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি ইতিমধ্যে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছিলেন।১১ ফলে নূতন শতাব্দীর সূচনায় কেরীর অর্জিত ভাষাশক্তি যে বেশি ছিল, তা সহজেই মনে করা যেতে পারে। বস্তুতঃ, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ কয়েক বৎসরে বাইবেল অনুবাদচিন্তা কেরীর মধ্যে প্রাধান্য পেলেও নূতন শতাব্দীর নূতন ব্যবস্থাপনার আগে সেই চিন্তা ব্যাপক তৎপরতা ও অভিমুখিতায় সুতীব্র হয়ে উঠতে পারেনি।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে নিউ টেস্টামেণ্টের বঙ্গানুবাদ প্রথম সংকরণ প্রকাশিত হয়, এবং ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দেই কেরীকে একটি চিঠিতে লিখতে দেখা যায়ঃ **'If we are given another fifteen years, we hope to translate**

and print the scriptures into all the chief languages of Hindustan.'১২ তিনি যেসব ভাষায় অনুবাদের কথা ভেবেছিলেন, তার মধ্যে আছেঃ বাংলা, হিন্দী, পাঞ্জাবী, ওড়িয়া, মারাঠি, গুজরাতী, তেলেগু ও কানাড়ী। পনেরো-ষোলো বছরের মধ্যে, অর্থাৎ ১৮১৯ খৃীষ্টাব্দের অবসানের আগে তিনি এই কাজে কতখানি সফল হয়েছিলেন, এস· পীয়ার্স কেরী তার একটি পরিচয় দিয়েছেনঃ ১। বাংলায় (সম্পূর্ণ),—কয়েকটি সংস্করণ সহ; ২। হিন্দীতে (সম্পূর্ণ), — কয়েকটি সংস্করণ সহ; ৩। পাঞ্জাবীতে (নিউ টেস্টামেণ্ট সম্পূর্ণ, এবং ওল্ড টেস্টামেণ্টের প্রায় অর্ধেক); ৪। ওড়িয়াতে (সম্পূর্ণ); ৫। মারাঠিতে (সম্পূর্ণ); ৬। গুজরাতীতে (প্রায় সম্পূর্ণ নিউ টেস্টামেণ্ট); ৭। তেলেগুতে (নিউ টেস্টামেণ্ট সম্পূর্ণ ও পেণ্টাটুয়েখ); ৮। কানাড়ীতে (নিউ টেস্টামেণ্ট),—কিন্তু এই ভাষার অনুবাদ আগুনে পুড়ে যায়।১৩ এই তথ্য স্বভাবতঃই প্রমাণ করে যে কেরী তাঁর ঈপ্সিত পরিধিকে স্পর্শ করেছিলেন। আবার ১৮১৪ খৃীষ্টাব্দের ৪ঠা অগাস্ট তারিখে ফুলারের কাছে অনূদিত বাইবেলের যে একটি তালিকা তিনি পাঠিয়েছিলেন,১৪ তাতে ছাব্বিশটি ভাষায় সম্পূর্ণ বা আংশিক অনুবাদের কথা আছে; এ থেকে বোঝা যায় যে ১৮০৩ সালে উচ্চারিত বাসনাকে তিনি স্বভাবতঃই অতিক্রম করে গিয়েছেন। অনুবাদকে তিনি শ্রীরামপুর মিশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের কার্যভার রূপেই সাধারণভাবে গণ্য করতেন; সেইজন্য ঐ তালিকায় অনুবাদ 'by us' বলে তিনি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু পরের বৎসর, ১৭-৫-১৮১৫-র চিঠিতে অনুবাদের সমস্ত পরিশ্রমকেই তিনি 'my labour' বলতে চেয়েছেন, কেননা, "The labour of correcting and revising all of them lies on me."১৫ শ্রীরামপুর জীবনে বাইবেল অনুবাদের সঙ্গে তিনি কিভাবে ও কতখানি সম্পৃক্ত ছিলেন, পুত্র জোনাথান কেরীও পরবর্তীকালে তা স্মরণ করেছেন।১৬ বস্তুতঃ অনুবাদ ও তার সংস্কার ও সংশোধনের দায়িত্বেই কেরী শুধুমাত্র সমর্পিত ছিলেন না; বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত বাইবেলের প্রকাশনা বিষয়ে তদারকী করাও তাঁর দায়িত্বের অঙ্গীভূত ছিল।১৭

বিচিত্র ভাষায় বাইবেল অনুবাদের কর্মকাণ্ডকে শ্রীরামপুর যে সম্ভব করে তুলতে পেরেছিল, তার কারণ অবশ্যই নিরলস সচেষ্টতা ও অধ্যবসায়। কিন্তু এই কর্মকাণ্ড সজীব গতি পেল শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠা, বিশেষতঃ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে। অথচ এর আগেও অনুবাদ-কর্মে কেরী নিযুক্ত ছিলেন, এবং তখন তিনি সচরাচর কিভাবে অনুবাদ করতেন, তার পরিচয় তৎকালীন তাঁর কয়েকটি চিঠি ও জার্নালের উদ্ধৃতি

থেকে স্পষ্ট হতে পারেঃ ১। 'I have...begun translating the gospel by John, which Moonshi afterwards corrects.'১৮ ২। 'I have a Pundit, who has, with me, examined and corrected all the epistles, to the second of Peter;...the natives who can read and write, understand it perfectly; and as it is corrected by a learned native, the style and syntax cannot be very bad.'১৯ এই উদ্ধৃতিগুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে, প্রথমাবধি তিনি অনুবাদ কর্মে দেশীয় পণ্ডিতের সহায়তা গ্রহণ করতেন, এমনকি তাঁদের সহায়তার ওপর অসহায়-ভাবে নির্ভরশীলও ছিলেন। এর মূল কারণ, যে ভাষায় তিনি অনুবাদ করছিলেন, সেই ভাষায় তাঁর ব্যক্তিগত অধিকার বিষয়ে তিনি নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন না। তাঁর অনুবাদ প্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনি আরও স্পষ্ট করে বলছেনঃ 'I employ a Pundit...with whom I go through the whole in as exact a manner as I can. He judges of the style and syntax, and I of the faithfulness of the translation. I have, however, translated several chapters to-gether, which have not required any alteration in the syntax whatever; yet I always submit this article entirely to his judgment. I can also by hearing him read, judge whether he understands his subject by him accenting his reading properly and laying the emphasis on the right words. If he fails in this, I immediately suspect the translation.'২০

অনূদিত অংশের যথাযোগ্যতা নির্ণয়ে কেরী যেভাবে অগ্রসর হতেন বলে এখানে বিবৃত হয়েছে, তাকে এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা বলা যায়; এবং এই রীতিকে সম্পূর্ণ বাতিল করে না দিলেও, একে অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করাও চলে না। এই বিবৃতির মধ্যে কেরীর অসহায়তার এক অতি নগ্নচিত্র প্রকাশিত হলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, দেশীয় ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থায় তাঁর পক্ষে এই রীতি গ্রহণ করা প্রায় অনিবার্য ছিল। পর-বর্তীকালে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি যে প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছিলেন, তাকে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে দেখতে হয়, কেননা, (ক) তিনি ইতিমধ্যে মূল কয়েকটি ভারতীয় ভাষায় অধিকার অর্জন করেছিলেন, (খ) অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুবাদক ছিলেন পণ্ডিতরা, এবং তিনি প্রধান পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

ক। বাংলা ভাষা শিক্ষাকালে অনতিবিলম্বেই কেরী বুঝতে পেরেছিলেন যে বাংলা ভাষা যথাযোগ্যভাবে শিখতে হলে তাঁকে সংস্কৃত শিখতে হবে, এবং সংস্কৃত শিক্ষার কাজ তিনি নিবিষ্ট মনোযোগে অতি দ্রুত শুরু করে

দিয়েছিলেন। ১৭৯৬-তে তিনি সংস্কৃত শিখতে শুরু করে দিয়েছেন এবং ১৭৯৮-র গোড়াতেই সংস্কৃত ব্যাকরণ ইংরেজিতে রূপান্তরের কাজে যে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছেন, সেই সাক্ষ্য উপস্থিত।২১ এ-থেকে স্পষ্টতঃই বোঝা যাচ্ছে যে তাঁর সংস্কৃত শিক্ষা অতি দ্রুত চালিত হয়েছিল, কেননা বাইবেল অনুবাদ করতে শুরু করেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে সংস্কৃত প্রায় সমস্ত ভারতীয় ভাষার উৎসস্থল, এই ভাষার সঙ্গে পরিচিত হলে যে কোন ভারতীয় ভাষায় সহজেই অধিকার অর্জন করা সম্ভব। তাঁর সংস্কৃত ব্যাকরণের ভূমিকায় কেরী জানাচ্ছেন যে সংস্কৃতের মাধ্যমে ভারতবর্ষে প্রচলিত প্রধান ভাষাগুলিতে ব্যবহৃত প্রতি পাঁচটি শব্দের মধ্যে অন্ততঃ চারটি শব্দের অর্থ তিনি বুঝতে পারেন। বস্তুতঃ, তিনি সংস্কৃত ভাষা-জ্ঞানের চাবিকাঠি দ্বারাই ভারতবর্ষীয় ভাষা-দুয়ার খুলে নিতে পেরেছিলেন।২২ অনেকগুলি ভারতীয় ভাষায় তিনি যে সহজেই বর্ধিত অধিকার লাভ করেন তার কারণ অবশ্যই তাঁর সংস্কৃতের অভিজ্ঞতা।

খ। কিন্তু উদ্যম, অধ্যবসায় ও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় তাঁর বর্ধিত অধিকার যতই থাক না কেন, বাইবেল অনুবাদের ব্যাপক অনুষ্ঠান শুধু কেরী মার্শম্যানের যুগপৎ উৎসাহে কখনোই পুরোপুরি সাধ্য ছিল না। বস্তুতঃ, শ্রীরামপুরে ক্রমশঃ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের অনেক পণ্ডিত ও মুন্সী এসে সমবেত হয়েছিলেন।২৩ এই পণ্ডিত ও মুন্সী প্রধানতঃ, কেরীরই সংগ্রহ, এবং তাঁরই উৎসাহে তাঁরা বাইবেলের বিভিন্ন ভারতবর্ষীয় ভাষায় অনুবাদের কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এঁদের অনুবাদধারার পরিচয়টি মোটামুটি এইরকমঃ "These men write out the rough copy of the translation into their respective languages; some translating from the Bengali, others from the Hindusthani, and others from the Sanscrit, as they are best acquainted with them. They consult with one another, and other Pundits who have been employed for several years for correcting the press and copy, and who almost know the scriptures by heart. They, therefore, form the idiom; after which I examine and alter the whole where necessary."২৪

ওয়ার্ডও জানিয়েছেন যে অনুবাদের কাজে যে নূতন নূতন পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই অনুবাদ পরীক্ষিত হতো। যখন কোন পণ্ডিত খানিকটা অনুবাদ করেছেন, তখন তাঁর অনুবাদের পাণ্ডুলিপি মুদ্রণের জন্য পাঠানো হতো, এবং মূল অনুবাদকের সঙ্গে থাকতেন একজন দেশী সহায়ক, যিনি প্রথম মুদ্রিত রূপটি পরীক্ষা করে দিতেন। এইভাবে প্রথম

ও দ্বিতীয় প্রুফ সংশোধিত হতো; তারপর মূল অনুবাদক নিজেই তৃতীয় প্রুফ নিয়ে কেরীর কাছে আসতেন, এবং উভয়ে মিলে তখন তৃতীয় প্রুফের ওপরই অনুবাদের প্রয়োজনীয় সংস্কার করতেন। প্রয়োজনবোধে সংস্কারের ও সংশোধনের জন্য প্রুফের সংখ্যা আরও বেড়ে যেত, এবং কেরীর মনোগত হলেই অতঃপর তা পাকাপাকিভাবে মুদ্রণের জন্য পাঠানো হতো।২৫ এইসব সাক্ষ্য থেকেই বোঝা যায় যে, শ্রীরামপুর মিশনকে কেন্দ্র করে এক দেশীয় অনুবাদক পণ্ডিত-বাহিনী গড়ে উঠেছিল। এই পণ্ডিতগোষ্ঠীই অনুবাদের কাজে প্রধান অংশ গ্রহণ করতেন, এবং কেরীর ভূমিকা ছিল সেখানে প্রধানতঃ পর্যবেক্ষক ও সংস্কারকের। এই যে বৃহৎ পণ্ডিতসমাজ শ্রীরামপুরে সমবেত ও সমন্বিত হয়েছিলেন, তার কারণ অনুবাদ বিষয়ে মিশনের সর্বাত্মক পরিকল্পনা, তাতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু এইরূপ গোষ্ঠী গড়ে তুলবার পেছনে কেরীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অনেকখানি কার্যকর ছিল। এই অভিজ্ঞতা স্বভাবতঃই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তাঁর অর্জিত অভিজ্ঞতা।২৬ ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বাংলা বাইবেলের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল, এবং এই সংস্করণের পাঠ তাঁর একাধিকবার সংস্কারের ফল। অথচ ১৮০৩ সাল থেকে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের কাজে উদ্যোগী হয়ে ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে তা প্রকাশ করলে দেখা গেল প্রথম সংস্করণের তুলনায় দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ ভাষানুবাদের দিক থেকে এতদূর অগ্রসর যে তাকে সম্পূর্ণ নূতন ভাষ্য বললে অন্যায় হয় না।২৭ গ্রন্থের এই উৎকর্ষের অপরাপর যে-কারণই থাক না কেন, তার প্রধান কারণ অবশ্যই: (১) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক হিসাবে ভাষা বিষয়ে তাঁর অধিক অভিজ্ঞতা অর্জন; (২) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তাঁর অধিনায়কত্বে যে দেশীয় পণ্ডিত-মুন্সীরা সমবেত হয়েছিলেন, তাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব। একদিক থেকে এই দুই কারণ অবশ্য পরস্পর অতি ঘনিষ্ঠ ও অনেক সময় অবিভাজ্য বলেও মনে হতে পারে; অন্যথায় বলা যেতে পারে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমস্ত নবীন উদ্যমে কেরী যে অধিকতর সফল হতে পেরেছিলেন, তার হেতুঃ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অর্জিত তাঁর অভিজ্ঞতা।

বাইবেল অনুবাদের ইতিহাস

শ্রীরামপুর থেকে অন্তত ছ'টি ভাষায় নিউ টেস্টামেণ্ট ও ওল্ড টেস্টামেণ্ট, অর্থাৎ সমগ্র বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছিল। এগুলি হলোঃ বাংলা, সংস্কৃত, ওড়িয়া, হিন্দুস্থানী, মারাঠি ও অসমীয়া। এই ভাষা-

গুলির সঙ্গে কেরীর ঘনিষ্ঠতা মোটামুটিভাবে বিশ্বাসযোগ্য। বাংলাদেশে তাঁর কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট হবার ফলে নিজের প্রয়োজনেই তাঁকে বাংলা শিখতে হয়েছিল। বাংলা ভাষায় শিক্ষানবিশী করার কালেই সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব ও অনিবার্যতা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। বাংলা ও সংস্কৃত তিনি সমান প্রযত্নে শিক্ষা করেন, এবং বাংলার মত তিনি সংস্কৃতেও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক পদে বৃত হয়েছিলেন। কেরীর পক্ষে ওড়িয়া ভাষায় অধিকার অর্জন করাও দুঃসাধ্য ছিল বলে মনে হয় না। ভৌগোলিক, পূর্ব-উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক, এবং ভাষারীতির দিক থেকে উভয় প্রদেশের সংলগ্নতা খুবই স্পষ্ট। সবার উপরে শ্রেষ্ঠ ও প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের উপস্থিতি। সব মিলে ওড়িয়ায় কেরীর অধিকার অনায়াসসাধ্য হয়ে ওঠাই সম্ভব। মারাঠিতে তাঁর অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ওই ভাষার অধ্যাপকরূপে তাঁর নির্বাচনে। মারাঠি পণ্ডিত বৈদ্যনাথ ভাষাশিক্ষায় তাঁকে বিশেষ সহায়তা করে থাকবেন; তাছাড়া এই ভাষায় তাঁর যথেষ্ট যোগ্যতার অপর পরিচয় ঐ ভাষার ব্যাকরণ রচনা। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ভাষা অসমীয়া, বাংলা ও ওড়িয়া ভাষারূপে এত ঘনিষ্ঠ যে, এর মধ্যে প্রধান ভাষা বাংলাভাষা সম্পর্কে যিনি অবহিত, তাঁর পক্ষে অপর দুই ভাষায় অধিকার অর্জন ইচ্ছাধীন বিষয়মাত্র। তদুপরি অসমীয়া ভাষার লিপি ও বাংলার লিপিতে প্রভেদ প্রায় নেই বললেই চলে। কাজেই কেরীর পক্ষে অসমীয়া ভাষা শিক্ষা অনায়াসসাধ্য হওয়াই সম্ভব। আর থাকে হিন্দুস্থানী, উত্তর ও মধ্যভারতে সর্বাধিক প্রচলিত এই ভাষার প্রধান দুই ভাগঃ আরবি-ফার্সী বহুল হিন্দুস্থানী ও সংস্কৃত-বহুল হিন্দুস্থানী। হিন্দুস্থানীর এই দুই রীতি অতঃপর উর্দু ও হিন্দী বলে চিহ্নিত হয়। এই দুই রীতিই উদ্ভূত হয় ইংরেজদের ভারতবর্ষে আসবার পর থেকে, প্রধানতঃ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পঠন-পাঠন ও শিক্ষা-পরিকল্পনার ছত্রচ্ছায়ায়। উর্দুর লিপি ফার্সী লিপি, হিন্দীর লিপি দেবনাগরী। এই কলেজের প্রভাবশালী অধ্যাপক হিসাবে, বিশেষতঃ যে প্রতিষ্ঠানের ছায়ায় হিন্দীর আধুনিক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল, তার ভিতরকার অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্বরূপে, এবং সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান ও দেবনাগরী লিপিজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন বলে, এই ভাষার অধিকার অর্জনে কেরীকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি বলেই মনে হয়।

এখন এই সমস্ত বিচিত্র ভারতীয় ভাষায় কেরী যে বাইবেল অনুবাদে অগ্রসর হয়েছিলেন, তার সাধারণ পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রথমে বাংলা বাইবেলের প্রসঙ্গ, কেননা একে নিয়েই কেরীর মনস্কতার একটি

বৃহৎ অংশের বিস্তার। তারপর কয়েকটি নির্বাচিত ভারতীয় ভাষায় তাঁর অনুবাদকে অনুসরণ করা হয়েছে প্রধানতঃ তাঁর সাহিত্যিক উদ্যমের বিরাটত্ব ও প্রকৃতি অনুসন্ধানের কথা মনে রেখে।

বাংলাঃ ইংরেজি বাইবেলের অনুবাদের ইতিহাসে উইক্লিফ্ ও টিণ্ডেল্ যে সম্মানিত প্রতিষ্ঠার অধিকারী, বাংলা বাইবেল অনুবাদের ক্ষেত্রে সেই শ্রদ্ধেয় অধিকার কেরীর প্রাপ্য, কোন কোন সমালোচক এইরকম বিবেচনা করেছেন।২৮ এই বিবেচনা সর্বত্র অনুমোদিত হয়নি।২৯ কিন্তু কেরী ও তাঁর সহযোগী অনূদিত ভারতীয় ভাষার বাইবেলসমূহের মধ্যে বাংলা অনুবাদই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেননা কেরী এই অনুবাদে ব্যক্তিগতভাবে সক্রিয় ছিলেন ও শ্রীরামপুর থেকে বাংলা অনুবাদই সর্বপ্রথম মুদ্রিত আকারে প্রচারিত হয়েছিল। কেরী অনূদিত বাংলা নিউ টেস্টামেণ্টের প্রকাশ ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে,৩০ এবং ইতিপূর্বে ম্যাথু-লিখিত গস্পেলের বাংলা অনুবাদ অবশ্য ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের অগাস্ট মাসেই মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল। বস্তুতঃ, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠা এবং ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা নিউ টেস্টামেণ্ট প্রকাশ থেকেই ভারতবর্ষীয় ভাষাসমূহে বাইবেল অনুবাদের ইতিহাসে পূর্বাঞ্চলের প্রাধান্য সূচিত হয়।

কিন্তু কেরীর বাংলা অনুবাদের আবির্ভাব কোন আকস্মিকতা দ্বারা চিহ্নিত ছিল না, একে সম্ভবতঃ স্বয়ম্ভূ প্রবর্তনা বলাও সংগত হবে না। কেরীর এই অনুবাদে টমাস, ফাউণ্টেন ও রামরাম বসুর সক্রিয় সহযোগিতার কথা ইতিহাস সমর্থিত। এবং এই যৌথ প্রয়াসের কথা বাদ দিলেও বাংলা বাইবেল অনুবাদের বিক্ষিপ্ত কতগুলি পূর্বসূত্র অনুসন্ধান করা সম্ভব। এই অনুসন্ধানে বিচ্ছিন্নভাবে অন্ততঃ তিনজনের নামের সংগে পরিচিত হওয়া যায়ঃ চেম্বার্স, টমাস ও এলার্টন্।

বাংলা বাইবেল অনুবাদ চেম্বার্সের একটি সদিচ্ছামাত্র বলে উল্লিখিত হওয়া উচিত। একে কোন রকম কার্যকর প্রয়াস বলা যায় না। সুপ্রীম কোর্টের ফার্সী দোভাষী চেম্বার্স একজন ফার্সী পণ্ডিত বলেও তৎকালে স্বীকৃত হয়েছিলেন। তিনি নিউ টেস্টামেণ্টের ফার্সী অনুবাদ করতে চেয়েছিলেন, এবং ভেবেছিলেন যে কোন দেশীয় মুন্সী দ্বারা সেই ফার্সী অনুবাদ থেকে তার বাংলা অনুবাদ প্রস্তুত করিয়ে নেবেন। বাংলা অনুবাদে এই পরিকল্পনার যোগ্যতা সংশয়াতীত ছিল না; ফলে এই পথে৩১ কোন কার্যকর প্রয়াসও চালিত হয়নি।

কেরীর সংগে মিলিত হবার পূর্বেই বাংলাদেশে থাকা কালে টমাস

বাইবেলের বঙ্গানুবাদে খানিকটা অগ্রসর হয়েছিলেন; এবং ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের আগে টমাসের অনুবাদাংশগুলি সম্ভবতঃ পাণ্ডুলিপি আকারেই সীমাবদ্ধভাবে প্রচারিত হয়েছিল। তবে কোন্ কোন্ অংশ তিনি ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই অনুবাদ করেছিলেন, সে-সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্যের অভাব আছে। অবশ্য ব্রাউন যে-কয়েকটি অংশ টমাস অনুবাদ করেছিলেন বলে জানিয়েছেন, সেগুলি হলোঃ জেনেসিস, সাম্স্, ম্যাথু ও মার্কের গসপেল, ,জেমস এবং ভবিষ্যদ্বাক্যের কিছু নির্বাচিত অংশ।৩২ এখন বাইবেলের টমাস-অনূদিত এই অংশগুলি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, জেনেসিস্ তিনি ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরের আগে অনুবাদ করেন নি।৩৩ বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরের মধ্যে তিনি লূক-রচিত গস্পেল্ ছাড়া আব কিছু অনুবাদ করেন নি।৩৪ সাম্স্ ও প্রোফেসিস্ সম্পর্কে অবশ্য কোন স্পষ্ট তথ্য নেই, তবে ম্যাথু, মার্ক ও জেম্স্, নিশ্চিত করে বলা না গেলেও, অনুমানের ভিত্তিতে টমাসের প্রথমবার বঙ্গদেশে অবস্থান-কালে অনুবাদ করা হয়েছিল বলে উল্লেখ করা যেতে পারে।৩৫ যাই হোক না কেন, টমাস যে নিউ টেস্টামেণ্ট-ওল্ড টেস্টামেণ্ট নির্বিশেষে বাইবেলের অংশবিশেষ যদৃচ্ছা বঙ্গানুবাদ করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।৩৬ এই অনুবাদ প্রায় সবদিক থেকেই ত্রুটিপূর্ণ ছিল, এবং কেরী এইসব অংশ সংশোধন করে অনুসরণ করার চেয়ে পুনরনুবাদ সহজসাধ্য বলে মনে করতেন।৩৭ কিন্তু বাইবেল অনুবাদে টমাসের উৎসাহ ছিল অপরিমিত, বাংলা বাইবেল সম্পর্কে এই উৎসাহ প্রায়ই সোচ্চার হয়ে উঠেছে, কিন্তু তাঁর সীমাবদ্ধ ভাষাজ্ঞান তাঁর উৎসাহের চরিতার্থ পরিণাম রচিত হতে দেয়নি।৩৮

মালদহের নীলকর জন্ এলার্টনের৩৯ নিউ টেস্টামেণ্টের অনুবাদ যখন প্রকাশিত হয়, তার আগে কেরীর বাংলা নিউ টেস্টামেণ্টের বেশ কয়েকটি সংস্করণ প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। এলার্টনের ‘জগত্তারক প্রভু যিশু খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচার’ কলকাতা বাইবেল সোসাইটি ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন।৪০ ইতিপূর্বে অবশ্য বাইবেল সোসাইটি তাঁর চারটি গসপেলের অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন, যার মধ্যে ম্যাথু ও জন্ অন্যতম। ব্যারাকপুরের স্কুলের ব্যবহারের জন্য ‘মঙ্গল সমাচার যোহন রচিত’ প্রকাশিত হয়েছিল।৪১ তাঁর নিউ টেস্টামেণ্টের অনুবাদ ১৮২০-র আগে প্রকাশিত না হলেও, কেরীর অনুবাদ কাজ শুরু হবার আগেই তিনি এই কাজে ব্যাপৃত হয়েছিলেন। কেরী বাইবেল অনুবাদের কাজে নিযুক্ত হয়েছেন জানতে পেরে তিনি সাময়িকভাবে তাঁর অনুবাদের কাজ বন্ধ করে

দিয়েছিলেন। এবং শেষ পর্যন্ত যখন তাঁর সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে বাংলা গদ্যরচনার ইতিহাস অনেকদূর অগ্রসর হয়ে গেছে, অন্যান্য গদ্যরচয়িতাদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের মত সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা ও রামমোহন রায়ের অভ্যুদয়ও সূচিত হয়েছে। কাজেই তাঁর রচনারীতি সম্পর্কে যে সাধুবাদ বর্ষিত হয় তার একটি সঙ্গত পরিপার্শ্বগত ইতিহাসও পাশাপাশি স্মরণ করা উচিত। তাঁর অনুবাদ সম্পর্কে ওয়েঙ্গার যে মন্তব্য করেছেন, তার দুই ভাগঃ (ক) মূল গ্রীক্-সংস্করণের সঙ্গে এলার্টন সম্যকভাবে পরিচিত না থাকার দরুণ তাঁর অনুবাদ সন্তোষজনক হতে পারে নি; যদিও (খ) তাঁর অনুবাদ-ভাষা সাধারণভাবে উৎকৃষ্ট। ৪৩

চেম্বার্সের পরিকল্পনা, টমাসের উদ্যম, ও এলার্টনের প্রয়াস, বাংলা বাইবেল অনুবাদের ইতিহাসে কয়েকটি অসম্পূর্ণ ও অপরিপুষ্ট গ্রন্থিমাত্র। ইতিহাসের অনুসরণে এঁদের বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাগুলির প্রাসঙ্গিক উল্লেখ অপরিহার্য, কিন্তু কেরীকে অবলম্বন করেই বাংলা বাইবেল অনুবাদের প্রথম ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ তৎপরতার ইতিহাস রচিত হয়েছে। পরবর্তী কালে য়েট্স্, ওয়েঙ্গার ও রাউজের নিবিষ্টতায় বাংলা বাইবেলের যে উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই ধারার সনাতন পুরুষ উইলিয়ম কেরী। কেরী যে এই কাজে প্রথম বিশিষ্ট হয়ে উঠতে পেরেছিলেন, তার কারণ তাঁর পরিকল্পনার নিশ্চয়তা। বস্তুতঃ কলকাতায় পদার্পণের পর থেকে মদনাবাটিতে স্থির হওয়া পর্যন্ত কেরীর বঙ্গদেশীয় জীবন খুবই অনিশ্চিত, অস্থির ও বিভ্রান্ত ছিল; তথাপি তিনি মুহূর্তের জন্যও বাইবেল অনু-বাদের 'পবিত্র কর্তব্যের' কথা বিস্মৃত হননি। তিনি ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের আগেই বাংলায় বাইবেল অনুবাদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন, যদিও বাংলা ভাষা শিক্ষায় প্রাথমিক ক্ষেত্রেও তিনি তখন বিশেষ অগ্রসর হতে পারেন নি। অথচ ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই তিনি নিউ টেস্টামেণ্টের অনুবাদই শুধু সম্পূর্ণ করেননি, ওল্ড টেস্টামেণ্টের অংশবিশেষও অনুবাদ করেছিলেন।৪৪ অনুবাদের ক্ষেত্রে কেরীর প্রথম সহযোগী টমাস। টমাসের সঙ্গে অনুবাদের কাজে জাহাজেই তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন; এবং তারপর রামরাম বসু, বঙ্গদেশে পদার্পণ করবার সময় থেকেই ভাষাশিক্ষা ও অনুবাদের ব্যাপারে কেরী তাঁকে নিজের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন; এবং সবার শেষে ফাউণ্টেন্। এঁদের মধ্যে রামরাম বসুর ভূমিকা প্রধানতঃ সহায়কেরই, তিনি অনুবাদের ক্ষেত্রে অনুবাদ-ভাষা সম্পর্কে কেরীকে সহায়তা করতেন মাত্র, নিউ

টেস্টামেণ্টের কোন নির্দিষ্ট অংশ তাঁর ব্যক্তিগত অনুবাদ বলে চিহ্নিত নয়। অপর দু'জন, টমাস ও ফাউণ্টেন, ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন নির্দিষ্ট অংশের অনুবাদ নিষ্পন্ন করেছিলেন; কেরী সেই সব অংশ মূলের সঙ্গে মিলিয়ে, প্রয়োজনীয় সংশোধনাদির পর গ্রহণ করেছেন। যদিও টমাসের অনুবাদের কাজ কোনক্রমেই সন্তোষজনক ছিল না ও টমাসের অনুবাদ সংশোধনের চেয়ে নূতন করে অনুবাদ করা কেরী সহজতর বলে মনে করতেন, এবং যদিও ফাউণ্টেনের অনুবাদ-অংশের সংশোধনের ভার তাঁর নিজের ওপরই বর্তেছিল, তথাপি টমাস ও ফাউণ্টেনের প্রস্তুত অনুবাদ তিনি গ্রহণ করেছিলেন। অন্য কথায় বলা যায়, কেরীর বাইবেল অনুবাদের কোন কোন অংশের মূল কাঠামো টমাস ও ফাউণ্টেনের হাতেই তৈরী, যদিও বাংলা বাইবেলের প্রথম অনুবাদক রূপে কেরীর নামই উচ্চারিত। তবে টমাস নিউ টেস্টামেণ্ট-ওল্ড টেস্টামেণ্ট নির্বিশেষে অনুবাদ করতে চেয়েছিলেন, যদিও নিউ টেস্টামেণ্টের ভাগ বেশি, ধর্মপ্রচারকের সক্রিয় ভূমিকায় নিজেকে স্থাপিত করেছিলেন বলে তাঁর পক্ষে এই অনুরক্তি হয়তো স্বাভাবিক। আর জাহাজে কেরী হিব্রু ভাষাভিজ্ঞ বলে যে সুযোগ তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিল, তা তিনি উপেক্ষা করতে চাননি বলেই সম্ভবতঃ ওল্ড টেস্টামেণ্টের জেনেসিস অনুবাদে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন।[৪৫] অপর দিকে ফাউণ্টেন যখন সম্পূর্ণ অতর্কিতভাবে মদনাবাটিতে এসে উপস্থিত হন, তখন নিউ টেস্টামেণ্টের অনুবাদ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, এবং এই অনুবাদে কেরী রামরাম বসুর প্রত্যক্ষ সাহায্য প্রায় ববাবরই লাভ করেছিলেন।[৪৬] রামরাম বসুকে বিতাড়িত করবার পর থেকে ওল্ড টেস্টামেণ্টের অনুবাদে কেরী যখন খুব অসহায় বোধ করছিলেন, তখনই ফাউণ্টেনের আবির্ভাব। কাজেই ভাষাশিক্ষা অতি দ্রুত চালিত করে ফাউণ্টেন তাঁর অনুবাদের জন্য বরাদ্দ পেয়েছিলেন ওল্ড টেস্টামেণ্টের অংশবিশেষ,[৪৭] নিউ টেস্টামেণ্টের অনুবাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ খুব স্পষ্ট নয়। রামরাম বসু নিউ টেস্টামেণ্টের অনুবাদে প্রধান সহায়ক; ওল্ড টেস্টামেণ্টের কোন কোন অংশ অনুবাদেও তাঁর সহায়তা অনুপস্থিত ছিল না। কারণ, কেরী প্রথমাবধি ওল্ড টেস্টামেণ্টের অনুবাদও উপেক্ষা করেননি। তাছাড়া টমাসের সঙ্গে তাঁর অনুবাদের প্রথম প্রয়াস ওল্ড টেস্টামেণ্টের অংশবিশেষ অবলম্বন করেই চালিত হয়েছিল।

কেরী নিউ টেস্টামেণ্ট গ্রীক থেকে ও ওল্ড টেস্টামেণ্ট হিব্রু থেকে অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর মূলানুসরণ সম্পর্কে সংশয় থাকা উচিত নয়, তবে ইংরেজি তাঁর মাতৃভাষা বলে এক অর্জিত ভাষা থেকে অপর এক অর্জিত ভাষায়

রূপান্তরের ক্ষেত্রে ইংরেজি বাইবেলের মাধ্যমিক ক্রিয়ার স্বাভাবিকত্বও পাশাপাশি স্বীকার করা ভালো। মূল ভাষার সঙ্গে ভারতবর্ষীয় ভাষান্তর তিনি মিলিয়ে দেখতেন ও ভাষান্তরে মূলের অনুসরণ সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর বিশ্রাম ছিল না। মনে হয় অনেকগুলি ক্ষেত্রে ইংরেজি বাইবেল থেকেই অনুবাদ প্রথমে সাধিত হয়েছিল, কেননা টমাস গ্রীক থেকে অনুবাদ করেছিলেন বা ফাউণ্টেন হিব্রু থেকে অনুবাদ করেছিলেন বলে কোন নিশ্চিত সাক্ষ্য উপস্থিত নেই। অথচ এঁদের অনূদিত অংশ গ্রন্থের মূল অবয়বে গ্রহণ করা হয়েছে। কেরীও নিজস্ব অনুবাদ-অংশের ভাষান্তর হয়ে গেলে মূল গ্রীকের সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মিলিয়ে পরিমার্জনা করতে চেয়েছিলেন।৪৮ কিন্তু এই মেলানোর কাজে অগ্রসর হবার আগে নিউ টেস্টামেণ্টের একটি গ্রীক নির্ঘণ্ট তাঁর জরুরি প্রয়োজন বলে ফুলারকে তিনি জানিয়েছেন।৪৯ এবং অত্যল্প কালের মধ্যেই তিনি গ্রীক ও হিব্রু অভিধান দেশ থেকে পেয়েওছিলেন।৫০ অতঃপর গ্রীক নির্ঘণ্টের সহায়তায় ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে নিউ টেস্টামেণ্টের অনুবাদ সম্পূর্ণ হবার পর থেকে ১৮০১ সালে নিউ টেস্টামেণ্টের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত অন্ততঃ চারবার তিনি নিজ হাতে পাণ্ডুলিপি পরিমার্জনা করেছিলেন।৫১ শুধু গ্রীক-নির্ঘণ্টের (Greek Concordance) ব্যবহার নয়, তৎকালীন ইংলণ্ডে বিশেষ প্রচলিত, ফিলিপ ডড্রিজের নিউ টেস্টামেণ্টের ভাষ্যও তিনি অনুবাদের ক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে অনুসরণ করেছিলেন বলে জানা যায়।৫২

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারিতে কেরী শ্রীরামপুরে পাদ্রী জীবন শুরু করেন। সেই বৎসর থেকেই বাইবেলের অনুবাদের মুদ্রণ ও প্রকাশের কাজও আরম্ভ হয়।৫৩ বাংলায় অনূদিত বাইবেলের যে-অংশ প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, তা হলোঃ ম্যাথুরচিত 'মঙ্গল সমাচার'। এই অংশের সঙ্গে ওল্ড টেস্টামেণ্টের খ্রীষ্ট মহিমাজ্ঞাপক কিছু কিছু অংশও মুদ্রিত হয়েছিল। মুদ্রিতাকারে প্রথম প্রচারের ক্ষেত্রে ম্যাথুরচিত গসপেল্-এর নির্বাচন সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্যঃ 'Matthew, ...which we considered of importance as containing a complete life of the Redeemer.' এই গ্রন্থ প্রথমে ৫০০ কপি মাত্র মুদ্রিত হয়েছিল, এবং এর প্রকাশনার কালঃ আগস্ট, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ। মুদ্রিত গ্রন্থের মধ্যে প্রায় দু-তিন শ কপি শুধু বিলিই করা হয়েছিল, এবং পুরো পাঁচশ কপি ছাপতে খরচা হয়েছিল তিন-চার পাউণ্ড মাত্র।৫৪

প্রথমে নিউ টেস্টামেণ্ট ও তারপর ওল্ড টেস্টামেণ্ট,—বাইবেল মুদ্রণের

ক্ষেত্রে এই ক্রমানুসরণের কথা ঘোষণা করেছিলেন মিশনারীরা।৫৫ এবং ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নিউ টেস্টামেণ্টের বাংলা অনুবাদ সম্পূর্ণ হলেও, পাশাপাশি একই সঙ্গে ওল্ড টেস্টামেণ্টের বাংলা অনুবাদের কাজও যে চলছিল, তা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করা হয়েছে। এই ওল্ড টেস্টামেণ্টের অনুবাদও ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছিল।৫৬ নিউ টেস্টামেণ্টের অনুবাদ সম্পূর্ণ হলে, বাইবেলের বাংলা নামকরণ সম্পর্কে কেরী ও তাঁর সহযোগী ফাউণ্টেন বিশেষভাবে সমস্যাপীড়িত হয়েছিলেন। কিভাবে 'মঙ্গলাখ্যান', 'ধর্মশাস্ত্র', ইত্যাদি নাম-প্রস্তাব বাতিল হয়ে গিয়ে 'ধর্ম-পুস্তক'—এই শিরোনাম বহাল হয়েছিল, তার বিবরণ দিয়েছেন ফাউণ্টেন তাঁর ৪ঠা জানুয়ারি, ১৭৯৮-র ডায়রিতে। এই শিরোনাম-সিদ্ধান্তে দেশীয় পণ্ডিতের বিবেচনাই বিশেষভাবে গৃহীত হয়েছিল।৫৭ শ্রীরামপুরে নিউ টেস্টামেণ্টের মুদ্রণের কাজ আরম্ভ হয় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে, ১৮০১ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যেই তা সম্পূর্ণ হয়। এই মুদ্রণকার্যে প্রধান মুদ্রক উইলিয়ম ওয়ার্ড, ডার্বিশায়ারের সেই ভদ্রলোক, স্বদেশে থাকতেই যাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, এবং বঙ্গদেশে মুদ্রণ সম্পর্কিত ভাবনা পুষ্ট হয়ে উঠবার সময়েও যাঁর কথা কেরী বিস্মৃত হননি। ওয়ার্ডের ঘনিষ্ঠ সহযোগীরূপে মুদ্রণ কার্যে অংশ গ্রহণ করেছিলেন কেরীর পুত্র ফেলিক্স। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে সোসাইটির কাছে লেখা চিঠিতে মিশনারীরা নিউ টেস্টামেণ্টের দ্রুতগতি মুদ্রণের কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু ছাপাখানায় গেলেও মুদ্রিত অনুবাদ যাতে যথাসম্ভব গ্রাহ্য হতে পারে, তার দিকে কেরীর মনোযোগ সর্বদাই নিবদ্ধ ছিল, এবং প্রুফের ওপর সংশোধন ও পরিমার্জনা করতে গিয়ে তিনি কখনোই সময় সম্পর্কে ভাবনা করতেন না। তথাপি যে অতি দ্রুত মুদ্রণকার্য সমাপ্ত হয়েছিল, এই তথ্য পক্ষান্তরে কেরী ও মুদ্রকদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের সাক্ষ্য বহন করছে।৫৮ প্রথম সংস্করণে নিউ টেস্টামেণ্ট দু-হাজার কপি ছাপা হয়েছিল, এবং এই সংস্করণ প্রকাশ করতে ব্যয় হয়েছিল মোট ৬১২ পাউণ্ড।৫৯ প্রেসে যাওয়া থেকে প্রকাশের মধ্যে নয় মাসের নেপথ্য-পরিশ্রমের ইতিহাস সঞ্চিত আছে। দু-হাজার কপি নিউ টেস্টামেণ্টের মধ্যে ১৭০০ কপি ছাপা হয়েছিল দেশী কাগজে, আর ৩০০ কপি ছাপা হয়েছিল বিলাতী কাগজে, কেননা ১৮০০ সালের অক্টোবরের মধ্যেই দেখা গেছে যে কিছু কিছু য়ুরোপীয়, মুদ্রণ সম্পূর্ণ হবার আগেই, ৩২৲ টাকা দিয়ে মুদ্রিত বাইবেলের গ্রাহক হয়েছেন।৬০ সামগ্রিকভাবে বাইবেলের অনুবাদ তো বটেই, নিউ টেস্টামেণ্টের মুদ্রণ ও প্রকাশ কেরীর জীবনের এক

মহৎ বাসনার চরিতার্থ পরিণাম। এবং এই ঘটনা তাঁর জীবনের এক অপরিমেয় উচ্ছ্বাসও বটে; তাঁর ভাবানুভূতির মগ্ন উচ্চারণেই তা ধরা পড়ে; 'I have lived to see the bible translated into Bengali, and the whole New Testament printed' ৬১ তাঁর অন্যান্য সহযোগীদের উচ্ছ্বাসও প্রবল, অনেক সময় অতি উচ্চারণের স্পর্শ থাকে তার মধ্যে। টমাস বাংলা বাইবেলের বাসনায় বাজি ধরতে চেয়েছিলেন, আর ওয়ার্ড বাইবেল অনুবাদের অলৌকিক ফললাভ সম্পর্কে সোচ্চার। নিউ টেস্টা-মেণ্টের প্রথম সংস্করণ ইংলণ্ডে পেঁাছুলে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে বিশেষভাবে উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল, এবং তার একটি কপি যাতে রাজা তৃতীয় জর্জ পেতে পারেন, তার জন্যে ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। কেরীর এই অভিনব গৌরববাহী পরিশ্রমের ফল সম্রাট কর্তৃক প্রশংসিতও হয়।৬২

নিউ টেস্টামেণ্টের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হতে খুব বেশি দিন সময় লাগেনি। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুতির তথ্য পাওয়া যায়। কেরী অনূদিত বাংলা নিউ টেস্টামেণ্ট দ্বিতীয় সংস্করণের তারিখ ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ বলেই চিহ্নিত, কিন্তু ওই তারিখটি সম্পর্কে তথ্য-বিভ্রান্তি ঘটেছে বলে ঐতিহাসিকরা সিদ্ধান্ত করেছেন।৬৩ মনোহরের তৈরী ছোট ও সুন্দর অক্ষরে ছাপা এই গ্রন্থখানির ছাপার কাজ সম্ভবতঃ ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দেই শুরু হয়েছিল, তবে ছাপার কাজ শেষ হয়ে ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে গ্রন্থখানি মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয়নি। বাংলা নিউ টেস্টামেণ্টের দ্বিতীয় সংস্করণ অতঃপর ১৮০৬ সালের সংস্করণ বলেই চিহ্নিত হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণে মোট ১৫০০ কপি ছাপা হয়েছিল, এবং প্রথম সংস্করণের তুলনায় দ্বিতীয় সংস্করণে সার্বিক উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই উৎকর্ষের কারণ সম্পর্কে স্মিথ প্রধানতঃ তিনটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেনঃ (ক) প্রথম সংস্করণের অনুবাদরূপ সম্পর্কে ও দ্বিতীয় সংস্করণের অনুবাদ-রূপ প্রস্তুতিতে কেরীর মিশন সহযোগীদের নিরন্তর সমালোচনা ও গঠন-মূলক সহায়তা; (খ) দেশীয় খ্রীষ্টানদের সমুদ্ভব ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজন; (গ) বাংলা, সংস্কৃত ও মারাঠিভাষার অধ্যাপকরূপে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কেরীর নবীন অভিজ্ঞতা।৬৪ বস্তুতঃ, তাঁর মিশন সহযোগীরা দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুতিতে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছিলেন, প্রায় প্রত্যেক পাদ্রীই প্রুফ সংশোধনে কোন না কোন রূপ অংশগ্রহণ করেছেন। এই কাজে মার্শম্যানের ভূমিকা ছিল ব্যাপক; কেরী ও মার্শম্যান মূল গ্রীকের সঙ্গে মিলিয়ে বাংলা অনুবাদের যথাযোগ্যতা পরীক্ষা করে দেখেছেন পারস্পরিক সহযোগিতায়। একজন গ্রীক-অংশ পড়ে যেতেন, এবং অপরজন বাংলা অনুবাদ মূলের

অনুরূপতা লাভ করেছে কিনা বিচার করে দেখতেন। এবং এইভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সক্রিয়তায় বাংলা নিউ টেস্টামেণ্টের দ্বিতীয় সংস্করণের উৎকর্ষ মোটামুটিভাবে প্রতিশ্রুত হয়েছিল। তাছাড়াও, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপনা-বৃত্তিতে স্থিত হবার ফলে ভাষাজ্ঞানের ক্ষেত্রেই যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিলেন, তা নয়; ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তাঁকে ঘিরে যে দেশীয় পণ্ডিত সমাজ সমবেত হয়েছিলেন, তাঁদের সান্নিধ্য ও সক্রিয়তাও তাঁকে ভাষাচর্চার ফললাভে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগদান করবার দুই বৎসরের মধ্যেই যে তিনি এই অভূতপূর্ব সুযোগের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন, তার প্রমাণ ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দেই বাংলা নিউ টেস্টামেণ্টের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুতির কাজে তাঁর মনঃসংযোগ। নিউ টেস্টামেণ্টের প্রথম সংস্করণের কাজ সম্পন্ন হয়েছিল মদনাবাটির নীলকুঠিতে; সেখানে যেসব দেশীয় মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তাঁরা এক অর্থে স্থানীয় লোক, তাঁদের ব্যবহৃত ভাষা ছিল স্থানীয় বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত। বিশুদ্ধ বঙ্গভাষা ও মদনাবাটি তথা মালদহের উপভাষার মধ্যে পার্থক্য আছে বলেই, স্থানীয় জন-সংযোগের মাধ্যমে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষা চর্চার ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট অগ্রসর হতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। অর্থাৎ মদনাবাটির পরিবেশের মধ্যে যে সীমাবদ্ধতা ছিল, সেখানে অনূদিত নিউ টেস্টামেণ্টের মধ্যেও সেই সীমাবদ্ধতার প্রতিফলন ছিল প্রায় অবশ্যম্ভাবী, তাঁর বাংলা নিউ টেস্টামেণ্ট ফলতঃ সমালোচনার গণ্ডী বহির্ভূত থাকতে পারেনি। যদিও এই সময় রামরাম বসু কেরীর ঘনিষ্ঠ সহযোগীরূপে সক্রিয় ছিলেন, এবং অন্যান্য কয়েকজন পণ্ডিতও কেরীকে প্রয়োজনীয় সহায়তা নিবেদন করেছিলেন, তথাপি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যে পণ্ডিত সমাজ সমবেত হয়েছিলেন, যোগ্যতায় ও অধিকারে তাঁরা এইসব পূর্ববর্তীদের চেয়ে যে বিশিষ্ট ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অন্যত্র কেরীর সাহিত্যজীবনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রভাবশালী ভূমিকা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে শুধু এই প্রস্তাবই যথেষ্ট যে, কেরীর বাংলা নিউ টেস্টামেণ্টের দ্বিতীয় সংস্করণের সার্বিক উৎকর্ষের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল বিচিত্র সূত্রের মধ্যে তাঁর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পদাধিকার ও অভিজ্ঞতা অন্যতম। এই অভিজ্ঞতা, বিচিত্র সমালোচনা ও উপদেশ ইত্যাদির সূত্রে কেরী সহজেই প্রথম সংস্করণের অনুবাদের ত্রুটি ও ভাষাবিভ্রাট সম্পর্কে অবহিত হন এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার ও পরিমার্জনার মাধ্যমে দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ প্রস্তুত করেন।

বাংলা নিউ টেস্টামেণ্টের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮১১

খ্রীষ্টব্দে। ১৮১১-র এই তৃতীয় সংস্করণকে ফোলিও সংস্করণও বলা হয়ে থাকে। এই সংস্করণকে পৃথক কোন সংস্করণে চিহ্নিত করা হয়তো ঠিক নয়; কেননা, এটি দ্বিতীয় সংস্করণেরই পুনর্মুদ্রণ। ১৮০৯ সালে মুদ্রণের জন্যে প্রেসে দেওয়া হয় এবং ১৮১১ সালে তা মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয়। মোট মুদ্রিত কপির সংখ্যা মাত্র ১০০। এই সংস্করণটি প্রস্তুত করা হয়েছিল 'for the use of the native congregations by that time formed.'৬৫ চতুর্থ সংস্করণের কাজের সূত্রপাত হয় ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে, এবং তা প্রকাশিত হয় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে।৬৬ এই সংস্করণে মুদ্রিত গ্রন্থ সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার। এবং এরপর ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে নিউ টেস্টামেণ্টের অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম সংস্করণ সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না;৬৭ এমন কি শ্রীরামপুর কলেজের কেরী লাইব্রেরীতেও এই তিনটি সংস্করণের কোন কপি দেখিনি। তবে ১৮৩২-এর সংস্করণ সম্পর্কে Tenth Memoir-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই সংস্করণের ভিত্তি নিউ টেস্টামেণ্টের ষষ্ঠ বাংলা সংস্করণ এবং গস্‌পেলগুলি সপ্তম সংস্করণ অনুসারী।

সব মিলে দেখা যাচ্ছে, কেরীর জীবৎকালেই বাংলা নিউ টেস্টামেণ্টের আটটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুত করা জরুরি হয়ে উঠেছিল প্রথম সংস্করণের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি সংশোধনের জন্য। তারপরও কেরী আরও ছ'টি সংস্করণ প্রস্তুত করেছিলেন, এবং এতগুলি সংস্করণ প্রকাশের পশ্চাতে প্রচারণার প্রেরণা বিশেষভাবে কার্যকর ছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু সংস্কার ও পরিমার্জনার মাধ্যমে অনুবাদ গ্রন্থখানিকে সার্থক ও অধিকতর গ্রাহ্য করে তোলার বাসনাও যে অনুবাদকের মনে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিল, সেকথাও পাশাপাশি স্বীকার করে নেওয়া উচিত। অনুবাদ সঙ্গত, সার্থক ও সুন্দর না হলে তা যে সর্বত্রগামী ও সর্বগ্রাহ্য হতে পারে না, তা তিনি জানতেন; এবং সর্বত্রগামিতা ও সর্বগ্রাহ্যতা ছাড়া খ্রীষ্টধর্ম প্রচারণার ক্ষেত্রে দেশীয় ভাষায় খ্রীষ্টধর্মগ্রন্থের ব্যাপক ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর নিশ্চিত পরিকল্পনা যে ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য, তা-ও তাঁর অপ্রতীত ছিল না। এই বারম্বার সংস্কার অনুবাদকে কতখানি উন্নত করতে পেরেছিল, সে-সম্পর্কে মতামতের বিভিন্নতা আছে,৬৮ কিন্তু কেরী কখনই তাঁর অনুবাদ সম্পর্কে নিশ্চয়তার দাবী করতেন না। তিনি তাঁর নিজস্ব ভূমিকা সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন; তিনি জানতেন যে ভারতবর্ষীয় ভাষায় বাইবেল অনুবাদের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা প্রধানতঃ প্রবর্তকের, প্রথম পথরেখা নির্মাণে তাঁর পরিশ্রম সবিনয়ে নিবেদিত মাত্র। কোন ভাষার

অনুবাদ সেই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচারের মাধ্যমে তার গুণাগুণ যাচাই করে প্রয়োজনীয় সংস্কারে তিনি আগ্রহী ছিলেন। বাংলা বাইবেলের অনুবাদের ক্ষেত্রেও তিনি মোটামুটি এই রীতি অনুসরণ করেই সংস্করণের পর সংস্করণ প্রস্তুত করে গিয়েছেন। তিনি আশা করতেন যে তাঁর পরবর্তী উদ্যোগী পণ্ডিতরা তাঁর অনুবাদের সংস্কার করে অনূদিত বাইবেলের রূপকে অধিকতর স্বাভাবিক ও সঙ্গতসুন্দর করে তুলবেন। বস্তুতঃ তাঁর এই প্রত্যাশা অচিরাৎ চরিতার্থ হয়েছিলঃ বাংলা বাইবেল অনুবাদে য়েট্‌স্‌-এর স্বীকৃতি তার প্রমাণ।

কেরী সমগ্র বাইবেল বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন; নিউ টেস্টামেণ্ট প্রকাশ করেছিলেন আগে, পরে ওল্ড টেস্টামেণ্ট। ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করা হয়েছে যে নিউ টেস্টামেণ্ট ও ওল্ড টেস্টামেণ্ট-এর অনুবাদের কাজ প্রায় পাশা-পাশি চলেছে। ওল্ড টেস্টামেণ্ট মূল ভাষা হিব্রু থেকে বাংলায় অনূদিত হয়; নিউ টেস্টামেণ্টের মত সংযোগমূলক ভাষা হিসাবে ইংরেজির সক্রিয়তাও হয়তো এই অনুবাদে থাকতে পারে। ওল্ড টেস্টামেণ্ট অনুবাদে কেরীর প্রধান সহায়ক ফাউণ্টেন হিব্রু ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন বলে তথ্য পাওয়া যায়নি। তাঁর ব্যক্তিগত কাজ তাই সম্ভবতঃ ইংরেজি বাইবেলের মাধ্যমেই চালিত হয়েছিল। এবং ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই ওল্ড টেস্টা-মেণ্টের বাংলা অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়ে যায়।৬৯ ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মোট চার খণ্ডে ওল্ড টেস্টামেণ্টের বাংলা অনুবাদ মুদ্রিত হয়।৭০ এই চারটি খণ্ডে আছেঃ (ক) পেণ্টাটিয়ুখ্‌; (খ) যশুয়া এস্‌থার; (গ) জব্‌-সঙ্‌ অব্‌ সোলোমন; (ঘ) ইসাইয়া—মালাখি। অর্থাৎ, পেণ্টাটিয়ুখ্‌ বা আদিপুস্তক, ইতিহাস, গীত ও ভবিষ্যদ্বাক্য। আদিপুস্তক বা মোশার ব্যবস্থা প্রকাশিত হয় ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে। আখ্যা-পত্রে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ মুদ্রিত হলেও, ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে যে তা প্রকাশিত হয় নি, তার সমর্থনে কয়েকটি তথ্যসূত্র আছে। যেমনঃ (ক) ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে কেরী জানাচ্ছেনঃ 'The first volume of the Old Testament........will soon appear.'৭১ অর্থাৎ এই সময় পর্যন্ত গ্রন্থখানির মুদ্রণ সম্পূর্ণ হয়নি; (খ) ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর লেখা কেরী মার্শম্যান ওয়ার্ডের একটি চিঠিতে আছেঃ 'The first volume of the Old Testament is nearly half-printed ; viz., to the thirty-third chapter of Exodus.' বা, ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাইয়ের একটি চিঠিতেঃ 'The last sheet of the Pentateuch will

be printed next week'.৭২ অর্থাৎ ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাইয়ের আগে ওল্ড টেস্টামেণ্টের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়নি।৭৩

ওল্ড টেস্টামেণ্টের প্রথম খণ্ডের পর তৃতীয় খণ্ড, অর্থাৎ গীতাদি প্রকাশিত হয় ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে। ইংরেজি আখ্যাপত্র অনুযায়ী ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দ। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাইয়ের চিঠিতেই আছেঃ 'We are about to print the last volume but one of the testament, including Job and Solomon's song. One hundred copies of the Psalms and Isaiah have been ordered by the college at Calcutta'.৭৪ এই পত্রানুযায়ী গীতাংশ ও ভবিষ্যদ্বাক্যের অন্তর্গত ইসাইয়ার একশ কপি যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কিনতে চেয়েছিলেন, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে; এবং কলেজের ইচ্ছানুযায়ী তা ছাপাতে হয়েছিল।৭৫

ওল্ড টেস্টামেণ্টের চতুর্থ খণ্ড এরপর প্রকাশিত হয় ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে। আখ্যাপত্রে ১৮০৫ সাল মুদ্রিত হয়েছে। এই Prophetical Book বা ভবিষ্যদ্বাক্যই শ্রীরামপুরের পরিকল্পনা অনুযায়ী ওল্ড টেস্টামেণ্টের শেষ খণ্ড বা শেষ বর্গ। ইসাইয়া থেকে মালাখি এই খণ্ডের বিষয়সূচী।৭৬

ওল্ড টেস্টামেণ্টের প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হবার পর দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ 'Historical Books' বা য়িশ্রালের বিবরণ প্রকাশিত হয় ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে।৭৭ এবং এই খণ্ড প্রকাশিত হবার সঙ্গেই বাইবেল অনুবাদের কাজ সম্পূর্ণ হয়। ওল্ড টেস্টামেণ্টের চার খণ্ড ও নিউ টেস্টামেণ্ট, যাকে শ্রীরামপুর পাদ্রীরা ধর্মপুস্তকের পঞ্চম খণ্ড বলে উল্লেখ করতেন, এই পাঁচ খণ্ডে, ১৮০১-১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কেরী সম্পূর্ণ বাংলা বাইবেলের মুদ্রণ ও প্রকাশ সম্পন্ন করেছিলেন।

বাংলা বাইবেল মুদ্রণ ও প্রকাশনের এই বিবরণ থেকে বোঝা যায়, শ্রীরামপুর অনুমোদিত খণ্ডসমূহ প্রকাশে পাদ্রীরা সবসময় ক্রমপর্যায় মেনে চলেন নি। তবে শুধু বাংলায় নয়, অন্যান্য ভাষাতেও, নিউ টেস্টামেণ্টের অনুবাদ ও প্রকাশকে তাঁরা অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন; সবার আগে নিউ টেস্টা-মেণ্টের প্রকাশে তাঁরা যত্নবান ছিলেন এবং নিউ টেস্টামেণ্টকে ধর্মপুস্তকের পঞ্চম খণ্ড বলে প্রচার করতেই তাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন।৭৮ এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, বাইবেল অনুবাদ-চিন্তা তাঁদের সবসময় খণ্ডানুসারী ছিল না, এক অখণ্ড সমগ্রতায় তাঁদের অনুবাদ-চিন্তা সংবদ্ধ হয়েছিল।

ওড়িয়াঃ স্মিথ অনুমান করেছেন যে বাংলা বাইবেলের ঠিক পর পরই বাইবেলের ওড়িয়া অনুবাদের কাজ শুরু হয়েছিল।৭৯ ওড়িয়া ভাষায় বাইবেল অনুবাদের কাজ ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করেছিল যে কারণগুলি,

তার মধ্যে প্রধান সম্ভবতঃ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কেরীর অধীনে প্রধান পণ্ডিত ছিলেন মৃত্যুঞ্জয়। তিনি বর্তমান উড়িষ্যার অন্তর্গত জাজপুরের লোক, এবং কলেজের বাংলা বিভাগের শ্রেষ্ঠ মনীষা। ওড়িয়া ও বাংলায় তাঁর সমান ব্যুৎপত্তি ছিল, সংস্কৃতে অধিকার বলে সংস্কৃত টোলও চালাতেন। ওড়িয়া বাইবেল রচনার পশ্চাতে মৃত্যুঞ্জয়-এর প্রেরণা থাকা খুবই স্বাভাবিক।

'The first spade-work in Oriya version was Mrityunjoy's'.৮০ মৃত্যুঞ্জয় ওড়িয়া অনুবাদের খসড়া প্রস্তুত করেছিলেন কেরীর বাংলা বাইবেল অনুসরণে। তারপর কেরী মৃত্যুঞ্জয়ের ওড়িয়া পাণ্ডুলিপি মূল গ্রীকের সঙ্গে মিলিয়ে প্রতিটি প্রয়োজনীয় অংশ সংশোধন করে দেন। এই নিউ টেস্টামেণ্ট অনুবাদের কাজ প্রথম শুরু হয় ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে,৮১ এবং তা প্রকাশিত হয় ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে।৮২ ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অতঃপর ওল্ড টেস্টামেণ্টের অনুবাদ সম্পূর্ণ হয় ও মোট চারটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়।৮৩ এই অনুবাদ মোটামুটিভাবে গৃহীত হয়েছিল; তার প্রমাণঃ (ক) মুদ্রিত গ্রন্থগুলি যথেষ্ট দ্রুত বিক্রি হয়ে যায়, নির্বোধ অনুবাদের এহেন সন্তোষজনক প্রচারণা সম্ভব নয়; (খ) কটক ব্যাপ্টিস্ট মিশনের এমোস্ সাটন্ কেরী-কৃত অনুবাদেরই সংস্কার ও সংশোধন করেছিলেন, এবং পরবর্তীকালে (১৮৪০-৪৪) সাটনের যে ওড়িয়া বাইবেল প্রকাশিত হয়, তার মূল ভিত্তি ছিল কেরীর অনুবাদ। কেরীর অনুবাদ প্রাথমিক স্তরে থেকেও যদি সংগত ও যোগ্য না হতো, তাহলে পরবর্তীকালের সংস্কৃত রূপ তাঁর অনুবাদকে ভিত্তি করে গঠিত হতো না।

হিন্দুস্থানীঃ৮৪ বাইবেল অনুবাদের ইতিহাসে ভারতবর্ষের দুইটি পরস্পর-সম্পৃক্ত ভাষা উর্দু ও হিন্দী সংস্করণের একটি বিশেষ স্থান আছে। ডাচ্ মিশনারী বেঞ্জামিন শুল্ৎস্-এর হিন্দুস্থানী অনুবাদের৮৫ পরেই হিন্দুস্থানীতে শ্রীরামপুর মিশনারীদের অনুবাদ প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করা যায়। ১৮০৩ সালের ১৪ই ডিসেম্বর কলকাতা থেকে ডক্টর রাইল্যাণ্ডকে লেখা কেরীর একখানি চিঠি থেকে বোঝা যায় যে ১৮০২ সালের মাঝামাঝি গিলখ্রীষ্টের যোগ্যতাকে বাইবেলের হিন্দুস্থানী অনুবাদে ব্যবহার করবার একটা চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু যে-কোনও কারণেই হোক তা পরিত্যক্ত হয়।৮৬ আবার এই চিঠির সূত্রেই দেখা যাচ্ছে যে ঐ সময়ের মধ্যে শ্রীরামপুর মিশনারীরা হিন্দুস্থানী ও ফার্সী ভাষায় বাইবেল অনুবাদের কাজে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছিলেন। এই কাজের জন্য শ্রীরামপুর মিশন দু-জন মুন্সী নিয়োগ করেন, এবং শ্রীরামপুর ত্রয়ী প্রত্যেকেই এই অনুবাদে

কোন না কোন ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। তবে কেরী জানিয়েছেন যে, ফার্সী অনুবাদে তাঁর কোন অংশ ছিল না। এই অনুবাদের কাজ কতদূর অগ্রসর হয়েছিল, সে-সম্পর্কে কেরী লিখেছেনঃ 'Brother Marshman has finished Matthew, and, instead of Luke, has begun the Acts. Brother Ward has done part of John, and I have done the Epistles, and about six chapters of the Revelation; and have proceeded as far as the second epistle of the Corinthians in the revisal: they have done a few chapters into Persian.'৮৭

হিন্দুস্থানী ভাষায় অনুবাদের কাজ কতদূর অগ্রসর হয়েছিল, কেরীর বিবৃতি থেকে তা স্পষ্ট; কিন্তু ফার্সী ভাষার কাজ কতদূর অগ্রসর হয়েছিল, সে-সম্পর্কে, হতে পারে নিজে তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন না বলে, তিনি যথেষ্ট স্পষ্ট হতে পারেন নি। প্রকৃতপক্ষে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীরামপুর মিশনারীরা হিন্দুস্থানী ভাষায় বাইবেল অনুবাদে মনঃসংযোগ করেন এবং ১৮০৭ সালের মধ্যেই তাঁদের হিন্দুস্থানীতে অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।৮৮ এই নিউ টেস্টামেণ্ট অনুবাদ মুদ্রিত হয়েছিল ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে, এবং ওল্ড টেস্টামেণ্টের চারখণ্ড ১৮১৩-১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। কেরীর বাইবেলের হিন্দী অনুবাদ কতখানি জনপ্রিয় হয়েছিল, সে সম্পর্কে মতান্তর আছে। কিন্তু প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবার কয়েক মাসের মধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন দেখা যায়, এবং দ্বিতীয় সংস্করণও অল্পদিনের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়। তথাপি কেরী হিন্দী অনুবাদের তৃতীয় সংস্করণ যে প্রকাশ করেননি তার কারণ, ১৮২০-তে তিনি চেম্বারলেন-এর অধিক সক্ষম অনুবাদ৮৯ প্রকাশ করাই উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেছিলেন। কেরীর হিন্দুস্থানী অনুবাদকে সঠিক হিন্দী অনুবাদ বলা উচিত নয়। আরবি, ফার্সী শব্দ তিনি অনুবাদে যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু চেম্বারলেন হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ভাষা সম্পর্কে বার বার উল্লেখ করেছেন, এবং তাঁর মনে হয়েছে যে হিন্দুরা অনুবাদে মুসলমানী শব্দ সাধারণতঃ পছন্দ করেন না। ফলে একই অনুবাদ হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের কাছেই গ্রাহ্য হবে কিনা, সে-সম্পর্কেও তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।৯০ আরবি ফার্সী তথা মুসলমানী শব্দ ব্যবহারের প্রতুলতা কেরীর হিন্দুস্থানী অনুবাদের বাস্তব উপযোগিতার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিবন্ধক হয়েছিল বলে চেম্বারলেনের সাক্ষ্য থেকে৯১ প্রতীয়মান হয়, এবং এই সাক্ষ্য পক্ষান্তরে কেরীর অনুবাদের ভাষারীতির ওপর আলোকপাতও বটে।

ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করা হয়েছে যে হিন্দুস্থানী ভাষানুবাদের সঙ্গে সঙ্গে মার্শম্যান ইত্যাদি ফার্সী ভাষায় বাইবেল অনুবাদের কাজেও নিযুক্ত হয়েছিলেন, এবং কেরী ফার্সী ভাষার অনুবাদের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করেননি। এই অনুবাদের কাজ কতদূর অগ্রসর হয়েছিল, সে সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা কঠিন, কেননা এই ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে হেনরী মার্টিন প্রায় অপ্রতিরোধ্য যোগ্যতা নিয়ে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁর এই যোগ্যতা বোধ হয় প্রথম প্রমূর্ত হয়ে উঠেছিল হিন্দুস্থানী ভাষায় নিউ টেস্টামেণ্ট অনুবাদের মাধ্যমে। হেনরী মার্টিন বিলেতে থাকতেই গিলখ্রীষ্টের কাছে হিন্দুস্থানীতে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন, এবং তাঁর হিন্দুস্থানী ও আধুনিক উর্দু প্রায় সমার্থক। ব্রিটিশ এ্যাণ্ড ফরেন বাইবেল সোসাইটির কলকাতা শাখার করেস্পণ্ডিং কমিটির আনুকূল্যে মার্টিনের এই কাজ ১৮০৮ সালে সম্পূর্ণ হলেও পুঙ্খানুপুঙ্খ সংস্কারের পর ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের আগে তা প্রকাশিত হয়নি। সোসাইটির পক্ষে শ্রীরামপুর প্রেস থেকে গ্রন্থখানি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় আরবি হরফে। মার্টিনের হিন্দুস্থানী আরবি ফার্সীর অনুবর্তী হয়ে আধুনিক উর্দুর পটভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করে, এবং পরবর্তীকালে মার্টিনের হিন্দুস্থানী বা উর্দু অনুবাদই কিছু সংস্কৃত শব্দান্তর ও দেবনাগরী হরফে মুদ্রণের মধ্য দিয়ে হিন্দী বাইবেলের যথার্থ গ্রাহ্যরূপ উপহার দিয়েছিল। হেনরী মার্টিনের ভাষাজ্ঞানের তীক্ষ্ণতা ও মেধাই তাঁকে বর্তমান ক্ষেত্রে শ্রীরামপুর মিশনারীদের সাফল্যকে অতিক্রম করতে বা তাকে নিষ্প্রভ করে দিতে সহায়তা করেছে।

মারাঠি ও অন্যান্য: ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই কেরী যে মোটামুটিভাবে মারাঠি ভাষা শিক্ষা করেছিলেন, তার সমর্থন তাঁর চিঠিপত্রাদির মধ্য থেকেই সংগ্রহ করা যায়।[৯২] ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দেই তাঁকে বাইবেলের মারাঠি অনুবাদে নিযুক্ত দেখা যায়।[৯৩] তবে কেরী নিউ টেস্টামেণ্টের মারাঠি অনুবাদে প্রধানতঃ মারাঠি পণ্ডিতের সহায়তায়ই অগ্রসর হতে পেরেছিলেন, তিনি কখনোই এক্ষেত্রে স্বনির্ভর ছিলেন না। ১৮০৩ সালের সেপ্টেম্বরে লেখা একটি চিঠিতে বাইবেল অনুবাদে এই মারাঠি পণ্ডিতের সক্রিয় অংশগ্রহণের কথা তিনি স্পষ্টতঃই উল্লেখ করেছেন,[৯৪] যদিও তাঁর পরিচয়-জ্ঞাপক বিশেষ কোন তথ্য তিনি প্রকাশ করেননি। তবে ১৮০৪ সালের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের একটি রিপোর্টের সূত্রে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে এই পণ্ডিতের নাম ছিল বৈদ্যনাথ।[৯৫] এই রিপোর্ট অনুযায়ীই বলা যায় যে বৈদ্যনাথ অনূদিত মারাঠি নিউ টেস্টামেণ্ট ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের

আগে মুদ্রিত হয়নি। অবশ্য সম্পূর্ণ নিউ টেস্টামেণ্ট প্রকাশিত হয়নি, ম্যাথুর গস্‌পেল্‌ অংশের মারাঠি অনুবাদ ৪৬৫ কপি মাত্র মুদ্রিত হয়েছিল।৯৬ এই গ্রন্থখানিই প্রথম মারাঠি বাইবেল বলে সম্মানিত হয়ে থাকে; অর্থাৎ বৈদ্যনাথ ও কেরীর মিলিত উদ্যম ও পরিশ্রমে বাইবেলের মারাঠি অনুবাদের সূচনা হয়েছিল। এরপর ১৮০৭ সালে যে নিউ টেস্টামেণ্টের অনুবাদ প্রকাশিত হয়, তা আর দেবনাগরী হরফে প্রকাশিত হয়নি, যদিও শিক্ষিত মারাঠিদের মধ্যে দেবনাগরী হরফের প্রচলন ছিল। এই সময় থেকে মারাঠি গ্রন্থাদি মোড়ি হরফে মুদ্রিত হয়।৯৭ নিউ টেস্টামেণ্টের মারাঠি দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সময় গস্‌পেলের মারাঠি অনুবাদ আবার স্বতন্ত্রভাবে সম্প্রচারিত হয়। শ্রীরামপুর লাইব্রেরীতে কেরীর মারাঠি বাইবেলের যে তালিকা পাওয়া গেছে, তা থেকে জানা যায়ঃ ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে 'পেণ্টাটিয়ুখ্‌'; ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে 'পোয়েটিক্যাল বুক্‌স্‌'; ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে 'হিস্টোরিক্যাল বুক্‌স'; ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রোফেটিক্যাল বুক্‌স্‌' প্রকাশিত হয়েছিল।৯৮

ওড়িয়া বাইবেলের প্রথম রূপকার ছিলেন মৃত্যুঞ্জয়, তেমনি মারাঠি বাইবেলের প্রথম রূপকার ছিলেন বৈদ্যনাথ। প্রথম খসড়া প্রস্তুত হলে কেরী তা মূলের সঙ্গে মিলিয়ে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশোধন করে দিতেন। কিন্তু কেরীর পণ্ডিত মারাঠি হলেও মারাঠি ভাষাচরিত্রের জ্ঞান তাঁর দুর্বল ছিল; কেননা মারাঠিভাষার মৌলিক রূপ যে অঞ্চলের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে, তা হলো পুণা ও তার পরিপার্শ্ব, কিন্তু এই পণ্ডিত ছিলেন নাগপুরের নিকটবর্তী অঞ্চলের লোক, এবং এই অঞ্চলের মারাঠিভাষা আঞ্চলিকতাকে তথা উপভাষিক স্তরকে অতিক্রম করে মারাঠি ভাষার প্রামাণিক নির্দিষ্টতার গৌরব লাভ করতে পারেনি। হূপার কেরীর মারাঠি অনুবাদ সম্পর্কে যথেষ্ট আক্রমণাত্মক মন্তব্য করেছেন, এবং তিনি শ্রীরামপুরের মারাঠি বাইবেলের দুর্বলতার দুটি কারণ উল্লেখ করেছেনঃ (ক) নাগপুর অঞ্চলের উপভাষা ব্যবহারজনিত সংকীর্ণতা; (খ) সচরাচর ব্যবসায়ী ও সাধারণ লোকের মধ্যে ব্যবহৃত মোড়ি হরফের ব্যবহার।৯৯ বম্বে অক্সিলিয়ারি বাইবেল সোসাইটি ও অ্যামেরিক্যান মিশনারী সোসাইটির মিলিত প্রচেষ্টায় ১৮২৬ সালে নূতন মারাঠি নিউ টেস্টামেণ্ট প্রকাশিত হবার পরও যখন ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে নূতন সংস্করণের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন অবশ্য তাঁরা কেরীর অনুবাদ তথা শ্রীরামপুর সংস্করণটি আবার পরীক্ষা করে দেখেন। মারাঠি পণ্ডিতেরা ও পাদ্রিরা অবশ্য এই সংস্করণকে

গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেননি, এবং অতঃপর মারাঠি বাইবেলের ইতিহাসে কেরীর আর কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু কেরী ত্রুটিপূর্ণ ও প্রাথমিক হলেও অগ্রজ, মারাঠি বাইবেল অনুবাদের অভ্যুদয়পূর্ব তাঁর হাতেই রচিত হয়েছিল। অ্যামেরিক্যান মিশন সোসাইটি অতঃপর বৃহত্তর ও যোগ্যতর ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিল সত্য. তথাপি তাঁদের প্রথম পদচারণা সুরু হয়েছিল কেরীকে ভিত্তি করেই, বাল-বোধ হরফে শ্রীরামপুর সংস্করণের প্রচারের মাধ্যমে।

মারাঠি ভাষায় বাইবেল অনুবাদ সম্পন্ন করেই কেরী ও শ্রীরামপুর মিশন ক্ষান্ত ছিলেন না, অপর একটি মহারাষ্ট্রীয় উপভাষা কঙ্কনীতেও তাঁরা অনুবাদের কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত গস্‌পেলের কঙ্কনী অনুবাদ মুদ্রণের জন্যে ছাপাখানায় পাঠানো হয়১০০ এবং ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তা প্রকাশিত হয়। কঙ্কনী নিউ টেস্টামেণ্ট এবং পেণ্টাটিয়ুখ্‌-এর কঙ্কনী অনুবাদের প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৮১৮ ও ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ।

শ্রীরামপুর থেকে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে কানাড়ী ভাষায় নিউ টেস্টামেণ্ট প্রকাশিত হয়েছিল।১০১ এই অনুবাদের গৌরব কতখানি ছিল, তা নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়, তবে মাদ্রাজ থেকে অক্সিলিয়ারি বাইবেল সোসাইটি ১৮৮৪ ও ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কানাড়ী হরফে রূপান্তরিত করে কেরীর কঙ্কনী অনুবাদ থেকে যথাক্রমে জন্‌ ও মার্ক লিখিত গস্‌পেল্‌ প্রকাশ করেছিল। এ থেকে, ক্ষীণতর সূত্রে হলেও, শ্রীরামপুরের কঙ্কনী নিউ টেস্টামেণ্টের প্রিয়তা অনুমানসাধ্য।

আরও কয়েকটি ভাষাঃ ১৮০৮-৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পাঞ্জাবী ও তেলুগু ভাষায় নিউ টেস্টামেণ্টের কাজ অনেকদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল বলে মনে হয়।১০২ পাঞ্জাবী ভাষায় সম্পূর্ণ বাইবেলই অনূদিত হয়েছিল। তেলুগু ভাষায় নিউ টেস্টামেণ্ট ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে, ও তার তিন বৎসর পব 'পেণ্টাটিয়ুখ্‌' ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সম্পূর্ণ বাইবেল শ্রীরামপুর থেকে তেলুগুতে প্রকাশিত হয়নিঃ তেলুগু বাইবেল রচনার ইতিহাসে শ্রীরামপুর প্রথমও নয়, গুরুত্বপূর্ণ নয়, অন্য ব্যক্তিত্ব, অন্যতর মিশনের তৎপরতায় তেলুগু বাইবেলের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারণা।

উত্তর পশ্চিম ভারতের আর কতকগুলি ক্ষুদ্র ভাষা ও উপভাষায়ও কেরী ও শ্রীরামপুরের উদ্যমে বাইবেলের অংশবিশেষের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদ পুশ্‌তু ভাষায়। এই ভাষায় শ্রীরামপুর থেকে নিউ টেস্টামেণ্ট ১৮১৮, 'পেণ্টাটিয়ুখ্‌' ১৮২৪ ও 'হিস্টরিক্যাল

বুকস্' ১৮৩২ সালে প্রকাশিত হয়। আফগানীস্থানের এই ভাষা সম্পর্কে কেরী খুব উৎসাহী ছিলেন বলে মনে হয় না, মোটামুটিভাবে এক আকস্মিক যোগাযোগের ফলেই এই ভাষায় অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি সক্রিয় হয়ে উঠে-ছিলেন। প্রাচ্যবিদ্ লীডেন ইতিপূর্বে ক্যালকাটা করেস্পণ্ডেন্স কমিটির পক্ষে পুশ্তু ভাষায় অনুবাদ শুরু করেছিলেন এক আফগান পণ্ডিতের সহায়তায়, এবং এই অনুবাদ অনেকটা অগ্রসরও হয়েছিল। এই সময় লীডেন কলকাতা ত্যাগ করবার কালে তাঁর এই সুযোগ্য আফগান পণ্ডিতটিকে কেরীকে উপহার দিয়ে যান। প্রায় সাত বছর ধরে কেরী ও আফগান মৌলভি একযোগে পরিশ্রম করে নিউ টেস্টামেণ্টের অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন।১০৩ ফার্সী হরফে মুদ্রিত এই অনুবাদের গৌরব সম্পর্কে নিশ্চিত করে কেউ কোন মন্তব্য করেননি। লীডেন কেরীকে যেমন আফগান পণ্ডিত দিয়েছিলেন, তেমনি বালুচি ভাষায় অনুবাদে তাঁর সহায়ক এক বালুচি পণ্ডিতও দিয়েছিলেন। লীডেন মার্ক লিখিত গস্পেল্ অনুবাদ সম্পন্ন করেছিলেন; আরো দুটি গস্পেলের বালুচি অনুবাদ শ্রীরামপুরে সম্পন্ন হয়; এবং বালুচিস্থানের ভাষায় তিনটি গস্পেল মাত্র প্রকাশিত হয়। এমনি কাশ্মীরি ভাষাতেও শ্রীরামপুর মিশন নিউ টেস্টামেণ্ট প্রকাশ করেন ১৮২১ সালে; ও ১৮৩২ সালে 'হিস্টরিক্যাল বুক্স্'-এর রাজাবলী ২ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। দেবনাগরীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও কাশ্মীরি সংস্করণ মুদ্রণের জন্য কাশ্মীরে প্রচলিত শারদা হরফ্ শ্রীরামপুর প্রস্তুত করেছিলেন। গাড়োয়ালী ভাষায় নিউ টেস্টামেণ্ট প্রকাশিত হয় ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে। কেরী কাশ্মীরি ও গাড়োয়ালী ভাষায় যে নিউ টেস্টামেণ্টের অনুবাদ করেন বা করান, তা দীর্ঘকাল প্রচারণার কোন সুযোগ লাভ করেনি।,তাঁর জীবৎকালে কাশ্মীরি সংস্করণ কাশ্মীরে পেঁৗছয়নি পর্যন্ত।১০৪ ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধী ভাষায় ম্যাথু লিখিত গস্পেল্ ও কুমায়ূনী ভাষায় নিউ টেস্টামেণ্টের অংশবিশেষও প্রকাশিত হয়। কুমায়ূনী ভাষায় সহায়ক পণ্ডিতের মৃত্যুতে এই ভাষার অনুবাদের কাজ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। লাহ্ন্দা বা মুলতানী ভাষায় নিউ টেস্টামেণ্টের অনুবাদও ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে প্রচারিত হয়েছিল।

১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে অসমীয় ভাষায় বাইবেল অনুবাদের সূচনা হয়। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার এই ভাষা প্রায় সর্বদিক থেকেই বাংলার মত, এমন কি হরফ পর্যন্ত। ফলে অসমীয় অনুবাদে বিশেষ কোন প্রতি-বন্ধকতা ছিল না। কিন্তু ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের অগ্নিকাণ্ডে অসমীয় পাণ্ডু-লিপি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে ১৮১৪ সালে কেরী লিখিত এক বিবৃতি

থেকে জানা যায় যে, অসমীয় ভাষায় নিউ টেস্টামেণ্টের মার্ক লিখিত গস্‌পেল্‌-এর প্রায় অর্ধেক পর্যন্ত মুদ্রিত হয়ে গেছে।১০৫ পুনরনূদিত এই সংস্করণের সংগে কেরীর সম্পর্ক প্রধানতঃ সংশোধন ও পরিমার্জনার। এবং ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সম্পূর্ণ নিউ টেস্টামেণ্ট এবং ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ওল্ড টেস্টামেণ্টের অনুবাদ অসমীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়। অসমীয় বাইবেল যে অসমীয় পণ্ডিতের সহায়তায় অনূদিত হয়েছিল, তাঁর যোগ্যতার ওপর প্রশ্ন তোলা হয়েছে,১০৬ এবং অতিরিক্ত সংস্কৃতানুগত্য, যা কেরী-নির্দেশিত বলে অনুমান করা সম্ভব, অনুবাদটিকে সফল হয়ে উঠতে দেয়নি।১০৭ আসাম প্রদেশের অন্যতম পার্বত্যভাষা খাসিতে বাইবেল অনুবাদের প্রথম গৌরবও কেরী তথা শ্রীরামপুর মিশনারীদের প্রাপ্য। একজন খাসি ভাষাভিজ্ঞের সহায়তায় ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দেই কেরী খাসিতে নিউ টেস্টামেণ্টের ম্যাথু রচিত গস্‌পেলের অনুবাদ করেছিলেন, কিন্তু ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের আগে নিউ টেস্টামেণ্টের সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ করতে পারেননি। এই অনুবাদ ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং বাংলা হরফে মুদ্রিত হয়েছিল। এইরকম বাংলা হরফে মণিপুরী ভাষাতেও শ্রীরামপুর থেকে নিউ টেস্টামেণ্ট প্রকাশিত হয ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে।

অনুবাদকের যোগ্যতা ও কেরী

অনুবাদক হিসাবে কেরীর যোগ্যতা কতখানি ছিল, কেরীর অনুবাদ আলোচনা প্রসংগে অতঃপব এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠতে পারে। এই প্রশ্ন আলোচনা করতে গেলে অনূদিত গ্রন্থের সংগে মূল গ্রন্থের তুলনামূলক আলোচনা করে দেখা আবশ্যক এবং সেই আলোচনা হবে বস্তুতঃ অনূদিত রূপের ওপরই নির্ভরশীল। কিন্তু অনুবাদকের যোগ্যতার প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে কৌতূহলও খুবই স্বাভাবিক; অর্থাৎ অনুবাদক যখন অনুবাদকর্মে নিযুক্ত হচ্ছেন, তখন তিনি অনুবাদের জন্য কতখানি প্রস্তুত—এই সমীক্ষার গুরুত্ব কোনক্রমেই উপেক্ষা করা যায় না। কেননা, অনুবাদকের যোগ্যতার ওপরই নির্ভর করে অনুবাদকর্মের ফলিত অবস্থা। তাছাড়াও অনুবাদক সম্পর্কে কতগুলি সাধারণ জিজ্ঞাসাও জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। অনুবাদক যে অনুবাদকর্মে প্রবৃত্ত হলেন, তার পেছনে তাঁর কি উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল; অনুবাদক যে অনুবাদকর্ম সম্পন্ন করলেন, সেখানে কোন ভূমিকায় তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন? এই প্রশ্নগুলি অতি সঙ্গতভাবেই উঠতে পারে, ফলে কেরীর প্রসংগেও এই প্রশ্নগুলি প্রয়োগ করা সমীচীন হবে।

অনুবাদকের যোগ্যতা সম্পর্কে অবশ্য বিচিত্র দাবী উত্থাপিত হয়, তথাপি সর্বত্রই অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে মতসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেখা যায়। এই ক্ষেত্রটি হলো ভাষাজ্ঞান সম্পর্কিত। এই ভাষাজ্ঞান আবার বিচার করা হয়ে থাকে প্রধানতঃ দুই ভাগেঃ (১) মূলের ভাষাজ্ঞান; অর্থাৎ যে ভাষা থেকে গ্রন্থ অনূদিত হচ্ছে, সেই মূল ভাষা সম্পর্কে অনুবাদকের জ্ঞান; (২) প্রযুক্ত ভাষাজ্ঞান; অর্থাৎ, যে ভাষায় মূল গ্রন্থের অনুবাদ করা হচ্ছে, সেই ভাষা সম্পর্কে অনুবাদকের জ্ঞান।

কেরী বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন মূল ভাষা থেকে, অর্থাৎ হিব্রু ও গ্রীক থেকে। গ্রীক ও হিব্রু ভাষা সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন; ছেলেবেলাতেই তিনি গ্রীক শব্দকোষ মুখস্ত করেছিলেন বলে তথ্য উপস্থিত আছে। কিন্তু গ্রীক ও হিব্রু ভাষা জানা এবং গ্রীক ও হিব্রু থেকে অনুবাদ করার মত করে সে ভাষা জানা, এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ অনেক। মোটামুটিভাবে একটি শব্দের কি অর্থ, কিংবা অভিধান মারফৎ সেই শব্দের আরো কি কি অর্থ হতে পারে, অথবা একই অর্থ একটি ভাষায় কত বিচিত্রভাবে প্রচলিত হয়ে থাকে, ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হওয়া সব সময় প্রমাণ করে না যে সেই ভাষা সম্পর্কে তিনি যথাযোগ্যভাবে অবহিত। বস্তুতঃ অনুবাদককে গৃহীত গ্রন্থের বক্তব্য সম্পর্কে অবহিত হলেই চলে না, বক্তব্যের ভিতর লোক তার সূক্ষ্ম পুঙ্খানুপুঙ্খতায় তাঁর কাছে উন্মোচিত হওয়া দরকার; তাতে যে সব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তার আক্ষরিক অর্থ জানলেই হয় না, তার ভিতর-দ্যোতনার প্রতিটি তন্ত্রে তাঁর জ্ঞান আবশ্যিক। সর্বোপরি মূল ভাষার বাক্যবিন্যাস-পদ্ধতিকে অতিক্রম করে যে বাণীভঙ্গি প্রতিষ্ঠিত, অনুবাদককে তাও উপলব্ধি করতে হয়, কেননা বাণীভঙ্গি বা স্টাইলই যে কোন রচনার প্রাণবিন্দু।

কেরী গ্রীক জানতেন, হিব্রু জানতেন। অল্পবয়েসেই ল্যাটিনে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি বহু ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন। যখন তিনি কর্মজীবনের অস্থির বিচিত্রতায় ঘুরে বেড়িয়েছেন, তখনও প্রত্যহ তিনি বাইবেল পড়তেন মূল ভাষায়। অর্থাৎ গ্রীক বা হিব্রুতে। কাজেই গ্রীক বা হিব্রু ভাষাজ্ঞান যেমন একদিকে তিনি অর্জন করেছিলেন, পড়বার অভ্যাসও তেমনি গড়ে তুলেছিলেন। এবং দীর্ঘ অভ্যাসে যে কোন ভাষার মৌলিক দিকগুলি যে সহজেই ধরা পড়ে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইংলন্ড থেকে বঙ্গদেশাভিমুখে আসবার সময় সাগরবক্ষে টমাসের কাছে বাংলা শেখার বিনিময়ে তাকে তিনি হিব্রু ও গ্রীক শিক্ষা দান করেছিলেন। পরে যখন তিনি বহুভাষিক অভিধান-এর খসড়া করেন, তখন তাতে তিনি ভারতীয়

মূল ভাষা সংস্কৃতের সঙ্গে গ্রীক ও হিব্রু শব্দের সাদৃশ্য দেখাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এইসব তথ্য পক্ষান্তরে প্রমাণ করে যে, যে ভাষা থেকে তিনি বাইবেলের অনুবাদ সম্পন্ন করেছিলেন, সেই ভাষা সম্পর্কে তিনি শুধু বহিরঙ্গ জ্ঞানেরই অধিকারী ছিলেন না; বরং সেই সব ভাষা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান গভীর ও যোগ্য হয়ে ওঠাই সম্ভবপর।

যে-ভাষা থেকে অনুবাদ করা হচ্ছে, সেই ভাষা সম্পর্কে অনুবাদকের অধিকার সম্পর্কে আলোচনার পর, যে ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে, সেই ভাষায় অনুবাদকের জ্ঞান সম্পর্কিত বিবেচনা প্রয়োজন। এই অনুবাদ ভাষা, ইংরেজিতে যাকে সচরাচর receptor language বলে, তাতে সামগ্রিক জ্ঞানার্জন অনুবাদের ক্ষেত্রে অনুবাদকের পক্ষে বোধহয় সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত। এই ভাষা সম্পর্কে অনুবাদকের সম্পূর্ণরূপে অবহিত হলেই চলে না, তাতে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠাও বিশেষ প্রয়োজনীয়। বিভিন্ন প্রচলিত ব্যাকরণাদি বা অভিধানাদি থেকে শব্দ ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা সাধ্য, কিন্তু তা দ্বারা ভাষার অভ্যন্তরীণ শক্তি আহরণ করা কতখানি সম্ভব, তা বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। সচরাচর দেখা যায় যে অনুবাদ ভাষার ভিতরশক্তি অনধিগত থাকে বলে অনুবাদ প্রায়শঃ ত্রুটিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এবং কেরী, যিনি ভারতবর্ষে যাত্রার অনতি-কাল পূর্বেও ভারতবর্ষ তথা বঙ্গদেশকে তাঁর নির্দিষ্ট কর্মস্থল বলে বিবেচনা করে দেখেন নি, যিনি ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সাগরবক্ষে টমাসের কাছে প্রথম বাংলা শিখতে শুরু করেন (টমাসের বাংলা ভাষাজ্ঞানও নির্ভুল ছিল, এমন কান প্রমাণ নেই।), যিনি ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নিউ টেস্টা-মেণ্টের সমগ্র অনুবাদ নিষ্পন্ন করেছিলেন,—তাঁর ভাষাশিক্ষা ও অনুবাদ কর্মের মধ্যে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতি সহজেই লক্ষগোচর হয়। বস্তুতঃ রামরাম বসুর কাছে ভাষাশিক্ষা গ্রহণ শুরু করা থেকেই তাঁর বাংলা ভাষায় মূল পাঠ-গ্রহণের সূচনা হয়েছিল বলে ধরা উচিত, এবং তা ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের অন্তিম দিনগুলির ঘটনা। এরপর তাঁর ভাষাশিক্ষা ও অনুবাদের কাজ দুই-ই সমান্তরাল ভাবে চলেছিল। এ থেকে স্বভাবতই মনে হতে পারে যে কেরী বঙ্গভাষায় যথাযোগ্যভাবে সমর্থ হয়ে ওঠার শর্তটিকে অনুবাদের ক্ষেত্রে মোটামুটি উপেক্ষা করেছিলেন। অথচ অনুবাদের ক্ষেত্রে বর্তমান শর্ত-পূরণ আবশ্যিক। অবশ্য একথাও পাশাপাশি সত্য যে কেরী বাংলা ভাষা সম্পর্কে যথাযোগ্য জ্ঞান অর্জনের উপযুক্ত সাহিত্য সহায়িকা পাননি। বাংলা অভিধান বা বাংলা সাহিত্যগ্রন্থ বলতে কিছুই তখন সহজপ্রাপ্য ছিল না; তার কারণঃ অধিকাংশ বাংলা।গ্রন্থই ছিল পুঁথিবদ্ধ, মুদ্রণানু-

কুলোর অভাবে সীমাবদ্ধভাবে প্রচারিত। হালহেডের বাংলা ব্যাকরণেও মাত্র কয়েকটি গ্রন্থনামের উল্লেখ পাওয়া যায়। হালহেড প্রধানতঃ রামায়ণ, মহাভারত ও বিদ্যাসুন্দর থেকে তাঁর ব্যাকরণে উদ্ধৃতিগুলি সংকলন করেছিলেন। এমন কি হালহেডের ব্যাকরণও, যা ১৭৭৮ খৃীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল এবং যার সঙ্গে কেরী পরিচিত ছিলেন, প্রধানতঃ রাজনৈতিক প্রয়োজনেই লিখিত হয়েছিল বলে তাৎক্ষণিক ব্যবহারিক প্রয়োজনের ও নির্দিষ্ট উপযোগিতার সীমাবদ্ধতাকে তা অতিক্রম করতে পারেনি। তদুপরি তাঁর ব্যাকরণে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি সাধারণ-ভাবে বাংলা পদ্য থেকেই সংকলিত। অথচ কেরীর প্রয়োজন ছিল বাংলা গদ্যের। যে-সমস্ত পত্রাদি, দলিলাদি, বা কারিকা জাতীয় পুস্তক ও ভেষজবিষয়ক পুঁথিতে বাংলা গদ্যের সংরক্ষিত নিদর্শন পরবর্তীকালের গবেষকরা উদ্ধার করেছেন, সঙ্গত কারণেই তার সঙ্গে কেরীর পরিচিত হওয়া সম্ভব ছিল না। ফলতঃ এটা মোটামুটি স্পষ্ট যে, বাংলা ভাষা, বিশেষ করে কেরীর পক্ষে প্রয়োজনীয় বাংলা গদ্য সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে জ্ঞান অর্জনের উপযুক্ত কার্যকর সুযোগ তাঁর ছিল না। ফলে এই বিষয়ে তাঁকে প্রধানতঃ নির্ভর করতে হয়েছিল প্রচলিত কথ্যভাষার ওপর। রামরাম বসু অপণ্ডিত ছিলেন না, এবং তাঁর শিক্ষায় বাংলা ভাষায় মৌলিক জ্ঞান কেরী অবশ্যই অংশতঃ অর্জন করতে পেরেছিলেন। তথাপি কথোপকথনের মধ্য দিয়ে যে কোন ভাষা সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত হয়ে ওঠা যায়, একথাও সত্য। কলকাতা থাকাকালীন তিনি বাঙালী সমাজের সঙ্গে মিশেছিলেন, লক্ষ্য করেছিলেন তাদের মধ্যে প্রচলিত ভাষাভঙ্গি; সুন্দরবনে লোকবসতি বিরল হলেও বাঙালী সমাজগোষ্ঠীর অভ্যন্তরেই নির্দিষ্ট হয়েছিল তাঁর বাস; মদনাবাটিতে নীলকুঠির কাজে দেশীয় লোকের জীবন্ত সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। ফলে জীবন্ত বাংলা ভাষার কাছাকাছি থেকে বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানকে সুনির্দিষ্ট করে তুলবার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন। এই সুযোগ তিনি উপেক্ষাও করেননি। বলা যেতে পারে, অত্যন্ত বাস্তবিকভাবে—প্রত্যক্ষ ও কার্যকরভাবে—বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাঁর শিক্ষা অগ্রসর হয়। এবং লোকমুখ থেকেই যে তিনি বাংলা বাক্যগঠন পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হচ্ছিলেন, অতঃপর এই অনুমানও সম্ভব। কেননা কবিতার বাক্যগঠন ও গদ্যের বাক্যগঠন যে কখনোই সদৃশ হতে পারে না, সাধারণ বিবেচনায় তা ধরা পড়তে বাধ্য; এবং কেরী নিজ প্রয়োজনের ভাষা সম্পর্কে যদি বিপুল বাংলা সাহিত্যের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যিক মনে না করে থাকেন, তাতে কোন অস্বাভাবিকতা নেই।

তাছাড়া, কোন ভাষা শিক্ষার জন্য অপরিহার্য সহায়ক—সেই ভাষার ব্যাকরণ, হালহেডের খানি ছাড়া প্রায় কিছুই ছিল না, বা থাকলেও দুষ্প্রাপ্য ছিল; আর হালহেডের ব্যাকরণ তাঁর প্রয়োজনের বিচারে কেরীর কতখানি সহায়ক হয়েছিল, তাও নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়।

কেরীর বাংলা শিক্ষায় রামরাম বসুর সহযোগিতার প্রসঙ্গ, খুব প্রাথমিক স্তরে সীমাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। রামরাম বসু ইতিপূর্বে টমাসের মুন্সী হিসাবে কাজ করেছেন; তাঁকে একদিকে যেমন তিনি বাংলা ভাষা শেখাতে চেষ্টা করেছেন, তেমনি অনুবাদেও সহায়তা করেছেন তাঁকে। তাঁর এই উদ্যম যতই বিচ্ছিন্ন ত্রুটিপূর্ণ হোক না কেন, বাংলা শেখানো যে কবিতায় হয় না, অনুবাদও যে তিনি গদ্যেই খসড়া করে-ছিলেন, এই বোধ ও সম্ভাবনা কখনোই বাতিল হয়ে যায় না। রামরাম বসু তাঁর লৌকিক ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাতেই এই পথে অগ্রসর হয়েছিলেন, কেরীর মুন্সী নিযুক্ত হবার সময় এই পথে পদচারণার অভিজ্ঞতা তাঁর আরও বিস্তারিত হয়ে থাকবে। ফলে, রামরাম বসুর ত্রুটিপূর্ণ ইংরেজি জ্ঞান কেরীর সঙ্গে ভাব বিনিময়ের পক্ষে প্রতিবন্ধক ছিল বলে অনুমান করে নিলেও কেরীর বাংলা ভাষা শিক্ষার পশ্চাতে রামরাম বসুর সহায়তা অযোগ্য ছিল বলে উপেক্ষা করা কঠিন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কেরী বাংলা শিখেছিলেনঃ (১) রামরাম বসুর মোটামুটি অভিজ্ঞ সহায়তায়; (২) লৌকিক সংযোগে ব্যবহারিক ভাষা নিবিষ্টভাবে লক্ষ্য করার মধ্য দিয়ে। এই প্রক্রিয়ায় একটি ভাষা সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে অবহিত হওয়া সম্ভব, কিন্তু অনুবাদের উপযুক্ত করে আয়ত্ত করা সম্ভব কিনা, সে সম্পর্কে সংশয় থাকতে পারে। যাই হোক, সব মিলে একথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে কেরীর বঙ্গভাষা শিক্ষা দৃঢ়-ভিত্তিক ছিল না; এবং অনুবাদের ভাষা সম্পর্কে শিথিল জ্ঞান তাঁর অনুবাদকর্মের যথাযোগ্যতার পক্ষে হানিকর হতে বাধ্য। অর্থাৎ অনুবাদকের পক্ষে অপরিহার্য যে শর্ত,—অনুবাদের ভাষা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান,—কেরী তা সন্তোষজনকভাবে পূরণ করতে পারেননি।

কেননা, নিজের প্রয়োজনের ভাষা কেরীকে নিজেরই তৈরী করে নিতে হয়েছিল। কাজেই অনুবাদকের যোগ্যতা বিচার প্রসঙ্গে অনুবাদের ভাষা সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান কেরীর কাছে পুরোপুরিভাবে দাবী করা সম্ভবতঃ সমীচীন হবে না। বস্তুতঃ যে-ভাষায় তিনি অনুবাদ করেছিলেন, সেই গদ্যভাষা তখন পর্যন্ত বাংলায় সাহিত্যিক অস্তিত্ব অর্জন করতে পারেনি।

সেই অপটু ভাষা মাধ্যমে কেরী যা করেছিলেন, তার মূল্যও অপরিসীম। অনুবাদকরা পরোক্ষভাবে অনুবাদের ভাষাকে গতিদান করেন, তার সাহিত্যিক অস্তিত্ব নির্দিষ্ট করে দেন, বিশেষতঃ যে-সব ভাষা অপরিণত ও অস্ফুট, সেই ভাষাকে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে ভাবে ও ভাষায় সমর্থ করে তুলতে কৃত্তিবাস, মালাধর গোষ্ঠীর যুগান্তকারী ভূমিকা বাংলা সাহিত্যেরই অন্তর্গত দৃষ্টান্ত। সেই মহৎ অনুবাদগোষ্ঠীর ভূমিকার আলোকে কেরীকে দেখলে খুব ভুল হবে না। তাঁদের সঙ্গে কেরীর যা প্রভেদ, তা এই যে, কৃত্তিবাস-মালাধর বঙ্গভাষাভাষী ছিলেন, আর কেরী ছিলেন বিদেশী। এবং তিনি যে বাঙালী নন, এ সম্পর্কে কেরীর সচেতনতা কখনোই কুণ্ঠিত ছিল না। লুথারের মতো আকর্ষণীয়ভাবে দেশীয় অনুবাদকরা কবে বাইবেল অনুবাদ করবেন, তার জন্য তিনি বিশেষ উৎকণ্ঠিত ছিলেন।

তাঁর এই বৈদেশিকতা কেরীর অনুবাদকর্মের একটি নিয়ামক শক্তি হিসাবে ক্রিয়াশীল ছিল। তিনি গ্রীক বা হিব্রু থেকে অনুবাদ করেছিলেন বাংলায়। মূলভাষা ও অনুবাদ-ভাষা দুই-ই ছিল তাঁর কাছে অর্জিত ভাষা। কোনটাই তাঁর মাতৃভাষা নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে এই অবস্থা একটু বিভ্রান্তিকর। যে ভাষা থেকে অনুবাদ করা হচ্ছে ও যে ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে—এই দুই ভাষার মধ্যবর্তী স্থলে অনুবাদকের অবস্থান, ফলে এই দুই ভাষার সঙ্গেই অনুবাদকের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে গড়ে ওঠে, কেননা এই সূত্রের ওপরই অনুবাদের যথাযোগ্যতা নির্ভরশীল। এই দুই ভাষার সঙ্গে অনুবাদকের সম্পর্ক মোটামুটি তিনদিক থেকে লক্ষ্য করা যেতে পারেঃ যেখানে (১) অনুবাদক মাতৃভাষা থেকে কোন অর্জিত ভাষায় অনুবাদ করেন; (২) অনুবাদক কোন অর্জিত ভাষা থেকে মাতৃভাষায় অনুবাদ করেন; এবং (৩) অনুবাদক কোন অর্জিত ভাষা থেকে অপর কোন অর্জিত ভাষায় অনুবাদ করেন। এই তিন ভাগের মধ্যে সচরাচর দ্বিতীয় ভাগটিই বিশেষ সার্থকতা অর্জন করে অনুবাদের ক্ষেত্রে। প্রথম পন্থাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে মিশনারীরা গ্রহণ করেছেন। অনুন্নত বিদেশে অনেক মিশনারীই ইংরেজি বাইবেল থেকেই সেই দেশের ভাষায় অনুবাদ নিষ্পন্ন করেছেন, এবং সেই ক্ষেত্রে অনুবাদ-উৎকর্ষ যাই হোক না কেন, অন্ততঃ সেই দেশের ভাষার শক্তিবিকাশে বা সেই দেশের ভাষার সমর্থরূপ গঠনে যে তাঁরা পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তৃতীয় পথটিতেও অনুবাদকদের একটি বড় অংশ বিশেষ উৎসাহ ও পক্ষপাত দেখিয়েছেন। কিন্তু এই তৃতীয় ধারার

অনুবাদ ফলশ্রুতিতে অনেক সময়েই সন্তোষজনক হয় না। প্রথম দুই পথে অনুবাদকের মাতৃভাষা দুই ভাষার মধ্যে একটি ভাষা হওয়াতে অনুবাদকের মাতৃভাষার স্বতন্ত্র কোন ভূমিকা নির্দিষ্ট হয় না, অনুবাদ ক্রিয়ায় অনুবাদকের মাতৃভাষা একটি প্রত্যক্ষ পক্ষই হয়ে ওঠে। কিন্তু তৃতীয় ক্ষেত্রে, অনুবাদকের মাতৃভাষার একটি পরোক্ষ তৃতীয় ভূমিকা সংগোপনে আত্মরক্ষা করে। এই ক্ষেত্রের অনুবাদে তিন ভাষার সূত্র কার্যকর হয়, এবং সেখানে মূল ভাষা ও অনুবাদ ভাষার মধ্যস্থতা করে অনুবাদকের মাতৃভাষা। কেরী বাইবেল অনুবাদে এই তৃতীয় পন্থা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এক অর্জিত ভাষা থেকে আরেক অর্জিত ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন এবং তাঁর মাতৃভাষা ছিল ইংরেজি। এক্ষেত্রে কেরীর অনুবাদে মধ্যস্থ ভাষা হিসাবে ইংরেজির সক্রিয়তার কথা উপেক্ষা করা যায় না। বাংলা গদ্যের কোন ঐতিহ্য ছিল না, কেরীকে প্রয়োজনের জন্য বাংলা গদ্য প্রচুর পরিশ্রমে তৈরী করে নিতে হয়েছিল, এই তথ্য মেনে নিয়েও তাঁর অনুবাদের ভাষা সম্পর্কে আলোচনায় ইংরেজি বাক্যন্যাসের প্রভাব সমালোচকরা উৎসাহের সঙ্গেই লক্ষ্য করেছেন। ইংরেজি অন্বয়সূত্র বাংলা রচনায় ব্যবহার করবার ফলে কেরীর অনুবাদ ভাষা যে যথাযোগ্য হতে পারেনি, সে কথা অস্বীকার করবার কোন দরকার নেই। কিন্তু এই প্রমাদ ঘটবার পিছনে অনেক কারণ থাকলেও, প্রধান কারণ যে তাঁর অনুবাদকের ভূমিকাটি, তাতে সন্দেহ নেই। অনুবাদে তৃতীয় পথ গ্রহণ করবার ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মাতৃভাষা ইংরেজির মধ্যস্থতা অন্তরালে অনুবাদককে ও তাঁর অনুবাদকে প্রভাবিত করে গেছে।

তথাপি মূলভাষা ও অনুবাদের ভাষা সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞান সন্তোষজনক হলেই যে অনুবাদকের যোগ্যতা প্রমাণিত হয়ে গেল, একথা মনে করবার কোন কারণ নেই। অনুবাদের ফলশ্রুতিই অনুবাদকের যোগ্যতা নির্ধারক অবশ্য; আবার অনুবাদকের যোগ্যতার ওপরই যে যোগ্য অনুবাদ নির্ভরশীল, সে কথাও সত্য। সেই জন্য ভাষাজ্ঞান ছাড়াও অনুবাদকের যোগ্যতার পরিমাপক অন্যতর অনেক উপাদানের তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব; তার মধ্যে অন্ততঃ একটির প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা সমীচীন হবে। এই উপাদানটি অনুবাদকের সাহিত্যিক অভিব্যক্তির ওপর অধিকার বিষয়ক। কোন অনুবাদকের সাহিত্যিক অভিব্যক্তির ক্ষমতা কতখানি, তা বিচার করে দেখা সহজসাধ্য নয়; তাঁর অনুবাদ কর্মের বিচার ছাড়া এই বিষয়ে অনুবাদক সম্পর্কে কোন মন্তব্য করাও তাই অনুচিত। কাজেই কেরীর কলম কতখানি সাহিত্যিক ছিল, তা অনুসন্ধান করতে হলে তাঁর

অনুবাদকে অনুসরণ করে পরীক্ষা করে দেখা বাঞ্ছনীয়। সাহিত্যিক অভিব্যক্তি সম্পর্কে অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বাণীভঙ্গি বা স্টাইলই সম্ভবতঃ প্রধান প্রসঙ্গ হয়ে ওঠে, তথাপি উচ্চারণ সচেতনতাও যে সমানুপাতিক গুরুত্ব অর্জন করে, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কেরীর অনুবাদে এই-রকম উচ্চারণ সচেতনতার কোন পরিচয় আছে কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। এখানে কেরীর ১৮১১ খৃষ্টাব্দের নিউ টেস্টামেন্ট সংস্করণের 'মঙ্গল সমাচার মাতিউ রচিত' থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত অংশ নির্বাচিত করা হলো। ইংরেজি Authorised version-এর সূত্রেই এই পর্যবেক্ষণ চালিত হয়েছে। (১) প্রথম পর্বের ১ থেকে ১৭ সংখ্যক পংক্তি স্বতন্ত্র সতেরটি অনুচ্ছেদে বক্ষ্যমাণ হয়েছে। কেরী সেখানে মাত্র তিনটি অনুচ্ছেদে সতের পংক্তির অনুবাদ করেছেন। পুরুষানুক্রমিক যে পরিচয় ২ সংখ্যক পংক্তি থেকে ১৬ সংখ্যক পংক্তিতে বিধৃত হয়েছে,—অর্থাৎ Authorised version-এ যেখানে প্রায় প্রতিটি পংক্তির জন্য স্বতন্ত্র একটি করে অনুচ্ছেদ নির্দেশ করা হয়েছে,—কেরী তা মানলেন না। তিনি পংক্তি অনুযায়ী সংখ্যা নির্দেশ করেছেন ঠিকই, কিন্তু পুরুষানু-ক্রমিক পরিচয় পর্যায়কে বিষয়ভাবের দিক থেকে মোটামুটিভাবে সমগোত্রজ বিবেচনায় ২ থেকে ১৬ সংখ্যক পংক্তি পর্যন্ত একটি মাত্র অনুচ্ছেদে সংশ্লিষ্ট করেছেন। ১৭ সংখ্যক পংক্তিতে,—যেখানে প্রধানতঃ কাল নির্দেশের মাধ্যমে এই ক্রমিক বংশ পরিচয়ের সার সংকলন করা হয়েছে, সেই অংশটি যেহেতু পূর্ববর্তী পনেরোটি পংক্তির সার সমীক্ষা, সেই জন্য কেরী ১৭ সংখ্যক পংক্তিটির অনুবাদ স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদের অন্তর্গত হবার উপযুক্ত বিষয় বলে বিবেচনা করেছেন: ফলে ১৭ সংখ্যক পংক্তি কেরীর অনুবাদে কার্যতঃ তৃতীয় অনুচ্ছেদ হিসাবে বিন্যস্ত হয়েছে। আবার ১ সংখ্যক পংক্তিটি যেহেতু পরিচ্ছেদের মূল বিষয় নির্দেশক, অর্থাৎ অনেকটা সূচনার মত, তাই কেরী সেই প্রথম পংক্তিকেও স্বতন্ত্র ভাব-বিষয় অনুযায়ী ইতিপূর্বেই স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদে স্থাপন করেছেন। বক্তব্য বিষয় অনুযায়ী অনুচ্ছেদ প্রকরণ প্রস্তুত করবার এই দৃষ্টান্তটি বিশেষরূপেই উল্লেখযোগ্য, কেননা তা পক্ষান্তরে কেরীর উচ্চারণ সচেতন-তারই পরিপোষক। (২) তৃতীয় পর্বের ১ ও ২ সংখ্যক অনুচ্ছেদ বিভাগে কেরীর অনুবাদ স্থাপিত হয়নি। Authorised version-এর এই দুটি অনুচ্ছেদে যে দুটি পংক্তি, কেরীর অনুবাদে সেই পংক্তি সংখ্যা নির্দেশের প্রথানুসরণ অবশ্যই লক্ষণীয়, কিন্তু একটি অনুচ্ছেদে সমর্পিত। কিন্তু ইংরেজির ১ সংখ্যক বাক্য বাংলায় ২ সংখ্যক বাক্যে, ও ইংরেজি ২ সংখ্যক

বাক্য বাংলা ১ সংখ্যক বাক্যে ধারণ করা হয়েছে। বাংলা বাক্যগঠন পদ্ধতির সঙ্গে এই বিপর্যয় বিশেষভাবে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পেরেছে। এই বিপর্যয় সাধন ও অনুচ্ছেদ চিন্তা যে কেরীর উচ্চারণ সচেতনতারই ফসল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। (৩) অষ্টাবিংশ পর্বের ১৯ ও ২০ সংখ্যক পংক্তি-অনুচ্ছেদ অনুসারে, কেরীর অনুবাদেও ১৯ ও ২০ সংখ্যক পংক্তি নির্দেশ আছে, কিন্তু ১৯ সংখ্যক পংক্তি অসম্পূর্ণ বাক্যের উদাহরণ। ১৯ ও ২০ সংখ্যক পংক্তি একসঙ্গে কেরীর অনুবাদে একটি পূর্ণবাক্যরূপে প্রতীত হয়েছে। অথচ Authorised version-এ দু'টি পংক্তি দুই পৃথক বাক্য হিসেবেই লক্ষ্য করা যায়। কেরী যে তাকে এক বাক্যে অন্বিত করতে পেরেছেন, তা বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ। একে তাঁর স্বাধীন অধিকারের দৃষ্টান্ত তথা উচ্চারণ ক্ষেত্রে সচেতনতার উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করা চলে।

উচ্চারণ সচেতনতার পরিচয় অবশ্যই খুব উল্লেখযোগ্য ও প্রসঙ্গ হিসাবেও তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কোন কোন অনুবাদক আছেন, যাঁরা সাধারণভাবে অনুবাদকের যোগ্যতার অধিকারী, এবং তাঁদের অনুবাদে প্রমাদের অংশ কম। তাঁরা দুই ভাষায় জ্ঞান অর্জন করেন, শব্দ সংযোজনা, চলতি প্রবাদ প্রবচন ও ব্যবহারাদি (usages) প্রয়োগ বা বাক্যাংশের অন্বয় প্রতিষ্ঠায় পরিশ্রমী ভূমিকা গ্রহণ করেন, উচ্চারণের ক্ষেত্রেও কখনো কখনো যথেষ্ট মনস্কতার পরিচয় দেন, তথাপি সমস্ত রচনার মধ্যে সেই শক্তি বিচ্ছুরিত হয় না, যা পাঠককে মগ্ন ও নিবিষ্ট করে তুলতে পারে, অর্থাৎ রচনা অনুবাদকের স্বকীয় বিশিষ্টতার প্রসাধিত গৌরব লাভ করতে পারে না। এই অনধিকার বা অক্ষমতা অনুবাদের সৃষ্টি-সফলতার পক্ষে প্রতিবন্ধকস্বরূপ, অথচ এই শ্রেণীর অনুবাদ সংখ্যাতীত ও বহুল পরিমাণে গৃহীত। প্রধানতঃ মিশনারীদের ক্ষেত্রে এই প্রমাদ লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। তথাপি তাঁরা যে যোগ্যতার পরিমাপের ক্ষেত্রে সমালোচকের মৃদু ভর্ৎসনা লাভ করেন ও সোচ্চার তিরস্কারে সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে যান না, তার কারণ দ্বিবিধঃ (১) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা কোন অপটু ভাষাকে অনুবাদের মাধ্যমে ব্যবহারযোগ্য করে তোলেন, অর্থাৎ সেই ভাষার গড়ে ওঠার ইতিহাসে প্রবর্তকের গরীয়ান ভূমিকায় নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেন; (২) অনুবাদকের উদ্দেশ্যঃ অর্থাৎ অনেক সময়েই অনুবাদকরা কোন মানবিক কারণে আন্তরিকতার সঙ্গে উদ্দেশ্যমূলক হয়ে ওঠেন ও অনুবাদ করেন। তাঁদের এই উদ্দেশ্যের মুখ্য প্রেরণা হলো মানবসমাজকে কোন মহৎ বক্তব্য সম্পর্কে অবহিত করানো বা আলোকিত উচ্চারণ শোনানো; এবং বাইবেল অনুবাদকদের মধ্যে যে এই উদ্দেশ্য বিশেষ ক্রিয়াশীল ছিল, তাতে কোন

সন্দেহ নেই। কোন রকমের উদ্দেশ্যমূলকতা মৌলিক সাহিত্যরচনার পক্ষে হানিকর হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের অন্যতম আঙ্গিক হিসাবে অনুবাদ আঙ্গিকের পরিকল্পনার সঙ্গেই কোন না কোন রকমের উদ্দেশ্য জড়িত হয়ে আছে। মালাধর বসুও যে ভাগবত অনুবাদ করেছিলেন, তার কারণ, লৌকিকের জন্যে সংস্কৃত থেকে লৌকিক মতে ভাগবতের মহান বক্তব্য-বস্তুর পুনঃ সম্প্রচারণা চেয়েছিলেন তিনি। এই উদ্দেশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, মহৎ প্রেরণার মত; এবং অনুবাদকের যোগ্যতা নির্ধারক একটি উপাদান রূপে, অন্ততঃ ধর্মশাস্ত্র অনুবাদের ক্ষেত্রে, এই মহৎ বা দৈব প্রেরণা-শক্তিকে সম্ভবতঃ উপেক্ষা করা যায় না। তবে অনুবাদের ক্ষেত্রে অনু-প্রেরণাবাদের প্রসঙ্গ সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই মতবিভেদ থাকতে পারে: কিন্তু এই তথ্য তো বাতিল হয়ে যায় না যে, পৃথিবীর যে কোন ভাষাতেই অনুবাদ করা হোক না কেন, সেই সব ভাষার বাইবেল অনুবাদকরা প্রায়শঃই বাইবেল সোসাইটির কাছে এহেন অভিমত প্রকাশ করে থাকেন যে তাঁরা Authorised version-কে দৈব প্রেরণা সঞ্জাত বলে মনে করেন। জেরোম, উইক্লিফ, লুথার বা টিণ্ডেলের মতো অনুবাদকদের মনোভঙ্গি বিশ্লেষণ করলেও অনুবাদে দৈব প্রেরণার উপাদান সম্পর্কে অনায়াস সমর্থন উচ্চারিত হয়েছে দেখা যাবে। প্রকৃতপক্ষে, বাইবেল অনুবাদের ক্ষেত্রে এই উপাদানটি অনুবাদকের যোগ্যতার পক্ষে অপরিহার্য বলেই বিবেচিত হয়। এবং উইলিয়ম কেরী যখন বাংলায় বাইবেল অনুবাদের মতো ব্যাপক ও মহান কাজে নিবিষ্ট হন, তখন অনুবাদকের যোগ্যতা তাঁর আছে কিনা, তার তাত্ত্বিক বিচারে কালক্ষেপ করবার সময় তিনি পাননি, তিনি অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন ভিতর প্রেরণায়। তাঁর বাংলা ভাষা-শিক্ষা সমর্থ হয়ে ওঠবার আগেই তিনি অনুবাদের ক্ষেত্রে কর্মিষ্ঠ, এবং এই দ্রুতি পক্ষান্তরে তাঁর ভিতর প্রেরণার ক্রিয়াশীলতার সমর্থক। প্রেরণার মতো অনিবার্যভাবে সক্ষম হয়ে ওঠেনি তাঁর অনুবাদ, কিন্তু তাঁর ভিতর প্রেরণার সততা সম্পর্কে সম্ভবতঃ কোন প্রশ্ন উঠবে না। তাছাড়া কেরীর অনুবাদের ভ্রান্তিমূলক দিকগুলির কথা যতই ঘোষণা করা হোক না কেন, সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজি বাইবেল অনুবাদকদের মত তিনি যে প্রচুরভাবে আহরণ করেছিলেন, অনুবাদের ভাষার প্রচ্ছ বাড়িয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেরীর অনুবাদের বিশুদ্ধতা সম্পর্কেও হয়তো সংশয় থাকতে পারে, কিন্তু তিনি বাংলা ভাষাসাহিত্যে নূতন বিষয় সংযোজন করেছিলেন, এবং তার গৌরবও অপরিমেয়।

অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রধানতঃ দুই ভাষার কার্যকর ভূমিকা প্রত্যক্ষ করা যায়ঃ (ক) মূল ভাষা; অর্থাৎ যে ভাষায় লিখিত গ্রন্থকে অনুবাদ করা হচ্ছে; এখানে নিউ টেস্টামেণ্টের ক্ষেত্রে মূল ভাষা গ্রীক ও ওল্ড টেস্টামেণ্টের ক্ষেত্রে মূল ভাষা হিব্রু; (খ) অনুবাদ ভাষা; অর্থাৎ যে ভাষায় গ্রন্থ অনূদিত হচ্ছে; এখানে তা হলো প্রধানতঃ বাংলা বা অন্য যে-কোন ভারতীয় ভাষা। আমরা বর্তমানে বাইবেলের বাংলা অনুবাদ বিষয়েই বিশেষতঃ সম্পর্কিত বলে অনুবাদ ভাষা অর্থে বাংলাকেই নির্দিষ্ট বিবেচনায় গ্রহণ করা হয়েছে।

কিন্তু মূল ভাষা ও অনুবাদ ভাষা স্বতন্ত্র দুই ভাষা বলে দুয়ের মধ্যে অবিকল অনুরূপতা সম্ভবতঃ কখনোই প্রত্যাশা করা চলে না। এমন কি আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাসমূহের পিতৃ-উৎস সংস্কৃত হলেও, বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে কতকগুলি নিশ্চিত পৃথগত্ব লক্ষ্য করা যায়। ভৌগোলিক ও সামাজিক সাধারণ ঐক্যের মধ্যেও ভারতবর্ষে যে বিচিত্র বিচ্ছিন্নতা আছে, তা শুধু ভাষাপদ্ধতির বিভিন্নতাই গড়ে তোলে নি, এমনকি লিপিচিত্রের মধ্যেও তার মুদ্রণ প্রায় প্রকাশ্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে অভারতীয় ভাষার সঙ্গে বাংলার ব্যবধান কতখানি হতে পারে, তা সহজেই অনুমানসাধ্য। বস্তুতঃ অনুবাদের প্রসঙ্গে ভাষা ব্যবধানের প্রশ্নটিকে কখনো উপেক্ষা করা চলে না। এই ব্যবধান ভাষাতাত্ত্বিক ব্যবধান ও সাংস্কৃতিক ব্যবধান—এই দুই দিক থেকেই গড়ে ওঠে বলে, অনুবাদের ক্ষেত্রে এই ব্যবধানের গুরুতর প্রভাব প্রায় আবশ্যিকভাবেই স্বীকার করে নিতে হয়।

এবং বোধহয় এই জন্যেই, কোন অনুবাদই কখনো অভ্রান্ত হতে পারে না। অনূদিত অংশ মূল অংশের অতি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে অবশ্য, বা কখনো কোন অসতর্কমুহূর্তে অনুবাদকে হয়তো সার্থক বলেও উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু এই সার্থকতা ততখানি, অনুবাদের পক্ষে যতখানি সার্থক হওয়া সম্ভব। অনুবাদ মূলানুগ হতে পারে, কিন্তু অনুবাদ কখনোই মূল হয়ে উঠতে পারে না; অনুবাদ ভাষায় মূলভাষার শব্দের সাদৃশ্য ব্যবহার করা যায়, মূলভাষায় শব্দযোজনা বা বাক্ বিন্যাস যেভাবে করা হয়েছে, তাকে অনুবাদে ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করা সাধ্য, মূলভাষার অর্থকে প্রত্যায়িত করাও অসম্ভব নয়, তথাপি সমস্তটাই অনুসরণের পর্যায়ে থেকে যায়, অনুবাদের ভাষার নিজস্ব পদ্ধতি ও পরিপ্রেক্ষিতটি স্বতন্ত্র বলে অনুবাদ অনুবাদমাত্রতাকে অতিক্রম করতে পারে না। আর রসেটি যে যেকোন

অনুবাদের মধ্যে অনুবাদের বিষয় সম্পর্কে অনুবাদকের মনোভাবের প্রায় অবশ্যম্ভাবী প্রতিফলন আছে বলে মনে করেছিলেন, সেই কথাটি প্রসঙ্গত মনে আসে। ফলে, কোন অনুবাদই অবিকল নয়, যেমন কোন সাহিত্য অবিকল জীবন নয়।

এবং অনুবাদ সাহিত্যেরই এক বিশিষ্ট আঙ্গিকমাত্র! যে কোন সাহিত্য-রূপের মতই এ এক ধরনের শিল্পসৃষ্টি। শিল্পের জীবন যেমন দ্বিতীয় জীবন বা কৃত্রিম জীবন, অনুবাদও তেমনি মূলের দ্বিতীয় রূপ বা কৃত্রিম-রূপ। আর যে কোন সৃষ্টিরই যেমন প্রকাশের পর্যায় বা ধারাক্রম আছে, যাকে অন্য কথায় বলা হয়ে থাকে শিল্পসৃষ্টির প্রক্রিয়া, অনুবাদের ক্ষেত্রেও তার যথাযথতা নিরূপিত, অর্থাৎ নিশ্চিত কতগুলি পর্যায় ক্রমশঃ অতিক্রম করে কোন অনুবাদ তার সার্থক ও নির্দিষ্ট রূপ লাভ করতে পারে। এবং শিল্পী ভেদে যেমন শিল্পসৃষ্টির রূপভেদ ঘটে, অনুবাদক ভেদে তেমনি অনুবাদেরও রূপভেদ ঘটে। এই প্রভেদসূত্রেই সচরাচর কোন অনুবাদকে বলা হয় আক্ষরিক অনুবাদ, কোন অনুবাদকে বলা হয় স্বাধীন অনুবাদ।

কিন্তু আক্ষরিক অনুবাদ বা স্বাধীন অনুবাদ বললে বস্তুতঃ কোন নির্দিষ্টতা প্রতীত হয় না। এই অভিধাগুলি সাধারণতঃ অত্যন্ত শিথিলভাবে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। যে যে উপাদানের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি এক অনুবাদকে অন্য অনুবাদ থেকে স্বতন্ত্র করে তোলে, সেগুলি যেহেতু সৃষ্টিক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সেই জন্য বিশেষ মনোযোগ সহকারে তা লক্ষ্য করা উচিত, এবং অতি মোটা কলমে তার গোত্র নির্ণয় করতে গেলে কোন না কোন রকমের ভুল হতে বাধ্য। সুতরাং কোন অনুবাদ ঠিক কি ধরনের অনুবাদ, সে সম্পর্কে, নিশ্চিত হতে হলে অনুবাদ-প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই তা নির্ণয় করা সমীচীন। প্রধানতঃ তিনটি পৃথক পর্যায়-ভেদে এই প্রক্রিয়াটিকে লক্ষ্য করা যেতে পারে। এই তিনটি পর্যায়ভেদ এইরকমঃ (১) আক্ষরিক; (২) অর্থগত; (৩) সাহিত্যিক। আক্ষরিক পর্যায়কে আবার প্রাথমিক পর্যায়, অর্থগত পর্যায়কে মাধ্যমিক পর্যায়, ও সাহিত্যিক পর্যায়কে পরিণাম পর্যায় বললে সম্ভবতঃ বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়।

এই পদ্ধতিতে গৃহীত প্রথম পর্যায়, যাকে বলা যেতে পারে অনুবাদে গৃহীত আক্ষরিক পদ্ধতি, তাকে শব্দানুবাদ বললে সম্ভবতঃ বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট হয়। মূল রচনার প্রতিটি শব্দের সদৃশ শব্দে রূপান্তরই এর প্রধান লক্ষণ। এই পদ্ধতিটি গ্রহণ করা হলে কোন অনুবাদই কখনো যথাযোগ্য হয়ে ওঠে না; কেননা বিভিন্ন ভাষাপদ্ধতির মধ্যে প্রকরণগত বিচ্ছিন্নতা প্রায়ই উপস্থিত থাকে, এবং অনুবাদ-ভাষার প্রকরণ-পদ্ধতি এই

ধরনের অনুবাদের ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয় বলে তার কোন গ্রাহ্য রূপ গড়ে উঠতে পারে না। ইংরেজিতে 'I am going'-এর শব্দানুবাদ হবেঃ আমি হই যাইতেছি। কিন্তু বাংলা বাক্য গঠনপদ্ধতিতে এই রূপ গ্রহণযোগ্য নয়: 'হই' সেখানে অবান্তর যোজনা। ফলে এহেন অনুবাদ অগ্রাহ্য হতে বাধ্য। যেহেতু যেকোন রচনার যোগ্যতা তার সঞ্চারণ শক্তির উপরই নির্ভরশীল, সেই জন্য অনুবাদের ভাষা সর্বত্রই নিজস্ব প্রকরণ ও পদ্ধতির অনুসরণ করবে,—এটা প্রায় বাধ্যতামূলক হয়ে ওঠে। অবশ্য একথাও সত্য যে শব্দানুবাদই সবচেয়ে মূলানুগ: এতখানি মূলের সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও এই অনুবাদ-পদ্ধতি প্রায় কেউই নিরঙ্কুশভাবে চর্চা করেননি, কেননা শব্দানুবাদকে বা তথাকথিত আক্ষরিক অনুবাদকে কখনোই যথার্থ বলা সম্ভব নয়। তথাপি আক্ষরিক অনুবাদের প্রতি মধ্যযুগে যে বিশেষ আনুগত্য ছিল, ইতিহাসে তার সমর্থন আছে। কিন্তু প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই তার ফল শোচনীয় হয়েছে।১০৮ এই ধরনের অনুবাদে অনুবাদ-ভাষার ধর্ম ও পদ্ধতি অনুযায়ী বাক্যগঠন, শব্দযোজনা, নিরুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে অনুবাদকরা কোন রকমের দায়িত্বই পালন করেন না। কিন্তু এই অনুবাদের একটি গুরুতর ভূমিকাও আছে। অনুবাদকে অনুবাদ-ভাষার ধর্মে সমর্পিত করবার আগে ব্যাকরণগত ও আভিধানিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয় অংশগুলি এই অনুবাদ থেকেই নির্দিষ্ট করে নেওয়া যায়। ফলে এই ধরনের অনুবাদকে অন্যভাবে হয়তো প্রাথমিক অনুবাদ বা খসড়া অনুবাদ বললে অন্যায় হয় না। যে কোন মূলানুসারী অনুবাদের ক্ষেত্রেই খসড়া পর্যায়ের অনুবাদের এই স্তরটি নেপথ্যে বর্তমান থাকে।

পরবর্তী পর্যায়ে অনুবাদক এই প্রাথমিক স্তরের পুনর্বিন্যাস করে থাকেন। এই বিন্যাস অনুবাদের ভাষার দাবী অনুযায়ীই সম্পন্ন হয়। মূলভাষার গঠনপদ্ধতির সঙ্গে অনুবাদভাষার গঠনপদ্ধতির স্বাভাবিক অসাম্য থাকে বলেই প্রাথমিক স্তরের অনুবাদে অনুবাদ-ভাষা সম্পর্কিত চিন্তার কোন অবকাশ থাকে না; এই দ্বিতীয় স্তরে অনুবাদ-ভাষা বিষয়ক চিন্তা অনুবাদকের মনোযোগের প্রধান অংশ হয়ে ওঠে, অনুবাদ-ভাষার সাধারণ পদ্ধতি অনুসরণ করে এই স্তরে অনুবাদক প্রথম স্তরের অসংলগ্নতাকে সংলগ্ন ও অর্থবহ করে তুলতে চেষ্টা করেন। অনুবাদের সঞ্চারণশক্তি এর ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য পাশাপাশি একথাও সত্য যে, অনুবাদক এই স্তরে নিছক ব্যাকরণগত ও আভিধানিক সংস্কারেই প্রধানতঃ নিবিষ্ট থাকেন বলে, যথাযথ অনুবাদের পক্ষে অপরিহার্য অন্যতর শর্তসমূহ প্রায়শঃ উপেক্ষিত হয়। এখানে 'I am going'-এর 'আমি যাইতেছি'-তে শুদ্ধ

প্রকরণ-সম্মত রূপান্তর সাধনই অনুবাদকের কাজ, অর্থাৎ অনুবাদ-ভাষার অনুশাসনে ন্যূনতম পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থ-গ্রাহ্য রূপটি প্রতিশ্রুত করা। এই ধরনের অনুবাদকে আমরা অর্থানুবাদ বলতে পারি। এই অর্থানুবাদের স্তরটিকে প্রকল্পিত বা hypothetical বলাও সম্ভব। তবে একথা তো অবশ্যই ঠিক যে, যেসব অনুবাদ প্রকাশিত হয়, তা সমর্থ ও সাহিত্যিক ভিত্তির ওপরই সচরাচর প্রতিষ্ঠিত; শব্দ-অনুবাদ বা অর্থ-অনুবাদ প্রায়শঃই নেপথ্য প্রক্রিয়া মাত্র, অভিব্যক্তিকে পরিণাম-রূপে প্রতিষ্ঠিত করবার লক্ষ্যেই তা নিবেদিত।

অনুবাদের এই যে পরিণত রূপ বা সাহিত্যিক রূপ, অনুবাদ প্রক্রিয়ায় এইটিই তৃতীয় বা চূড়ান্ত স্তর। এই স্তরের অনুবাদ কর্ম দ্বিতীয় স্তরের অর্থ সংস্কারের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে না; এখানে অনুবাদ-কর্ম অনুবাদকের মনোভাবের ওপর প্রধানতঃ নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। এই নির্ভরতা এক ধরনের স্বাধীনতা হয়তো; কিন্তু এই স্বাধীনতা যে অনুবাদকের ওপর এসে বর্তায়, তার কারণ অনুবাদের সক্ষমতা ও যথার্থতা প্রতিষ্ঠার জন্যে অনুবাদকের বিবেচনার একটি ভূমিকা থাকা দরকার। ফলে অনুবাদকের স্বাধীনতা মানে অনুবাদকের বিবেচনা, আর অনুবাদকের ভূমিকার অর্থ অনুবাদকের বিবেচনার ভূমিকা। অনুবাদকের এই বিবেচনা গড়ে ওঠে সতর্কতার অনুশাসনেঃ অনুবাদ-ভাষার রূপ ও রীতি সম্পর্কে সতর্কতা তো বটেই, যে দেশজ পরিপ্রেক্ষিত অনুবাদ-ভাষার ভিত্তি-ভূমি, সেই পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কেও সতর্কতা ও সচেতনতা। অনুবাদকের এই ভূমিকাটিকে যে মুহূর্তে স্বীকার করে নেওয়া হয়, তখন থেকে, অর্থাৎ এই সাহিত্যিক স্তরে, অনুবাদের আর কোন নিশ্চিত ঋজু রূপ প্রত্যাশিত থাকে না। একই গ্রন্থ বিভিন্ন অনুবাদক বিভিন্নভাবে অনুবাদ করতে পারেন, আবার একই অনুবাদক একটি গ্রন্থ অনুবাদে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্কার করতে পারেন। বাংলায় অনেকেই বাইবেল অনুবাদ করেছেন, তা থেকে নির্বাচিত কতগুলি অনুবাদ অবলম্বনে এই ধরনের একটি সমীক্ষা চালিত হতে পারে; কিন্তু এখানে কেরীই আমাদের বিষয়; ফলে, কেরীর অনুবাদের বিচিত্র সংস্কারের দিকেই এখানে লক্ষ্য করা হয়েছে।

দৃষ্টান্তঃ ১

লূক ৬ঃ ২০-২১

প্রথম সংস্করণ ১৮০১

তখন তিনি তাহার শিষ্যের দিগে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন ধন্য দারিদ্র একারণ ভগবানের রাজ্য তোমারদের। ধন্য এখানকার ক্ষুধিৎ একারণ তোমরা তৃপ্তি হইবা। ধন্য রোদক একারণ তোমরা হাসিবা।

১৮০৬ সংস্করণঃ

তখন তিনি আপন শিষ্যেরদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন হে দরিদ্রেরা তোমরা ধন্য কেননা ঈশ্বরের রাজ্য তোমারদের। হে ইদানীন্তন ক্ষুধিতেরা তোমরা ধন্য কেননা তোমরা তৃপ্ত হইবা। হে ইদানীন্তন রোদকেরা তোমরা ধন্য কেননা তোমরা হাসিবা।

১৮৩২ সংস্করণঃ

তখন তিনি আপন শিষ্যেরদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন যে হে দরিদ্রেরা তোমরা ধন্য কেননা ইশ্বরের রাজ্য তোমারদের। হে ইদানীন্তন ক্ষুধিতেরা তোমরা ধন্য কেননা তোমরা তৃপ্ত হইবা। হে ইদানীন্তন রোদকেরা তোমরা ধন্য কেননা তোমরা হাঁসিবা।

কেরীর তিনটি সংস্করণ থেকে উদ্ধৃত উপরের অংশ তিনটির স্বতন্ত্র রূপ সহজেই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। এখন, এই তৃতীয় স্তরে তিনটি বিভিন্ন অনুবাদের রূপান্তরের পরিমাণ কতটা, তা লক্ষ্য করা যেতে পারে।

অতিরিক্ত শব্দ-সংযোজনা ও শব্দগত পরিবর্তন যাই হোক না কেন, সমস্তই কোন-না-কোন রকম ভাবে বাক্যগঠন পদ্ধতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে; এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ১৮০১ সংস্করণে যখন লেখা হয়ঃ 'ধন্য দারিদ্র একারণ ভগবানের রাজ্য তোমারদের',—তখন তার সরল অর্থ এই রকম দাঁড়ায়ঃ ভগবানের রাজ্য তোমারদের; এই কারণে, হে দারিদ্র, তোমরা ধন্য। মূলের 'কারণ'-কে 'একারণ' লিখে কেরী, বলা বাহুল্য, কোন গঠনগত উৎকর্ষ প্রতিশ্রুত করতে পারেন নি। 'দরিদ্রেরা' অর্থে 'দারিদ্র' শব্দের প্রয়োগ কেরীর অনবধানতারই সূচক, পরবর্তী সংস্করণে তিনি তার সংশোধন করেছেন। পরবর্তী পংক্তিগুলিতে 'ক্ষধিৎ' বা 'রোদক' শব্দ তিনি বহুবচনেই ব্যবহার করেছিলেন, ফলে বহুবচন অর্থেই তিনি 'দারিদ্র' শব্দ প্রয়োগ করে থাকতে পারেন। ইংরেজি 'poor' শব্দের বিশিষ্ট ব্যবহারে যে সমষ্টি-ভাব থাকে, সেই সংস্কার তাঁর মনে এখানে সক্রিয় থাকা সম্ভব। এবং ১৮০১ সংস্করণে তিনি যে মূলের 'তৃপ্ত' স্থলে

'তৃপ্তি' লিখেছেন তাও তাঁর ভাষাজ্ঞানের অভাবজাত, সজ্ঞান পরিবর্তন বলে মনে হয় না। ১৮০৬ সংস্করণে প্রধান পরিবর্তন বাক্যগঠন-পদ্ধতিতে। এখানে মূলের সঙ্গে তুলনায় যে দু-টি ক্ষেত্রে শব্দগত পরিবর্তন দেখা যায়, তা সম্পূর্ণভাবেই বাক্যগঠন-সংস্কারের প্রয়োজনে বলেই মনে হয়। এখানে তিনি 'এখনকার' স্থলে 'ইদানীন্তন' শব্দ ব্যবহার করেছেন ভাষা-উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠার বিবেচনাতেই। ১৮০১ সংস্করণে তিনি কেন 'এখান-কার' লিখেছিলেন, তা অজ্ঞাত। ১৮০৬ সংস্করণে 'শিষ্যেরদের প্রতি' ব্যবহার করে ১৮০১ সংস্করণের ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে। 'হে'—এই সম্বোধনবাচক শব্দ ব্যবহার করে প্রতিটি ক্ষেত্রে ভাষার স্বাদুতা তিনি প্রতিশ্রুত করতে পেরেছেন। উক্ত অংশে ১৮০৬ সংস্করণের সঙ্গে ১৮৩২ সংস্করণের বিশেষ কোন প্রভেদ লক্ষ্য করা যায় না। 'যে' শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে বাচ্যরীতিতে বর্ণনাধর্মের আগম ঘটানো হয়েছে; তাছাড়া 'বলিলেন' স্থলে তিনি লিখেছেন 'কহিলেন', এবং 'হাসিবা' স্থলে লিখেছেন 'হাঁসিবা'। এখানে সবগুলি পরিবর্তনই সামান্য ধরনের বা গৌণ; এবং তা সাধারণ-ভাবে কখনোই অনুবাদের যথাযোগ্যতার ওপর হস্তক্ষেপ করেনি।

বিভিন্ন সংস্করণের যে পাঠ ওপরে সংকলিত হয়েছে, সেগুলি খুঁটিয়ে দেখলে কেরীর সংস্কার-ধারাটির সঙ্গে পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে। ১৮০১ সংস্করণের ভাষারূপকে ভিত্তি করে ১৮০৬ ও ১৮৩২ সংস্করণে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ১৮০৬ সংস্করণে ১৮০১ সংস্করণের থেকে অন্তত ৬টি ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শব্দ সংযোজিত হয়েছে, অন্তত ১২টি ক্ষেত্রে শব্দগত পরিবর্তন ঘটেছে। ১৮০৬ সংস্করণের থেকে ১৮৩২ সংস্করণে অবশ্য অতিরিক্ত যোজনার ক্ষেত্র ১টি, শব্দগত পরিবর্তনের ক্ষেত্র-ও একটি মাত্র।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে ১৮৩২ সংস্করণে "ঈ" সহযোগে 'ঈশ্বর' লেখা হলেও, এবং 'হা'-র ওপর "ঁ" প্রয়োগে 'হাঁসিবা' লেখা হলেও, এই দুটি দৃষ্টান্তকে শব্দগত পরিবর্তনের উদাহরণস্থল হিসাবে লক্ষ্য করা হয়নি। বাক্যগঠন পদ্ধতির রূপান্তর কেবলমাত্র প্রথম বাক্যেই দেখা যায়।

দৃষ্টান্তঃ ২

জন ১২ঃ ২৭

প্রথম সংস্করণঃ ১৮০১

এখন আমার প্রাণ মনস্তাপিৎ হইয়াছে আমিও কি বলিব হে পিতা ত্রাণ কর আমাকে এ দণ্ড হইতে কিন্তু ইহার কারণ আমি আইলাম এ দণ্ডে।

১৮০৬ সংস্করণ

এখন আমার মন চিন্তিত আছে আমিও কি বলিব? হে পিতা আমাকে এ কাল হইতে ত্রাণ কর আমি কি ইহা কহিব? কিন্তু এ কারণ আমি এ কালেতে আইলাম।

১৮৩২ সংস্করণ

এখন আমার মন ব্যাকুল আছে এবং আমি কি কহিব যে হে পিতা আমাকে এ কাল হইতে ত্রাণ কর কিন্তু এই কারণ আমি এ দণ্ডে আইলাম।

এখানে লক্ষণীয় যে ১৮০১ সংস্করণে শব্দ-সংখ্যা ২৩, ১৮০৬ সংস্করণে ২৭, এবং ১৮৩২ সংস্করণে ২৫। প্রথম সংস্করণে মূলের শব্দসংখ্যা রক্ষিত হয়েছে, ১৮০৬ সংস্করণে ব্যবহৃত শব্দসংখ্যা ৫টি বেশি ও ১৮৩২ সংস্করণে ৩টি। অর্থাৎ ১৮৩২ সংস্করণে ১৮০৬ সংস্করণ অপেক্ষা শব্দসংখ্যা অন্ততঃ ২টি কমে এসেছে। এই যে ব্যবহৃত শব্দসংখ্যার অনিশ্চযতা বা অস্থিরতা, তার কারণ যে অনুবাদকের সাহিত্যিক জিজ্ঞাসা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাক্যগঠন-পদ্ধতিতে এখানে বার বার রূপান্তর ঘটিয়েছেন লেখক; এমন কি প্রশ্নবোধক চিহ্ন প্রয়োগ করে অন্বয় ও অর্থ-ন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি অনেকখানি অগ্রসর হতেও চেষ্টা করেছেন ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণে। কিন্তু ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণে দেখা গেল, অনুবাদক শুধু দু'টি শব্দ-সংখ্যাই কমিয়ে আনলেন না, প্রশ্নবোধক চিহ্নেরও বিলুপ্তি ঘটালেন। শাস্ত্রগ্রন্থের গাম্ভীর্য যাতে উচ্চারণে ক্ষুণ্ণ না হয় তার জন্য সংহতিচর্চার প্রয়োজন, এবং অনুবাদক এখানে সম্ভবতঃ তাই করতে চেয়েছেন; আর প্রশ্নবোধক চিহ্নের বিলুপ্তিকরণের মাধ্যমে তিনি প্রশ্ন-তারল্য বর্জন করে বক্তার সংশয়কে ধারণ করবারই চেষ্টা করেছেন বলে মনে হয়। এখন বিভিন্ন সংস্করণের রূপান্তরের রূপ ও পরিমাণ নির্ণয় করা যেতে পারে।

বাক্যগঠন পদ্ধতির রূপান্তর এই উদ্ধৃতিগুলির ক্ষেত্রে এত প্রকাশ্য যে সে সম্পর্কে স্বতন্ত্র উল্লেখের প্রয়োজন হয় না। মূলের সঙ্গে তুলনায় অতিরিক্ত সংযোজিত শব্দ 'আমি'-র ব্যবহার প্রায় অনিবার্য ছিল, কেননা 'বলিব' এই ক্রিয়াপদের গঠনই কর্তার উত্তম পুরুষের নির্দেশক। অনুবাদক 'আমিও' লিখে শব্দের ওপর যে অতিরিক্ত বল স্থাপন করেছেন, তা অহেতুক বলেই মনে হয়, ১৮৩২-এর সংস্করণে তিনি তা সংশোধন করেছেন। মূল ভাষায় এই নির্দেশ নেই, এমন কি Authorised version-এও ছিল না। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণে 'আমি কি ইহা

কহিব? অংশটি অতিরিক্ত সংযোজনা এবং 'আমিও কি বলিব' অংশের পুনরুক্তি বলে এই অংশটি দুষ্ট। কিন্তু সম্পূর্ণ বাক্যটির অনুসন্ধানে দেখা যাবে যে 'আমিও কি বলিব' অংশটি প্রক্ষিপ্ত, অথচ 'আমি কি ইহা কহিব' অংশটি বাক্যে বিশেষ সামঞ্জস্যে স্থাপিত হয়েছে। 'এখন আমার মন চিন্তিত আছে হে পিতা আমাকে এ কাল হইতে ত্রাণ কর আমি কি ইহা কহিব?' —এই গ্রাহ্য বাংলা অনুবাদ কেরী অনায়াসেই প্রত্যয়িত করতে পারতেন 'আমিও কি বলিব' অংশটি বর্জন করে। কিন্তু তা তিনি করেন নি, ফলে অনুবাদ প্রত্যাশিত ফল-লাভে বঞ্চিত হয়েছে। এই বিভ্রান্তির কারণ সম্ভবতঃ মূলের প্রতি অনু-রাগ ও বাংলা পদান্বয় পদ্ধতির যোগ্য অনুসরণে তাঁর অক্ষমতা। তাতে দুবার প্রশ্নবোধক চিহ্ন প্রয়োগের বিপত্তি-ও এড়ানো যেত। কেরীর বাংলা দাড়ি চিহ্ন ছাড়া সাধারণভাবে যতিচিহ্নহীন। এই রকম স্থলে প্রশ্নবোধক চিহ্ন প্রয়োগের দৃষ্টান্ত বাংলা গদ্যের মুক্তি প্রয়াসের অন্যতম দৃষ্টান্ত রূপেই বরণীয় হয়ে ওঠার কথা, কিন্তু কেরী যে যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে বা মনোযোগের সঙ্গে এই কাজে ব্রতী হন নি, এখানে তা প্রায় প্রমাণিত; এবং তিনি অসহায়ভাবে শুধুই Authorised version-এর যতি চিহ্ন-পাত ঘটাতে চেয়েছেন, যা তাঁর বিবেচনাশক্তির প্রকাশক নয়। কিন্তু ১৮৩২-এর সংস্করণে শুধু 'যে' শব্দ প্রয়োগ করে তিনি যে বিপত্তির হাত থেকে অনুবাদকে রক্ষা করতে পেরেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখানে অনুবাদ-ভাষায় তাঁর বর্ধিত অধিকার অনুবাদে অনিশ্চয়তার হাত থেকে তাঁকে উদ্ধার করেছে এবং বিবেচনাশক্তি প্রয়োগ করবার উপযুক্ত সুযোগ তিনি সদ্ব্যবহার করতে পেরেছেন। বর্জিত শব্দের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ১৮০১ ও ১৮০৬ খৃীষ্টাব্দের সংস্করণ দুটির ২টি ক্ষেত্র ১৮৩২-এর সংস্করণে ১টিতে হ্রাস পেয়েছে। প্রথম দুটি ক্ষেত্রে বর্জিত 'এবং' শব্দ পরিশেষে গৃহীত হয়েছেঃ এর ফলে একদিকে যেমন মূলানুগত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তেমনি অপরদিকে অনূদিত অংশের ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে। প্রথম দুটি সংস্করণে 'এবং' শব্দের অনুপস্থিতিতে একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে বলেই মনে হয়। অন্ততঃ ১৮০৬-এর সংস্করণে 'এবং' শব্দ প্রযুক্ত হলে প্রশ্নবোধক চিহ্নের ব্যবহারে বাক্যগঠনের অভিনবত্ব সহজেই গ্রাহ্য হতে পারত, এবং উচ্চারণ সঙ্গতিহীন বলে মনে হতো না। তবে সব মিলে এই কথাটাই মনে হয় যে, 'এবং' শব্দের বর্জনগ্রহণের এই দ্বিধা-গ্রস্ততায় অনুবাদকের সচেতনতা ক্রিয়াশীল ছিল; যে-কোন পরীক্ষাই, বলা বাহুল্য, সচেতনতার পরিচয় বহন করে। শব্দগত পরিবর্তনের সবচেয়ে

লক্ষণীয় প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অংশের চতুর্থ শব্দটি। ১৮০১ সংস্করণের 'মনস্তাপিৎ' ১৮০৬ সংস্করণে 'চিন্তিত' ও ১৮৩২ সংস্করণে 'ব্যাকুল' হয়েছে; এই উদাহরণ অনুবাদকের শব্দ-সন্ধানের পরিচয়স্থল, সচেতন বিবেকের উপস্থিতিতেই শুধু এই রকম অক্লান্ত অনুসন্ধান সম্ভব। এমন কি বাক্যগঠন পদ্ধতির রূপান্তরের দিকে লক্ষ্য করলেও দেখা যাবে কেরী স্বাভাবিকতা প্রতিশ্রুত করতে বিশেষ সচেতন ছিলেন। 'ত্রাণ কর' শব্দ-বন্ধের ১৮০১ সংস্করণে প্রয়োগ ঘনিষ্ঠভাবে মূলানুগ, কিন্তু পরবর্তী সংস্করণগুলিতে বাংলা বাক্যরীতিতে ক্রিয়ার স্বাভাবিক স্থানে তাকে স্থাপন করে তিনি সহজ সঙ্গতি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন।

নির্বাচিত এই সমীক্ষায় কেরীর বিভিন্ন অনুবাদ-রূপের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তার প্রকৃতি সহজেই ধরা পড়ে। এই সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, কেরী ১। অনুবাদ-ভাষার যোগ্যতা অনুবাদে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি; ২। অনুবাদ-ভাষার উৎকর্ষ বিধানে সবর্দা মনস্ক ছিলেন। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, অনুবাদে ভাষাতাত্ত্বিক মনস্তত্ত্বই তাঁর মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেছিল। অবশ্য, অনুবাদ-ভাষার নির্ভুল ও সুষ্ঠু প্রয়োগের দিকটি যথার্থ অনুবাদের অন্যতম প্রধান শর্তের মধ্যেই পড়ে, তথাপি তা নিতান্তই প্রাথমিক শর্ত মাত্র। কেরী অনুবাদের এই প্রাথমিক শর্তপূরণে প্রধানভাবে মনোযোগী ছিলেন; উৎকৃষ্ট অনুবাদের অপরাপর শর্ত[১০৯] সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ খুব স্পষ্ট নয়, হয়তো তার কোন অবকাশও ছিল না। কাজেই কেরীর অনুবাদকে একটি সীমাবদ্ধ দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা উচিত হবে।

ভাষা-প্রসঙ্গ

কেরী অনূদিত বাংলা বাইবেলের ভাষা সম্পর্কে উৎকর্ষের দাবী সম্ভবতঃ কেউ করেন না। তিনি যখন প্রথম বাইবেল অনুবাদে হাত দেন বা বাইবেলের বাংলা অনুবাদ প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন, তখন পর্যন্ত বাংলা ভাষার ওপর তাঁর অধিকার যে স্বাধীন রচনা, এমন কি অনুবাদ রচনার পক্ষেও যথেষ্ট ছিল না, তা তাঁর রচনার মধ্যেই ধরা পড়ে। আবার, যখন তিনি বাইবেলের চূড়ান্ত সংস্করণ প্রস্তুত করেন, তখন বাংলা ভাষা সম্পর্কে তিনি যে নিজস্ব বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গির অধিকার লাভ করেছেন, সে সম্পর্কেও কোন সন্দেহ নেই। অথচ ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় মনে করেছেন যে প্রথম সংস্করণ থেকে শেষ সংস্করণের 'রচনারীতির আশানুরূপ উন্নতি'[১১০] হয়নি।

তথাপি তাঁর জীবদ্দশায় বাংলা বাইবেলের আটটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল; এবং তিনি প্রায় সব সময়েই সংশোধন ও পরিমার্জনায় নিজেকে নিযুক্ত রেখেছেন। তাঁর বাংলা নিউ টেস্টামেণ্টের আটটি সংস্করণের মধ্যে তিনটি সংস্করণ ১৮০১, ১৮০৬ ও ১৮৩২ থেকে কয়েকটি নির্বাচিত অংশ নিয়ে কেরীর ভাষার বিবর্তনের রূপটি অনুসরণ করা যেতে পারে। ১৮০১ প্রথম সংস্করণ, ১৮৩২ অন্তিম সংস্করণ, ও ১৮০৬ প্রথম সংস্করণ থেকে আমূল রূপান্তরিত—এই বিবেচনাতেই সংস্করণগুলির নির্বাচন। এদেশে তাঁর বাসকাল যত দীর্ঘ হচ্ছিল ও এদেশের লোক ও ভাষার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ যতই নিবিড় হচ্ছিল, ততই তাঁর ভাষা খাঁটি বাঙালীর ভাষার নিকটবর্তী হবে, এইটাই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। ১৮০১-এর সংস্করণ থেকে ১৮০৬-এর সংস্করণের ভাষা উন্নততর সন্দেহ নেই; এই ভাষা অধিকতর তদ্ভব শব্দ ও মৌখিক রীতির অনুগামীও বটে। কিন্তু ১৮৩২-এর সংস্করণে এসে দেখা যাবে যে কেরীর ভাষা অধিক সংস্কৃতগন্ধী। মনে হয়, কেরী তদ্ভব শব্দ, মৌখিক বাক্য-বিন্যাসরীতি ও বাগ্ভঙ্গী অপেক্ষা তৎসম শব্দাবলী ও সংস্কৃত গদ্যরীতির প্রতি সচেতনভাবেই পক্ষপাত দেখিয়েছেন।

অন্তিম সংস্করণে কেরীর এই ভাষাচেতনা তাঁর সংস্কৃত-মনস্কতারই পরিচয়স্থল। বাংলা ভাষা সম্পর্কিত ভাবনায় কেরী যে সংস্কৃত-মনস্কতা দ্বারা উদ্বোধিত হয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই, এবং এই দৃষ্টি-ভঙ্গিতেই তাঁর বাংলা ভাষাচিন্তা একটি প্রতীতীতে এসে উপস্থিত হয়েছিল। তাঁর এই সংস্কৃত-মনস্কতা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য-পুস্তকে যেমন জয়ী হয়েছে, তেমনি শ্রেষ্ঠ উদাহরণরূপে তাঁর অভিধান সংকলনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই, প্রকৃতপক্ষে, তাঁর ১৮৩২ সংস্করণের ভাষারীতির মনস্তত্ত্ব লক্ষ্য করা উচিত।

নিউ টেস্টামেণ্টের তিনটি সংস্করণ থেকে আমরা তিনটি উদাহরণ নির্বাচন করেছি। (১) মঙ্গল সমাচার মাতিউ রচিত, পর্ব ৮ ও ৯; (২) য়োহনের রচিত মঙ্গল সমাচার, পর্ব ১৫ঃ ৫-১৭; (৩) লূকের রচিত মঙ্গল সমাচার, পর্ব ১৮ঃ ১৮-৩০। এই তিনটি উদাহরণের তিনটি সংস্করণেরই পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে। অতঃপর একটি সংস্করণের সঙ্গে অপর সংস্করণের তুলনার কথা মনে রেখে সাধারণভাবে নিম্নলিখিত কয়েকটি দিক থেকে সংক্ষেপে ভাষাচরিত্র অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছেঃ ১। বানান-পদ্ধতি; ২। উচ্চারণ-পদ্ধতি (সেই সঙ্গে বানান); ৩। আরবি-ফারসী ও হিন্দুস্থানী শব্দের অনুপ্রবেশ; ৪। বাংলা ফ্রেজ ও ইডিয়মের ব্যবহার;

৫। অন্যান্য রূপতত্ত্বগত বিশেষত্ব; ৬। বাক্য গঠন রীতি; ৭। যতি চিহ্ন স্থাপন।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বাংলা বাইবেলের প্রথম সংস্করণ ভাষার দিক থেকে খুবই নিম্নমানের। কখনো কখনো এই ভাষাকে বাংলা ভাষা বলে মেনে নিতে কষ্ট হয়। উচ্চারণ-রীতি, বানান, বা বাক্যরীতির দিক থেকে এই ভাষা শুধু দুর্বল নয়, ত্রুটিভারাক্রান্ত ও প্রমাদযুক্ত—কোনদিক থেকেই এই ভাষা কেরীর প্রশংসার সূচক নয়, কেবলমাত্র উদ্যমটুকু ছাড়া। স্পষ্টতঃই বোঝা যায় যে তখন পর্যন্ত বাংলাভাষা তাঁর আয়ত্ত হয়নি, অথবা বাংলা ভাষাকে সাহিত্যরচনায় ব্যবহারের উপযোগী অধিকার তিনি অর্জন করতে পারেন নি।

এই সংস্করণে তৎসম শব্দ তিনি প্রচুর পরিমাণেই ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বানান শোচনীয়রূপে ভুল। এই প্রসঙ্গে কতগুলি উদাহরণ উল্লেখ করা যায়; যেমন, পরিস্কার (পরিষ্কার); উৎস্বর্গ (উৎসর্গ); স্বাক্ষী (সাক্ষী); শৎ (সৎ); অবস (অবশ); পিড়িত (পীড়িত); শ্বয়ন (শয়ন); ঘর্শণ (ঘর্ষণ); সাসুড়ি (শাশুড়ি); দুর্ব্বল্যতা (দুর্বলতা, দৌর্ব্বল্য); জন্ত্রণা (যন্ত্রণা); সুকর (শূকর); শর্য্যা (শয্যা); পাসণ্ডতা (পাষণ্ডতা); পাপি (পাপী); ছিড়িয়া (ছিঁড়িয়া); শান্তনা (সান্ত্বনা); মানব্য (মানব, মনুষ্য); ধনি (ধনী); শুচ (সূঁচ); সম্পত্য (সম্পত্তি); পূর্ন্ন (পূর্ণ); সুস্ক (শুষ্ক); ইত্যাদি।

প্রথম দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে যে ভুলগুলি বিচিত্র ধরনের। একদিকে যেমন ণত্ব-ষত্বের বিধানের প্রতি অমনোযোগ দেখা যায়, তেমনি অপরদিকে 'ই' কার—'ঈ' কারের ভেদ মানা হয়নি, বা 'য'-'জ' প্রায়ই একাকার হয়ে গেছে। এরই মধ্যে 'দুর্ব্বল্যতা', 'মানব্য' এবং 'শর্য্যা'—এই তিনটি ভুল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'দুর্ব্বল্যতা' ও 'মানব্য' নিঃসন্দেহে contamination বা মিশ্রণজাত। 'দুর্বলতা' ও 'দৌর্বল্য' মিলে 'দুর্ব্বল্যতা'। তেমনি 'মানব' ও 'মনুষ্য' মিলে 'মানব্য'। সংযুক্ত বর্ণ থাকলে অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত মানুষের উচ্চারণে এখন পর্যন্ত 'র'-এর আগম হয়ে থাকে, যেমন 'প্রসির্দ্ধ', 'সাহার্য্য'। কেরী সেই বিকৃতিকেই প্রশ্রয় দিয়েছেন মাত্র 'শয্যা'-কে 'শর্য্যা' লিখে।

ধ্বনি অনুসরণ করে বানান লিখবার রীতি অনুসরণ করবার ফলেই অন্যান্য ভুলগুলি এসে গিয়েছিল বলে মনে হয়। সবচেয়ে বড় ভুল লক্ষ্য করা যায় 'ত' এবং 'ৎ' প্রসঙ্গে। শব্দ শেষের 'ত' অনেক সময় বাংলাতে হল্‌ রূপে উচ্চারিত হয়। তখন 'ত' ও 'ৎ' উচ্চারণের দিক থেকে এক

হয়ে যায়। তাছাড়া, অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত মানুষের বিকৃত উচ্চারণের ফলেও কখনো কখনো 'ত' 'ৎ'-এর মত উচ্চারিত হয়ে থাকে। কেরী তাঁর রচনায় এই বিকৃতি সংশোধন করবার বিশেষ চেষ্টা করেন নি। ফলে তিনি সহজেই লিখে গেছেনঃ সহিৎ (সহিত); ব্যথিৎ (ব্যথিত); পীড়িৎ (পীড়িত); ভবিষ্যত (ভবিষ্যৎ); উপনিৎ (উপনীত); চিন্তিৎ (চিন্তিত); ইত্যাদি।

প্রথম সংস্করণে আরবি-ফারসী-হিন্দুস্থানী শব্দের অনুপ্রবেশ বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। আমাদের নির্বাচিত অংশের মধ্যে প্রাপ্ত ফারসী শব্দ 'সহর' বা 'পসন্দ', কিম্বা আরবি শব্দ 'মাফ', বাংলা ভাষার মধ্যে আজ এমনভাবে মিশে আছে যে ওই শব্দগুলিকে বিদেশী শব্দ বলে সনাক্ত করা বেশ কঠিন। তবে 'নির্বোধ ও বোবা মানুষ' অর্থে ফার্সী 'গুংগা' থেকে জাত 'গোঙ্গা মানুষ' অবশ্যই স্বতন্ত্র উল্লেখের দাবী রাখে।

বিশেষ করে 'কথোপকথনে'র পটভূমিকায়, ও রামবাম বসুর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার তথ্য মনে রাখলে, নিউ টেস্টামেণ্টের প্রথম সংস্করণের ভাষায় আরবি-ফারসী হিন্দুস্থানী শব্দাবলীর উল্লেখযোগ্য অনুপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে; 'কথোপকথন'-এর ভাষায় কখনো কোন কোন প্রস্তাবে আরবি-ফারসী হিন্দুস্থানীর অস্বস্তিকর বাহুল্য যেমন ওই ভাষাকে স্থানে স্থানে অ-বাঙ্গালী করে তুলেছে, তেমনি নিউ টেস্টামেণ্টের ভাষাতে আরবি-ফারসী হিন্দুস্থানী শব্দের অভাব স্নিগ্ধ বাঙ্গালী ভাব সঞ্জীবিত করে তুলতে পেরেছে বলে মনে হয়।

কিছু কিছু ভুল বা বিকৃত উচ্চারণ অবশ্য এই গ্রন্থে বাঙ্গালী আবহাওয়া গড়ে তুলবার পক্ষে সহায়ক হয়েছে। হয়তো শব্দগুলির উচ্চারণ ভুল ও অসাধু, তথাপি গ্রাম্য মানুষ সেই শব্দগুলিকে সচরাচর যেভাবে উচ্চারণ করে থাকে, মোটামুটি সেইভাবেই গ্রন্থে তাদের স্থান দেওয়াতে ক্লিষ্ট ও কৃত্রিম এবং বিদেশী বাক্যরীতিতে কণ্টকিত এই রচনার মধ্যে তথাপি বাঙ্গালীভাব কিছুটা অবশিষ্ট ছিল। যেমন, পরমায়ু > প্রমায়ু। বিপ্রকর্ষে একত্র > একত্তর। কিম্বা কথ্য বাগ্ভঙ্গীঃ 'পরিচ্ছদের আঁচলা'; 'তাহার বড় সুখ্যাত (সুখ্যাতি) সকল দেশান্তরে'; কেটা > কেডা। ইত্যাদি।

অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণের বিপর্যয়ও কোথাও ঘটেছে দেখা যায়। যেমন, থাখিলে (থাকিলে)।

রূপতত্ত্বের দিক থেকে বিশ্লেষণ করলেও কয়েকটি বিশেষত্ব সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমেই লক্ষণীয় বহুবচন নির্দেশে বিশেষত্ব। বহুবচনাত্মক প্রত্যয় 'দিগ'-র পূর্বে ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে;

এই রীতি উনবিংশ শতাব্দীতেও দীর্ঘদিন বাংলা ভাষায় প্রচলিত ছিল। স্বরান্ত শব্দে ষষ্ঠীর 'র', এবং হলন্ত শব্দে ষষ্ঠীর 'এর' যোগ করবার পর বহুবচনাত্মক প্রত্যয় ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, ধনীরদের, ভাইরদিগকে, শিশুরদিগকে, তোমারদের, আমারদের, মানুষেরদের, দরিদ্রেরদিগকের ইত্যাদি। শেষ উদাহরণটিতে স্বরান্ত শব্দ শেষে 'র' যুক্ত না হয়ে 'এর' যুক্ত হয়েছে। দ্বিতীয়া ও ষষ্ঠী বিভক্তি নির্দেশের জন্যই এটি প্রযুক্ত হয়েছে।

সাধু বাংলা ভাষায়, এবং কখনো বা প্রাদেশিক কথ্য বাংলায় নামধাতুর প্রয়োগ-বাহুল্য লক্ষ্য করা যায়। কেরীও পর্যাপ্ত পরিমাণে নামধাতুর ব্যবহার করেছেন। আমাদের নির্বাচিত অংশ থেকে উদাহরণঃ দৌড়িল, উত্তরিলেন, ইত্যাদি।

প্রাচীনকালের বাংলা থেকেই কর্তৃবাচ্যের স্থলে কর্মবাচ্যের (Passive voice) প্রয়োগ দেখা যায়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র ভাষাতেও এইরূপ ব্যবহারের পরিচয় আছে। অনূদিত নিউ টেস্টামেণ্টের প্রথম সংস্করণ তো বটেই, পরবর্তী সংস্করণগুলিতে, এমন কি ১৮৩২-র অন্তিম সংস্করণেও কেরী ভাষায় এই বিশেষত্বটি বর্জন করেন নি। প্রাসঙ্গিক কয়েকটি দৃষ্টান্তঃ জাহাজ ঢেউতে ঢাকা গেল (ঢাকা পড়ল); দ্রাক্ষারস চুয়া যায় (১৮৩২ সংস্করণে পাই ঃ দ্রাক্ষারস চুইয়া পড়ে); ডালের মত কাটা যায় (কাটা পড়ে); তাহারা পোড়া যায় (দগ্ধ হয়); ইত্যাদি।

এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় যে compound verb বা যৌগিক ক্রিয়া গঠনে বাংলা ভাষায় যেমন অসমাপিকা ক্রিয়ার (Gerundial Infinitive) উত্তরে অন্য এক ধাতুর সহায়তা নিতে হয়, এবং তা idiomatic, কেরী সর্বত্রই সেখানে 'গম্'-ধাতুর সাহায্য নিয়েছেন। এই জন্য ভাষা একদিকে idiomatic হয়নি, অপরদিকে কর্মবাচ্যের প্রয়োগ অনাবশ্যক রূপে দেখা দিয়েছে।

প্রথম সংস্করণের বাগ্‌ভঙ্গি ও বাক্যরীতিতে প্রায়শই বিদেশী প্রভাব স্পষ্ট। তাতে ভাষা ক্লিষ্ট, কৃত্রিম এবং বিদেশী দ্বারা লিখিত বলে সহজেই প্রমাণিত হতে পারে। ডক্টর শিশিরকুমার দাস কেরীর ভাষার এই বিজাতীয়ত্ব কয়েকটি নির্বাচিত সূত্রে বিশ্লেষণ করবার প্রয়াস পেয়েছেন।১১১ সর্বশেষ সংস্করণের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে কেরী প্রথম সংস্করণের উল্লিখিত অনেকগুলি ভুলেরই সংশোধন করেছেন, যদিও সংশোধিত রূপেও বিদেশী প্রভাবের পরিচয় সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়ে যায়নি। তাছাড়া অন্তিম সংস্করণের ভাষায় কেরীর সংস্কৃত-মনস্কতার অনুশাসন ভাষার

সহজ ও সাবলীল গতির পক্ষে প্রতিবন্ধক স্বরূপ হয়েছে বলে মনে হয়। অবশ্য সংস্কৃত চেতনাই যে এই জন্য দায়ী এরকম মনে করবার কারণ নেই। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত-মনস্ক হওয়া সত্ত্বেও যে ভাষাকে বেগবান ও শ্রীমণ্ডিত করতে পেরেছিলেন, এই তথ্যটি মনে রেখে বরং বলা যায় যে কেরীর মধ্যে সেই সৃজনশীল শিল্প-চৈতন্যের অভাবই তাঁর অন্তিম সংস্করণের ভাষার বন্ধনদশার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। আমাদের নির্বাচিত অংশ থেকে একটি সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক তালিকা এখানে প্রস্তুত করা গেল; এই থেকে কেরীর বাইবেলের ভাষায় ক্রমপরিণামের রূপটি ধরা পড়বে।

১৮০১	১৮০৬	১৮৩২
আইল কাকুতি করিতে করিতে	নিকটে আসিয়া কাকুতি করিয়া	নিকটে আসিয়া প্রার্থনা করিয়া
চমকিৎ	চমকিত	চমৎকৃত
ফেলিতে হইবেক বাহিরে অন্ধকারে	বাহিরে অন্ধকারে ফেলাইতে হইবেক	বহিস্থ অন্ধকারে ফেলা যাইবেক
মধ্যেখানে	মধ্যখানে	মধ্যস্থানে
যাহা বিভাষিত আছে য়িশঙীহা ভবিষ্যত বক্তা হইতে	য়িশয়ীহা ভবিষ্যদ্বক্তা যাহা বলিয়াছিলেন	য়িশাঈয়া আচার্য্যতে উক্ত
অংগ অবস	অংগ অবশ	পক্ষাঘাতি
তাহারা যাইয়া করিল তাহার বড় সুখ্যাত সকল দেশান্তরে	তাহারা যাইয়া তাহার বড় সুখ্যাতি সে সকল দেশে করিল	তাহারা যাইয়া তাঁহার বড় সুখ্যাতিতে সে সকল দেশে ব্যাপ্ত করিল
যাহা২ তোমারদের ইচ্ছা তাহা নিবেদন করিলে	যাহা২ তোমারদের ইচ্ছা তাহা প্রার্থনা করিলে	যাহা তোমারদের ইষ্ট তাহা প্রার্থনা করিলে

কেহ আপনার জীবন দিতে তাহার বন্ধুর নিমিত্ত	কেহ যদি বন্ধুর নিমিত্তে আপনার (জীবন) দেয়	মিত্রের নিমিত্তে আপনার প্রাণদান
দাস জানে না তাহার প্রভু কি করেন	প্রভু যে কার্য্য করেন দাস তাহা জানে না	প্রভুর ক্রিয়মান কার্য্য দাস জানে না
ধর্ম্ম মহাশয়হে কি করিয়া পাইব অনন্ত প্রমায়ু।	হে ধর্ম্মগুরু আমি কি করিলে অনন্ত পরমায়ু পাইব ?	হে ধর্ম্মস্বরূপ গুরো অনন্ত পরমায়ু পাইবার কারণ আমি কি করিব।

কয়েকটি নির্বাচিত উদাহরণ তুলে ওপরে দেখানো গেল তিনটি সংস্করণের ভাষার পার্থক্য ও সংশোধনের প্রকৃতি কি রকম। শেষ সংস্করণ যথার্থই সংশোধিত সংস্করণ, তথাপি কেরীর ভাষা যে এখানেও উৎকর্ষ স্পর্শ করতে পারেনি, তার পরিচয়ও স্পষ্ট।

যতিচিহ্ন স্থাপনেও কেরীর কৃতিত্ব খুব উল্লেখযোগ্য নয়। প্রথম সংস্করণে যতিপাত ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত; একমাত্র দাঁড়ির ওপর তাঁকে নির্ভরশীল থাকতে হয়েছে। পরবর্তী সংস্করণে কদাচিৎ প্রশ্নবোধক চিহ্ন মেলে। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রশ্নবোধক চিহ্নও শেষ সংস্করণে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত ওপরের তালিকায় শেষ উদাহরণটি। কমা, সেমিকোলন তিনি ব্যবহার করেন নি, শুধু দাঁড়িই ছিল তাঁর যতিপাতের প্রধান দিক্-চিহ্ন। মাঝে মাঝে শব্দের অন্তর্বর্তী বা বাক্যের অন্তর্বর্তী একটা শূন্য স্থান তিনি নিরূপণ করেছিলেন. কমা, সেমিকোলনের বিকল্পরূপেই এই শূন্যস্থানের সংস্থান তিনি করে থাকতে পারেন।

উল্লেখপঞ্জী ও টীকা

১। দ্রঃ Eustace Carey: Memoirs of William Carey; London, 1836. পৃষ্ঠা ১১৯-২০।

২। Robert N. Cust: A Sketch of the Modern Languages of the East Indies. গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত Appendix "G" দ্রষ্টব্য।

৩। মতান্তরে ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে। ৎস্ আইগেনবল্‌গ-এর কণ্টকিত জীবন সম্পর্কে দ্রষ্টব্যঃ Julius Ritcher: A History of Missions in India, (translated) পৃঃ ১০৩-৪। 1908.

৪। F. D. Walker: William Carey; London, 1926; পৃঃ ২৭৩।

৫। রেভারেণ্ড ডেভিড ব্রাউন-ও বাইবেলকে "The Great Missionary" বলে মনে করতেন। দ্রঃ C. Simeon edited: Memorial Sketches of the Rev. David Brown; London, 1816, পৃঃ ৭৫।

৬। S. P. Carey: William Carey; London, 1934; পৃঃ ৪২৩।

৭। দ্রঃ Indian Antiquary, June, 1903-তে গ্রীয়ারসনের প্রবন্ধ। গ্রীয়ারসন বলেছেন যে শ্রীরামপুর মিশনারীদের মধ্যেই সম্ভবতঃ ভারতীয় ভাষা বিষয়ক অনুসন্ধান প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। তাঁরা প্রথমে মনে করেছিলেন যে আটটি কি ন'টি প্রধান ভারতীয় ভাষা মূল সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত, এবং অন্যান্যগুলি হিন্দীরই উপভাষা মাত্র। কিন্তু অচিরাৎ তাঁরা এই ধারণা পরিবর্তন করেন এবং ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের শ্রীবামপুর মেময়ার্সে স্বাধীনভাষার গৌরবে ৩৩টি ভাষার উল্লেখ করেন।

৮। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রিয়লকার কেরীর মনোভাবটি উদ্ধার করেছেনঃ

"Although in the Mahratta country the Devanagari character is well-known to men of education, yet a character is current among the men of business which is much smaller, and varies considerably in form from the Nagari, ...We have cast a fount in this character". Quoted in A. K. Priolkar: Printing Press in India; Bombay, 1958; পৃঃ ৬৫।

৯। প্রকৃতপক্ষে, বাইবেলের ভারতীয় ভাষায় রূপান্তরকে অনেকেই 'contribution to the sphere of literature' বলে লক্ষ্য করতে চেয়েছেন। দ্রঃ Mrs. E. L. Wenger in 'The Story of Serampore and its college'; 1961; পৃঃ ৭।

১০। ১৭-৬-১৭৯৬ তারিখের কেরীর চিঠিঃ .... 'almost all the Pentateuch and the New Testament are now completed'

দ্রঃ Eustace : প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৫। কেরীর আর একটি চিঠিঃ 'The whole of the New Testament and part of the old, are translated,' ....মদনাবাটি, ২০-১২-১৭৯৬।

১১। কেরীর চিঠিঃ .... 'have begun to learn the Sanskrit language'. মদনাবাটি, ২০-১২-১৭৯৬।

১২। S. P. Carey-র গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ৪১৫।

১৩। ঐ। পৃঃ ৪১৫-১৬।

১৪। Eustace : পৃঃ ৫৩৪-৩৫।

১৫। ঐ। পৃঃ ৫৩৬।

১৬। দ্রঃ ঐ। পৃঃ ৫৭৫।

১৭। দ্রঃ H. H. Wilson in Eustace's : পৃঃ ৬১০।

১৮। Eustace : পৃঃ ২৩৫।

১৯। ঐ। পৃঃ ২৭৬।

২০। J. S. M. Hooper : The Bible in India ; London, 1938 ; পৃঃ ২৭ থেকে উদ্ধৃত।

২১। Eustace : পৃঃ ৩২৩।

২২। দ্রঃ Walker : পৃঃ ২৭১।

২৩। দ্রঃ ঐ। পৃঃ ২৭৩।

২৪। Eustace : পৃঃ ৫৩৮।

২৫। দ্রঃ S. P. Carey : পৃঃ ৪২৪।

২৬। 'They had acquired the mental habits necessary for such a work, in the prosecution of their translations at Serampore ; they were in a position, by Mr. Carey's connection with the college, to obtain the assistance of the learned men from all these countries.' J. C. Marshman : The Life and Times of Carey, Marshman and Ward ; Vol. I ; 1859 ; পৃঃ ১৯৩-৯৪।

২৭। দ্রঃ George Smith : The Life of William Carey, D. D., London, 1909 ; পৃঃ ১৮৮। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকারঃ ..... 'this translation (প্রথম সংস্করণ) was made in the jungles of Mudnabatty, where Mr. Carey possessed none of those advantages for the cultivation of the language which he enjoyed on his removal to Serampore, and more especially since his appointment to the College of Fort William.' J. C. Marshman : প্রাগুক্তঃ পৃঃ ১৮০।

২৮। দ্রঃ G. Smith : পৃঃ ১৮৬; S. P. Carey : পৃঃ ৪২৪।

২৯। দ্রঃ S. K. De. : History of Bengali Literature in the Nineteenth Century ; Calcutta, 1919 ; পৃঃ ১১০-১১।

৩০। ৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে গ্রন্থখানির ছাপা সম্পূর্ণ হয়, এবং সমস্ত মুদ্রিত পৃষ্ঠা একত্রে বাঁধাই করে একখানা বই উপাসনার টেবিলে স্থাপন করা

হয়। ঐ দিনটিকেই সেইজন্য বাংলা নিউ টেস্টামেণ্টের প্রথম প্রকাশের দিন বলে সচরাচর চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। দ্রঃ G. Smith : পৃঃ ১৮৮; Walker : পৃঃ ২২৯; S. K. De : পৃঃ ৪৮৭; Hooper : পৃঃ ২৯। সজনীকান্ত দাস ১২ই ফেব্রুয়ারি লিখেছেন, কিন্তু তথ্যের কোন সূত্র উল্লেখ করেন নি। দ্রঃ সজনীকান্ত দাসঃ বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৬৩; পৃঃ ৯৫।

৩১। দ্রঃ C. B. Lewis : The Life of the Rev. John Thomas; London, 1873; পৃঃ ৩৫। বাংলা শেখার জন্য টমাসকে যে বাঙালী মুন্সীর নাম প্রস্তাব করেছিলেন চেম্বার্স, তিনি ফার্সীতেও পারদর্শী ছিলেন; এবং এই ব্যক্তির নাম রামরাম বসু। দ্রঃ ঐ। পৃঃ ৬৫। যে দেশীয় পণ্ডিতের সহায়তায় চেম্বার্স ফার্সী অনুবাদ থেকে নিউ টেস্টামেণ্টের বাংলা অনুবাদ করতে চেয়েছিলেন, তিনি এক অনির্দিষ্ট নাম বটে, তথাপি মনে হয় রামরাম বসুর মধ্যেই তিনি সম্ভবতঃ সেই যোগ্যতা দেখে থাকবেন।

৩২। দ্রঃ William Brown; History of the propagation of Christianity among the Heathen, Vol. 3; London, 1854; পৃঃ ৫২২।

৩৩। দ্রঃ কেরীর ১৭-১০-১৭৯৩ তারিখের চিঠি; Eustace : পৃঃ ১১৯। ২৬-১০-১৭৯৩ তারিখে লেখা টমাসের চিঠি; ঐ। পৃঃ ১০১।

৩৪। মদনাবাটি থেকে ১৬-১১-১৭৯৬ তারিখে ফুলারকে লেখা কেরীর চিঠির অংশঃ 'the gospel by Luke is, all he has done in translating since he came into the country.' দ্রঃ Eustace : পৃঃ ২৭৬। এবং লুক রচিত গস্‌পেলও টমাস সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ অনুবাদ করেন নি। দ্রঃ ঐ। পৃঃ ৩২৩।

৩৫। কেরী বলেছেন, এই অংশগুলি টমাসের 'old copies.' দ্রঃ ঐ। পৃঃ ২৭৬। ১৭৯২ সালে টমাসও এই তিন অংশের কথা উল্লেখ করেছেন। দ্রঃ Periodical Accounts, Vol. I; পৃঃ ১৯।

৩৬। চেম্বার্সের কাছ থেকে পাওয়া দেশীয় ভাষার পণ্ডিত রামরাম বসুর হাতেই টমাসের বাংলা ভাষা শিক্ষা। ফলে টমাসের অনুবাদে রামরাম বসুর সক্রিয় ভূমিকা থাকা স্বাভাবিক। টমাসও স্বীকার করেছেনঃ 'it was he who chiefly laboured with me, in the translation of Matthew, Mark, James & C.' Periodical Accounts, Vol. I. পৃঃ ২০।

৩৭। দ্রঃ Eustace : পৃঃ ৩২৩।

৩৮। দ্রঃ Hooper : পৃঃ ২৯।

৩৯। ১৭৬৮-১৮২০। মালদহে প্রথম বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠাতা।

৪০। S. K. De : পৃঃ ১০৮।

৪১। Hooper : পৃঃ ২৯।

৪২। দ্রঃ Calcutta Review, Vol. 13; পৃঃ ১৩৬।

৪৩। দ্রঃ Calcutta Christian Observer, Vol. 17; পৃঃ ৫৫৭।

৪৪। দ্রঃ Eustace : পৃঃ ২৯৩; Smith : পৃঃ ১৮৬; Walker : পৃঃ ২৭০। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই ওল্ড টেস্টামেণ্টের বৃহৎ অংশের অনুবাদ নিষ্পন্ন হয়েছিল। দ্রঃ S. K. De : পৃঃ ১০৭।

৪৫। তবে কেরী 'জেনেসিস্'-অনুবাদের ক্ষেত্রে টমাসের কথা উল্লেখ করলেও. তাঁর ওল্ড টেস্টামেণ্টে 'জেনেসিস্'-এর আদি অনুবাদকরূপে টমাসের নাম উল্লেখ করেন নি; পক্ষান্তরে এই অনুবাদ তাঁর নিজস্ব বলেই জানিয়েছেন। দ্রঃ Eustace : পৃঃ ৩৪৫।

৪৬। নিউ টেস্টামেণ্টের অনুবাদে রামরাম বসুর সহায়তা অবশ্যই প্রধান ছিল; তবে সহায়তার ক্ষেত্রে তিনি একক ছিলেন না, অপরাপর পণ্ডিতরাও কেরীকে গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য নিবেদন করেছিলেন। দ্রঃ ঐ। পৃঃ ২৭৬; Smith : পৃঃ ১৮৭।

৪৭। কেরী জানিয়েছেন যে ফাউণ্টেন 'রুথ' ও 'জাজেস্' অনুবাদ করেছেন ও 'জশুয়া' অনুবাদ করছেন। দ্রঃ Eustace : পৃঃ ৩৩০। অন্যত্রও বলেছেন, 'There remains to be done now from I Samuel to Job, which brother Fountain is hard at work on, only I shall correct the copy'. ঐ। পৃঃ ৩৩৫। এই পত্রেই কেরী আবার জানাচ্ছেন যে, 'জব' তিনি নিজেই অনুবাদ করবেন। তাহলে এই দাঁড়ায় যে ফাউণ্টেন প্রায় পুরোপুরি 'হিস্টোরিক্যাল বুক্স্' অনুবাদ করেছিলেন। অর্থাৎ, ১ ও ২ 'স্যামুয়েল'; ১ ও ২ 'কিংস্'; ১ ও ২ 'ক্রনিক্ল্স্', 'এজরা' ও 'নেহিমিয়া'। ফলে ওল্ড টেস্টামেণ্টে ফাউণ্টেনের অনুবাদ অংশের পরিধি বেশ বিস্তৃত ছিল বলেই মনে হয়। শেষ পর্যন্ত ফাউণ্টেন 'জশুয়া', 'জাজেস্', 'রুথ', ১ ও ২ 'স্যামুয়েল', ১ ও ২ 'কিংস্', ও ২ 'ক্রনিক্স্ল্'-এর অনুবাদই হয়তো করে থাকবেন। 'হিস্টোরিক্যাল বুক্স্'-এর অন্যান্য অংশ, যা ফাউণ্টেন অনুবাদ করবেন বলে ইতিপূর্বে নির্দিষ্ট হয়েছিল, অর্থাৎ ১ 'ক্রনিক্ল্স্', 'এজরা', ও 'নেহিমিয়া' —কেরী স্বয়ং অনুবাদ করেছিলেন। দ্রঃ ঐ। পৃঃ ৩৪৫।

৪৮। দ্রঃ ঐ। পৃঃ ২৭৬।

৪৯। দ্রঃ ঐ। ঐ।

৫০। দ্রঃ ঐ। পৃঃ ২৮৪। সাটক্লিফ্কে লেখা চিঠি।

৫১। দ্রঃ Smith পৃঃ ১৮৭।

৫২। দ্রঃ Eustace : পৃঃ ২৭৬; Smith : পৃঃ ১৮৬-৮৭। ডড্রিজের 'Family Expositor' ছয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল (১৭৩৯-৫৬)। কেরী প্রথম খণ্ডখানিই ব্যবহার করেছিলেন বলে মনে হয়। নিউ টেস্টামেণ্টের এই ভাষ্য তৎকালীন রুচির অনুকূল হলেও কোনদিক থেকেই খুব আকর্ষণীয় ছিল বলে মনে করা হয় না। কেরীর অনুবাদের ওপর এই ভাষ্য ব্যবহারের ফলাফল সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না।

৫৩। বাইবেল মুদ্রণের জন্য প্রাথমিক প্রায় সব কাজই ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কেরী সম্পন্ন করেছিলেন। এই সময় আকস্মিক যোগাযোগে তাঁর কর্মক্ষেত্র উত্তরবঙ্গ থেকে শ্রীরামপুর স্থানান্তরিত হলে বাংলা বাইবেল মুদ্রণের ইতিহাসে এই দিনেমার শহরটির নাম চিহ্নিত হয়ে যায়, ও মদনাবাটির নাম উপেক্ষিত হয়। জানুয়ারি মাস শেষ হবার আগেই মুদ্রণযন্ত্র ও মুদ্রণের বিষয় নিয়ে শ্রীরামপুর প্রস্তুত হয়েছিল। দ্রঃ Eustace : পৃঃ ৩৯০।

৫৪। দ্রঃ ঐ। পৃঃ ৪০৩; S. K. De : পৃঃ ৪৮৭; Hooper : পৃঃ ২৮।

৫৫। দ্রঃ Eustace : পৃঃ ৩৯০।
৫৬। দ্রঃ S. K. De : পৃঃ ৪৮৭।
৫৭। দ্রঃ ঐ। পৃঃ ঐ।
৫৮। কেরী লিখেছেনঃ 'I find the copy, after three or four revisals, still to require a very close examination, and rigid correction ; besides the labour of correcting the proofs.' Eustace: পৃঃ ৪২৮। প্রুফ সংশোধনের প্রধান বাধা স্বরূপ কেরী বাংলা বানান সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন।
৫৯। দ্রঃ Smith : পৃঃ ১৮৭; Walker : পৃঃ ২২৯।
৬০। দ্রঃ Eustace : পৃঃ ৪০২; Smith : পৃঃ ১৮২ ও ১৮৭। বিভিন্ন কাগজে ছাপার কারণ দুইঃ ১। য়ুরোপীয় গ্রাহকবর্গ; ২। ছাপার খরচ কমানো। বস্তুত নিউ টেস্টামেণ্টের মুদ্রণ স্বল্পব্যয়েই সম্পন্ন হয়। দ্রঃ Eustace : পৃঃ ৪৪৬।
৬১। ঐ। পৃঃ ৪৫৭।
৬২। দ্রঃ Smith : পৃঃ ১৮৮।
৬৩। দ্রঃ S. K. De : পৃঃ ১০৯ ও ৪৮৮।
৬৪। দ্রঃ Smith : পৃঃ ১৮৮।
৬৫। দ্রঃ ঐ। পৃঃ ১৮৯।
৬৬। Tenth Memoir-এ দেওয়া ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ ভুল বলে ডঃ দে জানিয়েছেন। দ্রঃ S. K. De : পৃঃ ৪৮৮।
৬৭। নিউ টেস্টামেণ্টের ষষ্ঠ সংস্করণ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। দ্রঃ ঐ। ঐ।
৬৮। শ্রীরামপুর কলেজের জনৈক সংস্কৃতের অধ্যাপক নিউ টেস্টামেণ্টের প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ ও অষ্টম সংস্করণের পাঠ বিচার করে এস· পি· কেরীকে জানিয়েছেন যে, প্রায় প্রত্যেকটি সংস্করণে অনুবাদ অধিকতর সার্থক হয়ে উঠেছে। দ্রঃ S. P. Carey : পৃঃ ৪২২। আবার, ভাষার দিক থেকে কেরী যে শেষ পর্যন্ত বেশি উন্নতি করতে পেরেছিলেন, সজনীকান্ত দাস তা মনে করেন না। দ্রঃ সজনীকান্তঃ পৃঃ ৯৭। সুকুমার সেনের মতও সজনীকান্তের অনুরূপ। দ্রঃ সুকুমার সেনঃ বাংলা সাহিত্যে গদ্য; কলকাতা, ১৩৭৩ বংগাব্দ; পৃঃ ১৬।
৬৯। দ্রঃ S. K. De : পৃঃ ৪৮৭।
৭০। এই সব তারিখ Serampore Memoir অনুযায়ী, যা Smith ও সজনীকান্ত গ্রহণ করেছেন। সুশীলকুমার দে পুস্তকের আখ্যাপত্র অনুযায়ী ১৮০১-১৮০৯-এর মধ্যে ওল্ড টেস্টামেণ্টের প্রকাশকাল নির্দেশ করেও পাদটীকায় Serampore Memoir অনুযায়ী কালজ্ঞাপন করেছেন। দ্রঃ S. K. De : পৃঃ ১০৮।
৭১। দ্রঃ Eustace : পৃঃ ৪৫৭।
৭২। উভয় অংশই সজনীকান্তে উদ্ধৃত। পৃঃ ১৪০।
৭৩। এই গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি এই রকমঃ "ধর্ম্মপুস্তক। তাহা ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য।—। যাহা প্রকাশ করিয়াছেন মনুষ্যের ত্রাণ ও কার্য্যশোধনার্থে।

তাহার প্রথম ভাগ যাহাতে চারি বর্গ—মোশার ব্যবস্থা।—। য়িশরালের বিবরণ।—। গীতাদি।ভবিষ্যত বাক্য। মোশার ব্যবস্থা—। তর্জ্জমা হইল ঙেব্রি ভাষা হইতে।—। শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—। ১৮০১।"

৭৪। সজনীকান্তে উদ্ধৃত। পৃঃ ১৪০।

৭৫। দ্রঃ S. K. De : পৃঃ ১০৮। এই পুস্তিকাটির আখ্যাপত্র এই রকমঃ "দাউদের গীত।—এবং। য়িশ ঙিহার ভবিষ্যৎ বাক্য—। শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। —১৮০৩।—"। এই গ্রন্থখানি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়েছিল।

৭৬। ভবিষ্যদ্বাক্যের আখ্যাপত্রঃ "ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য।—মানুষের ত্রাণ ও কার্য্যশোধনার্থে। যাহা প্রকাশ করিয়াছেন।—তাহাই। ধর্ম্মপুস্তক। তাহার প্রথম ভাগ যাহাতে চারি বর্গ। —মোশাকরণক ব্যবস্থা। য়িশরালের বিবরণ।—গীতাদি। ভবিষ্যদ্বাক্য। তাহার চতুর্থ বর্গ ভবিষ্যদ্বাক্য এই।—এব্রি ভাষা হইতে তর্জ্জমা হইল।—শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। ১৮০৫।"

৭৭। য়িশ্রালের বিবরণের আখ্যাপত্রঃ "ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য।—। বিশেষতঃ। মনুষ্যের ত্রাণ ও কার্য্যসাধনার্থ তিনি যাহা প্রকাশ। করিয়াছেন।— অর্থাৎ। ধর্ম্মপুস্তক। । তাহার প্রথম ভাগ—যাহাতে চারিবর্গ। মোশার ব্যবস্থা। —য়িশ্রালের বিবরণ।—গীতাদি।—ভবিষ্যদ্বাক্য।—তাহার দ্বিতীয় বর্গ অর্থাৎ য়িশ্রালের বিবরণ এই।—এব্রি ভাষা হইতে তর্জ্জমা হইল। শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—১৮০৯"।

৭৮। দ্রঃ S. P. Carey : পৃঃ ৪১৬।

৭৯। দ্রঃ Smith : পৃঃ ১৯০।

৮০। দ্রঃ S. P. Carey : পৃঃ ৪১৭। নিউ টেস্টামেন্টের অনুবাদে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত পুরুষরাম-এর অংশ সম্পর্কেও ঐতিহাসিক অনুসন্ধান প্রয়োজন। পুরুষরামই কি ওড়িয়া নিউ টেস্টামেন্টের মূল অনুবাদক? দ্রঃ Rev. Claudius Buchanan : The College of Fort William in Bengal, 1805, পৃঃ ২২০।

৮১। ফুলারকে লেখা ২৭-২-১৮০৪ তারিখের কেরীর চিঠি। দ্রঃ Eustace : পৃঃ ৪৬৯।

৮২। দ্রঃ ঐ। পৃঃ ৪৯৯।

৮৩। ১৮১৪ সালের অগাস্টের রিপোর্টে দেখা যায় যে ওড়িয়া বাইবেলের শেষ খণ্ড মুদ্রণের জন্য ছাপাখানায় গেছে। দ্রঃ ঐ। পৃঃ ৫৩৪। জুলিয়াস রিচার এই অনুবাদের কাল ১৮১১-১৮১৭ বলেছেন। দ্রঃ Ritcher : পৃঃ ২৯০।

৮৪। গ্রীয়ারসন সংজ্ঞা দিয়েছেনঃ "We must define Urdu as the Persianized Hindostani of educated Mussalmans, while Hindi is the Sanskritized Hindostani of educated Hindus." হুপারের গ্রন্থে উদ্ধৃত, দ্রঃ Hooper : পৃঃ ৩৬। এবং হিন্দী বলতে শ্রীরামপুর মিশনারীরা বুঝতেন, "..............that dialect of Hindustani, which was derived principally from the Sanskrit, and which before the invasion of the Mussalmans, was spoken through out Hindustan,

and was still the language most extensively used among the common people." এস. পি. কেরীর গ্রন্থে উদ্ধৃত; দ্রঃ S. P. Carey : পৃঃ ৪১৭। কেরী অবশ্য বাংলা দেশে আসবার পর পর হিন্দুস্থানী ভাষা সম্পর্কে ভুল ধারণা তৈরী করেছিলেন, তিনি হিন্দুস্থানীকে বাংলা ও ফার্সীর মিশ্রণজাত বলে মনে করেছেন। দ্রঃ Eustace : পৃঃ ১৯৫। বোঝা যায়, এই ধারণা পরে সংশোধিত হয়েছিল। তবু হিন্দী ও হিন্দুস্থানীর মধ্যে কেরী নিশ্চিত পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেন নি বলেই মনে হয়। দ্রঃ Walker : পৃঃ ২৭২।

৮৫। তাঁর ভাষা ছিল 'দক্ষিণী'; অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত আরবি-ফারসী বহুল হিন্দুস্থানী; হরফ ছিল আরবি। অনুবাদের মূল্য তুচ্ছ। দ্রঃ Ritcher : পৃঃ ১১৩।

৮৬। দ্রঃ Smith : পৃঃ ১৭৯।

৮৭। ঐ।ঐ।

৮৮। ১৮-১-১৮০৮ তারিখে সাটক্লিফকে লিখিত চিঠিতেই কেরী জানিয়েছেন যে হিন্দুস্থানী অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়েছে ও তা ছাপাখানায় পাঠান হয়েছে। Eustace : পৃঃ ৪৯৯। আরও, দ্রঃ Smith : পৃঃ ১৯৩।

৮৯। চেম্বারলেন 'হিন্দুঈ' (হিন্দুবী) ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন। হিন্দুদের ভাষা বোঝাতে তিনি 'হিন্দুঈ' (হিন্দুবী) ব্যবহার করেছেন, যার চরিত্র হিন্দুস্থানী থেকে কিছু আলাদা। তিনি 'হিন্দুঈ' (হিন্দুবী) ভাষার সঙ্গে ব্রজভাষাতেও বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। চেম্বারলেনের সঙ্গে কেরীর সম্পর্ক খুবই হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল বলে, তাঁর অননূদিত অংশের অনুবাদ সম্পূর্ণ করে তিনি ব্রজভাষায় নিউ টেস্টামেন্টের প্রকাশ করেন ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে। দ্রঃ S. P. Carey, পৃঃ ৪২০। অবশ্য ইতিপূর্বে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দেই ব্রজভাষায় গস্‌পেলগুলি প্রচারিত হয়েছিল। দ্রঃ Hooper : পৃঃ ৩৪।

৯০। দ্রঃ W. Yates : Memoirs of Mr. John Chamberlain; Calcutta, 1824. পৃঃ ৩০৪ ও ৩১৪।

৯১। দ্রঃ ঐ।পৃঃ ৩০৭।

৯২। দ্রঃ Eustace : পৃঃ ৪৭৯; Smith : ১৭৯।

৯৩। দ্রঃ ২৭-২-১৮০৪ তারিখে ফুলারকে লেখা কেরীর চিঠি। Eustace : পৃঃ ৪৭০।

৯৪। দ্রঃ ঐ।পৃঃ ৪৬৩।

৯৫। দ্রঃ Rev. C. Buchanan : College of Fort William in Bengal 1805; পৃঃ ২০০।

৯৬। দ্রঃ Smith : পৃঃ ২৪৬। এই গ্রন্থখানিই যে কেরী-কথিত সহায়ক পণ্ডিতের অনুবাদ, তাতে সন্দেহ নেই, কেননা শ্রীরামপুর কেরী লাইব্রেরী থেকে কেরীর মারাঠি বাইবেল অনুবাদের যে তালিকা আমরা সংগ্রহ করেছি, তাতে নাগরী হরফে ১৮০৫ সালের ম্যাথুর গস্‌পেলেরই মাত্র উল্লেখ আছে; অন্যান্য মারাঠি অনুবাদ নাগরীতে ছাপা হয়নি। আর এই পণ্ডিত যে নাগরীতেই

অনুবাদ করেছিলেন, তার প্রমাণ কেরীর একখানি চিঠি। দ্রঃ Eustace : পৃঃ ৪৬৩।

৯৭। Memoir Relative to the Translations (1807)—থেকে একটি অংশ বর্তমান প্রসঙ্গে স্মিথ উদ্ধার করেছেন। দ্রঃ Smith : পৃঃ ১৮২।

৯৮। গ্রীয়ার্সন পেণ্টাটিয়ুখ ১৮১৩, হিস্টোরিক্যাল বুক্স্ ১৮১৬, প্রোফেটিক্যাল বুক্স্ ১৮১৯ বলে উল্লেখ করেছিলেন। এই তারিখগুলি নিয়ে ডক্টর পিঙ্গে খুবই বিপদগ্রস্ত হয়েছেন। দ্রঃ ডক্টর শ্রীনিবাস মধুসূদন পিঙ্গেঃ য়ুরোপীয়ান্চা মারাঠীচা অভ্যাস ব সেবা; ঔরঙ্গাবাদ, ১৯৬০; পৃঃ ৫৭।

৯৯। দ্রঃ Hooper : পৃঃ ৭৫।

১০০। দ্রঃ Eustace : পৃঃ ৫৩৪।

১০১। ১৮০৮-৯ সালের মধ্যে শ্রীরামপুর সম্ভবতঃ কানাড়ীতে নিউ টেস্টামেণ্টের অনুবাদ অনেকখানি সম্পন্ন করে থাকবেন। দ্রঃ Eustace : পৃঃ ৪৯৯; Smith : পৃঃ ১৮৩। কিন্তু ১৮১২-র সর্বক্ষয়ী অগ্নিকাণ্ডে তা নষ্ট হয়ে যায়। দীর্ঘদিন পরে আবার এই অনুবাদের প্রকাশে তাঁরা সক্ষম হন। লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির জন হ্যাণ্ড্স (John Hands) ওল্ড টেস্টামেণ্টের কানাড়ী অনুবাদে হাত দিয়েছেন জেনে কেরী আর ওল্ড টেস্টামেণ্টের অনুবাদে অগ্রসর হননি। দ্রঃ S. P. Carey : পৃঃ ৪২০।

১০২। কেরী পাঞ্জাবীকে 'language of the Seeks' বা শুধু Seek, এবং তেলুগুকে 'Telinga' বলে উল্লেখ করতে অভ্যস্ত ছিলেন।

১০৩। দ্রঃ S. P. Carey: পৃঃ ৪১৯-৪২০।

১০৪। দ্রঃ ঐ। পৃঃ ৪২২।

১০৫। দ্রঃ Eustace : পৃঃ ৫৩৪।

১০৬। দ্রঃ Hooper : পৃঃ ৯১।

১০৭। উইলসন কেরীর নামে প্রচলিত অনেকগুলি অনুবাদের ক্ষেত্রেই যে (ক) 'too scholastic a style' ও (খ) 'too much of the nature of Sanskrit compositions'-এর অভিযোগ তুলেছেন, অসমীয় বাইবেল অনুবাদ প্রসঙ্গেও সে-কথা প্রযোজ্য। দ্রঃ উইলসনের প্রবন্ধ, Eustace : পৃঃ ৬০৯।

১০৮। দ্রঃ E. A. Nida : Towards the science of translating; Leiden, 1964. পৃঃ ২৩। হিব্রু থেকে গ্রীকে মূলানুগ ও আক্ষরিক অনুবাদের দৃষ্টান্ত Nida কর্তৃক ভর্ৎসিত হয়েছে।

১০৯। যেমন Malinowski-কথিত 'context of situation' ইত্যাদি। দ্রঃ B. Malinowski in Ogden and Richards : The Meaning of Meaning; London, 1952.

১১০। সুকুমার সেনঃ বাংলা সাহিত্যে গদ্য; চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ; পৃঃ ১৬।

১১১। দ্রঃ S. K. Das : Early Bengali Prose; Calcutta, 1966; পৃঃ ৬৪-৬৭।

২। ব্যাকরণ রচনা

খ্রীষ্টধর্মবিষয়ক রচনার বাইরে বাংলা ভাষার ব্যাকরণই কেরীর সর্বপ্রথম রচনা; ধর্মপুস্তক যেহেতু অনুবাদমূলক, সেইজন্য বাংলা ব্যাকরণ (১৮০১) তাঁর প্রথম মৌলিক রচনাও বটে। অর্থাৎ ভাষাসাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যাকরণকে অবলম্বন করেই তাঁর মৌলিক রচনার আবির্ভাব সূচিত হয়েছিল। কেরী যখন প্রাচ্যবিদ্যায় মনোনিবেশ করেছিলেন, তখন ভাষাশিক্ষার উপযোগী কোন ব্যবস্থাই ছিল না, প্রাথমিক ধরনের সহায়তাও তখন কোনখান থেকে পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। সংস্কৃত বা আরবি ফার্সির মত ধ্রুপদী ভাষা ছাড়া আধুনিক ভারতীয় আর্য-ভাষার ব্যাকরণ-সূত্র তখন রচিত হয়নি, বা হলেও তা দুষ্প্রাপ্য ছিল। কেরীর পক্ষে সৌভাগ্য এই ছিল যে, যে বাংলা ভাষাকে নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে তাঁর প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার সূত্রপাত, ইতিপূর্বে হালহেড তার একখানি ব্যাকরণ সংকলন করে গিয়েছিলেন (১৭৭৮)। হালহেডের গ্রন্থ পরিকল্পনা দ্বারা তিনি অনেকখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন সত্য, তথাপি আপন পর্যবেক্ষণেই তিনি প্রধানভাবে বাংলা ভাষার গঠনপদ্ধতি অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছিলেন বলে তাঁর রচনায় স্বকীয়তার পরিচয়ও যথেষ্ট। আরবি ফার্সির মিশ্রণে বাংলাভাষার যে বিকৃতি ঘটে, হালহেড তার প্রতি বিরূপতা দেখিয়েছেন, কেরী কিন্তু বিশুদ্ধ বাংলা সন্ধান করতে গিয়েও বিদেশী শব্দের উপস্থিতিকে ভাষার শক্তিবৃদ্ধির উপাদানরূপেই লক্ষ্য করতে চেয়েছেন। হালহেড বিশুদ্ধ কাব্যভাষাকে অবলম্বন করে যেখানে ভাষা বিশ্লেষণ করেন, কেরী সেখানে উপভাষার বৈচিত্র্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারেন নি। অবশ্য প্রথম সংস্করণ বাংলা ব্যাকরণের ভূমিকায় প্রকাশিত কেরীর এই মানসিকতা পরবর্তীকালে অক্ষুণ্ণ থাকেনি, উত্তরোত্তর তিনি সংস্কৃতমনস্ক হয়েছেন।

বাংলাভাষার ব্যাকরণ রচনার মাধ্যমেই ব্যাকরণকার রূপে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ, অতঃপর তিনি সংস্কৃত ছাড়াও বিভিন্ন আধুনিক ভারতীয় ভাষার ব্যাকরণ রচনায় মনোযোগী হন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকের দায়িত্ববোধে তিনি সংস্কৃত ও মারাঠা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন; পাঞ্জাবী, তেলুগু বা কানাড়ি ভাষার ব্যাকরণ রচনা করে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার বৈজ্ঞানিক কাঠামো স্থির করবার বৃহত্তর দায়িত্ববোধের পরিচয় দেন। তাঁর রচনাগুলি সব সময় অভ্রান্ত ও সম্পূর্ণ নয়, তথাপি ফোর্ট উইলিয়ম

কলেজে বিভিন্ন ভাষাভাষী পণ্ডিতদের ও শ্রীরামপুরে বাইবেল অনুবাদের কাজে সমবেত পণ্ডিতদের সান্নিধ্য ও সহায়তার এই অভূতপূর্ব সুযোগকে তিনি ব্যর্থ হতে দিতে চাননি। কেরীর কৃতিত্ব এই যে, তিনি 'combining with the necessities of himself and of others, engaged him at various periods in the compilation of original and valuable elementary works.'১

কেরীর পূর্ববর্তী বাংলা ব্যাকরণ রচনা

আস্‌সুম্পসাউঃ

'পাদ্রি মানোএল-দা-আস্‌সুম্পসাম্‌-রচিত বাংলা ব্যাকরণ' সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন সেনের সম্পাদনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩১ খৃীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এর আগে মানোএলের ব্যাকরণ সম্পর্কে আমাদের কোন প্রত্যক্ষ ধারণা ছিল না। বিদেশীদের হাতে বাংলা ব্যাকরণ চর্চা প্রথম সূচিত হয়েছিল, এবং এই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে মানোএল প্রথম বাংলা ব্যাকরণকার না-ও হতে পারেন,২ কিন্তু তাঁর ব্যাকরণই যেহেতু পর্তুগীজ পাদ্রিদের ব্যাকরণচর্চার দৃষ্টান্তরূপে আমাদের কাছে উপস্থিত আছে, সেই জন্য তাঁকে সচরাচর প্রথম বাংলা ব্যাকরণকার রূপে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

মানোএলের বাংলা ব্যাকরণ পর্তুগীজ ভাষায় রচিত। প্রিয়রঞ্জন সেন তার বাংলা অনুবাদ করেছেন। গ্রন্থখানি লিসবন থেকে ১৭৪৩ খৃীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, এর রচনাকাল ১৭৩৪।৩ মাত্র চল্লিশ পৃষ্ঠায় গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ।

মানোএল ভাষা হিসাবে বাংলার নিকৃষ্টতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন। বাংলা ভাষা ল্যাটিন ভাষার রীতি ও বিধি অনুসরণ করে না, এটাই তাঁর বিবেচনায় বাংলার অপকৃষ্টতার কারণ।৪ তিনি যখন বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন, তখন তার পিছনে তাঁর ল্যাটিন সংস্কার ও আদর্শ বিশেষভাবে উপস্থিত ছিল।৫ দুই ভাষার প্রকৃতিগত বৈসাদৃশ্য গুরুতর হওয়ার দরুণ বৈয়াকরণরূপে মানোএলের ভূমিকাটি হয়েছিল ত্রুটিপূর্ণ, এবং তাঁর রচনাও অনেকক্ষেত্রে অসঙ্গতি দুষ্ট।

মানোএল এক জায়গায় বলছেনঃ '...এই বঙ্গ ভাষা বিশুদ্ধ নয়, পরন্তু হিন্দুস্থানী ও সংস্কৃতের মিশ্রণ, ইহা নিয়মিত নয়,'।৬ এই মনোভাব বাংলা ভাষা সম্পর্কে যখন তাঁর সজ্ঞানতার পরিচয় দেয় না, তখনও তিনি বাংলা ভাষার ব্যাকরণই রচনা করেছেন, অর্থাৎ স্বতন্ত্র ভাষারূপে বাংলাকে তিনি নিরূপণ করতে পেরেছিলেন। এই ভাষার ব্যাকরণ যে

তিনি রচনা করেছিলেন, অবশ্যই তার কারণ পর্তুগীজ পাদ্রিদের অব্যবহিত প্রয়োজন-চিন্তা; কিন্তু তিনি বাংলা ভাষাকে নিকৃষ্ট ভাষা রূপে দেখতেই অভ্যস্ত ছিলেন। অর্থাৎ, ভাষা সম্পর্কে কোন শিষ্টচেতনা দ্বারা তিনি ব্যাকরণ রচনায় উদ্বুদ্ধ হননি। এখানেই পরবর্তীকালের ইংরেজ ব্যাকরণ-কারদের তাৎপর্যের সঙ্গে তিনি যোগাযোগহীন। আবার, তিনি যখন বাংলাভাষাকে অনিয়মিত বলে উল্লেখ করেন, তখন তাঁর এই পর্যবেক্ষণ তাঁর মধ্যে কোন সদর্থক গঠনধর্মী প্রবণতার উৎসার ঘটায়নি; অথচ আমরা পরবর্তী ইংরেজ ব্যাকরণকারদের মধ্যে লক্ষ্য করেছি যে তাঁরা এই অনিয়মিত বাংলা ভাষাকে নিয়মিত রূপধর্মে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। এর কারণ অবশ্যই বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্য ও উৎকর্ষ সম্বন্ধে তাঁদের প্রত্যয়িত মনো-ভঙ্গি, যার অভাবে মানোএলের বৈয়াকবণ-ভূমিকা অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ। ব্যাকরণ রচনা প্রকৃতপক্ষে ভাষার গঠনচর্চা; ফলে উদ্যম হিসাবে তা গঠন-মূলক; মানোএলের মধ্যে এই প্রবৃত্তি কতখানি চরিতার্থ হয়েছিল, এই প্রশ্ন অবশ্যই থেকে যাবে; তিনি বাংলা ভাষার কতগুলি প্রকৃতি লক্ষ্য করতে চেয়েছিলেন মাত্র।

প্রকৃতপক্ষে, তাঁর ব্যাকরণে ধ্বনিতত্ত্ব সম্বন্ধে যে কোনও আলোচনা নেই, তা ভাষাকে পূর্ণাঙ্গরূপে লক্ষ্য করবার প্রবণতার অনুপস্থিতিই প্রমাণ করে। বাংলা ভাষার ধ্বনি সম্পর্কে অসহায়ভাবে তিনি কতগুলি অসুবিধার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন মাত্র।৭ ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে নীরবতা যে-কোনও অবস্থাতেই ব্যাকরণকারের ভূমিকাকে আহত করে। মনে হয় সংস্কৃত সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব তাঁর কাছে উচ্চারণ-ধ্বনির বৈজ্ঞানিক নিরূপণের পক্ষে বাধাস্বরূপ ছিল, পরবর্তী ইংরেজ ব্যাকরণকাররা পক্ষান্তরে সংস্কৃত সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন; তাঁদের এই অধিকার ধ্বনিতত্ত্ব অনুসরণে তাঁদের সহায়ক হয়ে থাকবে। মানোএলের রচনা ফলে নিতান্তই খণ্ড পর্যবেক্ষণ, তাঁর উত্থাপিত প্রসঙ্গগুলি রূপতত্ত্ব ও বাক্যরীতি সম্পর্কিত মাত্র।

মানোএলের শব্দ বিষয়ক আলোচনায় অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি শব্দরূপকে সংস্কৃতের মত লিঙ্গের ওপর নির্ভরশীলরূপে লক্ষ্য করেন নি। শব্দরূপে তিনি ছ'টি কারক ও ছ'টি বিভক্তির কথা উল্লেখ করেছেন, যথাঃ কর্তৃকারক, সম্বন্ধ, সম্প্রদান, কর্ম, সম্বোধন ও অপাদান। সুনীতিকুমার জানিয়েছেন যে ল্যাটিনে করণ, অপাদান ও অধিকরণ একই বিভক্তি দ্বারা দ্যোতিত হয়, এবং এই কারক ল্যাটিনে Ablativus বলে উল্লিখিত।৮ মানোএল Ablativo লিখেছেন, করণ ইত্যাদির অনুল্লেখের

সূত্র এখানে পাওয়া যাবে। মানোএল প্রচলিত বাংলায় বহুবচনের রূপ নির্দেশ করেন নি, এবং তিনি বলেছেন যে 'চলিত বাংলা ভাষায় বহুবচনের প্রয়োগ নাই'; তথাপি কোন কোন ক্ষেত্রে বহুবচনাত্মক শব্দরূপ যে বাংলায় প্রচলিত, তা তিনি দেখাতে ভোলেন নি; এই রূপ সাধু বাংলায় প্রচলিত।৯ বিশেষণের শব্দরূপ বিশেষ্যের রূপ অনুযায়ী নিষ্পন্ন হয় বলে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর দেওয়া কয়েকটি উদাহরণের সাক্ষ্যে বোঝা যায় যে, বিশেষ্যের লিঙ্গ অনুসারে বিশেষণের লিঙ্গ নিষ্পত্তির প্রচলন-ও তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। যেমনঃ করুণাময় পুরুভু/করুণাময়ী মারিয়া; বুড়া পুরুষ/বুড়ি মাইয়া ইত্যাদি। সর্বনামকে কর্তৃপদের মতই তিনি ছ'টি ভাগে চিহ্নিত করেছেন। ক্রিয়ার রূপ নিষ্পত্তিতে পূর্ববাংলার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা তিনি অনেক সময় প্রভাবিত, কিন্তু সাধু ক্রিয়াপদ সম্পর্কে এক ধরনের রক্ষণশীলতা প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়া ক্রিয়ার কাল ইত্যাদিও প্রসঙ্গরূপে গৃহীত হয়েছে। বাক্যযোজনা অংশে বাক্যযোজনার সূত্রের সঙ্গে পদসাধনের সূত্র উদ্ধৃত হয়েছে দেখা যায়, অর্থাৎ এখানকার একটি বড় অংশ রূপতত্ত্ব বিষয়ক। কারক দ্যোতক অনুসর্গ, ক্রিয়াবিশেষণ, অব্যয়, বিশেষণের তারতম্য নির্দেশে প্রত্যয় ব্যবহারের অনাবশ্যকতা, যৌগিকক্রিয়া ইত্যাদি অনেকগুলি প্রসঙ্গই বাক্যযোজনা অংশে উত্থাপিত হয়েছে।

মানোএলের বাংলা ব্যাকরণ সম্পূর্ণতার দাবি করে না। হালহেড ও কেরী পরবর্তীকালে একটি ভাষাগঠনের বোধে ব্যাকরণ রচনার পথে অগ্রসর হয়েছিলেন, মানোএল সেইভাবে অগ্রসর হন নি। বৈয়াকরণ হিসাবে এতে মানোএলের তাৎপর্য কিছুটা ক্ষুণ্ণ হতে পারে। তথাপি তাঁর ব্যাকরণের স্বাতন্ত্র্যও অস্বীকার করা যায় না। তিনিই প্রথম বাংলা ব্যাকরণকার; এবং প্রথম বাংলা ব্যাকরণকার সংস্কৃত সংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন ছিলেন না, এই তথ্যটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বাংলার দুই রূপ সম্পর্কেই অবহিত ছিলেন, Bengala Vulgar ও Bengala Politica—এবং লক্ষ্য করতে চেয়েছিলেন অন্য-নিরপেক্ষ আপন প্রকৃতি-নির্ভর বাংলা ভাষাকে। কিন্তু ল্যাটিন সংস্কার পরবর্তীদের সংস্কৃত সংস্কারের স্থলে উপস্থিত থাকায়, স্বভাবতই কিছু বিভ্রান্তি ঘটে গেছে।

নাথানিয়েল ব্রেসী হালহেড১০

নাথানিয়েল ব্রেসী হালহেডের 'A Grammar of the Bengal Language' ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলা

সাহিত্যের ইতিহাসে এই গ্রন্থের রচনা ও প্রকাশনা প্রধানতঃ দুইটি দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ বাংলাদেশে এই প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ যাতে ছাপা অক্ষরে বাংলা হরফ ব্যবহার করা হয়েছে; দ্বিতীয়তঃ এই প্রথম বাংলা ব্যাকরণ যার মধ্যে ভাষানিয়ন্ত্রণের সচেতনতা উচ্চারিত। চার্লস্ উইলকিন্স্ এই গ্রন্থের জন্য যে ছাপার হরফ প্রস্তুত করেন, তার দ্বারাই বাংলা ভাষা-সাহিত্যের ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের প্রাথমিক উপাদান উন্মীলিত হয়।

ইতিহাসের দিক থেকে হালহেডের ব্যাকরণ বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ নয়, কিন্তু তাঁর ব্যাকরণের পরিকল্পনাটি তাঁর নিজস্ব। তাঁর এই পরিকল্পনাটির সত্য তিনি খুব স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেনঃ 'The following work presents the Bengal language mearly as derived from its parent the Shanscrit.'১১ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে য়ুরোপে স্বতন্ত্র একটি ভাষারূপে বাংলার অস্তিত্ব সম্পর্কেই সংশয় ছিল, সেখানকার সাধারণ ধারণা ছিল যে বাংলায় ফার্সী হিন্দুস্থানী ভাষাই প্রচলিত, এবং হালহেড একে 'prejudice' বলে মনে করতেন। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, 'The many political revolutions it has sustained, have greatly impared the simplicity of its language'.১২

ফলে বাংলা ভাষার বিশুদ্ধ রূপ অনুসন্ধান করা কষ্টসাধ্য। এবং বাংলাদেশে য়ুরোপীয়রা যে বাংলা ভাষা দেখেছেন বা শিখেছেন, স্বাভাবিকভাবেই তার মধ্য দিয়ে বিশুদ্ধ বাংলা ভাষার সত্যরূপ ধরা পড়তে পারে না, কেননা এই সব য়ুরোপীয়রা প্রায় কেউই সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতার দিকটি লক্ষ্য করেন নি। হালহেড বলেন, 'therefore I conclude their systems must be imperfect . . . we may urge the impossibility of learning the Bengal dialect without a general and comprehensive idea of the Shanscrit'.১৩ এই জন্যই বাংলা ব্যাকরণসূত্র অনুধাবনে সংস্কৃত ব্যাকরণসূত্রের প্রয়োজন যেখানে প্রত্যক্ষতঃ দেখা দিয়েছে, সেখানেই তিনি তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, বাংলা ব্যাকরণ সংকলনে হালহেড যে সংস্কৃত-মনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন, তার মধ্য দিয়ে একটি নূতন প্রবণতার আত্মপ্রকাশ ঘটে; এবং অব্যবহিত পরবর্তী য়ুরোপীয় বাংলা-ভাষা-পথিকরা এই প্রবণতাকে একটি চিন্তাধারা ও শক্তিরূপে চর্চা করেছিলেন। হালহেডের ব্যাকরণ পরিকল্পনার গৌরব এইখানে যে, তিনি বিশুদ্ধ বাংলা ভাষার রূপ সন্ধান করেছিলেন নিজস্ব ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্বাসের আলোকে, এবং সেই রূপটিকে সুনির্দিষ্ট করে তুলতে চেয়েছিলেন ব্যাকরণ রচনার মাধ্যমে। তাঁর নিজস্ব এই ভূমিকা সম্পর্কে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন, ফলে

অকটপভাবে তিনি বলতে পেরেছেনঃ 'The path which I have attempted to clear was never before trodden; it was necessary that I should make my own choice of the course to be persued, and of the landmarks to be set up for the guidance of future travellers'.১৪

অথচ তাঁর গ্রন্থরচনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে হালহেড অতিশয় উচ্চারিত ছিলেন। গ্রন্থের আখ্যাপত্রেই উদ্দেশ্যটি প্রথম উচ্চারিতঃ 'বোধপ্রকাশ° শব্দ শাস্ত্র°। ফিরিঙ্গিনাম্‌পকারাথ'°। ক্রিয়তে হালেদেঙ্গ্রেজী'। ইংরেজ শাসকবর্গের উপকারার্থেই এই গ্রন্থের পরিকল্পনা। যারা শাসন করবে ও যারা আদেশ পালন করবে,—ইংরেজ ও ভারতীয় পরস্পর যাতে পরস্পরকে বুঝতে পারে, সেই জন্যই দেশীয় ভাষা শাসকবর্গের শিক্ষা করা দরকার। বলা বাহুল্য, হালহেডের এই উদ্দেশ্য প্রাথমিক ধরনের এবং বহিরঙ্গ, কেননা ব্যাকরণ সংকলন কালে শিক্ষার্থীদের উপযোগিতার প্রসঙ্গটি স্মরণ করে প্রচুর উদাহরণ সংকলন ও জগতাধর রায়ের পত্রের ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ করেও বাংলা ভাষার বিশুদ্ধরূপ সন্ধানে তিনি অমনোযোগী হতে পারেন নি। এর প্রধান প্রমাণ এই যে, তিনি বাংলা ভাষায় ফার্সী হিন্দুস্থানী পর্তুগীজ ইংরেজী ইত্যাদি বিজাতীয় শব্দের কার্যকর উপস্থিতি যখন লক্ষ্য করেন, তখন ইংরেজ শাসক ভাষাশিক্ষার্থী-দের কাজের সুবিধার জন্য এই সব শাব্দ উপাদান আলাদাভাবে শিখে নিতে উপদেশ দেন, যেমন উইলিয়ম জোন্স তাঁর ফার্সী ব্যাকরণে আরবী শেখার ব্যাপারটিকে স্বতন্ত্রভাবে উপদেশের মত করে উল্লেখ করেছেন;১৫ এবং হালহেড, প্রায় জোন্সের সাধারণরীতি অনুযায়ী, বাংলা ব্যাকরণে, ভাষায় এই-সব বিদেশী উপাদানের ব্যবহারিকতা সম্পর্কে সচেতন থেকেও, সহজভাবেই তাদের প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ থেকে মনে হয় হালহেড ব্যাকরণ প্রণয়নে তাৎক্ষণিক উপযোগিতার বোধ দ্বারাই চালিত, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিক্ষার্থীদের কাছে বিশুদ্ধ বাংলা ভাষার রূপটিও তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। যেসব উপাদান বাংলার বিশুদ্ধতাকে খর্ব করেছে, সেই সব উপাদানের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন নিতান্ত কার্যকরতার নিরিখেই তিনি উত্থাপন করতে চেয়েছেন মাত্র। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ভাষাচিন্তার আলোয় হালহেড আলোকিত ছিলেন,১৬ এবং এই তথ্যটি বাংলাভাষা চিন্তায় একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

হালহেডের ব্যাকরণের সূচী এইরকমঃ Of the Elements, Of Substantives, Of Pronouns, Of Verbs, Of Atributes and Relations, Of Numbers, Of Syntax. Of Orthœpy and

Versification. মোট এই আটটি অধ্যায়; এবং পরিশিষ্টে জগতধির রায়ের পত্র উদ্ধার করে তার ব্যাকরণ বিশ্লেষণ আছে। সুশীলকুমার দে এই সূচীপত্র নির্দেশে বলতে চেয়েছেন যে এর মধ্যে ইংরেজি ব্যাকরণের আদলটি ধরা পড়ে।১৭ কেউ কেউ অবশ্য এই সম্পর্কে সংশয়ও পোষণ করেন।১৮ যাই হোক, তাঁর সূচীপত্রটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রথম অধ্যায়ে তিনি বর্ণলিপি, যুক্তাক্ষর, বর্ণের উচ্চারণ আলোচনা করেছেন: বলা বাহুল্য, স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণভাগে তিনি বর্ণমালাকে স্বাভাবিকভাবেই লক্ষ্য করেছেন। এই অধ্যায়ের শেষে অনুশীলনী রূপে কাশীরাম দাসের মহাভারতের দ্রোণপর্ব থেকে একটি নির্বাচিত অংশ উদ্ধার করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয়বস্তু লিঙ্গ নির্ণয়, বিভক্তি ও বচন; তৃতীয় অধ্যায়ে সর্বনাম (নামবাচ্য) ও বিভক্তি বিচার। চতুর্থ অধ্যায়ে ধাতুরূপ ও বাংলা অর্থযুক্ত সংস্কৃত ধাতুর তালিকা। এখানে কৃদন্তপদ সম্পর্কেও উল্লেখ আছে। পঞ্চম অধ্যায়ে শব্দবিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ ও উপসর্গ (শব্দযোগ) ও তাদের সম্পর্কাদি বিষয় উল্লেখ করার পর ষষ্ঠ অধ্যায়ে সংখ্যা ও অঙ্কশাস্ত্রের তালিকা দেওয়া হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে বাংলা বাক্যরীতি সম্পর্কে আলোচনা, এবং এখানেই উল্লেখ করে রাখা দরকার যে হালহেড বিভিন্ন অধ্যায়ে ব্যাকরণবিধি কখনো কখনো প্রায় সূত্রাকারে উপস্থিত করার প্রয়াস পেলেও বাক্যরীতি সম্পর্কিত এই অধ্যায়ে তা করেন নি বা করতে পারেন নি। বাংলা বাক্যরীতির বিচিত্রতা প্রচুর উদাহরণের মাধ্যমে তিনি লক্ষণমাত্রিক পরিচয়ে উত্থাপন করতে চেষ্টা করেছেন মাত্র। অষ্টম অধ্যায়ে syllable ও আনুষঙ্গিক এবং ছন্দ সম্পর্কিত আলোচনা আছে।

হালহেড বাংলা ব্যাকরণের সূত্র বিধিবদ্ধ করবার প্রয়াস পেয়েছেন: বিধিবদ্ধ সূত্র থাকলে ভাষার প্রকৃতি বৈজ্ঞানিকভাবে অনুসরণ করা যায়। এতদিন পর্যন্ত এ বিষয়ে যে অভাব ছিল, হালহেড তা পূরণ করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর ব্যাকরণসূত্রগুলি সাধারণভাবে প্রাথমিক ধরনের, ব্যাকরণের জটিল জিজ্ঞাসা ও তত্ত্বমীমাংসায় তিনি স্বভাবতঃই অগ্রসর হননি। কিন্তু সর্বত্রই তিনি ব্যাকরণসূত্রকে উপযুক্ত ও প্রচুর উদাহরণ সম্বলিত করে উপস্থিত করেছেন। হালহেডের উদাহরণ-সংকলন সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, তিনি একাজে পদ্যাংশই নির্বাচন করেছিলেন উপযুক্ততার বিবেচনায়। তাঁর সমকালে বাংলা গদ্যের কোন প্রামাণ্য ও স্বীকৃত গ্রন্থাদির আবির্ভাব ঘটেনি বটে, কিন্তু গদ্যরচনার অভাবের জন্যই তিনি পদ্যাংশ নির্বাচন করেছিলেন, এই রকমের বিকল্প অভিমত পোষণ করবারও কোন কারণ নেই। এ সম্পর্কে হালহেডের বক্তব্য অতিশয় স্পষ্ট

ছিলঃ 'Throughout this work I mean to confine myself to examples taken from poetry only; as we are sure, that verse must have cost the author some time and study in the composition; and is therefore likely to be most conformable to the true genius and character of the language:'১৯

এরপর হালহেডের কয়েকটি দিক, প্রথমেই যা আমাদের চোখে পড়ে, তার নির্বাচিত পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে। (ক) হালহেডের সময় কোন বাংলা মুদ্রিত পুস্তক না থাকার জন্য প্রচলিত বাংলা হস্তলিপির ওপরই তাঁকে নির্ভর করতে হয়। ফলে হস্তাক্ষরে লিপিকারগণ তিনটি 'শ', দুটি 'জ' এবং দুটি 'ন' এর যে যদৃচ্ছ ব্যবহার করে থাকেন, তিনি সাধারণ সংস্কারেই তা গ্রহণ করেছেন, কেননা তিনি মনে করেন যে সংস্কৃতে এইসব লিপির ব্যবহারের নির্দিষ্টতা থাকলেও, বাংলায় তার পরিবর্তন প্রায়ই দেখা যায়। বলা বাহুল্য, এটা তাঁর একটা অসহায় সংস্কারই মাত্র, উচ্চারণবিশিষ্টতার সূত্রে তিনি বিষয়টিকে পরীক্ষা করে দেখেন নি, বানানের শুদ্ধরূপ অনুসন্ধানের আগ্রহও তাঁর মধ্যে অনুপস্থিত ছিল। এই সংস্কার বশতঃই তিনি "কু" ও "ঙ্গ" সমলিপি জ্ঞান করেছেন, "সান্ত্বনা"র 'ব' ফলা উপেক্ষা করেছেন, অথবা "ং" কে শুধুমাত্র "০" প্রতীকে উপস্থাপিত করবার প্রয়াস করেছেন। (খ) লিঙ্গ নির্ণয়ে একটি সাধারণ সূত্র বিধিবদ্ধ করে তিনি বলেছেন যে শব্দের সঙ্গে "আ" যোগে পুংলিঙ্গ ও "ঈ" বা "নী" যোগে স্ত্রীলিঙ্গ নিষ্পত্তি করা যায়, যেমনঃ বাঘ (পুং বা স্ত্রী নির্বিশেষে) বাঘা (পুং), বাঘনী (স্ত্রী): অথবা শান্তিপুরের স্ত্রী অর্থে "শান্তিপুরিণী"। (গ) তৃতীয়া থেকে সপ্তমী বিভক্তি পর্যন্ত সর্বনাম শব্দের বহুবচনের রূপ তিনি নির্দেশ করেছেনঃ ৩। আমারদিগেতে/তোমারদিগেতে; ৪। আমারদিগেরে/তোমারদিগেরে; ৫। আমারদিগেতে/তোমারদিগেতে; ৬। আমারদিগের/তোমারদিগের; ৭। আমারদিগে/তোমারদিগে। বলাবাহুল্য বাংলায় এই সর্বনাম-বচন-নিষ্পত্তি ঊনবিংশ শতাব্দীর লেখকরাও মেনে চলেছেন। (ঘ) হালহেডের ব্যাকরণে সমাস প্রকরণের কোন স্থান নেই।

গ্রন্থখানি পড়লেই ধরা পড়ে যে বাংলা ভাষার রূপটি খোলা চোখে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় পর্যবেক্ষণ করে তিনি প্রায়ই কতগুলি ব্যাকরণ সূত্র নিরূপণ করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এই সব নিষ্পত্তিগুলির যথার্থ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তিনি প্রায়শঃই অনুসন্ধান করেন নি। ফলে কিছু কিছু সূত্র সব সময় ভুল না হয়েও কৌতূহলোদ্দীপক বলে মনে হয়। কিন্তু 'it is well to study the spirit with which foreigners approach

our language.'২০এবং সংস্কৃতমনস্কতায় বাংলা ভাষার বিশুদ্ধতা উদ্ধারের ও প্রতিষ্ঠার আগ্রহেই হালহেডের ভূমিকাটি ঐতিহাসিকভাবে চিহ্নিত; এই চিন্তাবৃত্তিটিই কেরীর হাতে যোগ্যতর অনুশীলন লাভ করেছিল, ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ভাষার রূপ নির্মাণের প্রাথমিক ভূমি প্রস্তুত করে দিয়েছিল।

কেরীঃ ব্যাকরণ রচনার ইতিহাস

বাংলা ঃ উইলিয়ম কেরীর 'A Grammar of the Bengalee Language'-এর প্রথম সংস্করণ ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থরচনা কবে শুরু হয়েছিল, সে সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। তবে কেরী যখন মদনাবাটিতে অবস্থানরত, তখন থেকেই তিনি ব্যাকরণ রচনা বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন বলে জানা যায়। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর তারিখে লেখা তাঁর চিঠিতে আছেঃ 'I set about composing a grammar and dictionary of the Bengal Language.'২১ ঐ বৎসরই ৩১শে ডিসেম্বরে তিনি জানাচ্ছেনঃ 'I have been trying to compose a compendious grammar of the language.'২২ কাজেই মনে করা যেতে পারে যে বাংলা ব্যাকরণ রচনার প্রাথমিক প্রয়াস তাঁর মদনাবাটির জীবনেই সূচিত হয়েছিল। এবং ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা ভাষার শিক্ষকরূপে যোগদানের পর শিক্ষকের দায়িত্ববোধে তিনি পূর্ববর্তী অসম্পূর্ণ২৩ প্রয়াসকে সম্পূর্ণ করেন।

প্রথম সংস্করণ বাংলা ব্যাকবণের আখ্যাপত্র এই রকমঃ

'A/GRAMMAR/OF THE/BENGALEE LANGUAGE/BY W. CAREY./PRINTED AT THE MISSION PRESS. SERAMPORE/ 1801.'২৪

বড় হরফে ছাপা এই গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬+১০০। গ্রন্থখানি কেরী ভাষা-শিক্ষার সহায়িকারূপেই রচনা করেছেন, এর বেশি দাবিও তিনি করেন নি। মুখবন্ধে তিনি একথা স্পষ্টতঃই জানিয়েছেন।২৫ এই গ্রন্থ রচনায় তিনি হালহেডের ঋণ পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন, এবং হালহেডের ব্যাকরণ থেকে তাঁর ব্যাকরণের বিশিষ্টতাও ব্যাখ্যা করেছেনঃ 'I have made some distinctions and observations not noticed by him, particularly on the declensions of nouns and verbs and use of participles.'২৬

দ্বিতীয় সংস্করণ বাংলা ব্যাকরণের প্রকাশকালঃ ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ। এর আখ্যাপত্রটি এই রকমঃ

'A/GRAMMAR/OF THE/BENGALEE LANGUAGE./THE SECOND EDITION, WITH ADDITIONS./BY W. CAREY./ TEACHER OF THE SUNGSKRIT, BENGALEE, AND MAHRATTA/ LANGUAGES, IN THE COLLEGE OF FORT WILLIAM./SERAMPORE,/Printed at the Mission/Press/1805.'

এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮+১৮৪। মুখবন্ধটি সম্পূর্ণ নূতন করে লেখা। প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থখানিও পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে সম্পূর্ণ নূতন গ্রন্থের রূপ নিয়েছে, দ্বিতীয় সংস্করণ মাত্র বললে গ্রন্থপরিচয় স্পষ্ট হয় না। এমন কি আকারেও গ্রন্থটি প্রথম সংস্করণের দ্বিগুণ। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দেই এই গ্রন্থের ছাপার কাজ শুরু হয়েছিল,২৭ এবং গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি স্পষ্টতঃই বললেনঃ' 'on account of the variations from the former edition, may be esteemed a new work'.২৮ ১৮০৫ সালের ২২শে অগাস্ট তারিখে লেখা তাঁর চিঠিতেও প্রায় একই কথা তিনি সাটক্লিফকে জানিয়েছেনঃ 'I have written and printed a second edition of my Bengali grammar, wholly new worked over, and greatly enlarged.'২৯

তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে। এই গ্রন্থে দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা সামান্য পরিবর্তিত ও একটি অতিরিক্ত অধ্যায় সংযোজিত। মূল গ্রন্থ পাঠেও দ্বিতীয় সংস্করণকেই অনুসরণ করা হয়েছে, কয়েকটি ক্ষেত্রে অবশ্য সামান্য পরিবর্তন ও সংযোজন লক্ষ্য করা যায়। এই সংস্করণে বাংলা লিপি চিত্রের একটি পৃষ্ঠা আছে।

চতুর্থ সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ। এই সংস্করণে তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকাই অবিকলভাবে পুনর্মুদ্রিত। লক্ষণীয় এই যে, এই পুনর্মুদ্রিত ভূমিকা 'Serampore, March, 1818' তারিখ-লাঞ্ছিত হয়েছে। সজনীকান্ত দাস লিখেছেনঃ 'চতুর্থ সংস্করণের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ১৮১৮ সনে প্রকাশিত Dialogues... পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণটিও ইহার সহিত একত্র মুদ্রিত ও বাঁধাই হইয়া একই পুস্তকের আকার লইয়াছে।'৩০ কিন্তু জাতীয় গ্রন্থাগারের সংস্করণটি শুধুই ব্যাকরণ অংশের, কথোপকথন তার সঙ্গে যুক্ত থাকার পরিচয় সেখানে নেই।

এই পর্যন্ত অর্থাৎ চতুর্থ সংস্করণ পর্যন্ত বাংলা ব্যাকরণ কেরীর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছিল। কেরীর মৃত্যুর পর ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয়, এবং তা চতুর্থ সংস্করণের অবিকল পুনর্মুদ্রণ।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে দেশীয় ছাত্রদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে জন রবিনসন 'বঙ্গভাষার ব্যাকরণ' প্রকাশ করেন, এই ব্যাকরণখানি কেরীর ব্যাকরণেরই বঙ্গানুবাদ। পরিশিষ্টে 'ধাতুর তালিকাটি অবশ্য রবিনসনের সংযোজন। রবিনসন মূল গ্রন্থে-ও কিছু পরিবর্তন ও সংযোজন করেছেন, এবং 'The translator has in every instance endeavoured to simplify the sentences by the use of such terms as appeared most intelligible to the generality of natives.'৩৩

সংস্কৃতঃ ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন শ্রীরামপুর থেকে রাইল্যান্ডকে কেরী লিখছেনঃ 'I am also appointed teacher of the Sungscrit language, and though no students have yet entered in that class, yet I must prepare for it. I am, therefore, writing a grammar of that language, which I must also print.'৩২ কেরীর এই উক্তিতে তাঁর সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনার ও প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতটি স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকেই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় কিছুটা অগ্রসর হয়ে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধান রচনায় হাত দিয়েছিলেন। মনে হয় এই প্রয়াস ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই চালিত হয়েছিল এবং প্রকাশোপযোগী পরিকল্পনায় তা সমর্পিত হয়নি। কেননা, কেরীর সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনায় প্রধান সহায়ক দুই সংস্কৃত পন্ডিতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে শিক্ষকরূপে যোগদানের পূর্বে স্থাপিত হয়নি।

কেরীর সংস্কৃত ব্যাকরণ ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় অর্ধেক ছাপা হয়ে গিয়েছিল; কেরী জানাচ্ছেনঃ 'There are now four hundred and thirty-two pages of the Sungscrit grammar (large quarto) printed off. I expect that there will be nearly as much more."৩৩ ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে এই ব্যাকরণের মুদ্রণ সম্পূর্ণ হয়।৩৪ কিন্তু ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দেই সংস্কৃত ব্যাকরণের একটি অংশ তিনি প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। এই অংশ প্রকাশের পর তিনি ব্যাকরণের অবশিষ্ট অংশ রচনা করেন, অথবা ছাপার কাজ আরম্ভ করার আগেই তিনি ব্যাকরণ রচনা সম্পূর্ণ করেছিলেন, এ সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। তবে সাহেবদের সংস্কৃতশিক্ষার প্রথম যুগে ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত কেরীর ব্যাকরণই যে প্রথম সম্পূর্ণ সংস্কৃত ব্যাকরণ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এইচ· টি· কোলব্রুকের সংস্কৃত ব্যাকরণ এই মর্যাদা দাবি করতে পারে না, কেননা তা ছিল একটি খন্ডের অসম্পূর্ণ রচনা। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দের চার্লস উইলকিন্সের সংস্কৃত

ব্যাকরণও ছোট এবং অসম্পূর্ণ; ফলে ইংরেজ লেখকদের রচিত সংস্কৃত ব্যাকরণের ইতিহাসে কেরীর গ্রন্থ স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রথম পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও দ্বিতীয় পণ্ডিত রামনাথ বাচস্পতি এই গ্রন্থ রচনায় কেরীকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছিলেন। তাঁদের মেধা ও যোগ্যতার প্রতি গ্রন্থের ভূমিকায় কেরী সম্মান দেখিয়েছেন। বোপদেব প্রভৃতির যেসব সংস্কৃত ব্যাকরণ তখন বাংলা দেশে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল, তিনি তার পরিকল্পনা ও নির্দেশাদি দ্বারা স্বভাবতঃই প্রভাবিত হয়েছিলেন, এই সব গ্রন্থের পরিভাষাও তিনি ব্যাকরণসূত্র রচনার সময় ব্যবহার করেছেন। কেরী এই ব্যাকরণ রচনা করেও বোপদেবের মুগ্ধবোধ পাশাপাশি পড়বার উপ-যোগিতার কথা বলতে চেয়েছেন। উইলসন তো কেরীর ব্যাকরণকে 'most serviceable illustration and interpreter of the brief and technical compilation of the Indian philologist.'৩৫—রূপেই লক্ষ্য করতে চেয়েছেন।

কেরীর সংস্কৃত ব্যাকরণের আখ্যাপত্র এইরকম ঃ

'A Grammar/of the/Sungskrit Language/composed/from the works of the most esteemed grammarians./To which are added,/ Examples for the exercise of the student,/and/a complete list of the Dhatoos, or Roots./By W. Carey./Teacher of the Sungskrit, Bengalee, and Mahratta Languages, in the College of Fort William./Serampore,/Printed at the Mission Press./1806' সহস্রাধিক পৃষ্ঠার এই গ্রন্থখানি রিচার্ড মারকুইস ওয়েলেসলিকে উৎসর্গ করা হয়েছে। মূল গ্রন্থ মোট পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত. প্রথম খণ্ডঃ of the Letters and of their euphonic combinations, দ্বিতীয় খণ্ডঃ of declension, তৃতীয় খণ্ডঃ Of Conjugation, চতুর্থ খণ্ডঃ of the formation of derivative nouns, এবং পঞ্চম খণ্ডঃ Of Syntax. Syntax-এর সঙ্গে ম্যাথুর গসপেলের প্রথম তিনটি অধ্যায় ছাড়া ঈশোপনিষদের অংশ ও শ্রীমদ্ভাগবতের এক অধ্যায় ইংরেজি অনুবাদসহ সংযোজিত হয়েছে।৩৬ এ ছাড়া একটি যোগ্য নির্দেশিকা ও ১০৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী বর্ণানুক্রমিক সংস্কৃত ধাতুর একটি তালিকা আছে। প্রচুর দৃষ্টান্ত সংকলিত হওয়ায় ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থখানির উপযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মারাঠিঃ *মহারাষ্ট্রে রাজনৈতিক শক্তিরূপে ইস্ট ইণ্ডিয়া* কম্পানীর অভ্যুদয়ের সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে মারাঠি ভাষার শিক্ষাক্রম প্রচলিত হয়। এবং মারাঠি ভাষার শিক্ষকতার ভার কেরীর ওপর বর্তায়। কিন্তু ভাষা শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কোন রকম প্রাথমিক ধরনের বইও পাওয়া যেত

না বলে তাঁর ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য কেরী একখানি মারাঠি ভাষার ব্যাকরণ রচনার কাজে ব্রতী হন। তাঁর মারাঠি ভাষার ব্যাকরণের মুখবন্ধেই তিনি এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। মারাঠি ভাষার ব্যাকরণের মুখবন্ধ লেখা হয় ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ: ঐ বৎসরই ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে গভর্ণমেণ্ট হাউসে অনুষ্ঠিত ডিসপিউটেশ্যনে তাঁর অধীনস্থ এক শিক্ষার্থী মারাঠি ভাষায় প্রশংসনীয় অধিকারের পরিচয় দেন.৩৭ যা মারাঠি ভাষার শিক্ষকতায় কেরীর যোগ্যতার সাক্ষ্য বহন করে। ফলে, অনুমান করা যেতে পারে যে, ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দেই, মারাঠি ভাষার শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করার কাল থেকেই, নিজের প্রয়োজনেই তিনি ঐ ভাষার ব্যাকরণসূত্র সংকলনে মনোযোগী হয়েছিলেন। এবং এই কাজে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে মারাঠি ভাষার প্রধান পণ্ডিত বৈদ্যনাথের সহায়তা ও সহযোগিতার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম: কেরীও কলেজের পণ্ডিত হিসাবে ও তাঁর মারাঠি ব্যাকরণ রচনার প্রধান সহায়ক রূপে বৈদ্যনাথের যোগ্যতার কথা উল্লেখ করেছেন।৩৮

মারাঠি ব্যাকরণের কোন পূর্বাদর্শ কেরীর সামনে ছিল না। ইতিপূর্বে পর্তুগীজ ভাষায় একখানি মারাঠি ব্যাকরণ লিখিত হলেও কেরী তা সংগ্রহ করতে পারেন নি; ফলে, ব্যাকরণের পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে তাঁকেই করে নিতে হয়েছিল। এর আগে তিনি বাংলা ব্যাকরণ লিখেছিলেন, এবং মারাঠি ব্যাকরণ রচনা কালে তার দ্বিতীয় সংস্করণও প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল: কাজেই মারাঠি ব্যাকরণ রচনার সময় তিনি স্বাভাবিকভাবেই বাংলা ব্যাকরণের পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হয়েছিলেন।

মারাঠি ভাষায় ব্যবহৃত হরফ দুই প্রকারঃ মোড়ি ও দেবনাগরী। এর মধ্যে ব্যাকরণে তিনি দেবনাগরী হরফই ব্যবহার করেছিলেন, কারণঃ (১) এই হরফ শিক্ষিতদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত ও এই রীতি অনুযায়ীই মারাঠি গ্রন্থাদি রচিত হয়ে থাকে; (২) 'Superior fitness of that character to express grammatical niceties with precision'৩৯; (৩) বাংলা-দেশে মোড়ি হরফের মুদ্রা তখন পর্যন্ত প্রস্তুত না হওয়া।৪০

কেরীর মারাঠি ভাষার ব্যাকরণের পৃষ্ঠাসংখ্যা ২০৯; ভূমিকা ও অন্যান্য ৮, মূল ব্যাকরণ ১৫২, ও পরিশিষ্ট ৪৯। মূল ব্যাকরণ অংশ মোট নয়টি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ। প্রথম পরিচ্ছেদ 'Of the Letters (অক্ষর)'। এখানে ৩৪টি ব্যঞ্জন ও ১৬টি স্বর অক্ষরের উল্লেখ করে জানানো হয়েছে যে, অন্তত তিনটি অক্ষরের ক্ষেত্রে মারাঠি উচ্চারণ শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া শেখা সম্ভবপর নয়। দেবনাগরীতে মারাঠি অক্ষর পরিচয় জ্ঞাপন করেও

মোড়ি বর্ণমালার অভাবাত্মক দিক সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছেঃ 'In the Moorh alphabet the long vowels, and the two first nasals of the Devunaguri system are wanting.' দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ 'Of the permutation of Letters (সন্ধি)'। স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি—এই দুই উপবিভাগে পরিচ্ছেদটি বিভক্ত, এবং সন্ধিকে ভারতীয় ভাষার একটি সাধারণ রীতি ও লক্ষণ রূপেই লক্ষ্য করা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ 'Of Nouns (শব্দ)'। শব্দের শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে সাধারণ কয়েকটি উল্লেখের পর পরিচ্ছেদটিকে প্রধান দুই উপবিভাগে ভাগ করা হয়েছে: একটি লিংগ সম্পর্কিত, অপরটি কারক সম্পর্কিত। লিংগ তিন প্রকার ও কারক সাত প্রকার। কারক সম্পর্কিত উপবিভাগে বিভিন্ন কারকে কি-ভবে পদ গঠিত হয়, তা দেখানো হয়েছে। শেষে 'Observations on the substantive' শিরোনামে চিহ্নিত একটি অংশে এই বিষয়ে কতগুলি বিশেষ প্রসংগ সূত্রাকারে উল্লেখ করা হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ 'Of Adjectives'-এ চারটি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে প্রসংগের বিবেচনা লক্ষ্য করা যায়। বিভাগগুলি এইঃ (১) Of the gender of Adjectives, (২) Of the declension of adjectives, (৩) Of the comparison of adjectives (৪) Of the formation of adjectives 'Of Pronouns' নামাংকিত পঞ্চম পরিচ্ছেদে বচনভেদে সর্বনামের যে রূপান্তর ঘটে, অনেকগুলি সর্বনাম শব্দের রূপ-রূপান্তর প্রস্তুত করে তা দেখানো হয়েছে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ 'Of verbs' এখানে প্রথমেই বলা হয়েছে যে, (১) মারাঠি ক্রিয়াপদের modes আট রকমের; (২) মরাঠি ক্রিয়ায় ব্যবহৃত কাল (tense) আট রকমের; (৩) পুরুষ (person) তিন প্রকার; (৪) বচন (number) দুই প্রকার; (৫) লিংগ কার্যতঃ দুই প্রকার। তারপর 'a scheme of the endings of a regular verb' কাল (tense) অনুসারে উত্থাপন করা হয়েছে। কয়েকটি ক্রিয়াপদের কাল (tense) ও modes অনুসারে রূপভেদ উল্লেখ করা ছাড়া অন্যত্র 'Passive voice' সম্পর্কিত আলোচনাও লক্ষ্য করা যায়। পরিচ্ছেদের শেষ অংশঃ 'Remarks on the verbs.' সপ্তম পরিচ্ছেদে 'Of compound words (সমাসপদ)' সম্পর্কিত আলোচনায় সমাসপদের গঠনরীতি, সমাসের শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদি বিষয়ে নির্দেশ আছে। অষ্টম পরিচ্ছেদের চার ভাগঃ (১) Adverbs (২) Prepositions (৩) Conjunctions (৪) Interjections. Adverb-কে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছেঃ (ক) Adverbs of Time (খ) Adverbs of Place (গ) Adverbs of circumstances. তাছাড়া Preposition-কে Post-position রূপেই এখানে লক্ষ্য করা হয়েছে। নবম পরিচ্ছেদঃ 'Of Syntax'-এর প্রথমেই

জানানো হয়েছে যে, মারাঠি বাক্য গঠন পদ্ধতি 'কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া'—এই ক্রম অনুসারী। প্রচুর দৃষ্টান্ত সহযোগে অতঃপর মারাঠি বাক্যগঠন রীতির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তাৎক্ষণিক প্রয়োজন ও উপযোগিতার বিবেচনাতেই মারাঠি ব্যাকরণ রচিত হয়েছিল। ইংরেজদের মারাঠি ভাষায় শিক্ষিত ও ব্যবহারিক জ্ঞানার্জনে সক্ষম করে তোলাই এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য এখানে যে কতখানি সোচ্চার, তার প্রমাণ এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট (Appendix) অংশ। মোট ৪৯ পৃষ্ঠা ব্যাপী এই পরিশিষ্টে মারাঠি কথোপকথন বা dialogue সংকলিত। মারাঠি ভাষার বিচিত্র কথোপকথনের নমুনা মোট নয়টি বিভিন্ন ভাগে উল্লেখ করা হয়েছে। শেষ ভাগটি 'The story of the merchant's son' নামে একটি গল্প কাহিনী। এই পরিশিষ্ট অংশ শিক্ষার্থীদের অনুশীলন ও ভাষার ব্যবহারিক রীতি অনুসরণের দিক থেকে উপযোগী হওয়াই স্বাভাবিক। একই পরিকল্পনায় কেরী বাংলা 'কথোপকথন' সংকলন করেছিলেন, তবে তাকে ব্যাকরণের পরিশিষ্ট মাত্র রূপে উপস্থিত না করে স্বতন্ত্র গ্রন্থের মর্যাদা দান করেছিলেন।

অন্যান্য ভাষা ঃ অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মধ্যে কেরী একখানি পাঞ্জাবী ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থের আখ্যাপত্রে তার প্রকাশকাল ১৮১২ বলে লেখা আছে। গ্রন্থের মুখবন্ধও রচিত হয়েছিল ঐ সালেরই মে মাসে। কিন্তু কেরীর একখানি চিঠির সূত্রে জানা যায় যে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসেও পাঞ্জাবী ব্যাকরণের ছাপা শেষ হয়নি।[৪১] এ থেকে মনে হয় যে ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে বইখানি গোড়া থেকে ছাপা আরম্ভ হয় ও ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা সম্পূর্ণ হয়।[৪২]

পাঞ্জাবী ব্যাকরণ কেরী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষার্থীদের অব্যবহিত প্রয়োজন বোধে রচনা করেন নি। অন্ততঃ এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনের ভাবনা একটু পৃথক ছিল। ইংরেজদের আঞ্চলিক অধিকারের ক্ষেত্র বর্ধিত হবার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা তাদের পক্ষে প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। এই কারণেই পাঞ্জাবী ভাষার প্রাথমিক ধরনের এই ব্যাকরণ রচনার কাজে কেরী উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই গ্রন্থের পরিকল্পনায় গুরুতর ভাষাভাবনা উপস্থিত ছিল বলেও মনে হয় না; তিনি সুস্পষ্টভাবে এ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেছেনঃ 'The following sheets are

intended to furnish short and appropriate rules for the acquisition of this language, without attempting any remarks, upon the nature of grammar in general.'৪৩

পাঞ্জাবী বলতে কেরী শিখদেরই মাত্র বুঝেছিলেন; এবং গুরুনানকের গ্রন্থসাহেবের ভাষারূপকে বলেছেন 'গুরু-মুখী-নাগরী'। গুরুমুখী সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন যে, এই রূপ দেবনাগরী থেকেই উদ্ভূত। এর বর্ণমালাও দেবনাগরীর পারম্পর্যেই বিধৃত, যদিও দেবনাগরীর কয়েকটি বর্ণ এখানে অনুপস্থিত। তাছাড়া পাঞ্জাবী ভাষার প্রকৃতি বিচার করে বলা হয়েছে যে, এই ভাষার মধ্যে এক ধরনের সংকরত্ব আছে। এখানকার অধিকাংশ উপাদান যখন সংস্কৃত থেকে গৃহীত, তখনও আরবী, ফার্সী, পুশ্‌তো ইত্যাদি ভাষা থেকে সংগৃহীত উপাদান উপেক্ষণীয় নয়। মনে হয়, কেরী এখানে প্রধানভাবে শাব্দ উপাদান সম্পর্কে উল্লেখ করতে চেয়েছেন। ব্যাকরণখানি তিনি মোট সাতটি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ করেছেন; প্রথম অধ্যায়েঃ 'Of Letters'; দ্বিতীয়ঃ 'Of the Compounding of Letters'; তৃতীয়ঃ 'Of Words'; চতুর্থঃ 'Of Adjectives'; পঞ্চমঃ 'Of Pronouns'; ষষ্ঠঃ 'Of Verbs'; ও সপ্তমঃ 'Of Syntax'. ষষ্ঠ অধ্যায়ে ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী 'A list of verbs with their participles' এবং 'of Indeclinable Participles' অংশটির বিশিষ্টতা চোখে পড়ে। সপ্তম অধ্যায়ে অন্বয়বিধি সম্পর্কে আলোচনা খুবই সংক্ষিপ্ত, এমনকি দৃষ্টান্ত উল্লেখের পরিমাণও খুব কম।

প্রকৃতপক্ষে, পাঞ্জাবী ব্যাকরণের কোন পূর্বাদর্শ কেরীর সামনে ছিল না: অন্যান্য ভাষার ব্যাকরণ রচনার মাধ্যমে ব্যাকরণ রচনা সম্পর্কে একটা সাধারণ পরিকল্পনার যে অধিকার তিনি অর্জন করেছিলেন, তারই সূত্রে এই ব্যাকরণ পরিকল্পিত হয়েছিল বলে মনে করা যায়। কেরীর পাঞ্জাবী ভাষার ব্যাকরণ দীর্ঘকাল পর্যন্ত বিদেশীর কাছে পাঞ্জাবী ভাষা শিক্ষার সহায়ক-রূপে স্বীকৃত হয়েছে।

কেরীর তেলিঙ্গা ভাষার ব্যাকরণ বা তেলুগু ব্যাকরণ প্রকাশিত হয় ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে। কেরীর চিঠি অনুযায়ী জানা যায় যে ছাপার জন্য পাণ্ডুলিপি ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দেই প্রেসে পাঠানো হয়।৪৪ কিন্তু ১৮১২-র অগ্নিকাণ্ডে এই পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়৪৫ এবং গ্রন্থখানির প্রকাশনা বন্ধ থাকে। ১৮১২-র শেষ নাগাদ তেলিঙ্গা মুদ্রা আবার প্রস্তুত হয়ে গেলে ঐ ভাষায় ছাপার পথ প্রশস্ত হয়। কেরীকে এই ব্যাকরণখানিও সম্ভবতঃ আবার রচনা করতে হয়, এবং তাঁর চিঠি অনুযায়ী মনে হয় যে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চের আগে তা তিনি সম্পূর্ণ করতে পারেন নি।৪৬

তেলিঙ্গা ভাষার ব্যাকরণের মুখবন্ধে কেরী এই গ্রন্থরচনার প্রেরণা

ব্যাখ্যা করেছেন: 'A wish to contribute to the more extensive cultivation of the Indian languages.'৪৭ গ্রন্থ প্রণয়নে কেরীর এই মনোভাব প্রমাণ করে যে, অন্তত এই ক্ষেত্রে তিনি তাৎক্ষণিক প্রয়োজনবোধ দ্বারা চালিত হননি। 'Languages of India, so highly deserving of cultivation.'৪৮ কেরীর মনস্কতার অনেকখানিই অধিকার করে ছিল, এবং ভাষাচর্চার নিরপেক্ষ পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাকরণকার কেরীর মনোলোক এখানে উন্মোচিত হয়।

তেলিঙ্গা ভাষার ব্যাকরণ তার এই প্রাথমিকরূপে অবশ্যই বিশিষ্ট হয়ে উঠতে পারে নি; পরবর্তীকালে ঐ ভাষার ব্যাকরণ অধিক সূক্ষ্মতা ও সার্থকতার সঙ্গে রচিত হয়েছে। এই ব্যাকরণখানি তথাপি ইংরেজিতে লিখিত প্রথম তেলিঙ্গা ভাষার ব্যাকরণ। বস্তুতঃ, তেলুগু ভাষার জটিলতা সম্পর্কে কেরী প্রথমাবধি অবহিত ছিলেন।৪৯ তিনি স্পষ্টতঃই জানিয়েছেন যে উত্তর ভারতীয় ভাষার উৎসের সঙ্গে তেলুগু, কানাড়ি, তামিল, মালয়ালম, ইত্যাদির যোগ থাকলেও, প্রকৃতিতে এইসব ভাষা সম্পূর্ণরূপেই স্বতন্ত্র, এদের শব্দভাণ্ডারের একটা বিরাট অংশই ঐতিহাসিক পারম্পর্যে ব্যাখ্যাসাধ্য নয়। এই দুরূহ ভাষার ব্যাকরণ রচনায় তথাপি যে কেরী ব্রতী হয়েছিলেন, তার কারণ সম্ভবতঃ দুই: (১) এই ভাষার প্রকাশ ক্ষমতার ঐশ্বর্য সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস; (২) ঐ ভাষার একজন পণ্ডিতকে তিনি সহায়করূপে পেয়েছিলেন। এই সহায়ক সদর দেওয়ানী আদালতের সুব শাস্ত্রী (Sooba Shastri)। তেলিঙ্গা ব্যাকরণের পরিকল্পনাটি এইরকম: প্রথম অধ্যায়: 'Of Letters'; দ্বিতীয়: 'Of Words'; তৃতীয়: 'Of Adjectives'; চতুর্থ: 'Of Pronouns', ও পঞ্চম: 'Of Verbs', 'Of Sundhi'. লক্ষণীয় যে পঞ্চম অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত 'সন্ধি' প্রসঙ্গ বিপর্যয় ঘটিয়েছে। 'সন্ধি' স্বতন্ত্র অধ্যায়ভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল, বিশেষতঃ যখন তেলুগু ভাষার প্রকৃতি অনুসরণে সন্ধি প্রকরণের ভূমিকার গুরুত্ব সম্বন্ধে কেরী সচেতন ছিলেন।

রাইল্যাণ্ডের কাছে লেখা ১০-১২-১৮১১ তারিখের চিঠিতে কেরী জানিয়েছেন যে, তিনি যে সব ভাষা শিখছেন, তার প্রত্যেকটির একখানি করে ব্যাকরণ রচনা করবেন। এই সময়ের মধ্যেই বাংলা, সংস্কৃত ও মারাঠি ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশ করেছেন: এবং তেলিঙ্গা ও পাঞ্জাবী ভাষার ব্যাকরণের কাজও সম্পূর্ণ ও সেগুলি ছাপার জন্য প্রস্তুত। ওড়িয়া ভাষার ব্যাকরণ রচনার কাজে তিনি ইতিমধ্যেই হাত দিয়েছেন, এবং কানাড়ি, কাশ্মীরী, নেপালী ও সম্ভব হলে অসমীয় ভাষার ব্যাকরণ রচনা করবার অভিপ্রায় ঘোষণা করেছেন।৫০ ফুলারের কাছে লেখা ২৫-৩-১৮১৩-র

চিঠি অনুযায়ী জানা যায় যে, কানাড়ি ভাষার ব্যাকরণ রচনার কাজে তিনি অনেকদূর অগ্রসর হয়েছেন, এবং কাশ্মীরী, পুশ্‌তো ও বালুচ ভাষার ব্যাকরণ রচনার জন্য উপাদান সংগ্রহ করছেন।৫১ এই সব উদ্যোগগুলির মধ্যে কানাড়ি ভাষার ব্যাকরণ রচনার কাজ তিনি সম্পূর্ণ করেছিলেন; ঐ গ্রন্থখানি ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।৫২ অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর উদ্যম ফলপ্রসূ হয়নি বলেই মনে হয়।

ব্যাকরণ-চর্চার পরিপ্রেক্ষিত

কেরী ভারতীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভের বিষয়টিকে প্রথমাবধি প্রয়োজন সাপেক্ষেই দেখেছিলেন। ভারতবর্ষের পথে যখন তিনি সমুদ্রযাপন করছেন, তখনই দেখা যায় ঈশ্বরের মহিমা প্রচারের আপন দায়িত্বভার সম্পর্কে তিনি সচেতন; এবং সন্তানেরাও যে পরবর্তীকালে এই কাজে অংশ গ্রহণ করবেন, এই রকমের বাসনাও তাঁর মধ্যে জাগ্রত। এই বাসনা থেকেই সম্ভবতঃ তাঁর আরেকটি ইচ্ছা অংকুরিত হয়েছিলঃ 'intend to bring up one in the study of Sanscrit, and another of Persian'.৫৩ হিদেনদের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্য পেঁছে দিতে হলে তাদের ভাষাশিক্ষা যে জরুরী, এই বিবেচনায় তিনি খুব নির্দিষ্ট ছিলেন, এবং মনে রাখা দরকার যে এই প্রয়োজনবোধের দাবিতেই কেরী বিভিন্ন ভারতীয় ভাযা চর্চায় প্রযত্ন করেছিলেন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মার্চের জার্নালে তিনি লিখেছেন, 'The study of a language, though a dull work, yet is productive of pleasure to me, because it is my business, and necessary to my preaching in any useful manner.'৫৪ এই জন্যই তিনি, বঙ্গদেশে পেঁছিবার আগেই সমুদ্রবক্ষে টমাসের কাছে বাংলা ভাষা শিক্ষায় পাঠ গ্রহণ করতে শুরু করেছিলেন। এই প্রয়োজনের রূপটি তাঁর কাছে দুদিক থেকে ধরা পড়েছিলঃ ১। বঙ্গভাষাভাষীদের মধ্যে থেকে তাদের কাছে যখন খ্রীষ্টমহিমা প্রচার করতে হবে, তখন ইংরেজি ভাষায় অনভিজ্ঞ সেই জনসমাজের নিজেদের ভাষাতেই যদি তাঁর বক্তব্য তুলে ধরতে না পারা যায় তা হলে সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য; ২। খ্রীষ্টমহিমাজ্ঞাপক সুবৃহৎ ধর্মগ্রন্থ অখ্রীষ্টানদের হাতে তাদের ভাষামাধ্যমে তুলে দিতে পারলে, খ্রীষ্টমহিমা বিষয়ক সম্প্রচারণা বহিরঙ্গতা অতিক্রম করে তাদের মধ্যে অন্তরঙ্গভাবে সাড়া জাগাতে পারে। অর্থাৎ, মৌখিক প্রচার ও অনুবাদের মাধ্যমে প্রচার,—এই দুয়ের জন্যই স্থানীয় ভাষাশিক্ষা তিনি বিশেষ জরুরি

বলে বিবেচনা করেছিলেন।৫৫ এই জন্য অধিকাংশ মিশনারীর মত, কেরীর ভাষা শিক্ষাকেও প্রয়োজন সাপেক্ষ ভাষাশিক্ষা বলেই উল্লেখ করা চলে।

এবং ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে একজন বিদেশী হিসাবে কেরী গুরুতর সংকটে পড়েছিলেন। আমাদের দেশে শিক্ষাব্যবস্থার কার্যকর পরিকল্পনা ও প্রসার তখন পর্যন্ত সংকুচিত; অপটু ব্যবস্থাপনায় ভাষাশিক্ষার যে নগণ্য আয়োজন ছিল, সেখানেও উপকরণের অভাববোধ কখনো পীড়ার কারণ হয়েছিল বলে মনে হয় না। স্বভাষাভাষীদের ভাষাশিক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব স্বদেশীয় চিন্তাকে স্পর্শ না করলেও, বিদেশীদের কাছে জরুরি ছিল বলেই এই অভাবাত্মক দিকটি তাঁদের কাছে সংকটের মত আত্মপ্রকাশ করে।

বস্তুতঃ, ভাষাশিক্ষার প্রধান উপকরণ বা সহায়িকা দুইটিঃ ভাষার শব্দ-ভাণ্ডার ও ব্যাকরণ। কেরী তাঁর ভাষাশিক্ষাকালীন বিভিন্ন চিঠি ও জার্নালে 'vocabulary and grammar' বা 'grammar and dictionary' শব্দগুলি ঘনিষ্ঠ পরস্পরতায় এমন জরুরিভাবে উল্লেখ করে গেছেন যে, তা থেকে ভাষাশিক্ষায় অভিধান ও ব্যাকরণের অপরিহার্যতা বিষয়ে সহজেই তাঁর সচেতনতা ধরা পড়ে। দুঃখের বিষয়, বাংলা ভাষার সমর্থিত কোন ব্যাকরণ ও অভিধান কেরীর হাতের কাছে ছিল না। ইতিপূর্বে বিদেশী সংকলিত যে দু-খানি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যেও আসসুম্পসাওঁ-র ব্যাকরণ তখন দুষ্প্রাপ্য হওয়ার দরুণ তখন বিস্মৃতপ্রায় ছিল, তবে হাল-হেডের ব্যাকরণ অপেক্ষাকৃত হালের হওয়ার দরুণ এই ব্যাকরণখানি থেকে তিনি যথেষ্ট উপকার গ্রহণ করবার প্রস্তুত সুযোগ লাভ করেছিলেন। হালহেডের ব্যাকরণ যে বাংলা ভাষাবৃত্তি অনুসরণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, কেরী তা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন; পীয়ার্সের কাছে লেখা তাঁর ২-১০-১৭৯৫ তারিখের চিঠিতে তার প্রমাণ আছে। ঐ চিঠিরই৫৬ এক জায়গায় আছেঃ 'There is a dictionary and grammar, of Hindoosthani, published by a Mr Gilchrist, a very good one, but this will not be very useful for Bengali; it is, however, a useful and very excellent work, in three volumes, quarto.'

এই চিঠিটি সম্ভবতঃ মদনাবাটি থেকে লিখিত হয়েছিল। এখানে দেখা যাচ্ছেঃ কলকাতা থেকে দূরে মালদহের গ্রামে বসেও ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে আধুনিক উদ্যমগুলির সংগে তিনি পরিচিত ছিলেন। ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে অভিধান ও ব্যাকরণ যে কতখানি উপযোগী ও অপরিহার্য, কেরী তা বুঝেছিলেন; গিলখ্রীস্টের অভিধান ও ব্যাকরণ বাংলা ভাষা অনুসরণে

বিশেষ কার্যকর নয় বলে যখন তিনি মন্তব্য করেন, তখনও ঐ গ্রন্থের সূত্রেই বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ কিন্তু অনায়াসেই লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্ত তথ্যই প্রমাণ করে যে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধানের অভাববোধে কেরী বিশেষভাবে পীড়িত হয়েছিলেন এবং বাংলা ভাষার এই অভাবাত্মক দিকটি পূরণ করতে চেয়েছিলেন।

তথাপি একটি কথা এখানে মনে রাখা দরকার। এই অভাববোধ সম্ভবতঃ বাংলা ভাষার বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সূচিত হয়েছিল, তবু এই অভাববোধ স্বভাবে যে প্রধানতঃ ব্যক্তিগত অভাববোধ মাত্র, তা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। বৃহত্তর অর্থে বাংলা ভাষার একটি অভাবাত্মক দিক তিনি লক্ষ্য করেছিলেন বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণের জন্যই সেই অভাব নিরসনে তিনি উদ্যত হয়েছিলেন। এই ব্যক্তিগত প্রয়োজন-সাপেক্ষ অভাববোধ তাঁর মধ্যে প্রবল ছিল বলে, তিনি যখন শব্দসম্ভার সংকলন করেন তখন তা ইংরেজি প্রতিশব্দের আলোকেই তিনি পরিষ্কার করে নেন, অথবা যখন ব্যাকরণের সূত্রগুলি রচনা করেন তখন তা মাতৃভাষার মাধ্যমেই ধারণ করেন, যাতে তা সহজে অনুধাবন করা যায়। বাংলা ভাষার কোন সমর্থ ব্যাকরণ বা অভিধান যদি থাকতও, তথাপি প্রাথমিক অবস্থায় কেরীকে সম্ভবতঃ আপন প্রয়োজনেই তার ইংরেজি রূপান্তর সাধন করে নিতে হতো।

ব্যক্তিগত প্রয়োজনের সূত্রে এই যে তাঁর ব্যাকরণাদি রচনার উদ্যোগ, তা-ই ক্রমশঃ ব্যক্তিগত প্রয়োজনের সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করে, বৃহত্তর পরিধিতে প্রয়োজনের বৃত্তিটিকে প্রসারিত করে দিয়েছিল। তাঁর মতই, যাঁদের মাতৃভাষা ইংরেজি, তাঁদের প্রয়োজন পূরণে তাঁর এই উদ্যম পরবর্তী-কালে চালিত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। একে এক অর্থে প্রয়োজনবোধের রূপান্তরসাধনও বলা যায়।

আমাদের কাছে এটা খুবই স্পষ্ট যে, বাংলা ভাষায় অসম্পূর্ণ অধিকার নিয়েই কেরী বাইবেল অনুবাদের কাজে হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন তিনি ভাষা শিক্ষা ও অনুবাদের কাজ সমান্তরালভাবে চালাচ্ছেন, তখন শুধু রামরাম বসুর প্রত্যক্ষ সহায়তার ওপর অসহায়ভাবে নির্ভরশীল না থেকে, ভাষার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবার জন্যও যথেষ্ট আয়াস করেছেন। তাঁর এই আয়াস ভাষার শব্দ, বৈয়াকরণিক তথ্যাদি সংকলনের মধ্যে স্পষ্টতঃই ধরা পড়ে। যখন ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের গোড়ায় বাংলা ভাষায় তিনি প্রাথমিক স্তরের শিক্ষানবিশী করছেন, তখনও তাঁর মনোযোগ ভাষার বিশিষ্ট ব্যবহারাদি বা শব্দভঙ্গি অনুসরণে নিবদ্ধ। তখনই যে তাঁর এইসব পর্যবেক্ষণ সংকলন করবার আগ্রহ তিনি পোষণ

করতেন, তার প্রমাণ ৩-১-১৭৯৪ তারিখে লেখা তাঁর চিঠি, যাতে তিনি সাটক্লিফকে বাংলা ভাষার শব্দাদির নমুনা পাঠিয়েছিলেন।৫৭ পরে যখন তিনি বাংলা ভাষায় পরিবর্ধিত অধিকার অর্জন করেন, তখনও প্রাথমিক অবস্থায় গৃহীত এই পদ্ধতিটি তিনি প্রত্যাখ্যান করেননি। ১৭৯৪ খৃীষ্টাব্দের অগাষ্টের মধ্যেই বাইবেল অনুবাদের কাজে তিনি অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিলেন; তখনো, ৯-৮-১৭৯৪ তারিখে সাইক্লিফকে লেখা চিঠির সূত্রে দেখা যায়, ভাষার শব্দ সংগ্রহ ও ব্যাকরণের স্বভাব সংকলনের কাজে তিনি বিরত নন। ঐ চিঠিতে তিনি সাটক্লিফকে জানাচ্ছেনঃ 'I intend to send you soon a copy of Genesis, Matthew, Mark, and James, in Bengali; with a small vocabulary and grammar of the language, in manuscript, of my own composing.'৫৮

এই উদ্ধৃতি থেকে দুটি বিষয় অন্তত স্পষ্ট হয়ঃ ১। কেরী বাইবেল অনুবাদের প্রয়োজনে ভাষাশিক্ষা কালে ভাষার স্বভাব অনুধাবন সূত্রে ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দকোষ প্রস্তুত করেছিলেন (ক) ভাষার সঙ্গে ব্যক্তিগত-ভাবে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবার জন্য, (খ) ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দকোষেব অভাব পরোক্ষভাবে পূরণ করবার জন্য; ২। অবাংলা ভাষাভাষী অর্থে ইংরেজরা যাতে বাংলা বাইবেল বুঝতে পারেন, তার সুবিধার জন্য। সাটক্লিফকে বাইবেলের অংশবিশেষের বাংলা অনুবাদ পাঠানো বৃথা যদি না সঙ্গে সহায়িকা থাকে। কেরী তাই বাংলা অনুবাদের সঙ্গে ভাষার ব্যাকরণ ও নির্বাচিত শব্দভাণ্ডার-সংকলন পাঠাতে চেয়েছিলেন। ২-১০-১৭৯৫ তারিখে এস. পীয়ার্সের কাছে লেখা চিঠিতেও কেরী জানিয়েছেন যে, ওই বছরের মার্চেই 'I set about composing a grammar and dictionary of the Bengal language, to send to you.'৫৯ এখানেও দেখা যাচ্ছে তাঁর রচনার পশ্চাতে পীয়ার্স নামক ব্যক্তিত্বটি কোন না কোনভাবে উপস্থিত।

এই প্রসঙ্গটি নানা কারণেই বিশেষ জরুরি। অবাংলাভাষাভাষীর প্রয়োজনের কথা কেরী বোধ হয় কখনই বিস্মৃত হননি। তাঁর ব্যাকরণ তাই ইংরেজিতে লেখা বাংলা ভাষার ব্যাকরণ; তাঁর অভিধানও বাংলা অভিধান নয়, বাংলা-ইংরেজি দোভাষা অভিধান।

বস্তুতঃ, ভাষাশিক্ষার মূল দুই উপকরণ অভিধান ও ব্যাকরণ সম্পর্কে কেরীর সমস্ত প্রযত্নের মধ্যে প্রয়োজনবোধের যে ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়, তার রূপ পরবর্তীকালে আরও খানিকটা পরিবর্তিত হয়েছিল। ইংরেজি ভাষাভাষীদের প্রয়োজনীয়তার দিকটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে নূতনতর দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়। তখন সাটক্লিফ বা পীয়ার্স যাতে অনূদিত বাইবেল অনুসরণ করতে পারেন, তার জন্য শব্দ-

ভাণ্ডার বা ব্যাকরণ সংকলনের প্রয়োজন গুরুতর নয়; ধর্মগ্রন্থ বা ধর্ম-সংশ্লিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতটি অতঃপর সম্পূর্ণভাবে বাহ্য হয়ে গেল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ভারতীয় ভাষায় ইংরেজ শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনই এখন কেরীর এতদ্বিষয়ক উদ্যমের মূল প্রেরণাভূমি। এখানকার শিক্ষার্থীরা কেউ ধর্মপ্রচারক নন, প্রত্যেকেই রাষ্ট্র-পরিচালনার বৃহৎ আয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাঁদের কাছে দেশীয় ভাষাশিক্ষা সমর্থ শাসনকার্যের জন্যই প্রয়োজনীয়। ভাষাচর্চায় প্রয়োজন সাপেক্ষতার রূপ-পরিবর্তনের এই প্রেক্ষাপটটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্যাকরণরচনার উদ্যোগে প্রয়োজন সাপেক্ষতা এখনো যথারীতি প্রধান, কিন্তু বৃহত্তর প্রয়োজনে ও পরিধিতে তার ব্যাপ্তি ঘটে। ভাষার ব্যাকরণই মুখ্য প্রসঙ্গ হয়ে উঠলেও, প্রয়োজনভিত্তি দৃঢ় বলে ব্যাকরণ রচনায় ইংরেজি ভাষামাধ্যম স্বাভাবিকভাবেই গৃহীত হয়, কম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীদের মাতৃভাষা দেশীয় ভাষাশিক্ষার মাধ্যমরূপে স্বীকৃতি পায়। এই পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতটি কেরীর ১৫-৬-১৮০১ তারিখে রাইল্যাণ্ডকে লেখা একটি পত্র থেকে উদ্ধৃতির মাধ্যমে স্পষ্ট হতে পারে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা ভাষার অধ্যাপনায় নিযুক্ত হবার পর কেরী লিখছেনঃ

'When the appointment was made, I saw that I had a very important charge committed to me, and no books or helps of any kind to assist me. I therefore set about compiling a grammar, which is now half printed.'৬০

নূতন দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর কেরী যে অসহায় বোধ করেছিলেন, এই চিঠির সূত্রে তা অনুমান করা যেতে পারে। তথাপি আপন উদ্যমে তিনি যে অচিরাৎ এই সংকট কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন, তার কারণ, ভাষা শিক্ষার প্রধান দুই উপকরণ ব্যাকরণ ও অভিধান সংকলনে আপন প্রয়োজনের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে ইতিপূর্বেই তিনি মনোযোগী হয়েছিলেন। নূতন এই অবস্থায় তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যম বৃহত্তর দাবিপূরণের ক্ষেত্রে সমর্পিত হয়। পূর্বে উদ্ধৃত ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের একটি চিঠিতেই দেখা যায় তিনি ব্যাকরণ রচনায় প্রবৃত্ত, ১৮০১ সালের জুনে দেখা যাচ্ছে তার অর্ধেক মুদ্রিত হয়েছে। লক্ষণীয়, বাইবেল অনুবাদ ও মুদ্রণ প্রসঙ্গ যখন তিনি এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করেন, ব্যাকরণ-রচনা বা শব্দ-সংগ্রহ প্রসঙ্গে অনুরূপভাবে তিনি কখনই মুদ্রণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন নি। প্রকৃতপক্ষে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা ও সেখানে তাঁর নূতন দায়িত্বভারের ফলে উদ্ভূত নূতন পরিস্থিতিতেই ব্যাকরণ প্রকাশনার ক্ষেত্রে নবতর ভূমিকায় কেরীর আত্মপ্রকাশ ঘটে। প্রথমাবধিই তিনি ভাষার ব্যাকরণাদি সম্পর্কে

মনস্ক ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু নূতন পরিস্থিতিতেই বাংলা ব্যাকরণকে ব্যাকরণ-শাস্ত্ররূপে তিনি মুখ্যভাবে লক্ষ্য করতে চেয়েছেন। কেরীর দিক থেকে একে এক ধরনের উত্তরণ বললে সম্ভবতঃ অন্যায় হয় না; বাইবেল অনুবাদের আনুষঙ্গিক রূপে একদিন যে ব্যাকরণ-সন্ধিৎসা তাঁর মধ্যে গৌণ ধর্মে আত্মপ্রকাশ করেছিল, এখানে তার মুক্তি সূচিত হয়।

প্রয়োজন সাপেক্ষতার এইরকম বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে ব্যাকরণাদি রচনাকে কেরী প্রকৃত জ্ঞানচর্চার উদার পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্য করতে পেরেছিলেন বলেই মনে হয়। ফেলিক্স যখন ব্রহ্মদেশে যাচ্ছেন, পিতা উইলিয়ম তাঁকে যে উপদেশামৃত দান করেন, তার অংশ বিশেষ এখানে প্রসঙ্গক্রমে উদ্ধার করা যায়ঃ

'Let the Burmese language occupy your most precious time, and your most anxious solicitude. Do not be content with its superficial acquisition. Make it yours, root and branch. Listen with prying curiosity to the forms of speech, the construction and accent of the people. All your imitative powers will be wanted, and, unless you frequently use what you acquire, it will profit you little. As soon as you feel your feet, compose a grammar, and some simple christian instruction...... Be very careful that your construction and idiom are Burman, not English.' ৬১

এই উদ্ধৃতিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য; কেননা ভাষাসন্ধানে কেরীর মনোভাব কিরকম ছিল, তা এখানে অতি অকপটভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষ-ভাষাগোষ্ঠীর ভাষায় খ্রীষ্টান শাস্ত্র প্রচার করাই মূল উদ্দেশ্য বটে, তথাপি সেই বিশেষ ভাষাশিক্ষার বিষয়টিও কখনোই গৌণ নয়। বিভিন্ন ভাষা-শিক্ষায় কেরীর আগ্রহ ও প্রযত্ন যে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের গুরুত্বেই চালিত হয়েছিল, এই তথ্যটি আমাদের কাছে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও, নিরপেক্ষ ভাষাশিক্ষা, অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানচর্চার পরিপ্রেক্ষিতে ভাষাশিক্ষা প্রকল্পকে যে তিনি লক্ষ্য করতে পেরেছিলেন, তা-ও আমাদের কাছে আড়াল থাকে না। 'Christian instruction' বার্মান ভাষায় লেখা যখন ফেলিক্সের কাছে প্রত্যাশিত, তখনও গুরুতরভাবে আকাঙ্ক্ষিত হলো অন্তরঙ্গ ও সমগ্র-ভাবে তাঁর বার্মান ভাষাশিক্ষা, যা ভাষার ব্যাকরণগত সূত্রগুলি অনুধাবন করা, ভাষার গঠনরীতি এবং সংশ্লিষ্ট ভাষাভাষীদের মুখের ভাষা লক্ষ্য করার মাধ্যমেই সাধ্য হতে পারে। অর্জিত ভাষার রচনা যাতে নিরঙ্কুশভাবে অর্জিত ভাষার রচনাই হয়, তার প্রতি দৃষ্টি রাখাই প্রধান কাজ, লেখকের মাতৃভাষার প্রত্যক্ষ প্রভাবে তা অনেক সময়েই বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়।

এখানে কেরীর যে মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায়, তাতে ভাষাচর্চাকে তিনি যে প্রকৃত জ্ঞানচর্চার সমার্থক বলে মনে করতেন, এই সত্যটিই যেন উদ্ঘাটিত হয়; ভাষায় রচিত খ্রীষ্টান শাস্ত্র যাতে বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রাহ্য রূপ লাভ করতে পারে তার জন্যই—সংশ্লিষ্ট ভাষার আন্তর পরিচয়লাভের প্রয়োজনীয়তার যে দিকটি এখানে অনতিপ্রচ্ছন্ন, তা-ও যেন আড়াল হয়ে যায়। তা-ছাড়াও অনুন্নত ভাষাকে সমর্থ ও উন্নীত করার উদ্যমে এক অতি প্রধান কাজ যে সেই ভাষার রীতিগত শৃঙ্খলা বিধান করা, এবং তা যে সেই ভাষার ভিত্তিস্বরূপ ব্যাকরণ ও শব্দকোষ রচনা দ্বারাই সূচিত হতে পারে, এই অভিজ্ঞতাও কেরী অর্জন করেছিলেন। বোধহয় সেই জন্যই ফেলিক্সের খ্রীষ্টান উপদেশামৃতের বার্মান অনুবাদের চেয়ে বার্মান ব্যাকরণ রচনাকে গুরুত্বের দিক থেকে তিনি ন্যূন করে দেখতে পারেন নি। এ-ও এক ধরনের হিতব্রত; খ্রীষ্টান মিশনারীদের কার্যাবলীর ইতিহাসে এই কর্ম-ধারা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বস্তুতঃ কেরীর ব্যাকরণ-চর্চার বাস্তবিক পরিপ্রেক্ষিতটি অনুসরণ করলে ব্যাকরণ-চর্চায় তাঁর ভূমিকাটি আলোকিত হয়ে ওঠে। নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রয়োজনের সংকীর্ণতা > অনূদিত বাইবেল অনুধাবনে ইংরেজিভাষীর প্রয়োজনীয়তার বোধ > শিক্ষার উদার প্রয়োজনে জ্ঞানের অনুশীলন > প্রয়োজন নিরপেক্ষ প্রকৃত জ্ঞানচর্চার বোধে উত্তরণ;—কেরীর ব্যাকরণ-চর্চার ভূমিকাটি মোটামুটিভাবে এইরকম পর্যায়ভেদে সাজানো যেতে পারে। প্রচারক মিশনারীর জ্ঞানতপস্যায় উত্তরণের কাহিনীই এক অর্থে কেরীর জীবন কাহিনী; তাঁর ব্যাকরণ-চর্চার পরিপ্রেক্ষিতের স্তর পরিবর্তনে তাঁর বিষয়-ধ্যানের স্বরূপ কিভাবে বিবর্তিত হয়েছিল, সেই সূত্র অনুসন্ধানের মাধ্যমেই এই কাহিনীর সত্যরূপটি উন্মোচিত হয়ে যায়।

বাংলা ব্যাকরণ পরিচয়

সজনীকান্ত দাস কেরীর বাংলা ব্যাকরণের প্রথম সংস্করণের একটি কপি তাঁর সংগ্রহে আছে বলে দাবী করেছিলেন, কিন্তু ঐ সংস্করণের মুখবন্ধ ও বিষয়সূচীর উল্লেখ ছাড়া তিনি গ্রন্থখানি সম্পর্কে বিস্তৃত কোন পরিচয় উদ্ধার করেন নি। তাঁর দেওয়া গ্রন্থ পরিচয়টি এই রকমঃ 'প্রথম সংস্করণের পুস্তকে এই কয়টি অধ্যায় ছিলঃ—বর্ণমালা, Substantives, adjectives, pronouns, verbs, adverbs, prepositions, conjunctions, interjections, of compound words, syntax, contractions of numbers.'[৬২] প্রথম সংস্করণ সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি কেউ উল্লেখ করে নি; এমন কি

উইলসন কেরীর ব্যাকরণ সম্পর্কে যখন মন্তব্য করেন, তখন কেরীর বাংলা ব্যাকরণের পরবর্তী অনেকগুলি সংস্করণই প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল, ফলে তাঁর এই মন্তব্য শুধু প্রথম সংস্করণ ভিত্তিক নয়। প্রকৃতপক্ষে, ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলে প্রথম সংস্করণের সামান্যতা প্রকট হয়ে ওঠে, কেরীও দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তককে প্রায় নূতন গ্রন্থ বলে মনে করতেন। অতঃপর তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হলেও দেখা যায়, সামান্য কিছু পরিমার্জনা সত্ত্বেও গ্রন্থের ভিত্তি ওই দ্বিতীয় সংস্করণ। ফলে কেরীর বাংলা ব্যাকরণ বলতে প্রধানভাবে দ্বিতীয় সংস্করণকেই বোঝায়, প্রথম সংস্করণ ঐতিহাসিক সংস্কার ও কৌতূহলের সামগ্রীরূপে উল্লেখ্য হয়ে থাকে মাত্র।

দ্বিতীয় সংস্করণ কেরীর বাংলা ব্যাকরণের যথার্থরূপ, পঞ্চম সংস্করণ চতুর্থ সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ মাত্র। তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণকে দ্বিতীয় সংস্করণের পুনর্মুদ্রণমাত্র বলা যায় না, কিছু কিছু পরিমার্জনার চিহ্ন এই সংস্করণগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান অধ্যায়-ভাগে সেই জন্য দ্বিতীয় সংস্করণ ব্যাকরণের বিষয় পরিচয় উদ্ধার করা হয়েছে, এবং দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণে পরিমার্জনার চেষ্টা করা হয়েছে এমন ক্ষেত্রগুলিও নির্দেশ করা হয়েছে।

SECTION—I: দ্বিতীয় সংস্করণের Section I এক থেকে দশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিধৃত। বিষয়ঃ Of Letters.—অর্থাৎ "অক্ষর"৬৩ বিষয়ক। সূচনায় গ্রন্থকার জানাচ্ছেনঃ "There are fifty letters (অক্ষর) in the Bengalee Alphabet, of which thirty-four are consonants (ব্যঞ্জন), and sixteen vowels (স্বর)"। ব্যঞ্জন রূপে তিনি এই 'অক্ষর'-গুলিকে ধরেছেনঃ ক, খ, গ, ঘ, ঙ। চ, ছ, জ, ঝ, ঞ। ট, ঠ, ড, ঢ, ণ। ত, থ, দ, ধ, ন। প, ফ, ব, ভ, ম। য, র, ল, ব, -। শ, ষ, স, হ, ক্ষ। স্বর 'অক্ষর' এইগুলিঃ অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ। 'অক্ষর'-পরিচয় কেরী তালিকাবদ্ধ উত্থাপনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নি; ব্যঞ্জন 'অক্ষরের' বর্গ-পরিচয়, ধ্বনি-পরিচয় (অল্প প্রাণ, মহাপ্রাণ, সানুনাসিক), স্বর 'অক্ষরের' হ্রস্ব ও দীর্ঘ রূপ, অর্ধস্বর নির্ণয় ও উচ্চারণ তত্ত্বের (কণ্ঠ্য, তালব্য, মূর্ধণ্য, দন্ত্য, ওষ্ঠ্য) প্রাথমিক লক্ষণে 'অক্ষর'-তত্ত্ব অনুসরণে তাঁর চেষ্টা বিশেষভাবেই লক্ষণীয়। Section I-এর একটি দ্বিতীয় ভাগ আবার পরিকল্পিত হয়েছে, যার বিষয় 'অক্ষরের' উচ্চারণ,—"On the Pronunciation (উচ্চারণ) of the Letters." বাংলা 'অক্ষরের' উচ্চারণবিধি যেভাবে ব্যাকরণগত নিরূপণ লাভ করে,

কেরী পূর্বাংশে (Of Letters অংশে) তার প্রাথমিক ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন; ফলে উচ্চারণ বিষয়ক নির্দেশের এই অংশটি কেরীর ব্যাকরণ রচনার অব্যবহিত উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্য করাই উচিত হবে। এখানে কেরী প্রত্যেকটি বাংলা 'অক্ষরের' উচ্চারণ কোনও না কোন ইংরেজি শব্দ বা শব্দবন্ধের শব্দধ্বনির অনুরূপতায় ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। ইংরেজি ভাষাভাষীর জন্য রচিত বাংলা ব্যাকরণে উচ্চারণ নির্দেশের এই পদ্ধতি বিশেষ কার্যকর হওয়াই সম্ভব, নিরঙ্কুশ বাংলা ব্যাকরণে এই ধরনের পরিকল্পনার কোন স্থান থাকে না। তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণে Section-I-এর এই বিষয় ও ব্যাখ্যার মধ্যে কোন প্রভেদ দেখা যায় না।

SECTION—II: এগার পৃষ্ঠা থেকে ঊনত্রিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিধৃত Section II-র শিরোনামঃ "Of Compounding Letters." এই অধ্যায়ে কেরী বাংলা যুক্তাক্ষরবিধি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রথমেই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, 'The vowel অ is inherent in every consonant'. তারপর বলেছেন যে ব্যঞ্জন ব্যঞ্জনের সঙ্গে অথবা স্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যুক্তাক্ষর সৃষ্টি করতে পারে। "ফোলা" (ফলা)যুক্ত অক্ষরকেই তিনি যুক্তাক্ষর বলে নির্দেশ করেছেন, এবং বাংলায় প্রচলিত বিভিন্ন ফলার রূপ ও তার ব্যবহার দেখাতে চেষ্টা করেছেন। এই ফলা ব্যবহারকে আবার তিনি দুই ভাগে ভাগ করে দেখেছেন। (১) 'Of compounding a consonant with a vowel', (২) 'Of compounding consonants.'। প্রথমে ব্যঞ্জনে স্বর-ফলার ব্যবহার দেখানো হয়েছে। স্বর-ফলাগুলির প্রতীকচিহ্ন বা 'symbol' (া, ি, ী, ু, ূ, ে, ৈ, ো, ৌ), অক্ষরে তার প্রয়োগের ফলে উদ্ভূত রূপচিত্রের নবীনতা, ও তার উচ্চারণবিধি এই অংশে কেরী মোটামুটি বিশ্বস্তভাবেই দেখাতে চেষ্টা করেছেন। এই ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাখ্যার পদ্ধতি এইরকমঃ

›wel	symbol	compound	pronunciation
আ	া	বা	ba
ই	ি	বি	bi
ঈ	ী	বী	bee
উ	ু	বু	boo

'যুক্ত অক্ষর' বলে মনে করেছেন। কিন্তু এ-সম্পর্কে তিনি সচেতন ও সতর্ক ছিলেন যে, "The Consonant with its annexed vowel is

esteemed one letter, and pronounced as such." এরপরে ব্যঞ্জনের সঙ্গে ব্যঞ্জনের যুক্তরূপ অনুসন্ধানেও কেরী একই রীতিতে অগ্রসর হয়েছেন। এখানে দেখা যায়, মূল অক্ষরের সঙ্গে 'ফলা' প্রয়োগের ফলে জাত যুক্তাক্ষরে কোথায় ফলা-র উচ্চারণ মূল অক্ষরের পরে বা আগে নিষ্পন্ন হবে, তার নির্দেশও যথাযথ দেওয়া হয়েছে। যেমনঃ র-ফলার (্র) প্রয়োগ-জাত 'ক্র' অক্ষরে ফলার-র উচ্চারণ পরে, এবং রেফের (র্) প্রয়োগজাত 'দর্প' শব্দের উচ্চারণে ফলা আগে উচ্চারিত হয়। এ ছাড়া বাংলা যুক্তাক্ষরের ক্ষেত্রে অক্ষরলিপি যে কোথাও কোথাও পরিবর্তিত হয়ে যায়, এখানে তার নির্দেশও আছে। যেমনঃ ক্র-ক্র; শু-শু, ত্র-ত্র; ইত্যাদি। চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার সম্পর্কে উল্লেখও এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

এই অধ্যায়ের অপব গুরুতর অংশ 'সন্ধি' বিষয়কঃ 'Of the Union of Letters, of words (সন্ধি)।' সন্ধির সংজ্ঞা তিনি এইভাবে দিয়েছেনঃ 'The bringing of two words of syllables into contact, so that the final of the one coalesces with the initial of the other, is called sundhi, or joining. It is effected by a change in the final of the first member, or the initial of the last, or in both." সন্ধির দুই ভাগঃ (১) Sundhi of vowels (২) of consonants : অতঃপর তিনি স্বর-সন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধির বিধিনির্দেশ ও উদাহরণ পৃথক পৃথকভাবে সংকলন করেছেন। উদাহরণগুলি বাংলাশব্দের ইংরেজি সমার্থক শব্দের প্রয়োগে অথবা ইংরেজি অর্থ ব্যাখ্যার মাধ্যমে ইংরেজ শিক্ষার্থীর উপযোগী করে তোলা হয়েছে।

কিন্তু তৃতীয় সংস্করণে (১৮১৫) সন্ধি-তত্ত্ব Section II-তে আলোচিত হয়নি। এই সংস্করণে Section II-তে ব্যঞ্জন+স্বর ও ব্যঞ্জন+ব্যঞ্জন —এই যুক্তাক্ষর বিষয়ক অংশই শুধু অন্তর্ভুক্ত। সন্ধি এই সংস্করণের Section X-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে,—আলাদা অধ্যায়ের মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণের সন্ধির বিষয় ও ব্যাখ্যার মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। তবে তৃতীয় সংস্করণের অধ্যায়ের নামকরণে তুচ্ছ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়: এখানে অধ্যায়ের নামঃ 'of the junction of letters (সন্ধি)'। চতুর্থ সংস্করণে তৃতীয় সংস্করণের এই পরিকল্পনাই গৃহীত হয়েছে। তৃতীয় সংস্করণে সন্ধি-কে স্বতন্ত্র অধ্যায়ের মর্যাদা দিলেও তা কেরীর ব্যাকরণ ভাবনার উৎকর্ষ প্রমাণ করে বলে মনে হয় না। এখানে 'Syntax' অধ্যায়ের পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সন্ধি-প্রসঙ্গ উপস্থাপিত; এবং এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে তিনি বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, ক্রিয়াবিশেষণ, অনুসর্গ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা নিষ্পন্ন করেছেন। এ থেকে মনে হতে পারে

যে কেরী সন্ধির স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ স্থাপনায় যথেষ্ট সতর্কতার পরিচয় দেন নি। প্রকৃতপক্ষে, সন্ধি অক্ষর বিষয়ক অনুসন্ধানই বটে, phonology বা ধ্বনিতত্ত্বের অন্তর্গত; ফলে এই অধ্যায়ের স্থান অক্ষরতত্ত্বের আলোচনার সন্নিহিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয় সংস্করণে স্বতন্ত্র অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত না হলেও, এই দিক থেকে তিনি সন্ধিবিধি উপস্থাপনায় অধিক সঙ্গতির পরিচয় দিয়েছেন বলে মনে হয়।

SECTION—III: তিরিশ থেকে তিপ্পান্ন পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিধৃত Section III-র শিরোনামঃ 'Of words.' এই অধ্যায়ে কেরী শব্দতত্ত্ব সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা করেছেন। অধ্যায়ের সূচনাতেই তিনি জানিয়েছেন, 'Words are divided into nouns, verbs, and indeclinable particles.' সাধারণভাবে শব্দ প্রসঙ্গের এইরকম উত্থাপনের পর তিনি 'বিশেষ্য' সম্পর্কে আলোচনা করেছেন,—'of Substantives.' এই প্রসঙ্গে তিনি জানাচ্ছেন যে বিশেষ্য শব্দকে দুই ভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে; (১) সেই সব শব্দ যা ব্যঞ্জন অক্ষরে শেষ হয়েছে; (২) সেই সব শব্দ যা স্বরাক্ষরে শেষ হয়েছে। এই হলন্ত ও স্বরান্ত শব্দের উদাহরণ দিয়েছেন যথাক্রমে কুকুর ও পিতা। এই নির্দেশের পরই তিনি কারক ও বিভক্তির প্রসঙ্গ উদ্ধার করেছেন। কারক ও বিভক্তি সম্বন্ধে নির্দেশ এই-রকমঃ কর্তা (প্রথম), কর্ম (দ্বিতীয়) করণ (তৃতীয়), সম্প্রদান (চতুর্থ), অপাদান (পঞ্চম), সম্বন্ধ (ষষ্ঠ), অধিকরণ (সপ্তম)। কারক অনুযায়ী বিভক্তিজ্ঞাপক দুটি টেবল্-ও তিনি পর পর উদ্ধার করেছেন। পুংলিঙ্গে ও স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহারযোগ্য বিভক্তির রূপ দেখানোর সঙ্গে ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহারযোগ্য বিভক্তির রূপও নির্দেশিত হয়েছে। এরই মধ্যে বাংলা বচন সম্পর্কিত উল্লেখও দেখা যায়। তিনি স্পষ্টতঃই জানিয়েছেন যে বাংলায় দুইটি মাত্র বচন আছেঃ একবচন ও বহুবচন; এবং খুব নির্দিষ্ট-ভাবে উল্লেখ না থাকলে ক্লীবলিঙ্গে সাধারণতঃ বহুবচন হয় না। এরপর একবচন ও বহুবচন নির্দেশ করে উদাহরণজ্ঞাপক কয়েকটি পুংলিঙ্গ, স্ত্রী-লিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গের শব্দরূপ তালিকাকারে সাজিয়ে দিয়েছেন।

এই অধ্যায়ের অন্তিম অংশঃ 'Observations on the Nouns.' এখানে বাক্য গঠনে বিভক্তিলাঞ্ছিত শব্দ ব্যবহার না করেও যে অন্য স্বতন্ত্র শব্দ প্রয়োগ করে প্রয়োজনীয় ফললাভ করা যায়, কেরী তা দেখাতে চেয়েছেন। যে যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এইরকম ব্যবহার অনুমোদিত, তিনি তাও লক্ষ্য করতে চেষ্টা করেছেন। যেমনঃ আপনার হাত দিয়া করিয়াছি। (তে-বিভক্তির পরিবর্তে)। ঈশ্বর কর্তৃক জগত সৃষ্ট। (তে-র পরিবর্তে)।

বিশেষ্য সম্পর্কে কেবীর পর্যবেক্ষণের একটি লক্ষণীয় অংশ ১০নং অনুচ্ছেদ। 'শোকরূপ অন্ধকার', বা, 'দুর্গতিরূপ জল' কেন সম্বন্ধবাচক বিভক্তিযুক্ত হয় না, এখানে তার নিরূপণ আছে। সম্বোধনবাচক শব্দ ও তার ব্যবহারবিধি সম্পর্কেও তাঁর নির্দেশ প্রসারিত। এখানে তিনি নির্দেশক প্রত্যয় সম্বন্ধেও উল্লেখ করেছেন। লিঙ্গ প্রসংগও এখানে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, এবং উদাহরণ স্বরূপ প্রচুর লিংগান্তরিত শব্দরূপ উদ্ধার করা হয়েছে।

'Observations on the Nouns' এই অধ্যায়ের খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সবসময় যে খুব বৈয়াকরণিক শৃঙ্খলায় কেরী এই অংশটি সাজাতে পেরেছেন, তা নয়, অবশ্য শিরোনাম অনুযায়ী তা প্রত্যাশিতও নয়;—এই অংশটিকে পক্ষান্তরে, বৈয়াকরণিক নির্দেশাদির প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও, অনুশীলনী বা Lesson-অংশ বলাই সম্ভবতঃ অধিকতর সঙ্গত হবে। শব্দের ও বাক্যের সাহায্যে এখানে সর্বক্ষেত্রে উদাহরণের প্রাচুর্য, এবং ইংরেজি শব্দ, শব্দবন্ধ, বা বাক্যের সহযোগে তা বোঝাবার প্রয়াস এত নিরলস ও সুস্পষ্ট যে, ইংরেজদের ভাষাশিক্ষার তাৎক্ষণিক প্রয়োজনবোধেই যে কেরী এই অংশের এইরকম উত্থাপন করেছিলেন, তা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। অন্যদিক থেকে লক্ষণীয় যে, (১) উদাহরণ সংকলনে তিনি বাংলা গদ্যরূপ ব্যবহার করেছেন; (২) প্রচুর এমন শব্দ উদ্ধার করেছেন যাকে মুখের ভাষার শব্দ বা শব্দবন্ধ বললেই ভাল হয়, ঠিক সাধু শব্দ বা শব্দ-বন্ধের মর্যাদা যার প্রত্যয়িত নয়। যেমন: 'ঠাঁই', 'গুচ্ছার', 'ছালিয়া' ইত্যাদি। কিংবা, 'ছালিয়াটি সুবুদ্ধি বটে', ইত্যাদি।

তৃতীয় সংস্করণে (১৮১৫) Section III-র বিষয়প্রসঙ্গ দ্বিতীয় সংস্করণের অনুরূপ; তবে সেখানে বিন্যাসে, ব্যাখ্যায়, ও যোগ্যতর উদাহরণ সংকলনে বাংলা ব্যাকরণে কেরীর বর্ধিত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তৃতীয় সংস্করণেও এই অধ্যায়ের শিরোনাম 'of words.' কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে যেখানে অধ্যায়কে তিনি প্রধান দুটি মাত্র ভাগে ভাগ করে-ছিলেন,৬৪ সেখানে তৃতীয় সংস্করণে উপবিভাগের সংখ্যা তিনি বর্ধিত করেন। এখানে অধ্যায়ের উপবিভাগ এইরকম: (ক) of substantives; (খ) of neuter nouns; (গ) observations on the Nouns; (ঘ) of the Gender of Nouns; (ঙ) of Euclitic Particles. এই পাঁচটি উপ-বিভাগে কেরী যে বিষয়গুলি উত্থাপন করেছেন, দ্বিতীয় সংস্করণে সেই সেই বিষয়ই তিনি মাত্র দুটি উপবিভাগের পরিধির মধ্যে উল্লেখ করেছিলেন; তথাপি এখানে এই উপবিভাগগুলি নির্দিষ্ট হওয়ায় বিষয়বিন্যাস অধিক-

তর সুস্পষ্টতা লাভ করেছে। দ্বিতীয় সংস্করণের Observations-অংশের মধ্যে অনেকগুলি প্রসঙ্গ থাকা সত্ত্বেও একধরনের অবিন্যাস ও বিশৃঙ্খলা আছে, তৃতীয় সংস্করণের বিষয়নির্দেশ তা থেকে গ্রন্থখানিকে অনেকটা মুক্ত করতে পেরেছে। বিষয়জ্ঞান অধিকতর নির্দিষ্ট হওয়ার দরুণই এই-রকম সম্ভবপর হয়েছে বলে মনে হয়। আবার, দ্বিতীয় সংস্কবণের ওপর কিছু পরিবর্ধনও এখানে চোখে পড়ে; যেমনঃ তৃতীয় সংস্করণের বর্তমান অধ্যায়ের ২০নং অনুচ্ছেদ। অধিকন্তু, দ্বিতীয়-র তুলনায় তৃতীয় সংস্করণে উদাহরণগুলিকে অধিক পূর্ণাঙ্গ ও সঙ্গত করে তুলবার জন্যও তিনি প্রযত্ন করেছিলেন। যেমনঃ I did it with my own hand বোঝাতে দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি লিখেছিলেন, 'আপনার হাত দিয়া করিয়াছি'; তৃতীয় সংস্করণে লিখেছেন, 'আমি আপনার হাত দিয়া করিযাছি'। কিংবা, I write with a pen বোঝাতে দ্বিতীয় সংস্করণে আছে, 'আমি কলমকরণক লেখি'; তৃতীয় সংস্করণেঃ 'আমি কলমকরণক or কলমেতে লিখি'। অথবা, the business was accomplished by your kindness বোঝাতে দ্বিতীয় সংস্করণে আছে, 'আপনকার অনুগ্রহপূর্বক কর্ম সিদ্ধ হইল'; তৃতীয় সংস্করণেঃ 'আপনকাব অনুগ্রহতে or অনুগ্রহপূর্বক কর্ম সিদ্ধ হইল'। এই উদাহরণগুলির দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে তৃতীয় সংস্করণের প্রস্তুতিতে কেরী উদাহরণ-রূপ প্রতিষ্ঠায় অধিকতর মনোযোগ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণে নেই, এইরকম নূতন উদাহরণও তৃতীয় সংস্করণে তিনি কোথাও কোথাও সংকলন করেছেন; যেমন, ২১নং অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় উদাহরণটি। তৃতীয় সংস্করণের সঙ্গে চতুর্থ সংস্করণের কোন প্রভেদ লক্ষ্য করা যায় না।

SECTION—IV: চুয়ান্ন থেকে ষাট পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিধৃত এই অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছেঃ Of Patronymics, Gentiles, Derivatives, &C. এখানে (১) Of Patronymics (অপত্যার্থ শব্দ), (২) Of Gentiles (জনার্থশব্দ), (৩) Of Abstract Substantives (ভাবার্থ), (৪) Of Verbal Nouns (ধাত্বর্থ শব্দ), ও (৫) Of Nouns of Government, Agency, &C.-এই পাঁচটি উপবিভাগে বিচিত্র শব্দশ্রেণীর ব্যুৎপত্তি সাধারণভাবে নির্ণয় করবার চেষ্টা আছে। একদিক থেকে দেখতে গেলে বর্তমান অধ্যায়টিকে পূর্ববর্তী অধ্যায়টির পরিপোষক বা বর্ধিত অংশ বলে মনে হতে পারে অবশ্য, কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে তা সম্ভবত নয়; এখানে বাংলায় ব্যবহৃত কিছু শব্দ, শব্দবন্ধ বা তার ব্যুৎপত্তির পরিচয়ই উদ্ধার করা হয়েছে। তবে এই অধ্যায়টি ব্যাকরণের সামগ্রিক পরিকল্পনায় ঠিক কিভাবে এবং

কোন অংশে যুক্ত, তা খুব নিশ্চিতভাবে নির্ধারিত নয়। তৃতীয় সংস্করণে এসে এই অংশটির যোগ্যতা অংশতঃ নির্ধারিত হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণে এই অধ্যায়টি খুবই অনির্দিষ্টভাবে রচিত ও শিথিলভাবে উপস্থাপিত বলে মনে হয়।

তৃতীয় সংস্করণে (১৮১৫) দ্বিতীয় সংস্করণের Section IV বর্জিত হয়েছে। এই অংশটি তৃতীয় সংস্করণের Section VII-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এবং তৃতীয় সংস্করণের Section VII-এর নাম হলোঃ 'Of the Formation of Words.' তৃতীয় সংস্করণে এই পরিচ্ছেদের গোড়াতেই পরিচ্ছেদটির পরিকল্পনা ও উপযোগিতা সম্পর্কে কেরী বলেছেন, 'A very large proportion of the words in the Bengalee Language are formed from the Sungskrit roots, with which and the manner of forming words from them, every student of the Bengalee, and other languages derived from that source, ought to be well acquainted.' কিন্তু প্রায় সংগে সংগেই তিনি জানিয়েছেন যে, 'It would scarcely come within the limits of a grammar intended for common use, to insert rules for the formation of every word used in the language'. নির্বাচিত কয়েকটি প্রসংগ ও উদাহরণ উল্লেখের পর তিনি লিখেছেন, "Those who wish to become better acquainted with the etymology of Bengalee words, will do well to study carefully the chapter of কৃদন্ত and উনাদি affixes in the Sungskrit grammar." এই পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্টতঃই বোঝা যাচ্ছে যে, আত্যন্তিক প্রয়োজনের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই এই পরিচ্ছেদটিকে পরিকল্পনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণের 'Of Nouns of Government, Agency, &C.' তৃতীয় সংস্করণে বর্জিত হয়েছে; এবং 'Of collectives' সংযোজিত হয়েছে। Etymology বা ব্যুৎপত্তি-নির্ণয় এই পরিচ্ছেদের অন্যতম প্রধান বিষয় হওয়ার অর্থ, প্রত্যয়াদি নির্দেশ এই পরিচ্ছেদের প্রধান লক্ষ্যের অন্যতম হয়ে ওঠা। প্রত্যয়ের প্রচুর উদাহরণ ও স্থূলনির্দেশ এখানে স্বাভাবিকভাবেই লক্ষ্য করা যায়। চতুর্থ সংস্করণে কেরী তৃতীয় সংস্করণকেই অনুসরণ করেছেন।

SECTION—V: একষট্টি থেকে বাহাত্তর পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিধৃত এই অধ্যায়ের নামঃ 'Of Adjectives (গুণবাচক)'। Adjectives বা গুণবাচক শব্দ এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। প্রথমেই গুণবাচক শব্দ বা বিশেষণের বচন যে সাধারণভাবে পরিবর্তিত হয় না, এই কথা বলবার পর, কেরী উদাহরণ সহযোগে বিশেষণের লিঙ্গান্তর বিষয়ে কয়েকটি প্রসঙ্গের উদ্ধার করেছেন। যেমন, সুন্দর স্ত্রীলিঙ্গে সুন্দরী, রূপবান স্ত্রীলিঙ্গে রূপবতী ইত্যাদি।

এই অংশটিকে-অধ্যায়ের সূচনা-ভাগ বলা যেতে পারে। অধ্যায়ের পরবর্তী বিভাগ হলোঃ 'Of the comparison of Adjectives'. মাত্র দুইটি অনুচ্ছেদে, বিশেষণের ব্যবহারে comparison কিভাবে নিষ্পন্ন হয়, তা উদাহরণসহ দেখান হয়েছে; যেমন বলা হয়েছে যে 'তর' বা 'তম' সহযোগে প্রয়োজনীয় নিষ্পত্তি সম্ভবপর হয়। অধ্যায়ের তৃতীয় অংশ হলোঃ 'Of the Formation of Adjectives'. এই অংশটি মোটামুটি দীর্ঘ; মোট তিরিশটি অনুচ্ছেদে বিশেষণের বিচিত্র রূপ-পরিচয় এখানে উদ্ধার করা হয়েছে। বিশেষণরূপে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দ কিভাবে গঠিত হয়, তার প্রতিই কেরী প্রধানতঃ লক্ষ্য রেখেছেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সমস্তটাই প্রচুর উদাহরণ সংকলনের আয়োজন বলে মনে হয়; তথাপি অর্থ ও সম্পর্কের বিচিত্র শ্রেণী-প্রকৃতিতেই তিনি উদাহরণগুলিকে সাজিয়েছেন, এবং কখনো কখনো মনে হতে পারে সে শব্দগঠনের পশ্চাতে বিশেষভাবে উপস্থিত সূত্রগুলিও তিনি নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন। যেমনঃ ৮নং অনুচ্ছেদে তিনি লিখেছেন, 'Many adjectives which express the possession of some quality, or a connection with some circumstance, are formed from the name of the quality or the circumstance by adding ইক or ঈ and lengthening the preceeding vowel by the rule of briddhi. Ex. From ধর্ম্ম, religion, is formed ধার্ম্মিক, religious.'

অবশ্য, বিশেষণরূপে যেসব শব্দের পরিচয় তিনি এখানে উদ্ধার করেছেন, সেগুলি সম্পর্কিত বিবেচনা বর্তমান অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত কিনা, সে সম্বন্ধে কেরীর মনেও সংশয় ছিল। সেই জন্যই বোধহয় অধ্যায়ের শেষে এই বিষয়ে তিনি এই ধরনের মন্তব্য যোগ করে দিয়েছিলেন, 'Several of the foregoing rules properly belong to the chapter of compound words, but on account of their frequent application they are introduced here'. প্রকৃতপক্ষে, বিশেষণ শব্দের গঠন পরিচয় তিনি যে অংশে উদ্ধার করেছেন, তা শব্দ গঠন বিষয়ক অধ্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। কেরী সে সম্পর্কে সচেতন থেকেও 'বিশেষণ' অধ্যায়েই যে তার বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন, তার কারণ অবশ্যই শিক্ষার্থীদের তাৎক্ষণিক সুবিধা সম্পর্কে তাঁর মনোযোগ। এবং দেখা যাবে, এই অংশটি তৃতীয় সংস্করণে আর 'Of Adjective' অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়নি।

তৃতীয় সংস্করণের (১৮১৫) Section IV হয়েছে বিশেষণ সম্পর্কিত অধ্যায়—'Of Adjectives'. এই অধ্যায়টি খুবই ছোট;—মোট তিন পৃষ্ঠায়

(৪২-৪৪) সম্পূর্ণ। অধ্যায়টিকে দ্বিতীয় সংস্করণের প্রায় অনুরূপ বলা যায়; শুধু দ্বিতীয় সংস্করণের 'Of the Formation of Adjectives' উপবিভাগটি এখানে বর্জিত। 'Of the comparison of Adjectives'. —এই উপবিভাগে অন্ততঃ একটি অতিরিক্ত অনুচ্ছেদের সংযোজন দেখা যায়, ফলে দৃষ্টান্তের পরিমাণ স্বাভাবিকভাবেই কিছু বেড়েছে। এই ৯নং অনুচ্ছেদে বিশেষণরূপে অনুকার শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদের প্রসঙ্গ দ্বিতীয় সংস্করণে 'Of the formation of Adjectives'-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। Comparison-অংশের সঙ্গে এই অনুচ্ছেদের সঙ্গতি নিরূপিত নয়। সূচনা পর্বেও একটি অতিরিক্ত অনুচ্ছেদ আছে। তাছাড়া ৪নং অনুচ্ছেদে ২য় সংস্করণের তুলনায় অতিরিক্ত উদাহরণ সংকলিত হয়েছে। তৃতীয় সংস্করণের Section VII-এ, 'Of the Formation of words' নামাঙ্কিত অধ্যায়ে দ্বিতীয় সংস্করণের 'Of Adjectives' (Section V) অধ্যায়ের 'Of the formation of Adjectives' উপবিভাগের অনেকগুলি প্রসঙ্গের স্থানান্তর ঘটেছে। বিশেষণ শব্দের গঠনকে এখানে দুইভাগে লক্ষ্য করা হয়েছেঃ (ক) 'Of the formation of Verbal Adjectives'; (খ) 'Of Derivative Adjectives.' এখানে দ্বিতীয় সংস্করণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে বর্জন ও সংযোজন দুইই চোখে পড়ে। বরং বলা উচিত যে দ্বিতীয় সংস্করণের তুলনায় এখানে কেরী বিষয়টি প্রায় নূতন করে লিখতে চেষ্টা করেছেন, এবং বিশেষণ শব্দ গঠনে সংস্কৃত প্রত্যয় কতখানি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তার পরিচয়ও মোটামুটিভাবে এখানে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় সংস্করণের দ্বিধা থেকে মুক্ত হয়ে বিশেষণ শব্দের গঠন বিষয়টিকে তৃতীয় সংস্করণে শব্দ-গঠন প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, এখানে সেটাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। চতুর্থ সংস্করণ এখানে তৃতীয় সংস্করণেরই অনুসারী।

SECTION—VI: তিয়াত্তর থেকে তিরাশী পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিধৃত Section VI-এর নামঃ 'Of Pronouns' (সৰ্ব্বনাম)। সর্বনাম বিশেষ্যেরই মত; তার লিঙ্গ বিশেষ্যের মত পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ও ক্লীবলিঙ্গ,—এই তিন প্রকার। সর্বনাম-রূপ বিশেষ্য-রূপের অনুযায়ী নিষ্পত্তি হয়। 'Personal pronouns'-এর দুই ভাগঃ (১) গৌরবোক্তি, (২) নীচোক্তি। —কেরী এইভাবে সর্বনাম-বিষয়ক অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। তারপর তৃতীয় ও চতুর্থ অনুচ্ছেদে সর্বনাম 'আপনি' শব্দের প্রয়োগ-গত প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করেছেন।

অধ্যায়ের প্রধান অংশই সর্বনাম-শব্দরূপ রচনায় ব্যয়িত হয়েছে।

গৌরবোক্তি 'আমি', 'তুমি', 'তিনি', 'তিহ', 'ইনি', 'ইহ'; নীচোক্তি 'মুই', 'সে'; এবং ক্লীবলিঙ্গের 'সে বা তাহা' ও 'কি' ইত্যাদির বিভক্তি অনুসারী একবচন ও বহুবচনাত্মক শব্দরূপ তিনি রচনা করেছেন। তাছাড়া কোন কোন সর্বনামপদ ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ স্থানে স্থানে দিয়ে রেখেছেন। উদাহরণঃ 'The pronominal adjectives are কোন্, What ? কেন, any, কিছু, any, some, অন্য, another. The two first are indeclinable. The two last are regularly declined without any substitution'.

অন্যান্য অধ্যায়ের মত এখানেও দেখা যাবে যে, প্রতিটি সর্বনাম শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ উদ্ধারের রীতি অক্ষুণ্ণ আছে।

তৃতীয় সংস্করণের (১৮১৫) Section V,—'Of Pronouns',—দ্বিতীয় সংস্করণের প্রায় অনুরূপ। তবে নির্দেশগুলি এখানে কোথাও কোথাও খুব স্পষ্ট, এবং কখনো বা অতিরিক্ত। যেমনঃ কর্তৃকারকে প্রথমার এক-বচনে 'আমি', ও বহুবচনে 'আমরা'—দ্বিতীয় সংস্করণে এই শব্দরূপটুকুই মাত্র উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় সংস্করণে দেখা যাচ্ছে যে, এই শব্দরূপ উদ্ধার করেও কেরী শিক্ষণীয় নির্দেশ দিচ্ছেনঃ 'The final is rejected before the termination of the nominative plural in the first and second personal persons.' এইরকম কিছু কিছু অতিরিক্ত নির্দেশ তৃতীয় সংস্করণের সর্বনাম-অধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য বলা চলে।

অনুরূপভাবে বলা যায়, কয়েকটি ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যাখ্যা লক্ষ্য করা গেলেও, চতুর্থ সংস্করণের (১৮১৮) সর্বনাম প্রসঙ্গ সাধারণভাবে তৃতীয় সংস্করণ অনুসারী।

SECTION—VII : চুরাশী থেকে একশ ছত্রিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত Section VII-এর নামঃ 'of verbs, (ক্রিয়ার পদ)'। কেরীর ক্রিয়াপদ বিষয়ক এই পরিচ্ছেদটি খুবই দীর্ঘ। প্রথমেই তিনি কতগুলি বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ দান করেছেন। যেমনঃ ১।। বাচ্য-সম্পর্কিতঃ—বাচ্য দুই প্রকারঃ (ক) the active (কর্তৃবাচ্য); (খ) the passive (কর্মণিবাচ্য)। ২।। Modes আট প্রকারঃ (ক) The Indicative (স্বার্থ); (খ) Inchoative (আরম্ভার্থ); (গ) Subjective (আশংস্যার্থ); (ঘ) Imperative (অনুমত্যর্থ); (ঙ) Infinitive (নিমিত্তার্থ); (চ) Optative (ইচ্ছার্থ); (ছ) Potential (শক্ত্যার্থ); (জ) Intensive (অতিশয়ার্থ)। ৩।। Indicative mode-এর কাল (tense) আট প্রকার; (ক) বর্তমানঃ দুইটি—the first aorist (নিত্য প্রবৃত্ত বর্তমান), ও the present definite (শুদ্ধ বর্তমান); (খ) অতীত বা ভূতঃ পাঁচটি,—the second

aorist (অপরোক্ষভূত); the perfect (অদ্যতনভূত); the imperfect definite (শুদ্ধভূত); the perfect (অদ্যতনানদ্যতনভূত); the pluperfect (অনদ্যতনভূত); (গ) ভবিষ্যৎঃ একটি। এর মধ্যে the first aorist, the second aorist, the imperfect ও future—এই চারটি সাক্ষাৎ ধাতু থেকে ব্যুৎপন্ন; অপরগুলি কোন সহকারী ক্রিয়া সহযোগে গঠিত হয়ে থাকে।

এইসব আলোচনার পর কেরী ক্রিয়ার কাল নির্ধারক প্রত্যয়সমূহের পরিচয় দিয়েছেন। এবং এই কাল-নির্ধারক প্রত্যয়ের উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি গৌরব বাচক ও নীচ বা হীনবাচক—এই দুইভাগে ভাগ করে সে-গুলিকে দেখিয়েছেন। এরপর ক্রমানুসারে তাঁর আলোচনা এইরকমঃ (ক) Indicative Mode-এর আটটি কালের Scheme of the inflections of verbs রচনা করেছেন; (খ) Participle সম্পর্কে তথ্য পেশ করেছেন; এবং কোন কোন ক্ষেত্রে,—যেমন, Present participles ও passive participles-এর ক্ষেত্রে—যে বাংলা ভাষা প্রধানতঃ সংস্কৃতানুসারী, তা নির্দেশ করেছেন; (গ) বিভিন্ন কালে auxiliary verb 'আছি'-র ব্যবহার দেখিয়েছেন; (ঘ) verbal noun 'করণ' পদের বিভিন্ন mode ও tense-এর রূপ ও তার ব্যবহার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন; (ঙ) neuter verb 'হওন' পদের বিভিন্ন mode ও tense-এর রূপ ও তার ব্যবহার দেখিয়েছেন; (চ) causal verb (প্রেরণার্থ) যে simple verb (স্বার্থ) থেকেই তৈরী হয়, তা বিজ্ঞাপিত করে 'করান' পদের বিভিন্ন mode ও tense-এর রূপ ও তার প্রয়োগ দেখিয়েছেন; (ছ) Negative verb সম্পর্কে তথ্য ও তার ব্যবহাররীতি জ্ঞাপন করেছেন; (জ) Passive voice সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে দৃষ্টান্তসহ উল্লেখ করেছেন।

এই অধ্যায়ের শেষ অংশঃ 'Remarks on the verbs'। দ্বিতীয় সংস্করণের Section III-র অন্তর্গত 'Observations on the nouns' অংশটির মতই এই অংশটি বর্তমান পরিচ্ছেদে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রচনা-কারের দৃষ্টিগোচর হয়েছে এইরকম কিছু কিছু ব্যাকরণগত বিধি এখানে মোটামুটি সূত্রাকারে উল্লেখ করা হয়েছে। তথাপি প্রচুর দৃষ্টান্ত রচনার মাধ্যমে ক্রিয়াপদ ব্যবহারে শিক্ষার্থীকে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করবার প্রবণতাই এখানে প্রধান বলে কখনো কখনো মনে হতে পারে। দীর্ঘ গদ্য-বাক্য উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধার করা এই অংশের অন্যতর উল্লেখযোগ্য দিক। লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, যা এই অধ্যায়ে ইতিপূর্বে সূত্রাকারে বিবৃত হয়েছে, এখানে প্রধানভাবে তারই ভাষায় প্রয়োগ দেখাবার আয়োজন। এই রীতিটা

মোটামুটি এইরকমঃ (১) Present Definite-এর লক্ষণ নির্দেশ, তারপর উদাহরণঃ 'আমি বিচার করিতেছি।' (২) Second Aorist-এর লক্ষণ নির্দেশ, তারপর উদাহরণঃ 'আমি বালককালে পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করিতাম।' (৩) Imperfect tense-এর লক্ষণ নির্দেশ ও উদাহরণঃ 'আমি কল্য বাটীতে আইলাম।' (৪) Perfect tense-এর লক্ষণ উল্লেখ ও তারপর উদাহরণঃ 'আমি তাহাকে সে বিষয় কহিয়াছি।' (৫) Future tense-এর লক্ষণ ব্যাখ্যা ও তারপর উদাহরণঃ 'ভাদর মাসে বৃষ্টি হবে।' ইত্যাদি।

অন্যান্য পরিচ্ছেদের মত, সর্বত্রই বাংলা শব্দের, শব্দ-বন্ধের, বা বাক্যের ইংরেজি অর্থ বা অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য একই। তবে একটি প্রবণতা এখানে উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়ঃ কেরী Section III অর্থাৎ বিশেষ্য বিষয়ক পরিচ্ছেদ ও Section VII অর্থাৎ ক্রিয়া বিষয়ক পরিচ্ছেদে—মোট দুইটি নির্বাচিত ক্ষেত্রে—Observations বা Remarks অংশের প্রস্তাবনা করে বিষয়ের কার্যকর অনুশীলনের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। কর্তা ও ক্রিয়া ভাষাশিক্ষায় এই দুইটি প্রসঙ্গই যে প্রধান ও গুরু, হতে পারে সেই বিবেচনা এইরকম পরিকল্পনার পশ্চাতে উপস্থিত ছিল।

তৃতীয় সংস্করণে (১৮১৫) Section VI-এর বিষয়ঃ 'of verbs (ক্রিয়াপদ)'। এখানে প্রথমেই অত্যন্ত স্পষ্ট একটি ঘোষণা শোনা যায়. 'The Bengalee verbs, with a few exceptions, are formed from the Sungskrit dhatoos or roots'. দ্বিতীয় সংস্করণে কিন্তু এইরকম ঘোষণা শোনা যায় নি। তৃতীয় সংস্করণে তিনি তিন প্রকারের Mode সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন; (ক) the Indicative (স্বার্থ), (খ) the Subjunctive (আশংসার্থ); (গ) the Imperative (অনুমত্যর্থ)। দ্বিতীয় সংস্করণে কিন্তু তিনি আট প্রকার Mode-এর কথা বলেছিলেন। বাচ্য ও Indicative mode-এর কাল সম্পর্কে মতামত তৃতীয় সংস্করণে বদলায় নি। তৃতীয় সংস্করণের 'ক্রিয়ার পদ' অধ্যায়ের একটি বিশেষত্ব এই যে, এখানে কেরী সংস্কৃত অনেকগুলি ধাতু বাংলায় কি রূপান্তর পরিগ্রহ করেছে, তা দেখাতে চেয়েছেন। এইগুলি যে তিনি বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তা নয়; বরং বাংলার ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত হিসাবে অভিজ্ঞতাসূত্রেই তা উত্থাপন করেছেন বলে মনে হয়। এ থেকে মনে হতে পারে যে তিনি বাংলা শিক্ষার্থীর তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের কথাই বেশি চিন্তা করেছেন; কিন্তু সংস্কৃত ধাতুর সঙ্গে বাংলা ক্রিয়াপদের যোগাযোগও স্পষ্টতঃই লক্ষ্য করতে

চেয়েছেন—এখানেই কেরীর বৈয়াকরণিক চিন্তার অধিকতর উন্মেষের প্রমাণ। তৃতীয় সংস্করণে দ্বিতীয় সংস্করণের মত verbal noun 'করণ'-এর mode ও tense অনুযায়ী রূপ বর্ণনা তিনি করেন নি, বরং এখানে তিনি 'কৃ' ধাতুর রূপই উত্থাপন করেছেন। ক্রিয়াপদের মূল অনুসন্ধানে তাঁর আগ্রহ, মূল ধাতুর সূত্রে প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করার উৎসাহই এতে প্রমাণিত হয়। সংস্কৃত মূলের সঙ্গে বাংলা ক্রিয়াপদের যোগাযোগ লক্ষ্য করে বিষয় উপস্থাপনার এইরকম আরও দৃষ্টান্ত ক্রিয়াপদের অধ্যায়ে আছে। দ্বিতীয় সংস্করণে ২১নং অনুচ্ছেদে compound subjunctive-এর রূপ দেখানো হয়েছেঃ verb 'থাকন' participle 'ইয়া'র যোগে। তৃতীয় সংস্করণে 'of com-pound verb' উপবিভাগে ৫৫নং অনুচ্ছেদে মূল 'স্থা' ধাতুর রূপান্তর 'থাক'-এর সঙ্গে যোগাযোগের কথা নির্দিষ্টভাবেই বলা হয়েছে। এই দৃষ্টান্তগুলি, তৃতীয় সংস্করণে 'ক্রিয়ার পদ' অধ্যায় রচনায় কেরী মূল অনুসন্ধানে যে বিশেষ সচেতন ছিলেন, তার সাক্ষ্য বহন করে। এবং একথা বললেও সম্ভবতঃ ভুল হবে না যে, তাঁর ব্যাকরণ চিন্তার বিশিষ্ট পরিচয় এই তথ্যাবলীর মধ্যে বিধৃত আছে।

চতুর্থ সংস্করণে বর্তমান প্রসঙ্গ সাধারণভাবে তৃতীয় সংস্করণের অনুরূপ।

SECTION—VIII : একশ সায়ত্রিশ থেকে একশ ঊনপঞ্চাশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিধৃত এই অধ্যায়ের নামঃ 'Of Indeclinable Particles'.। ব্যাকরণের চারটি প্রসঙ্গ এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেঃ (ক) Adverbs ; (খ) Pre positions ; (গ) Conjunctions ; (ঘ) Interjections.

বাংলা ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বপ্রথম Adverb-এর স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে এইভাবেঃ 'Adverbs are naturally indeclinable, but a great proportion of those words which correspond with adverbs in other languages, are nouns substantive in this, and are generally put in the Locative case to express the circumstances of verbs. They always govern the possessive case of the noun with which they are constructed.' এরপর প্রকৃতি অনুযায়ী adverb-কে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছেঃ (ক) Time (খ) Place (গ) Miscellaneous বা বিবিধ। বাংলায় প্রায়শঃ ব্যবহৃত হয়, এমন শব্দের দিকে লক্ষ্য রেখে সময় বাচক adverb-এর কিছু উদাহরণ সংকলন করা হয়েছে: যেমনঃ 'তাবৎ', 'যখন'. 'তখন', 'সর্বদা', 'নিত্য', 'কবে' ইত্যাদি। স্থানবাচক adverb 'এখানে', 'সেখানে', 'যেখানে', 'নিকটে', 'তথায়' ইত্যাদি। বিবিধ-পর্যায়ে সংকলিত উদাহরণসমূহের মধ্যে আছেঃ 'যেমন', 'কেমন,' 'প্রায়', ,'অনুসারে', 'অতি', 'কেন', 'বটে' 'পরস্পর' ইত্যাদি। এরপর

adverb শব্দের গঠন বা formation-এর কিছু পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

Preposition-এর স্বরূপও, বাংলা ভাষায় বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছেঃ 'Many of those particles called prepositions in other languages are nouns substantive, or adjectives, in the Bengalee, and follow the noun or pronoun in the possessive case......These are generally used in the locative cases, and govern a noun in the possessive.' উদাহরণ সহযোগে এই প্রসঙ্গ ব্যাখ্যার পর ২০টি 'inseparable prepositions' বিশেষ্যাদির সঙ্গে যুক্ত হয়ে কিভাবে শব্দগঠন করে, তা দৃষ্টান্তসহ দেখানো হয়েছে। এখানে সংকলিত 'inseparable prepositions'-গুলি এইঃ প্র, পরা, অপ, সম, নি, অনু, নির, দুর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, উপ, ইত্যাদি। অতঃপর 'Examples to illustrate the powers of the inseparable prepositions' নামে সংক্ষিপ্ত একটি উপবিভাগ পরিকল্পিত হয়েছে। এই অংশটি যতখানি গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়ে বেশি কৌতূহলোদ্দীপক।

Conjunction অংশে, বাংলায় সচরাচর ব্যবহৃত হয়, এইরকম কিছু সংযোজক শব্দের দৃষ্টান্ত সংকলন করা হয়েছে; 'এবং', 'ও', 'কিম্বা', 'বা' ইত্যাদি।

Interjection বাংলায় খুব কমই আছে। সচরাচর ব্যবহৃত হয় এইরকম কিছু উদাহরণ চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যেমন, 'distress'-প্রকাশকঃ 'বাপরে'; 'pain'-প্রকাশকঃ 'উঃ'; 'surprise'-প্রকাশকঃ 'বাহবাঃ'; 'pity' প্রকাশকঃ 'আহা', ইত্যাদি।

তৃতীয় সংস্করণে (১৮১৫) এই অধ্যায়টি section IX বলে চিহ্নিত। দ্বিতীয় সংস্করণের সঙ্গে এই অধ্যায়ের তৃতীয় সংস্করণের কোন ব্যবধান নেই। Preposition অংশে preposition-এর স্বরূপ ব্যাখ্যা অংশতঃ পরিবর্তিত ও স্পষ্টতর করা হয়েছেঃ 'Many nouns substantive and adjectives, are in the Bengalee language constructed with other nouns or pronouns to perform the office of prepositions,......These are generally in the locative case, and follow a noun or pronoun which is the possessive. This has induced some to call them post-positions.'

চতুর্থ সংস্করণের (১৮১৮) বর্তমান প্রসঙ্গ তৃতীয় সংস্করণের অনুরূপ।

SECTION—IX :একশ পঞ্চাশ থেকে একশ সাতান্ন পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিধৃত এই অধ্যায়টির নামঃ 'of Compound Words, (সমাস)'।

কয়েকটি সাধারণ (simple) শব্দের সমাহারে একটি সমাসবদ্ধ পদ তৈরী হয়ে থাকে। এবং তাতে কেবল শেষ শব্দটিই বিভক্তিযুক্ত হতে পারে (inflected)। সমাসবদ্ধ পদের ছয় শ্রেণী।

প্রথমেই এই নির্দেশ জ্ঞাপন করে, এখানে এই ছয়টি বিভিন্ন শ্রেণীর সমাসবদ্ধ পদের রূপ ও প্রকরণ রচনা করা হয়েছে। যেমনঃ (১) দ্বন্দ্বঃ 'Compounds which are formed by collecting several substantives into one word. This is usually done by omitting the copulative conjunction.' উদাহরণঃ পল্লব ফল পুষ্পস্তবক। (২) বহুব্রীহিঃ 'compound epithets formed by joining two or more words together.' উদাহরণঃ মৃগাক্ষি, পীতাম্বর, দুরাত্মা। (৩) কর্ম্মধারায়ঃ 'compound words formed by the construction of a substantive with its adjective.' উদাহরণঃ বিলাস বিপিনসমূহে। (৪) তৎপুরুষঃ 'words formed by compounding a substantive in any case, with a verb, omitting the inflection of the noun. The compounds thus formed are adjectives;' উদাহরণঃ জলপূর্ণ, গৃহাগত, পিতৃধর্ম্ম, শিখরবাসী, ইত্যাদি। তৎপুরুষকে সাতটি ভাগে লক্ষ্য করবার চেষ্টা এখানে উল্লেখযোগ্য। (৫) দ্বিগুঃ 'compound words formed by collecting several things together by means of a numeral;' উদাহরণঃ ত্রিভুবন, চতুর্দ্দিগ। (৬) অব্যয়ীভাবঃ 'compounds formed by prefixing a preposition or adverb to another word. These words have the same effect as adverbs;' উদাহরণঃ যাবজ্জীবন, যথাশক্তি।

এছাড়াও একধরনের পদের পরিচয় এখানে উদ্ধার করা হয়েছে; যেমন, জলটল, বাসনকুসন, ইত্যাদি।

এই অধ্যায়ের শেষ অংশঃ 'Rules to direct in the pronunciation of the INHERENT VOWEL at the end of a word.' কয়েকটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে এই বিষয়ে কিছু প্রস্তাব করা হয়েছে মাত্র। অবাঙালীর পক্ষে উচ্চারণ সম্পর্কিত এই নির্দেশ উপযোগী বলে বিবেচিত হতে পারে; তথাপি পাশাপাশি প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই অংশ 'সমাস' অধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়া বা যুক্ত করা সমীচীন হয়েছে কিনা।

তৃতীয় সংস্করণের (১৮১৫) Section VIII হলো 'of compound words', বা, 'সমাস' সম্পর্কিত অধ্যায়। সমস্তটাই প্রায় দ্বিতীয় সংস্করণের মত করে সাজানো, সাধারণভাবে দ্বিতীয় সংস্করণেরই অনুরূপ। সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যাখ্যা বা সংযোজন লক্ষ্য করা যায় মাত্র। যেমন, (১) কর্ম্মধারয় সমাস ব্যাখ্যা অধিক বিস্তারিত হয়েছে ও নূতন উদাহরণ

সংকলিত হয়েছে; (২) তৎপুরুষ সমাসের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন দৃষ্টান্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, অপরদিকে তেমনি সুদীর্ঘ ১০নং অনুচ্ছেদ সংযোজন করে তৎপুরুষ সমাসবদ্ধ পদে শেষ শব্দ রূপে সচরাচর ব্যবহৃত হয় এইরকম শব্দের একটি দীর্ঘ তালিকা রচনা করে তার ব্যবহার দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই প্রয়াস শিক্ষার্থীদের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন চরিতার্থ করবার আয়োজন রূপেই লক্ষ্য করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, এই ১০নং অনুচ্ছেদ উপযোগিতার দিক থেকে তৃতীয় সংস্করণের এই অধ্যায়কে অধিকতর গ্রাহ্য করে তুলেছে। (৩) ১৪নং অনুচ্ছেদে কতগুলি বিচিত্র পদের তিন প্রকার উদাহরণ সংকলন করা হয়েছে; যেমন; (ক) হানাহানি, গালাগালি; (খ) বশীভূত, বহিষ্কৃত; (গ) জলটল, বাসনকুসন। এর মধ্যে শুধু 'গ' পর্যায়ই দ্বিতীয় সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত ছিল; অর্থাৎ 'ক' ও 'খ' পর্যায়ের উদাহরণাদি ও ব্যাখ্যা তৃতীয় সংস্করণের নূতন সংযোজন।

চতুর্থ সংস্করণ (১৮১৮) মোটামুটি তৃতীয় সংস্করণেরই অনুরূপ। তবে, একটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বর্জন লক্ষ্য করা যায়। শব্দের অন্তিমে inherent vowel-এর উচ্চারণ সংক্রান্ত অংশটি এখানে এই অধ্যায়ের শেষে সংযোজিত হয়েছে। বস্তুতঃ, অধ্যায় ঘনিষ্ঠতার দিক থেকে ওই অংশ চতুর্থ সংস্করণের Section IX-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়াও সমীচীন হয়েছে বলে মনে হয় না।

SECTION—X : একশ আটান্ন থেকে একশ আটষট্টি পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিধৃত এই অধ্যায়টির নামঃ 'Of syntax'. বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মোট ২৯টি অনুচ্ছেদে সমাপ্ত এই অধ্যায়টি সংক্ষিপ্তভাবে রচিত হয়েছে বলাই উচিত। প্রথমেই স্বাভাবিক বাক্যগঠনে বিশেষণ, বিশেষ্য, ক্রিয়া ও ক্রিয়া-বিশেষণের ঠিক কোন স্থান নির্দিষ্ট, দৃষ্টান্ত সহযোগে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে যে বিভিন্ন ব্যাকরণ-প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে, মোটামুটি তারই সূত্র ধরে এখানে বাক্যগঠনের পদ্ধতি ও প্রকরণ কতগুলি ক্ষেত্রে কি রকম হয় বা হওয়া সঙ্গত, তা নির্ধারণ করবার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

বাংলা বাক্যগঠন পদ্ধতি সম্পর্কে কেরীর জ্ঞান যে বিশ্বাসযোগ্য ছিল, তার প্রমাণ এই অধ্যায়ের ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ। এই অনুচ্ছেদটি এইরকমঃ 'In forming sentences, the agent usually placed first, the object second, and the verb last.' কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া—বাংলার এই বাক্য-গঠন পদ্ধতি ইংরেজি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, এবং বাংলার এই বিশিষ্টতা

সম্পর্কে তিনি প্রথমাবধিই সচেতন ছিলেন দেখা যায়। উদাহরণ দিয়ে তিনি বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছেনঃ 'মন্ত্রী রাজাকে কহিল'।

অসংখ্য উদাহরণের সাহায্যে বাংলা বাক্যের বিভিন্ন প্রকরণ তিনি বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, এবং এই সব বাক্যের গঠনপদ্ধতির ওপরও সাধারণভাবে আলোকপাত করেছেন। উদ্ধৃত কোন কোন বাক্যে অবশ্যই অস্পষ্টতা আছে; যেমন, that is not the cow অর্থে 'সে গরু নাই'; অথবা, I have no money অর্থে 'আমার কিছু টাকা নয়'; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ২৭নং অনুচ্ছেদটি বাংলা বাক্যগঠন পদ্ধতি বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার উজ্জ্বল পরিচয় নিয়ে উপস্থিত হয়। এখানে তিনি জানাচ্ছেনঃ 'An affirmation is frequently made by asking a question;' এবং দুইটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করেছেনঃ 'এত ঔষধ কি খাইতে পারি?' বা, 'আমি কি তাহা করিব না?' এখানে প্রশ্নবাচক দুই উদাহরণেরই অস্ত্যর্থক প্রয়োগ; অর্থঃ আমি এত ঔষধ খেতে পারি না; এবং, আমি তা অবশ্যই করব।

২৯নং অনুচ্ছেদে প্রশ্নবোধক বাক্যরচনারীতি সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করেছেন, কি তু প্রশ্নবোধক বাক্যেও অর্থের যে তারতম্য ঘটে, ২৭নং অনুচ্ছেদেই তিনি তা লক্ষ্য করেছিলেন। এই দুটি অনুচ্ছেদ, ২৭ ও ২৯নং অনুচ্ছেদ, আরেকটি কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্যঃ উভয়ক্ষেত্রেই কেরী বাক্যশেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন প্রয়োগ করেছেন। বাংলা ব্যাকরণ রচনা করতে গিয়ে বাক্যরীতি নিষ্পত্তিতে যতিচিহ্ন প্রয়োগের ভূমিকা তিনি এখানে রচনা করে গেলেন। কমা ইত্যাদি যতিচিহ্নের ব্যবহারের পথ প্রশস্ত করবার চেষ্টাও তাঁর লক্ষণীয়; এই অধ্যায়ের ১৬নং অনুচ্ছেদে প্রদত্ত উদাহরণটি এই প্রসঙ্গে উদ্ধার করা যেতে পারেঃ 'I give, salute, speak, or give advice, to my friend'—এই ইংরেজি অংশটির বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে, 'আমি বন্ধুরে দি, নমস্কার করি, কহি, or পরামর্শ দি'। অর্থ-যতিপাতের দৃষ্টান্তরূপে এই উদাহরণটি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় সংস্করণের (১৮১৫) Section XI-র প্রসঙ্গঃ 'of syntax.' কিছু অতিরিক্ত উদাহরণের সংযোজন ছাড়া অধ্যায়টি দ্বিতীয় সংস্করণেরই প্রায় অনুরূপ। চতুর্থ সংস্করণও (১৮১৮) তৃতীয় সংস্করণ অনুসারী।

এছাড়া অধ্যায়চিহ্নহীন কিছু কিছু প্রসঙ্গও ব্যাকরণে স্থান পেয়েছে; সেগুলি সম্পর্কে স্বতন্ত্র উল্লেখের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। এই প্রসঙ্গগুলি বিভিন্ন সংস্করণের সূচিপত্রের তুলনামূলক তালিকায় উল্লেখ করা হলো মাত্র।

কেরীর বাংলা ব্যাকরণের বিভিন্ন সংস্করণের সূচিপত্র

*প্রথম সংস্করণ ১৮০১	দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮০৫	তৃতীয় সংস্করণ ১৮১৫	চতুর্থ সংস্করণ ১৮১৮	পঞ্চম সংস্করণ ১৮৪৩
বর্ণমালা	1. Of Letters (পৃ ১-১০)	1. Of Letters (পৃ ১-৯)	1. পৃ ১-৫	চতুর্থ সংস্করণের
Substantives	2. Of Compounding Letters (পৃ ১১-২৯)	2. Of Compounding Letters (পৃ ১০-১৮)	2. পৃ ৬-১০	অনুরূপ
Adjectives				
Pronouns	3. Of Words (পৃ ৩০-৫৩)	3. Of Words (পৃ ১৯-৪১)	3. পৃ ১১-২৩	
Verbs	4. Of Patronymics, Gentiles, Derivatives &c. (পৃ ৫৪-৬০)	4. Of Adjectives (পৃ ৪২-৪৪)	4. পৃ ২৪-২৫	
Adverbs	5. Of Adjectives (পৃ ৬১-৭২)	5. Of Pronouns (পৃ ৪৫-৫৬)	5. পৃ ২৬-৩২	
Prepositions	6. Of Pronouns (পৃ ৭৩-৮৩)	6. Of Verbs (পৃ ৫৭-১০০)	6. পৃ ৩৩ ৫৯	

* সজনীকান্ত দাস যে অধ্যায়-প্রসঙ্গ নির্দেশ করেছেন তদনুযায়ী উল্লেখ করা হয়েছে।

Conjunctions	7. Of Verbs (পৃ ৮৪-১৩৬)	7. Of the Formation of words (পৃ ১০১-১১৬)	7. পৃ ৬০ ৬৯
Interjections	8. Of Indeclinable Particles (পৃ ১৩৭-১৪৯)	8. Of Compound words (পৃ ১১৭-১২৭)	8. পৃ ৭০-৭৫
Of Compound words	9. Of Compound words (পৃ ১৫০-১৫৭)	9. Of Indeclinable Particles (পৃ ১১৮-১৩৮)	9. পৃ ৭৬-৮৩
Syntax	10. Of Syntax (পৃ ১৫৮-১৬৮)	10. Of the junctoin of Letters (পৃ ১৩৯-১৪৭)	10. পৃ ৮৪-৮৮
Contraction of numbers	এছাড়াঃ Of Numerals; of Money, Weights, and Measures; Time; The days of a week; of the Hindoo Months; Contractions. (পৃ ১৬৯-১৮৪)	11. Of Syntax (পৃ ১৪৮-১৫৬) এছাড়াঃ of Numerals, of Money, Weights, and Measures; Time; The days of the week, of Hindoo Months; Contractions. (পৃ ১৫৭-১৮৪) এবং Compound Letter-এর হস্তাক্ষর নমুনা।	11. পৃ ৮৯-৯৩ অন্যান্যঃ পৃ ৯৪-১০০। উল্লেখ্যঃ তৃতীয় সংস্করণের হস্তাক্ষরলিপিপত্র নেই।

বাংলা সংস্কৃত থেকে জাত ভাষা। আঞ্চলিক ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই ভাষার এমন কিছু কিছু বিশিষ্টতা গড়ে ওঠা স্বাভাবিক, যার সঙ্গে সংস্কৃতের কোন মিল নেই। কিন্তু তথাপি প্রত্যক্ষ উৎসের সাক্ষ্যবহনকারী উপাদান-নির্ভরতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া সম্ভবতঃ কখনোই সম্ভব না। বাংলা ভাষা তার নিজস্ব প্রকৃতিতেই স্বপ্রতিষ্ঠ, তবু আমরা কতখানি অসহায়ভাবে উৎসবন্ধনে সমর্পিত, যেকোনও বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থই তার প্রমাণ। একথা অবশ্য সত্য যে বাংলা ভাষার ব্যাকরণে সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র উপস্থিত থাকা অর্থ তার সংস্কৃতপরতা নয়; যেখানে বাংলার নিজস্ব প্রকৃতির চেয়ে সংস্কৃতের প্রকৃতির প্রতি পক্ষপাত দেখানো হয়, সেখানেই মনোভাব সংস্কৃতানুসারী বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। রামমোহন রায় তাঁর ব্যাকরণে বাংলা-ভাষার নিজস্ব প্রকৃতির প্রতি খুব সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে কখনো কখনো আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন ঠিকই, তবু সম্পূর্ণ ভাষা-প্রকৃতিতে বাংলা ব্যাকরণশাস্ত্রের বিবেচনার ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। কেরী যখন বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন, তখন পর্যন্ত এই প্রবণতা কেন, বাংলা ব্যাকরণ রচনারই কোন বাঞ্ছিত পথরেখা উন্মুক্ত ছিল না। তখন এই পথে অব্যবহিত কাছের দৃষ্টান্ত ছিলেন হালহেড, সংস্কৃত প্রকৃতির আলোকে যিনি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করতে চেয়েছিলেন। কেরী ছিলেন এই পথে হালহেডের উত্তর সাধক, হালহেডের প্রবণতা তাঁর মধ্যে উপস্থিত থাকা অস্বাভাবিক নয়। বাংলা সংস্কৃতজাত,—এই বোধের ভিত্তিতে কেরী বা হালহেডের কোন ভুল ছিল না; আজকের দৃষ্টিতে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির যে ভুল সম্পর্কে অভিযোগ করা হয়, তা হলো তাঁরা বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতরীতি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করেছিলেন। কেরীর সংস্কৃতমনস্কতা সম্পর্কে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুবার উল্লেখ করেছি, বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়নেও যে তাঁর এই প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে ধরা পড়ে, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই মনোভাবও তাঁর বাংলা ভাষার বিশুদ্ধ রূপসন্ধান ও রূপনির্মাণের অভিপ্রায় থেকেই গড়ে উঠেছিল।

কেরী বাংলা বর্ণমালার যে তালিকা উত্থাপন করেছেন, তা থেকেই তাঁর এই মনোভাবের নিয়ন্ত্রণ ধরা পড়ে। অনুস্বার ও বিসর্গকে তিনি ব্যঞ্জনরূপে লক্ষ্য করেন নি; পক্ষান্তরে, স্বরবর্ণের তালিকায় পরাশ্রিত

বর্ণরূপে তার স্থান নির্দেশ করেছেন। বাংলায় অনুস্বার ও বিসর্গকে ব্যঞ্জনধ্বনি রূপে লক্ষ্য করাই প্রচলিত অভ্যাস, কেননা, অনুস্বারের উচ্চারণ বাংলায় 'ঙ'-র অনুরূপ, এবং বিসর্গর উচ্চারণ 'হ'-র অঘোষধ্বনির মত। কিন্তু কেরীর এই নিরূপণ তাঁর সংস্কৃতমনস্কতার ফল বলেই মনে হয়; কেননা, অনুস্বার ও বিসর্গ ণত্বকালে স্বরবর্ণের মধ্যে গণ্য হয়, এবং স্বরসন্ধি কালে ব্যঞ্জনের মধ্যে গৃহীত হয়ে থাকে। অনুস্বার ও বিসর্গ ফলতঃ উভয়ধর্মী, এই জন্য অনেক সংস্কৃত ব্যাকরণকার এই দুটির স্থান স্বরবর্ণের শেষে ও ব্যঞ্জনবর্ণের আগে নির্দেশ করে থাকেন। কেরী বাংলা বর্ণ 'ড়' বা 'ঢ়'-ও উল্লেখ করেন নি; সংস্কৃতে 'ড' ও 'ঢ' ওই উচ্চারণের উপযুক্ত বলে বিবেচিত, বিন্দুযুক্ত 'ড' ও 'ঢ' বাংলা উচ্চারণ সম্মত নিজস্ব বর্ণ। অবশ্য প্রাচীন বাংলায়ও ঐ বর্ণ দুইটির পরিচয় পাওয়া যায় না। ফলে কেরী যখন এই বর্ণ দুইটিকে গ্রহণ করেন না, তখন তাকে সংস্কৃতানু-সরণমাত্র বলে লক্ষ্য না করে প্রথানুসরণ বলাই সংগত; তাঁর বাংলা রচনায় কিন্তু ঐ বর্ণ দুটি স্বভাবতঃই ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু তিনি যখন 'য়' বর্ণ উল্লেখ করেন নি, এবং অন্তস্থ 'য'-র উচ্চারণ সংস্কৃত উচ্চারণের অনুরূপ করে নির্দেশিত করলেন, তখন তাকে তাঁর সংস্কৃতমনস্কতার অন্যতম উদাহরণ রূপে লক্ষ্য করা ভুল হবে না, কেননা আধুনিক বাংলার 'য'-র উচ্চারণ প্রাকৃত থেকেই 'জ'-র অনুরূপ হয়ে যায়।৬৫ অন্তস্থ 'ব'-র উচ্চারণও কেরী সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী নিষ্পত্তি করতে চেয়েছেন; বাংলায় আকৃতি বা উচ্চারণে প-বর্গীয় 'ব' ও অন্তস্থ 'ব'-র মধ্যে কোন ব্যবধান না থাকলেও তিনি দুয়ের উচ্চারণ বিভিন্নতা সম্পর্কে রক্ষণশীলতা দেখিয়েছেন। অথবা 'শ', 'স', 'ষ' বাংলা উচ্চারণে অভিন্ন হলেও ওই তিন বর্ণের উচ্চারণের তারতম্য যখন তিনি সচেতনভাবে লক্ষ্য করতে চান, তখন অবশ্যই মনে হতে পারে যে, তিনি বাংলা উচ্চারণের নিজস্ব স্বভাবের পোষকতা করেন নি, এবং সংস্কৃত উচ্চারণের অনুশাসন দ্বারাই প্রধানভাবে চালিত হয়েছিলেন। সন্ধি সম্পর্কে আলোচনায়ও কেরীর পরিকল্পনার পেছনে সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণ আছে বলে মনে হয়। সন্ধিকে স্বতন্ত্র গুরুত্বে লক্ষ্য করা ব্যাকরণ সন্ধিৎসার দিক থেকে পূর্ণতার পরিচায়ক বলে যখন লক্ষ্য করা উচিত, তখনও এই গুরুত্ব নিরূপণে তাঁর সংস্কৃতমনস্কতার নিয়ন্ত্রণ অস্বীকার করা যায় না। খাঁটি বাংলার সন্ধি সব সময় সংস্কৃত সন্ধির নিয়ম শাসিত নয়, কেননা তা অনেক সময়েই বাংলা ভাষার প্রকৃতি ও রীতির পরিপন্থী হয়ে ওঠে। কেরীর মধ্যে এই চেতনার অভাবই এক্ষেত্রে তাঁর প্রয়াসকে সংস্কৃত-অনুসারী বলে মনে করবার প্রধান কারণ।

বাংলা শব্দকে কেরী তিন ভাগে লক্ষ্য করেছেন; যেমনঃ বিশেষ্য, ক্রিয়া এবং অব্যয়। তিনি শব্দকে পদের সমার্থক বলে মনে করেছেন। শব্দকে এই তিনভাগে লক্ষ্য করার পেছনে সংস্কৃতের সংস্কার ক্রিয়াশীল থাকা অস্বাভাবিক নয়। কারক ও বিভক্তির সাত প্রকার রূপ তিনি দেখিয়েছেন। 'কর্তা' কারকে প্রথমা বা 'কর্ম্ম' কারকে দ্বিতীয়া—এই ক্রম নির্দেশিত হয়েছে। এই রীতি স্পষ্টতঃই সংস্কৃতের রীতি। প্রকৃতপক্ষে, বাংলায় চিহ্ন দ্বারাই বিভক্তি নির্দেশিত হয়ে থাকে; প্রথমা দ্বিতীয়ার সুনির্দিষ্ট বন্ধনে, সংস্কৃতের মত, বাংলা শব্দ-বিভক্তির অনুসরণ বাংলাভাষার প্রকৃতি সন্ধানের অনুকূল রীতি নয়।৬৬ অন্যত্র শব্দগঠন সম্পর্কিত আলোচনায় কেরী বাংলা শব্দগঠন সম্পর্কিত বিস্তৃত জ্ঞান সংস্কৃত ব্যাকরণের উনাদি ও কৃদন্ত প্রত্যয় অনুশীলনের ওপর নির্ভরশীল বলেও অভিমত প্রকাশ করেছেন। এখানে তাঁর সংস্কৃত-মনস্কতার পরিচয়টি খুবই স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। আবার শব্দগঠনে প্রত্যয়াদির ব্যবহার দেখাতে তিনি সাধারণভাবে তৎসম শব্দরূপ প্রতিষ্ঠার দিকে আগ্রহ দেখিয়েছেন। তদ্ভব শব্দের সঙ্গে বাংলা প্রত্যয়ের যোগে নিষ্পন্ন শব্দরূপ উদ্ধারে তাঁর কুণ্ঠাই তাঁর সংস্কৃত-সংস্কার সম্পর্কে আমাদের নিশ্চিত করে তোলে। অথবা কৃদন্ত পদ নিষ্পত্তিতে যখন তিনি গুণ ও বৃদ্ধির কথা তোলেন, তখন তাঁর সংস্কৃতানুগত্য বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হই, কেননা বাংলা ব্যাকরণে সংস্কৃত ব্যাকরণের ওই নিয়মের বিশেষ সার্থকতা নেই। বাংলায় খুঁজ খোঁজ, ঘির ঘের, দুল দোল ইত্যাদি স্বরধ্বনি পরিবর্তনের কিছু দৃষ্টান্ত আছে সত্য, কিন্তু তাকে সংস্কৃত গুণ বা বৃদ্ধি জনিত বলে লক্ষ্য করা অনুচিত, ওইগুলিকে 'বাংলা ভাষার নিজস্ব ধ্বনি পরিবর্তন রীতির প্রভাবের ফল' রূপে দেখাই সঙ্গত।৬৭

বিশেষণের লিঙ্গান্তর বিষয়ে কেরীর পর্যবেক্ষণ সাধারণভাবে সংস্কৃতানুসারী। বিশেষ্যের লিঙ্গের ওপর বিশেষণের লিঙ্গ-নির্ভরতার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন; যেমন, সুন্দর স্ত্রীলিঙ্গে সুন্দরী। এই রীতি স্পষ্টতঃই সংস্কৃত ব্যাকরণের, বাংলায় এইরকম নিষ্পত্তির বিশেষ তাৎপর্য নেই। এমন কি বিশেষণের তারতম্য নির্দেশেও কেরীর পর্যবেক্ষণ সংস্কৃত-ঘনিষ্ঠ। তর ও তম-কে বিশেষণের তারতম্য প্রকাশক প্রত্যয় রূপে নির্দেশ করে তাঁর মানসিকতার বিশেষ প্রকৃতি উন্মোচিত করেছেন। সর্ব্বনামের লিঙ্গ সম্পর্কে তাঁর নির্দেশকেও সংস্কৃতানুগত বলাই উচিত। তিনি বলেছেন যে সর্ব্বনামের লিঙ্গ বিশেষ্যের মতই তিন প্রকার, কিন্তু বাংলায় লিঙ্গ ভেদে সর্ব্বনামের রূপ ভেদ হয় না; কেবল কতকগুলি সর্ব্বনামের ক্লীবলিঙ্গে বিশেষরূপ আছে।৬৮

কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া বাংলা ক্রিয়াপদ সংস্কৃত ধাতুমূল থেকে নিষ্পন্ন, কেরীর এই অভিমত বাংলা ব্যাকরণের তৃতীয় সংস্করণে ব্যক্ত হয়েছে, দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি এইরকম কোন ঘোষণা করেন নি। ফলে মনে হতে পারে বাংলা ভাষারূপকে সংস্কৃতঘনিষ্ঠ রূপে দেখার প্রবণতা তাঁর দিনে দিনে বেড়েছিল মাত্র। সংস্কৃত ধাতুমূলে বাংলা ক্রিয়ার উৎসসন্ধানে তাঁর এই আগ্রহ বাংলা ভাষাপ্রকৃতির নিজস্বতা ব্যাখ্যার পক্ষে অনুকূল রীতি নয়; আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষায় বাংলারও নিজস্ব ধাতুমূল তৈরী হয়ে গিয়েছিল, এবং এই ধাতু অন্য-নিরপেক্ষ। কাজেই সংস্কৃত ধাতুমূলে বাংলা ধাতুর মূল স্থাপনের প্রবণতাকে কেরীর একটি বিশেষ মানসিক উদ্যমরূপেই দেখতে হয়, যেখানে বাংলা ভাষারূপ বিবেচনায় সংস্কৃতসংস্কারের প্রাধান্য।

বাংলা ব্যাকরণ রচনায় কেরীর দৃষ্টিভঙ্গি সংস্কৃতঘনিষ্ঠ। ব্যাকরণের আভ্যন্তরীণ তথ্য থেকে তাঁর এই প্রবণতার পরিচয়টি ধরা পড়ে; বিভিন্ন সংস্করণে তাঁর মুখবন্ধগুলিতেও সুস্পষ্টভাবেই তিনি তাঁর এই বিশিষ্ট মনোভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। পাঁচটি সংস্করণে তাঁর রচিত মুখবন্ধ প্রকৃতপক্ষে তিনটি; প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধই প্রধান দুটি রচনা। তৃতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধেরই পরিমার্জনা, কদাচিৎ নতুন কথার সংযোজন দেখা যায়। চতুর্থ সংস্করণের মুখবন্ধ তারিখ পরিবর্তন করে তৃতীয় সংস্করণের মুখবন্ধেরই পুণর্মুদ্রণ। পঞ্চম সংস্করণেও তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকাই পুণর্মুদ্রিত। এই সমস্ত মুখবন্ধ বা ভূমিকায় কেরী বাংলা ভাষাকে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে চান তার পরিচয় সুস্পষ্ট। প্রথম সংস্করণের ভূমিকা৬৯ থেকে বোঝা যায় তিনি বাংলা ভাষার দুটি রূপ লক্ষ্য করেছিলেন; এক, যে ভাষায় হিন্দুদের ধ্রুপদী সাহিত্য রচিত হয়েছে, অর্থাৎ সাহিত্যের ভাষা; দুই, যে ভাষা সচরাচর কথোপকথন কালে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ কথিত ভাষা। এখানে কেরী জানাচ্ছেন যে, গ্রন্থাদিতে ব্যবহৃত ভাষা সংস্কৃত-জাত এবং এই ভাষাই বিশুদ্ধ বাংলা; এবং কথিত ভাষায় উপভাষিক বৈচিত্র্য ও আরবী ফারসী ইত্যাদি বৈদেশিক শব্দের প্রচুর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। স্পষ্ট করে উল্লেখ না করলেও পরোক্ষভাবে তিনি এই কথিতভাষাকে অবিশুদ্ধ বলতে চেয়েছেন। কেরীর এই বিবেচনায় সাহিত্যিক ভাষাকে সংস্কৃতঘনিষ্ঠ বলে দেখা হয়েছে, কথিত ভাষাকে এইরকম সংস্কার থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে তাঁর পর্যবেক্ষণ সামগ্রিক বাংলা ভাষাকে অবলম্বন করে চালিত, তিনি দুই প্রকার ভাষাবৃত্তি সম্পর্কে আর সে রকম জোর দেন নি। এখানে তিনি বলতে চেয়েছেন, যে, বাংলায় ফারসী বা আরবী

শব্দের চেয়ে সংস্কৃত শব্দের পরিমাণ খুবই বেশি, এইদিক থেকে বাংলা ভারতের অন্যান্য ভাষা থেকে সংস্কৃতের অধিক ঘনিষ্ঠ।৭০ তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় এই ঘনিষ্ঠতার পরিমাণ তিনি নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছেন, এখানে তাঁর বক্তব্যঃ আরবী ফারসী অনেক শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হলেও, বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের সংখ্যা চার পঞ্চমাংশ, অর্থাৎ মোট ব্যবহৃত শব্দের শতকরা আশী ভাগ।৭১ এই থেকে বোঝা যায় শুধু সাহিত্যিক ভাষার ওপর তিনি আর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন নি, সমগ্র বাংলা ভাষাকেই সংস্কৃতঘনিষ্ঠরূপে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। বাংলার এই সংস্কৃত-ঘনিষ্ঠতার রূপ আবার তাঁর শব্দনির্ভর পর্যবেক্ষণেরই ফল মাত্র, অথচ প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় তিনি স্পষ্টতঃই জানিয়েছিলেন যে ভাষার প্রকৃতি তার শব্দভাণ্ডারের উৎসের ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং ভাষার নিজস্ব গঠনপদ্ধতিই তার বিশিষ্ট প্রকৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করে। ফলে একথা স্বভাবতই মনে হতে পারে যে বাংলা ভাষার গঠনপদ্ধতির নিজস্বতা সম্পর্কে কেরী যখন অবহিত, তখন অসহায়ভাবে শব্দভাণ্ডারের উৎসের ওপর নির্ভর করে ভাষার সংস্কৃতঘনিষ্ঠতার সংস্কার গড়ে তুলেছিলেন।

ভাষার গঠনপদ্ধতি বলতে ঠিক কি বোঝায়? তারাপোরওয়ালা বাক্যকে 'the unit of Language' হিসাবে ধরেছেন। তা হলে বাক্যগঠন-পদ্ধতির মধ্যেই ভাষার গঠনপদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়। তারাপোরওয়ালা বাক্যগঠন পদ্ধতিকে এইভাবে দেখিয়েছেনঃ Sentence—the unit of Language < Grammatical Forms (Pada) < Words (Śabda) or Roots (dhātu).৭২ কাজেই শব্দ বা ধাতুর ব্যাকরণগত নিষ্পত্তি-ও গঠনপদ্ধতির অঙ্গীভূত উপাদান। বাংলা বাক্যরচনার যেমন অন্যনিরপেক্ষ নিজস্ব রীতি আছে, তেমনি পদ গঠনেরও নিজস্ব প্রবৃত্তি আছে। কেরী যখন বাংলা ভাষার গঠনপদ্ধতির নিজস্বতা সম্পর্কে উল্লেখ করেন, তখন তিনি বাংলা বাক্যরীতি ও পদগঠনরীতির নিজস্বতা অনুসরণ করবেন, এটা স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশিত। প্রকৃতপক্ষে কেরী তাঁর ব্যাকরণে বাংলা ভাষার নিজস্ব প্রকৃতি অনুসন্ধানে কখনো কখনো যোগ্যতার পরিচয় দিতে পেরেছেন। বিশেষণ সম্পর্কিত আলোচনায় অনুকারবাচক বিশেষণ সম্পর্কে তিনি যে উৎসাহ দেখিয়েছেন, তাতে খাঁটি বাংলা ভাষার মনস্তত্ত্বে তাঁর অধিকারই প্রমাণিত হয়। তিনি বাংলায় যৌগিক ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য ও মূল ধাতুর যে অর্থান্তর দেখিয়েছেন, তাকে বাংলা ভাষার নিজস্ব প্রকৃতি অনুসন্ধানের দিক থেকেই লক্ষ্য করা উচিত। বাংলা অব্যয় সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণ বাংলা ভাষার প্রকৃতি অনুসরণে তাঁর যোগ্যতার পরিচায়ক। বস্তুতঃ, বাংলা ভাষায়

অব্যয়ের বিচিত্র প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়, তার প্রকৃতিও বিচিত্র। 'দিকি', 'কো', 'তো' ইত্যাদির প্রয়োগ৭৩ লক্ষ্য করা অবশ্যই তাঁর বাংলামনস্কতার উদাহরণ রূপে গ্রাহ্য হবে। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই৭৪ তিনি উদাহরণ সংকলনে তৎসম ও তদ্ভব রূপ পাশাপাশি উল্লেখ করেও তদ্ভব দৃষ্টান্ত সংকলনে উৎসাহ বেশি দেখিয়েছেন।

তথাপি এতে কোন সন্দেহ নেই যে, পদগঠনে তিনি সংস্কৃতমনস্কতার পরিচয় বেশি দিয়েছেন। তাঁর এই সংস্কৃতানুগত্য বেশি চোখে পড়ে এই জন্য যে, বাংলা প্রকৃতির সুষ্ঠু নিরূপণে তিনি প্রায়ই উৎসাহ দেখান নি। নতুবা, তৎসম শব্দ, সংস্কৃত প্রত্যয়, শব্দের তিন ভাগ নিরূপণ, বা বিশেষ্য অনুযায়ী বিশেষণের লিঙ্গ নির্ধারণ, সন্ধি প্রকরণ ইত্যাদি সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন, তা বাংলা ব্যাকরণের অংশ বলেই স্বীকৃত। বস্তুতঃ ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ধারায় বাংলার নব্যভারতীয় আর্যভাষারূপে অভ্যুদয় তার বিশিষ্ট কতগুলি প্রবণতার সৃষ্টি করলেও, সংস্কৃতের প্রভাব থেকে তা কখনো মুক্ত হতে পারে নি। এই প্রভাব সংস্কৃত শব্দ ও ব্যাকরণের পদ্ধতি বা দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব দুইই। বাংলার নিজস্ব প্রকৃতি অনুসরণ বাংলা ব্যাকরণে যেমন বাধ্যতামূলক, তেমনি সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণের সঙ্গে বাংলার যে রক্ত-সম্পর্ক, তার সূত্রও উপেক্ষণীয় নয়। এই কারণেই এমন কি আধুনিককালের বাংলা ব্যাকরণে ভাষার নিজস্ব প্রকৃতি ও সংস্কৃত উপকরণের ব্যাখ্যা, দুইই ভাষাবিশ্লেষণের সামগ্রিকতা ও সততা রক্ষায় সহজেই অঙ্গীকৃত হয়েছে। কাজেই কেরীর ব্যাকরণে সংস্কৃতানু-গত্যের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাকে বাংলা ভাষা পর্যবেক্ষণে তাঁর ঐতিহাসিক চেতনারই পরিপোষক বলে দেখা উচিত। তবে একথা অবশ্য সত্য, ঐতিহাসিক চেতনা বলতে সংস্কৃত থেকে প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে আধুনিক ভাষারূপে বাংলা ভাষার আবির্ভাব সম্পর্কে যে সজ্ঞানতা বোঝায়, সে সম্পর্কে তাঁর ধারণা যে খুব স্পষ্ট ছিল, কেরী অন্তত তার কোন পরিচয় রেখে যান নি। যাই হোক, বাংলা ভাষার নিজস্ব প্রকৃতি অনুসন্ধানে কেরীর মনোযোগ সর্বব্যাপী ছিল না, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির এই অভাবাত্মকতাই তাঁর সংস্কৃত-ঘনিষ্ঠতা রূপে সচরাচর বিবেচিত হয়ে থাকে।

উল্লেখপঞ্জী ও টীকা

১। H. H. Wilson in Eustace Carey's : Memoirs of William Carey, London, 1836; p. 588.

২। ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে একটি বাংলা ব্যাকরণ রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়। দ্রঃ Hosten in : Bengal : Past and Present, Vol. IX, Pt. I. p. 46.

৩। দ্রঃ S. K. Chatterji and P. R. Sen edited : Manoel Da Assumcam's Bengali Grammar, Calcutta, 1931. প্রবেশক, পৃঃ দ০। উল্লেখের ক্ষেত্রে বাংলা অংশই অতঃপর নির্দেশ করা হয়েছে।

৪। দ্রঃ ঐ। ব্যাকরণের বাক্যযোজনা অংশের ৪৮ ও ৫৩নং সূত্র। পৃঃ ৩৮-৪০।

৫। দ্রঃ ঐ। প্রবেশক, পৃঃ ১।০ এবং পৃঃ ২১।

৬। ঐ। পৃঃ ৩৮।

৭। দ্রঃ ঐ। ব্যাকরণের বাক্যযোজনা অংশের ৫১ ও ৫২ নং অনুচ্ছেদ; পৃঃ ৩৮, ৩৯।

৮। দ্রঃ ঐ। প্রবেশক, পৃঃ ১।০

৯। দ্রঃ ঐ। পৃঃ ১১-১২।

১০। ১৭৫১-১৮৩০। শেরিডনের বন্ধু হালহেড বিলাতে থাকতেই উইলিয়ম জোন্সের সঙ্গে পরিচিত ও প্রাচ্যভাষা শিক্ষায় উৎসাহিত হন। ইষ্ট ইন্ডিয়া কম্পানীর রাইটার হয়ে এদেশে আসবার পর ওয়ারেন হেস্টিংসের নির্দেশে হিন্দু আইনের অনুবাদ করেন; এই অনুবাদ 'A Code of Gentoo Laws' লন্ডন থেকে ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে শব্দসংগ্রহ তালিকায় কিছু বাংলা শব্দ সংকলিত হয়েছিল দেখা যায়। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা ভাষা শিক্ষার সহায়তার জন্য রচিত তাঁর 'A Grammar of the Bengal Language' হুগলী থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষা সাহিত্যের ইতিহাসে এই গ্রন্থখানির গুরুত্ব অপরিসীম। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংলন্ডে ফিরে যান।

১১। N. B. Halhed : A Grammar of the Bengal Language, Hooghly, 1778 ; Preface, p. XXI.

১২। ঐ। Preface, p. XX.

১৩। ঐ। Preface, pp. XIX-XX.

১৪। ঐ। Preface, p. XIX.

১৫। দ্রঃ William Jones : A Grammar of the Persian Language, London, 1771. Preface, p. XXI.

১৬। হালহেডের বাংলা ব্যাকরণকে 'One of the earliest efforts to

কলকাতা, ১৯৭১; পৃঃ ৭৫।

৬৭। ঐ। পৃঃ ২৩৫।

৬৮। ঐ। পৃঃ ১২২।

৬৯। দ্রঃ সজনীকান্ত উদ্ধৃত, পৃঃ ১২৬।

৭০। দ্রঃ W. Carey: Bengalee Grammar, 1805; Preface, p. vi.

৭১। দ্রঃ ঐ। 3rd Edition, Preface, pp. iii-iv.

৭২। Tarapore Wala: Elements of the science of language, 2nd Edition; p. 181.

৭৩। দেখ দিকি। আমি করি নি কো। ইত্যাদি।

৭৪। যেমনঃ সম্বোধনবাচক অব্যয়, পদাশ্রিত নির্দেশক. সংযোগবাচক ও মনোভাব-বাচক অব্যয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

৩। অভিধান সংকলন

জনসন অভিধানকারদের 'unhappy mortals' বলেছিলেন। তথাপি তিনি ইংরেজি ভাষার একখানি বিপুল অভিধান সংকলন করেছিলেন। এই অভিধান প্রণয়নের পশ্চাতে একটি বাসনা সম্ভবতঃ তাঁর মনে বিশেষভাবে জীবিত ছিল; তিনি চেয়েছিলেন একটি বিশেষ ভূমিকাঃ 'propagator of knowledge'-এর ভূমিকা। আর এই আলোকেই অভিধান রচনায় ব্যয়িত তাঁর সমস্ত পরিশ্রমের একটি সার্থকতা তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন; তিনি লিখেছেনঃ 'When I am animated by this wish, I look with pleasure on my book, however defective, and deliver it to the world with the spirit of a man that has endeavoured well'.১ অতঃপর আর সন্দেহ থাকে না যে একটি প্রশংসনীয় উদ্যম রূপেই তিনি তাঁর অভিধান রচনার প্রয়াসটিকে লক্ষ্য করতে চেয়েছিলেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে উইলিয়ম কেরীর অভিধান রচয়িতার ভূমিকাটিও বিশেষ প্রশংসনীয়। তিনি বাংলা দেশে এসেছিলেন ইংলণ্ডের অষ্টাদশ শতকীয় উত্তরাধিকার নিয়ে। Encyclopaedia Britannica-র সূত্রে২ আমরা জানি যে কেরীর আবির্ভাবকালের পূর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডে জন কার্সে (John Kersey), জন বেইলি (John Baily) ও সামুয়েল জনসনের (Samuel Johnson) ইংরেজি অভিধান প্রকাশিত হয়েছিল। জনসনের অভিধান দুটি ফোলিও খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। যদিও জনসন এ-বিষয়ে খুব সচেতন ছিলেন যে, কোনও মানুষের পক্ষেই সম্পূর্ণরূপে ও সর্বাঙ্গীণভাবে কোনও ভাষার অভিধান রচনা করা সম্ভবপর নয়, তথাপি ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার যে কাজ আভি-ধানিকদের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, তা তিনি সততার সঙ্গে পালন করতে চেয়েছিলেন। আর এই কাজে তিনি হাত দিয়েছিলেন এমন একটা সময়, যখন ইংরেজি ভাষার অবস্থা ছিল 'Speech copious without order, and energetick without rules;..........there was perplexity to be disentangled, and confusion to be regulated.'৩ ইংরেজী ভাষার এইরকম এক অনিশ্চিত অবস্থায় জনসন ভাষার একটি গঠনতন্ত্র মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট করে দিতে প্রয়াস পেয়েছিলেন, এবং তাঁর এই

উদ্যম অব্যবহিত সম্বর্ধনা লাভ করেছিল। কেরী যখন পড়াশুনো করতে সুরু করেছেন, তখন ইংলণ্ডে অভিধানের শেষতম সার্থকতা ও আদর্শের রূপ নিয়ে জনসনের অভিধান প্রতিষ্ঠিত; এই প্রতিষ্ঠা কেবল সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দীতেই আবদ্ধ ছিল না, এমন কি ঊনবিংশ শতাব্দীরও এক বিস্তৃত সময় পরিধিতে তা বিধৃত হয়েছিল। রেভারেণ্ড টড্ ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে জনসনের অভিধানকে যে সংশোধিত আকারে প্রকাশ করতে যত্নবান হয়েছিলেন, তা পক্ষান্তরে প্রমাণ করে যে অভিধানখানির গৌরব ও উপযোগিতার ভিত্তি তখন পর্যন্ত অটুট ছিল।

তাঁর সর্বাপেক্ষা নিকট অভিজ্ঞতার বিষয় ছিল বলে, কেরীর অভিধান সম্পর্কিত আলোচনায় জনসনের ইংরেজি ভাষার অভিধানখানির কথা স্বভাবতঃই উঠতে পারে। বলা বাহুল্য, অভিধানের শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে জনসনের অভিধান যখন কেরীর অভিজ্ঞতায় উপস্থিত থাকা সম্ভবপর, তখনও, উভয়ের অভিধান রচনার পরিপ্রেক্ষিত যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল, এই তথ্যটি স্মরণযোগ্য। জনসন অভিধান রচনা করেছিলেন অনিয়ন্ত্রিত ইংরেজি ভাষার শুদ্ধ নিয়ন্ত্রণের বাসনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, এবং তিনি ইংরেজি ভাষার অভিধান সংকলন করেছিলেন; আর কেরী রচনা করেছিলেন বাংলা-ইংরেজি দোভাষী অভিধান, এবং বাংলা ভাষার একটি সুগঠিত রূপ তুলে ধরা তাঁর অভিপ্রায়ভুক্ত হলেও অব্যবহিত লক্ষ্য ছিল ছাত্রদের ভাষাশিক্ষার তাৎক্ষণিক প্রয়োজন-নিষ্পত্তি। এই কারণেই কেরীর অভিধান সম্পর্কিত বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতটি একটু স্বতন্ত্র।

জনসনের ইংরেজি অভিধান তাঁর কাছে অভিধান রচনার আধুনিকতম আদর্শ রূপেই উপস্থিত ছিল মাত্র; কিন্তু তিনি যে ভাষার অভিধান রচনা করেন, তার কোন পূর্বাদর্শ ছিল কিনা, কেরীর অভিধান সম্পর্কে আলোচনায়, তা-ও পরীক্ষা করে দেখা দরকার। বাংলা অভিধানের পূর্বসূত্র সন্ধান-কালেও আমাদের প্রথমেই অবহিত থাকা উচিত যে, বিশুদ্ধ বাংলা অভিধানের কোনও ঐতিহ্য কেরীর পূর্বে বা পরে অনেকদিন পর্যন্ত বাংলাদেশে গড়ে ওঠে নি। তথাপি ভারতীয় অভিধান-চিন্তা য়ুরোপীয় আভিধানিকদের হাতে কিভাবে রূপান্তরিত হয়েছিল, তা লক্ষ্য করা প্রয়োজন: কেননা, অভারতীয় আদর্শের প্রচলিত আধুনিক ধারাতেই কেরী ভারতীয় ভাষার অভিধান সংকলনে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

কেরীর পূর্ববর্তী অভিধান-ঐতিহ্য

সংস্কৃতই সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে একমাত্র ভাষা, যাকে সর্বভারতীয় পরিচয়ে

চিহ্নিত করা যায়। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার যখন উদ্ভব-লগ্ন, তার অনেক আগেই সাহিত্য-ব্যাকরণ-অভিধান রচনার এক গৌরবময় ঐতিহ্য সংস্কৃতে এদেশে গড়ে উঠেছিল। অর্বাচীনকালে আমরা যাকে 'অভিধান' অভিধায় চিহ্নিত করে থাকি, সংস্কৃতে তার কোন অবিকল উদাহরণ প্রাচীনকালে অবশ্যই ছিল না। প্রাচীন কোষগ্রন্থ বলতে যা বোঝা যেত, তারই রূপান্তরিত ও বিকশিত রূপ অভিধানে লক্ষ্য করা যায় মাত্র। কোষগ্রন্থ ও অভিধানের মধ্যে যে সামান্য-লক্ষণের সাদৃশ্য, তা প্রধানতঃ শব্দ-সংগ্রহ বিষয়ক। দুয়ের মধ্যে প্রধান ব্যবধান বিন্যাস ও পদ্ধতি-জনিত। বর্তমানে বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস-পদ্ধতিই অভিধানের আন্তর্জাতিক স্বীকৃত প্রকরণ; কিন্তু কোষগ্রন্থসমূহে শব্দবিন্যাস-পদ্ধতি বর্ণানুক্রম-বিধি অনুসরণ করে নি, সেখানে শ্লোকরচনার মাধ্যমে কোষকারগণ শব্দ, শব্দের অর্থ ও শব্দের লিঙ্গ নির্দেশ করে গেছেন। এই নির্দেশ স্মৃতিগত করতে হয় বলে ললিতছন্দ-দেহে তাকে ধারণ করাই সমুচিত. কেননা ছন্দোবদ্ধ রচনা বা শ্লোক সহজে স্মরণসাধ্য। সংস্কৃত অভিধানও. শব্দ-সংগ্রহ পদ্ধতির নিজস্বতা সত্ত্বেও, অভিধানের সঙ্গে ব্যাকরণের সম্পর্ক বাতিল করে দিতে পারে নি। শব্দকোষ কেবল ব্যাকরণ-তাৎপর্যের দিক থেকে লিঙ্গ-নির্দেশ করেই ক্ষান্ত থাকে নি, সমগ্র সংগ্রহের পশ্চাতে যে বৃত্তিটি প্রধানতঃ ক্রিয়াশীল ছিল, তা অভিধান সংকলনের সর্বকালীন মনোভাবঃ ভাষার মধ্যে শব্দের ব্যবহারকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করার অভিপ্রায়।

এবং সংস্কৃত অভিধানের ইতিহাসে অমর সিংহের নাম[৪] সুপরিচিত। পর্যায়, নানার্থ ও লিঙ্গ—সংস্কৃত অভিধানের এই যে প্রধান তিন ভাগ, অমর সিংহের অভিধানে এই তিন ভাগেরই উত্থাপন আছে; ফলে, অমর সিংহের অভিধান ত্রিকাণ্ড বলেও পরিচিত। 'অমরকোষ' সম্পর্কে এখানে বিশেষ উল্লেখ করার কারণঃ (ক) অমরকোষের যে চল্লিশটি বা বেশি টীকা-গ্রন্থ আছে, তার মধ্যে অন্যতম খ্যাতনামা টীকাকার ছিলেন বাঙালি,—বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দ।[৫] এবং সর্বানন্দের এই 'টীকা সর্বস্বের' মধ্যে বাংলা অভিধানের বিক্ষিপ্ত প্রাক্-ইতিহাস অনুসন্ধান করা সাধ্য। সর্বানন্দের টীকা সর্বস্বে কিঞ্চিদধিক তিনশত শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ আছে। বসন্তরঞ্জন রায় এই শব্দগুলির একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন।[৬] যোগেশচন্দ্র রায় সর্বানন্দীয় বাংলা শব্দগুলিকে সূত্রানুযায়ী বিন্যস্ত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। কয়েকটি উদাহরণের সমর্থন পেয়ে তিনি অনুমান করেছেনঃ 'বোধহয়, শব্দের উচ্চারণ অনুযায়ী বানান করা হইত'।[৭] তাঁর

শব্দ বিন্যাসরীতিতে দ্বাদশ শতাব্দীর বাংলা শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক অনু-সন্ধিৎসাই অধিক প্রকাশ পেয়েছে। বসন্তরঞ্জন রায় পক্ষান্তরে সর্বানন্দীয় শব্দকোষকে বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত করেছেন। টীকা সর্বস্বের ওপর আলোক-পাত করতে গিয়ে এঁরা প্রত্যেকেই নিজস্ব শব্দ-সমীক্ষা-পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, সন্দেহ নেই; কিন্তু কোথাও একথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়নি যে সর্বানন্দীয় বাংলা শব্দ-সংগ্রহের মধ্যেই বাংলা অভিধানের প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত প্রদীপটি প্রজ্বলিত আছে। অবশ্য একথাও পাশাপাশি সত্য যে সর্বানন্দ সম্ভবতঃ বাংলা শব্দকোষ প্রণয়ন সম্পর্কে কখনোই সচেতন ছিলেন না; তবে কোষগ্রন্থের টীকাকার হিসাবে শব্দসংকলন কালে তাঁর ভূমিকাটি যুগপৎ টীকাকারের ও আভিধানিকের হওয়াই স্বাভাবিক। (খ) অমরকোষের যে সম্পাদনার ভারটি কোলব্রুক৮ গ্রহণ করেছিলেন, কোনদিক থেকেই তা কম সম্মানীয় নয়। এই গ্রন্থ সম্পাদনায় উইলিয়ম কেরী খুব প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না, কিন্তু এই গ্রন্থের প্রকাশনার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগটি খুবই স্পষ্ট। কোলব্রুক সম্পাদিত অমরকোষ কেরী ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে মুদ্রিত করেন। এরই দ্বিতীয় সংখ্যা শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে তারই প্রয়োজনে ও পৃষ্ঠপোষকতায় এই কাজে কোলব্রুক অগ্রসর হয়েছিলেন। এই অভিধানের শেষের দিকে তিনি যে 'Alpha-betical Index' প্রবর্তন করেন, তা বিশেষ অভিনব ও বিশিষ্টতাদ্যোতক। একে ছন্দোবদ্ধ শব্দকোষকে বর্ণানুক্রমিক আধুনিক বিন্যাস দান করবার সুন্দর একটি প্রয়াস বলা যায়। বস্তুতঃ, কোলব্রুকের অমরকোষের এই পরিশিষ্ট অংশটি আধুনিক অভিধান রচনায় পাশ্চাত্য পদ্ধতির প্রয়োগক্ষেত্র রূপেই লক্ষ্য করা উচিত। এই পদ্ধতিচেতনার গৌরবেই তিনি সংস্কৃত অভিধানের সম্পাদকমাত্র হয়েও, বাংলা অভিধানের ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে অনিবার্য এক ব্যক্তিত্বে অধিষ্ঠিত আছেন। বাংলাদেশে অভিধান রচনার যে উদ্যম ও উৎসাহ সেদিন লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল, তিনি তাঁর অন্যতম শক্তিকেন্দ্র; কেরী সহকর্মী রূপেই শুধু নয়, আভিধানিকের উৎসাহেও এই উদ্যমের প্রাণস্পন্দনে স্পৃষ্ট, ও এই গ্রন্থের প্রকাশনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

আসুসুম্পসাউ

বাংলা অভিধান প্রণয়নের ইতিহাসে পাশ্চাত্য মনীষার আত্মনিয়োগ একটি লক্ষণীয় বিশেষত্ব। খ্রীষ্টধর্ম-সম্প্রদায় পৃথিবীর বিভিন্ন অনুন্নত দেশে

এই কাজে নিজেদের ব্যাপৃত করেছেন, বাংলাদেশও সেই উদ্যম থেকে বঞ্চিত হয় নি। পর্তুগীজ পাদ্রি মানোএল-দা-আসসুম্পসাউ*৯ বাংলা-পর্তুগীজ ও পর্তুগীজ-বাংলা যে শব্দকোষ সংকলন করেছিলেন,১০ বাংলা অভিধানের ইতিহাসে তার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ আসন নির্দিষ্ট হয়েছে। প্রায় মধ্য অষ্টাদশ শতকে এই সংকলনখানি মুদ্রিত হয়েছিল, কিন্তু এই সংকলনের সঙ্গে কোন ঘনিষ্ঠ পরিচয় সেদিন পর্যন্ত আমাদের ছিল না। গ্রীয়ার্সন প্রমুখ অনেকেই এই গ্রন্থ সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছেন, সুশীলকুমার দে ফাদার হস্টেনের সূত্রে এর পরিচয় নিবেদন করেছেন, এমন কি ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণও এর অধিক কোন বিবরণ পেশ করতে পারেন নি।১১ এর মূল কারণ অবশ্য সংকলনটির দুষ্প্রাপ্যতা। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে এর যে দুখানি প্রতিলিপি আছে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিবরণ অনুযায়ী তার একখানি খণ্ডিত ও একখানি অবিকৃত; তিনি সেই প্রতিলিপি থেকে আসসুম্পসাউ'র শব্দকোষের একটি নির্বাচিত সংকলন প্রস্তুত করেন ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রিয়রঞ্জন সেন সহযোগে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে তা সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। আসসুম্পসাউ'র গ্রন্থখানির নামকরণ থেকেই বোঝা যায় যে শব্দকোষটি দ্বিভাষিক। আখ্যাপত্রে সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করা হয়েছেঃ 'Dividido em duas partes' অর্থাৎ, 'দুইভাগে বিভক্ত', অর্থাৎ, বাংলা-পর্তুগীজ অংশই নয়, পর্তুগীজ-বাংলা অংশ মিলেই তবে সংকলনটি সম্পূর্ণ। এই রীতি তৎকালীন অভিধানরচনারীতির বৈশিষ্ট্য ছিল কিনা বলা কঠিন, তবে পরবর্তীকালে ফরস্টারও শব্দকোষ প্রণয়নে এই রীতিই অনুসরণ করেছিলেন, তাঁর অভিধানও ইংরেজি-বাংলা ও বাংলা-ইংরেজি এই দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ হয়েছিল। কেরী স্বয়ং এই রীতি অবলম্বন করেন নি অবশ্য, তবে তাঁর অভিধানের যে সংক্ষেপিত সংস্করণ দুই খণ্ডে জন ক্লার্ক মার্শম্যান প্রকাশ করেছিলেন, তাতে তিনি কিন্তু এই রীতিই কেরীর নামে প্রবর্তন করেন, এবং মনে হয় কেরী এই রীতি অনুমোদন করেছিলেন।

আসসুম্পসাউ'র সংকলন তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে রচিত হয়েছিল। তাঁর শব্দকোষের মুখবন্ধ নবীন প্রচারকদের প্রতি উদ্দিষ্ট। মুখবন্ধে শব্দকোষের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার পটভূমি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে। জর্জ-দা-আপ্রেজেন্তাসাউ-ও লিখেছেনঃ এই গ্রন্থখানি "খ্রীষ্টপন্থী সমধ্যুষিত সুবৃহৎ উপনিবেশমণ্ডলীর হিতসাধনের পক্ষে সর্মাধক উপযোগী।"১২ তথাপি, সমকালীন উপযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত বা নির্বাচিত ব্যবহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও,

এই গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক অধিষ্ঠান খর্ব হয় না। আস্‌সুম্পসাউ'র শব্দকোষ বাংলা শব্দ-সংকলনের প্রথম সচেতন উদ্যম বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে যে বাংলা অভিধান অন্ততঃ একখানি সংকলিত হয়েছিল, তার উল্লেখ পাওয়া গেছে। ১৬৮৩ খৃীষ্টাব্দে ফাদার সাতুচ্চি একখানি চিঠিতে লিখছেনঃ 'The fathers have not failed in their duty : they have learned the language well, have composed vocabularies, a grammar, a confessionary and prayers : they have translated the Christian doctrine etc , nothing of which existed till now.'১৩ এই পত্রানুযায়ী মনে হয় পর্তুগীজ পাদ্রিদের উৎসাহে ও সক্রিয় উদ্যমেই প্রথম বাংলা শব্দকোষের রচনা হয়েছিল; তবে পাশাপাশি একথাও সত্য যে সাতুচ্চি উল্লিখিত শব্দকোষ পাওয়া যায় নি, এবং ঐতিহাসিক উল্লেখমাত্রতার মধ্যেই এর পরিচয়ের সমাপ্তি ঘটেছে।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বৃটিশ মিউজিয়ম থেকে আস্‌সুম্পসাউ'র শব্দকোষের বাংলা-পর্তুগীজ অংশের একটি নির্বাচিত অথচ প্রচুর শব্দ-সম্বলিত নকল মুদ্রিত করেছেন। পর্তুগীজ-বাংলা অংশ মুদ্রণ না করলেও, তার ৫৩২-৫৩৩ পৃষ্ঠার যে ফোটো-প্লেট মুদ্রিত হয়েছে, তা দেখে বোঝা যায়, বর্ণানুক্রমে শব্দ-সংগ্রহ সম্পাদিত হয়েছিল, এবং এই রীতি বাংলা দেশে তখন অভিনব। সুনীতিকুমার বাংলা-পর্তুগীজ অংশও প্রকাশ করেছেন বর্ণানুক্রমে, তবে তা প্রথম বর্ণের অনুসরণ-মাত্র।

আস্‌সুম্পসাউ'র গ্রন্থে বাংলা হরফ় ব্যবহৃত হয় নি সম্ভবতঃ এই কারণে যে তখন পর্যন্ত বাংলা ছাপার হরফ কোথাও তৈরী হয় নি। ফলে রোমান হরফে বাংলা লেখা ছাড়া আস্‌সুম্পসাউ'র গত্যন্তর ছিল না। তবে দেশীয়ভাষা রোমান হরফে ধারণ করার একটা ধাবা পর্তুগীজরা ভারতবর্ষে এসেই মোটামুটিভাবে তৈরী করে নিয়েছিলেন; সুনীতিকুমারের অনুমান অনুযায়ী ষোড়শ শতাব্দীতেই রোমান হরফে বাংলা লেখার প্রচলন হয়ে থাকবে। আস্‌সুম্পসাউ'র রোমান-বাংলা বর্ণবিন্যাসরীতি যে সহজ ও তা যে বাংলা উচ্চারণকে মোটামুটি যথাযথভাবেই অনুসরণ করেছে, তার কারণ তাঁর বহুদিন আগেই বাংলা দেশে এই রীতির একটি ঐতিহ্য গড়ে উঠতে পেরেছিল।১৪

আস্‌সুম্পসাউ'র শব্দসংগ্রহে মোট কত শব্দ সংগৃহীত হয়েছিল, সুনীতি-কুমার তা উল্লেখ করেন নি। তিনি কেবলমাত্র লক্ষণীয় শব্দগুলি সংকলন করে প্রকাশ করেছেন। সুনীতিকুমার সম্পাদিত আস্‌সুম্পসাউ'র এই শব্দকোষটি

পর্যালোচনা করলে স্বভাবতঃই মনে হতে পারে যে শব্দকোষটি প্রধানতঃ আঞ্চলিক ভিত্তিতে রচিত; অর্থাৎ বাংলাদেশের একটি বিশেষ অঞ্চলে, ঢাকা-সন্নিহিত পূর্ববঙ্গে, যে ভাষা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রচলিত ছিল, এই শব্দ-সংগ্রহের ভিত্তি মোটামুটি সেই ভাষা: এবং এই শব্দ-সংগ্রহের বিশিষ্টতা পূর্ববঙ্গের উচ্চারণরীতি অনুসরণে। প্রসঙ্গতঃ কয়েকটি সংগৃহীত শব্দ উদাহরণস্বরূপ এখানে উদ্ধার করা যেতে পারেঃ Antthu patite, আঁটু পাতিতে; আঁটু < হাঁটু। Batthi, বাঠি (খর্বাকৃতি)। Behan, বেহান (সকালবেলা)। Caoa, কাউয়া (কাক)। Coutarer ttango, কৌতরের টাঙ্গ (পায়রার ঘর)। Dheuc, ঢেউক (জৃম্ভণ)। Ghao ঘাও (ক্ষত)। Manga মাঙ্গা (মহার্ঘ)। Nouq নৌখ (নখ)। Olop, অলপ (অল্প)। Pathali পাথালি (আড়াআড়ি)। Priticar প্রিতিকার (প্রতিকার)। Qhazuaite, খাজুয়াইতে (চুলকানো)। xuami সুয়ামী (স্বামী)। Zhinoi ঝিনই (ঝিনুক)।

এই শব্দসংগ্রহে পূর্ববঙ্গের উচ্চারণের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সহজেই অনুসৃত হয়েছে; এবং এই আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট আস্‌সুম্পসাউ'র সমগ্র রচনাবলীর বিচারে এক আবশ্যকীয় উপাদান, শব্দসংগ্রহের ক্ষেত্রেও। তথাপি তদ্ভব, দেশী ইত্যাদি শব্দ ছাড়াও তিনি যে তৎসম শব্দ সংকলনেও যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন, শব্দ-সংগ্রহে তার প্রমাণও কম নয়। এই দিক থেকে দেখতে গেলে আস্‌সুম্পসাউ'র শব্দসংগ্রহে বিচিত্রতার অভাব দেখা যাবে না, যা পক্ষান্তরে প্রমাণ করে যে সংগ্রাহক শব্দসংগ্রহকে এক সামগ্রিক রূপ দান করতে চেয়েছিলেন। এমন কি ভাষার চল্‌তি ব্যবহারাদিও তাঁর লক্ষ্য এড়িয়ে যেতে পারে নি, কোথাও কোথাও তিনি তা সঞ্চয় করেছেন; যেমন, Burate Bura বুড়াতে বুড়া (মন্দ থেকে আরও মন্দ)। Matti loilo, মাটি লইল (সমাধিস্থ)। Muquer Omrito মুকের অমৃত (থু থু)। ইত্যাদি।

তথাপি একথা সর্বথা সত্য যে আস্‌সুম্পসাউ'র শব্দসংগ্রহ একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য দ্বারা চালিত; প্রধানতঃ পর্তুগীজ পাদ্রিদের মধ্যেই এই গ্রন্থের প্রচারণা তাঁর অভিপ্রেত হয়ে থাকবে। এই চরিতার্থতা কতটা অর্জিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে অবশ্য কোন তথ্য নেই। তথাপি একমাত্র পর্তুগীজ পাদ্রিদের ব্যবহারের পরিধিকে এই গ্রন্থ অতিক্রম করে গিয়েছিল বলে মনে হয়, সুনীতিকুমার ফরাসী অভিধানকার ওসাঁ এই শব্দকোষ ব্যবহার করেছিলেন অথবা দেখেছিলেন বলে অনুমান করেছেন।১৫ পরবর্তীকালে বাংলার জ্ঞানসাধনার ভূমিতে পর্তুগীজ পাদ্রিদের প্রাধান্য হ্রাস, এবং ফরাসী ও

ইংরেজের প্রাধান্য সূচিত হয়েছিল; তথাপি আস্‌সুম্পসাউ'র গ্রন্থ যে সেই পর্তুগীজ অপ্রাধান্যের যুগেও সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয় নি, গ্রন্থকারের পক্ষে এই তথ্য বিপুল সাফল্যের দ্যোতক।

ওসাঁ

বাংলা দেশে অভিধান প্রণয়নের ইতিহাসে ওগ্যুস্ত্যাঁ ওসাঁ-র১৬ ভূমিকাটি প্রায় প্রত্যেক গবেষকই স্মরণ করেছেন। ওসাঁ প্রণীত অভিধান কখনোই মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয় নি, ফলে এর কোন ফলবান ভূমিকা গড়ে ওঠা স্বাভাবিক ছিল না। অভিধান সংকলনের পশ্চাতে তাঁর যে উৎসাহ সক্রিয় ছিল, তা সম্পূর্ণরূপেই আভিধানিকের উৎসাহ কিনা, সে সম্পর্কে হয়তো সংশয় থাকতে পারে; কিন্তু তৎকালীন অধিকাংশ অভিধান-প্রণয়নের ক্ষেত্রে যে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয়তার বোধটি সর্বদা ও সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়, ওসাঁর সংকলনের পশ্চাতেও সম্ভবতঃ সেইরূপ কোন উদ্দেশ্য বর্তমান ছিল। আস্‌সুম্পসাউ' পর্তুগীজ পাদ্রিদের বাংলা ভাষা শিক্ষার তাৎক্ষণিক জরুরী প্রয়োজনে পর্তুগীজ-বাংলা ও বাংলা-পর্তুগীজ শব্দকোষ প্রণয়ন করেছিলেন; পরবর্তীকালে ফরস্টার যে ইংরেজী-বাংলা ও বাংলা-ইংরেজি শব্দকোষ সংকলন করেন, তার উদ্দেশ্যঃ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষার্থী বা কম্পানীর কর্মচারীদের কর্মানুষ্ঠানের পক্ষে এই ধরনের গ্রন্থের তাৎক্ষণিক গুরুতর প্রয়োজন ছিল; কোলব্রুক যে অমরকোষের সম্পাদনা করেন, যদিও তা সংস্কৃত অভিধান, তথাপি ইংরেজির মাধ্যমেই তাঁকে সম্পাদনার কাজটি সম্পন্ন করতে হয়েছিলঃ কেননা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য তা প্রয়োজন। গিলখ্রীষ্ট ও হান্টারের ইংরেজি-হিন্দুস্থানী বা হিন্দুস্থানী-ইংরেজি অভিধানও এই আলোকেই দেখা সম্ভবপর। বাংলা অভিধানের দিকে চোখ ফেরালেও স্পষ্টতঃই বোঝা যাবে, বিশুদ্ধ বাংলা শব্দসংগ্রহ-র বাসনা ও ভাষাকে সুনির্দিষ্ট রূপদানের জন্য নির্দেশনামা রচনা এই সময়কার বাংলাদেশে অভিধানচর্চার প্রেরণা-কেন্দ্র ছিল না। সমস্ত প্রয়াসেই দ্বিভাষাসূত্র গৃহীত হয়েছে। ওসাঁ প্রণীত অভিধানও দ্বিভাষিকঃ ফরাসী-বাংলা। সংকলক ওসাঁ চন্দননগরের একজন ফরাসী নাগরিক। তথ্যগত সমর্থনের অভাব থাকলেও, একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তিনি শব্দসংগ্রহে সমকালীন মনোভাব দ্বারা প্রভাবিত; ফরাসী শাসকবর্গের সঙ্গে দেশীয় শাসিতদের সম্পর্ক নিশ্চিত ও আত্মিক করে তোলার প্রয়োজনবোধ তাঁর সংকলনের পশ্চাতে থাকতে পারে। কিন্তু ওসাঁ আভিধানিক হিসাবে উল্লেখযোগ্য অন্য কারণে। তিনি শুধু ফরাসী-

বাংলা শব্দকোষই প্রণয়ন করেন নি, তিনি ফরাসী, ইংরেজি, ভারতে প্রচলিত পর্তুগীজ, ফারসী, উর্দু ও বাংলা শব্দসংগ্রহও করেছিলেন। এই ধরনের বহুভাষিক শব্দসংগ্রহ গ্রন্থ সম্ভবতঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই প্রথম। উইলিয়ম কেরী পরবর্তীকালে বৃহত্তর ভাষাতাত্ত্বিক পটভূমিকায় বহুভাষিক অভিধান রচনায় নিমগ্ন হয়েছিলেন বলে আমরা জানি, কিন্তু এ-ধরনের রচনার পূর্বসূত্র ওসাঁর প্রচেষ্টার মধ্যেই সন্ধান করতে হয়। ওসাঁর বহু-ভাষিক শব্দসংগ্রহ অবশ্যই কোন নিশ্চিত ভাষাতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে মনে হয় না, এবং তিনি বাংলাদেশে তৎকালে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষার শব্দসংগ্রহ করেছিলেন মাত্র। এই থেকে অনুমান করা যায় যে সমকালীন ব্যবহারিক উপযোগিতার প্রতিই তাঁর লক্ষ্য নিবদ্ধ ছিল।

ওসাঁর অভিধান ও শব্দকোষগুলি কখনো মুদ্রিত হয় নি,—পাণ্ডুলিপি আকারে প্যারিসের জাতীয় গ্রন্থশালায় রক্ষিত আছে। তাঁর হাতের লেখা চারখানি শব্দসংগ্রহ ও অভিধান সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্যারিসের গ্রন্থশালায় দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন, এবং তিনি সেই চারখানি গ্রন্থের পরিচয় যা দিয়েছেন, তা মোটামুটি এইঃ ১। ফরাসী, ফারসী, উর্দু ও বাংলা গোত্র-সম্পর্ক ও কুটুম্বিতা সম্বন্ধীয় শব্দাবলীর সংগ্রহঃ ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দ; ফারসী ও বাংলা হরফে লিখিত, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। ২। ফরাসী ও বাংলা অভিধান, প্রায় ১১০০০ ফরাসী শব্দ ও তার বাংলা প্রতিশব্দ প্রায় ৩০,০০০; ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত; ৩৮৪ পৃষ্ঠা; বাংলা শব্দগুলি রোমান হরফে লিখিত। ৩। ফরাসী ও বাংলা শব্দকোষ, প্রায় ১২৫০০ ফরাসী শব্দ ও তার দু-তিন গুণ বাংলা প্রতিশব্দ; মার্চ ১৭৮১ থেকে অগাষ্ট ১৭৮১-র মধ্যে সংকলিত; ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্লিখিত; পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬০; বাংলা শব্দগুলি রোমান হরফে লিখিত। ৪। ফরাসী, ইংরেজি, ভারতে প্রচলিত পর্তুগীজ, ফার্সী, উর্দু ও বাংলা শব্দ-সংগ্রহ; শব্দ-সংখ্যা ৩৭০০ থেকে ৩৮০০-র মধ্যে; ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে রোমান হরফে লেখা; পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯৬।১৭

এই চারখানি শব্দকোষেই ওসাঁ প্রধানতঃ রোমান হরফ ব্যবহার করেছেন। সুনীতিকুমারের বিবরণ অনুযায়ী তিনি তিনখানি গ্রন্থে রোমান হরফ ও একখানি গ্রন্থে বাংলা হরফ ব্যবহার করেছেন। তবে তাঁর ব্যবহৃত এই বাংলা হরফ সম্পর্কে সুনীতিকুমার কোন নির্দিষ্ট আলোকপাত করেন নি। ওসাঁর একটি অভিধান থেকে তাঁর ফরাসী শব্দ ও তার বাংলা প্রতিশব্দ সংকলনের কয়েকটি উদাহরণ গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমনঃ ১। **Accident (ফরাসী)—achombite, afote, atchanoque (বাংলা) ২।**

Bonnom (ফরাসী)—Protichtitto, pitichta, protichta (বাংলা); ৩। Pouvre diable (ফরাসী) —qhidarto, doriddro, cangal (বাংলা); ৪। Villaine (ফরাসী)—Couroupa, coutchitta bost (বাংলা)।

উদ্ধৃত এই কয়েকটি ফরাসী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ রোমান হরফে ওসাঁ যেভাবে লিখেছেন, তা বর্তমানের দৃষ্টিতে খুবই অস্বাভাবিক লাগবে। রোমান হরফে বাংলা শব্দ লিখতে গিয়ে ওসাঁ যদি কোন প্রমাদ ঘটিয়ে থাকেন তা হলে তার জন্যে তাঁর উচ্চারণকেই দায়ী করতে হবে। সুনীতি কুমারের মনোভাব এ-সম্পর্কে এইরকমঃ '১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মানুএল-দা-অস্সুম্পসাঁও লিসবনে রোমান অক্ষরে যে বাংলা-পর্তুগীজ ব্যাকরণ ও অভিধান ছাপান, তাহাতে বাংলা শব্দের উচ্চারণ ধরিয়া, পর্তুগীজ ভাষার রীতি অনুসারে বানান করা হইয়াছে। ওসাঁও তাঁহার সঙ্কলিত সংগ্রহে নিজ মাতৃভাষা ফরাসীর উচ্চারণ অনুসারে রোমান অক্ষরে বাংলা শব্দের বানান করিয়াছেন'।১৮

সুনীতিকুমার অনুমান করেছেন যে ওসাঁ পাদ্রি মানুএলের বই ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর এই অনুমানের ভিত্তি সম্ভবতঃ দুইঃ ক। রোমান হরফে বাংলা শব্দ লিখতে গিয়ে নিজ মাতৃভাষার উচ্চারণবিধি অনুসরণ; খ। দু-একটি স্থলে মানুএল-ব্যবহৃত বিশেষ শব্দ তিনিও প্রয়োগ করেছেন, যেমনঃ 'ক্ষুধার্থ' ও 'দরিদ্র' সমার্থক রূপে প্রয়োগ, অথবা 'বস্তু'-কে 'বস্ত' লেখা ইত্যাদি। আরেকটি বিষয়ও ওসাঁর সংকলনে লক্ষণীয়; সেটি হলোঃ সংকলনে উপভাষিক শব্দের সংস্থান। তিনি শুধু 'প্রতিষ্ঠা' শব্দই সংকলন করেন নি, পাশাপাশি 'পিতিষ্ঠা' শব্দেরও সম-মর্যাদা দান করেছেন।১৯

বস্তুতঃ, ওসাঁর সংকলন-গ্রন্থগুলির কোন ব্যবহারিক গৌরব বাংলা অভিধানের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত হয় নি, কিন্তু ইতিহাসের দিক থেকে তাঁর এই উদ্যম খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক গ্রন্থি বলে বিবেচিত হবে। তাঁর সংকলনের পশ্চাতে কি প্রেরণা ক্রিয়াশীল ছিল, তা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভবতঃ সঙ্গত হবে না, কিন্তু তিনি যে আপন উৎসাহে ঊনবিংশ শতাব্দীর আসন্ন জ্ঞান সাধনার উল্লাসের দ্বারপ্রান্তে অনুচ্চার বৈতালিক, তাতে কোন সংশয়ের অবকাশ নেই। বাংলা অভিধান-ইতিহাসে ওসাঁ একটি গুরুত্ব-পূর্ণ নাম।

আপজন

'বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা অভিধান'-এর সংকলক রূপে সজনীকান্ত দাস জনৈক এ· আপজনের নাম নির্দেশ করেছেন। একখানি

বাংলা-ইংরেজি শব্দকোষের সন্ধান পেয়ে তার ওপর তিনি আলোকপাত করবার চেষ্টা করেন ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায়। গ্রন্থখানির কোথাও সংকলকের নাম নেই। ২০শে মার্চ ১৭৯২ ও ১৬ই এপ্রিল ১৭৯৩ তারিখের ক্যালকাটা ক্রনিক্‌ল্‌ পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি বিজ্ঞাপন, এবং যে ক্রনিক্‌ল্‌ প্রেস থেকে গ্রন্থখানি ছাপা হয়েছিল তাতে আপজনের অংশ ছিল,—এই দুই সূত্রের বিবেচনায় তিনি শব্দকোষখানি আপজনের সংকলন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।

গ্রন্থটির আখ্যাপত্র এইরকমঃ 'ইংরাজি ও বাংগালী বোকেবিলারি। /AN EXTENSIVE/VOCABULARY./Bengalese and English./VERY USEFUL/TO TEACH THE NATIVES ENGLISH/AND/TO ASSIST BEGINNERS IN LEARNING/THE BENGAL LANGUAGE./ CALCUTTA,/PRINTED AT THE CHRONICLE PRESS/MD ccxc III.'

আখ্যাপত্রটি যে যথেষ্ট মনোযোগের সঙ্গে রচিত হয়নি তা বোঝা যায় যখন দেখি সংকলক কখনো শব্দকোষটিকে ইংরেজি বাংলা, আবার কখনো বাংলা ইংরেজি বলে চিহ্নিত করেন। এখানে মনোযোগের অভাব প্রকাশ পায় এইজন্য যে আখ্যাপত্রানুযায়ী মনে হতে পারে যে শব্দকোষে ইংরেজি-বাংলা ও বাংলা-ইংরেজি, দুই ক্রমই অনুসরণ করা হয়েছে, যেমন পরবর্তী-কালে ফরস্টার করেছিলেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই রচনাটিতে একটি পর্যায়ই অনুসরণ করা হয়েছে, এবং তা হলো বাংলা-ইংরেজি।

আপজন গ্রন্থখানিকে ইংরেজি শিক্ষার্থী বাঙালিদের উপযোগী, ও বাংলা শিক্ষার্থী ইংরেজদের সহায়িকা রূপে বর্ণনা করেছেন। মনে হয়, ফরস্টার কথিত Vice versa রীতিতে রচিত শব্দকোষের সহায়তায়ই দুই প্রকারের উপযোগিতা সাধ্য হতে পারে। দেশীয়দের ইংরেজি ভাষা শিক্ষার সহায়িকা রূপে রচনার সার্থকতা সবচেয়ে বেশি হয় যখন তা বাংলা-ইংরেজি ক্রমে লিখিত হয়, এইক্ষেত্রে তাই করা হয়েছে। কিন্তু বাঙালীদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষায় আগ্রহ তখন যে বিশেষ অঙ্কুরিত হয়েছিল, এমন সাক্ষ্য উপস্থিত নেই; ফলে সংকলকের ইচ্ছানুযায়ী গ্রন্থখানি কতটা চরিতার্থ হতে পেরেছিল, সে সম্পর্কে অবশ্যই প্রশ্ন থেকে যায়। আবার বাংলা ভাষায় প্রাথমিক পাঠগ্রহণকারী ইংরেজ এইরকম গ্রন্থ থেকে সব চেয়ে বেশি ফললাভ করতে পারেন, যদি তা ইংরেজি-বাংলা ক্রমে লিখিত হয়, এখানে যা করা হয় নি। এবং এই তথ্যও মোটামুটি আমাদের কাছে উপস্থিত যে, যে কোনও কারণেই হোক, ফরস্টার বা কেরী তাঁদের সমকালীন এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। এ থেকে দু-রকমের অনুমান সম্ভবঃ ১। এই শব্দকোষখানির উপযোগিতা প্রমাণিত হয় নি; অথবা আপজনের ব্যক্তিগত

ভাগ্য বিপর্যয়ের সঙ্গে গ্রন্থখানির প্রচার বিপর্যয়ও ঘটতে পারে; ২। ফরস্টারের শব্দকোষেই ভাষা সচেতনতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম শব্দ সংগ্রহ করা হয়েছিল, এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে যথার্থ শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে যখন প্রথম বাংলা শিক্ষার সূচনা হয়, তখন তার ভার পড়ে এমন এক ব্যক্তির ওপর, যাঁর শিক্ষা-মনন ভাষাচৈতন্য অনুশাসিত। বস্তুতঃ হালহেড, ফরস্টার ও কেরী প্রমুখের বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের অধিকার সম্পর্কিত স্থির বিশ্বাসই এই সময়কার অ-বঙ্গভাষাভাষীদের বাংলা শিক্ষার ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। অথচ আপজনের শব্দকোষে সমকালীন ভাষাচৈতন্যের কোন পরিচয় নেই। একথা অবশ্য সত্য যে তাঁর সংকলন প্রকাশিত হবার কালে কেরী অথবা ফরস্টার দৃশ্য-বহির্ভূত ছিলেন, তবু হালহেডের মাধ্যমে বাংলা ভাষা সম্পর্কে যে ঐতিহাসিক বিবেচনার সূত্রপাত হয়েছিল, আপজন তার স্পর্শলাভ করেননি। হতে পারে, এই কারণেই পরবর্তী কোষকারদের কাছে তিনি উপেক্ষিত হয়েছিলেন।

আপজন প্রথমে ব্যঞ্জন বর্ণ ও পরে স্বরবর্ণক্রমে শব্দ সংগ্রহ করেছিলেন। যুক্তাক্ষরের ক্ষেত্রে হাতের লেখার হরফ ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়, এবং বানানের ক্ষেত্রে প্রায়ই তিনি বিপর্যয় ঘটিয়েছেন। এই বিপর্যয় বিশেষ করে শ, স, ষ, ব্যবহারের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে। গ্রন্থখানির প্রকাশ কাল ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ।

ফরস্টার

এইচ· পি· ফরস্টারের শব্দকোষের আখ্যাপত্রটি এইরকমঃ
A/VOCABULARY/IN TWO PARTS,/ENGLISH AND BONGALEE/AND/VICE VERSA./BY H. P. FORSTER,/SENIOR MERCHANT ON THE BONGAL ESTABLISHMENT/VOX ET PRAETEREA NIHIL/Calcutta/FROM THE PRESS OF FERRIS AND CO./1799.

এই শব্দ-কোষখানি দুই খণ্ডে প্রকাশিত; প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ, ও দ্বিতীয় খণ্ডের ১৮০২। প্রথম খণ্ড ইংরেজি-বাংলা ও দ্বিতীয় খণ্ড বাংলা-ইংরেজি; ফরস্টার Vice versa বলতে এই রীতিকেই বুঝিয়েছেন। প্রথম খণ্ডের কোষ অংশের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪২১; এর সঙ্গে ২ পৃষ্ঠা উৎসর্গপত্র এবং ভূমিকা বা Introduction ২০ পৃষ্ঠা। দ্বিতীয় খণ্ডে কোন আখ্যাপত্র বা ভূমিকা নেই, মূল কোষ অংশের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪৩; এর সঙ্গে আছে সংযোজন ও শুদ্ধিপত্র ৯ পৃষ্ঠা এবং ২ পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রাহকদের নামের একটি তালিকা।

গ্রাহকদের তালিকায় দেখা যাচ্ছে, এ দেশীয় ভাষার শব্দকোষ বা অভিধানের ক্ষেত্রে যে-কজন য়ুরোপীয় তখন উদ্যম দেখিয়েছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করেছিলেন; গিলখ্রীষ্ট, হাণ্টার, কোলব্রুক, কেরী প্রত্যেকেই। বাইবেল অনুবাদক জন এলার্টনও এক সেট নিয়েছিলেন।

ফরস্টার গ্রন্থখানিকে 'Attempt at a regular Bongalee Vocabulary' বলতে চেয়েছেন। গ্রন্থরচনার কারণ সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন যে, সরকারীসূত্রে দেশীয় ভাষা শিক্ষার আবশ্যকতা স্বীকৃত হওয়ায়, অন্যতম দেশীয় ভাষা বাংলার এই শব্দকোষ তিনি প্রণয়ন করেছেন উপযোগিতার বিবেচনায়।

ফরস্টার বাংলা ভাষা সম্পর্কে বিশুদ্ধতার অভাবের অভিযোগ অস্বীকার করেন নি, তবে তাঁর মতে বিশুদ্ধতার এই অভাবের কারণ বাংলা ভাষার ব্যবহৃত রাজস্ব ও আদালত সম্পর্কিত পরিভাষা, যা প্রধানতঃ হিন্দুস্থানী বা আরবী ফারসী শব্দ। বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তিনি দেখতে পেয়েছেন যে, মোট জনসংখ্যার অন্তত ছয়-দশমাংশ বাংলা ছাড়া অন্য ভাষা ব্যবহার করে না, শতকরা নব্বই ভাগ কাজ বাংলার মাধ্যমেই সাধিত হয়।২০ এই বাংলা ভাষার দুটো রূপ তিনি লক্ষ্য করেছেনঃ 'the polite and vulgar;' বাংলায় একে ভদ্র ও ইতর বলা যেতে পারে। ইতর ভাষা সমাজের নীচু স্তরের মানুষের মধ্যেই সচরাচর ব্যবহৃত; ভদ্র ভাষার মধ্যে অনেক সংস্কৃত উপাদান উপস্থিত, এই ভাষায় অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ অনুদিত হয়েছে। মনে হয় ভদ্র ভাষা বলতে তিনি লিখিত ভাষা বা সাধু ভাষাই মনে করেছেন। এবং ভদ্র বাংলা ভাষা সম্বন্ধে তাঁর উচ্চ প্রত্যাশা ছিল, ভদ্র ভাষার শক্তি সম্বন্ধে তিনি নিঃসংশয় ছিলেন।২১ বাংলা ভাষা সম্পর্কে ফরস্টারের সচেতনতা এই সব বিবেচনা ও প্রত্যাশার মধ্যে ধরা পড়ে; এবং এই সংকলনের মাধ্যমে ভাষাকে তিনি বিশুদ্ধতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। সেইজন্যই এই প্রয়াসকে তিনি 'Attempt at a regular Bongalee Vocabulary' বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন বলে মনে হয়।

কোষকারের দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কেও ফরস্টার সচেতন ছিলেন। এই সচেতনতা থেকেই সংকলন স্ফীততর হওয়ার ভয় থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রচলিত রীতি ও ব্যবহার অনুসরণে একই শব্দের বহুতর প্রতিশব্দ সংকলন করেছেন। যেমন, এখান হইতে, এখান থেক্যা, এই নিমিত্ত, এই কারণ ইত্যাদি; এগুলি সবই ইংরেজি Hence-এর বাংলা প্রতিশব্দ। শব্দ সংকলনে তিনি যখন এইভাবে অগ্রসর হতে চান, তখনও তিনি 'Perpetual recurrence of the auxiliary verbs'-কে প্রচলিত বাংলা ভাষার একটি

দুর্বলতা রূপে নিরূপণ করতে কুণ্ঠিত হন নি। এবং এই গঠন-জনিত ত্রুটির হাত থেকে তিনি শব্দকে উদ্ধার করতে চেয়েছেন 'By restoring the verbal nouns to their full powers, and using them as verbs.'২২ এ থেকে বোঝা যায় যে ফরস্টার একদিকে যেমন ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের সংকলনে মনোযোগী ছিলেন, তেমনি অপরদিকে ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের দুর্বলতা ও ত্রুটি মুক্ত করতেও আগ্রহ দেখিয়েছেন; তিনি ভাষার বিশুদ্ধতা সম্পর্কিত চিন্তা দ্বারা স্পৃষ্ট হয়েছিলেন। ভাষার বিশুদ্ধতা প্রতিশ্রুত করা অভিধানকারের অন্যতম দায়িত্ব বলে জনসন মনে করতেন, এবং এই মনোভঙ্গি কোষকাররা এখনো বর্জন করেন নি। ভাষার প্রচলিত শব্দরূপ ও বিশুদ্ধ শব্দরূপ, দুইই সংকলন করা আভিধানিকের কৃত্য; ফরস্টার দুইই করবার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য এরই মধ্যে তদ্ভব শব্দের সংকলনে তাঁর উৎসাহ বিশেষভাবে চোখে পড়ে। মনে হয়, বিশুদ্ধ অর্থে তিনি তৎসম শব্দকেই মাত্র ধরেন নি, তৎসম তদ্ভব দুইই তাঁর বিশুদ্ধ শব্দের সংজ্ঞায় পড়ে।

ব্যাকরণ-চিন্তা অভিধান চিন্তার অঙ্গীভূত উপাদান। সংস্কৃত কোষকারকগণও কোষগ্রন্থে ব্যাকরণ-ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। তবে সাধারণভাবে Vocabulary-তে ভাষার শব্দসংগ্রহ ও তার অর্থ প্রকাশ করা ছাড়া অন্য কিছু প্রত্যাশা করা হয় না। ফরস্টারও বহিরঙ্গে তাই করেছেন মাত্র; কিন্তু তাঁর Vocabulary-র একটি দীর্ঘ মুখবন্ধ আছে, ঐ অংশে তিনি সংকলিত শব্দ সম্পর্কে ভাষাবিষয়ক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন।২৩ ভাষাতাত্ত্বিক কতগুলি নির্দিষ্ট লক্ষণে তিনি যেভাবে বাংলা ভাষাকে লক্ষ্য করেছেন, তার সমর্থনেই এই সংকলনের শব্দগুলির নিষ্পত্তি ঘটেছে বলে ধরতে হবে। তিনি যেমন উচ্চারণ ও লিপিপ্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন, তেমনি শব্দ গঠন পদ্ধতির কতগুলি বিশেষত্বও ব্যাখ্যা করেছেন, যাকে সম্ভবতঃ পুরোপুরি etymological বা ব্যুৎপত্তি-নির্ভর বলা যাবে না, তথাপি তাঁর মনোভঙ্গি যে তার নিকটবর্তী হয়েছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

কেরী: অভিধান রচনার পরিধি ও ইতিহাস

কেরীর নামে পাঁচখানি অভিধান প্রচারিত; এইগুলির মধ্যে চারখানির সংকলন তাঁর, অপরখানি তিনি সম্পাদনা করেছিলেন মাত্র। এই অভিধানগুলি হলো: বাংলা, মারাঠি, ভুটানী, সংস্কৃত, ও বহুভাষিক। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা, সংস্কৃত ও মারাঠি ভাষার অধ্যাপক রূপে তিনি ওই তিন ভাষার অভিধান সংকলন করেছিলেন, এবং ভাষাতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসায়

উদ্দীপিত বাইবেলের ভারতীয় ভাষার অনুবাদক রূপে তিনি একটি বহুভাষিক অভিধান রচনা করেন। এই কাজে তিনি দেশীয় পণ্ডিতদের সহায়তা স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয়, যদিও এই সহায়তার পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন। ভুটানী ভাষার অভিধানের মূল রচয়িতা চার্চ মিশনারী সোসাইটির Mr. Schroeter; কেরী তা সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। এই পাঁচটি অভিধানের মধ্যে আবার তিনখানি মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল: এগুলি হলোঃ বাংলা, মারাঠি, ভুটানী। অপর দুখানি অভিধান সংস্কৃত ও বহুভাষিক—মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করে নি। শ্রীরামপুর কেরী লাইব্রেরীতে এই অভিধান দুটির পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে।

বাংলা ঃ

কেরীর বাংলা অভিধান রচনা তাঁর জীবনের এক স্মরণীয় কীর্তি। ঠিক কতদিন তিনি বাংলা অভিধানের সংকলন কাজে নিবিষ্ট ছিলেন, তা অভ্রান্তভাবে নির্ণয় করা কঠিন। বাইবেল অনুবাদে ব্যস্ত থাকার সময় থেকেই এর সূচনা, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক রূপে অধিষ্ঠিত হবার পর প্রয়োজনবোধে একাজে তিনি অধিকতব উৎসাহী হয়ে থাকবেন। অনুমান করা যেতে পারে তিনি বছর কুড়ি এই কাজে কখনো ঘনিষ্ঠ মনোযোগে, কখনো বা শিথিল উদ্যমে, ব্যাপৃত ছিলেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর অভিধানের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়, ১৭৯৫ থেকে সংকলন কাজে ব্রতী হয়েছিলেন বলে মনে করলে সময় কাল ঐ কুড়ি বৎসরই দাঁড়ায়।২৪

কেরীর বাংলা অভিধানের একটি খণ্ডাংশ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে।২৫ কিন্তু ছাপার কাজ বড় অক্ষরে হওয়ার দরুন গ্রন্থের আকার অতিকায় হয়ে ওঠে এবং কেরী এই হরফে ছাপা আর বেশি দূর টানতে চান নি। ছোট অক্ষর প্রস্তুত করে আবার তিনি অভিধানখানি ছাপেন, ও বড় হরফে ছাপা অভিধানাংশের প্রচার রহিত করেন।২৬ কেরীর মৃত্যুর পর Asiatic Journal-এ প্রকাশিত ফেলিক্স কেরীর মন্তব্য সম্ভবতঃ ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এই সংস্করণের ওপর ভিত্তি করেই রচিত; তাঁর মন্তব্য এইরকমঃ 'the first letter of the alphabet, forming the Sanskrit and Greek privative Prefix, had been injudiciously multiplied by examples, the positive forms of which were to be found in the subsequent pages.'২৭ ফেলিক্স কেরী "অ" বর্ণ অবলম্বনে সংকলিত শব্দাবলীর যে পরিচয় নির্ণয় করেছেন, তা ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণ সম্পর্কে সত্য হলে, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পর্কেও সত্য। তবে

ফেলিক্‌স একই সঙ্গে লক্ষ্য করতে ভোলেন নিঃ 'The Doctor, however, acted from the best motive,—an anxiety to supply his pupils with a ready resolution of primary difficulties.'২৮

প্রাথমিকভাবে ফেলিক্‌স কথিত ছাত্র উপযোগিতার লক্ষ্য থেকে কেরী যে সরে আসেননি, দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকাই তাঁর প্রমাণ। তাঁর বাংলা অভিধানের প্রথম খণ্ড ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে, সম্ভবতঃ এপ্রিল মাসে, প্রকাশিত হয়।২৯ স্বরবর্ণের মোট ১৩টি বর্ণ যেসব শব্দের আদ্যক্ষর বলে তিনি বিবেচনা করেছেন, তা-ই এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে অভিধানের দ্বিতীয় খণ্ডের মুদ্রণ সম্পূর্ণ হলে,৩০ প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণের কিছু কিছু আখ্যাপত্রে, যা তখন পর্যন্ত অবিক্রিত অবস্থায় ছিল, তারিখের পরিবর্তন করে ছাপা হয়; দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ কাল, অর্থাৎ, ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দই ঐ আখ্যাপত্রেও মুদ্রিত হয়। সজনীকান্ত জানিয়েছেনঃ 'এই কারণে একই সংস্করণে আখ্যাপত্রে ১৮১৮ এবং ১৮২৫ দুই তারিখই মুদ্রিত দেখা যায়। প্রথম খণ্ড ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই।'৩১

কেরীর অভিধানের আখ্যাপত্র এইরকমঃ

প্রথম খণ্ডঃ A/DICTIONARY/OF THE/BENGALEE LANGUAGE/IN WHICH/THE WORDS ARE TRACED TO THEIR ORIGIN/AND/THEIR VARIOUS MEANINGS GIVEN/VOL. I/BY W. CAREY, D.D./PROFESSOR OF THE SUNGSKRITA, AND BENGALEE LANGUAGES, IN THE/COLLEGE OF FORT WILLIAM./SECOND EDITION, WITH CORRECTIONS AND ADDITIONS./SERAMPORE PRINTED AT THE MISSION PRESS/1818.

প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ডঃ ঐ। ঐ। ঐ। ঐ। ঐ। ঐ। ঐ। ঐ।/VOL. II—PART I/ঐ। ঐ। ঐ।

SERAMPORE :/PRINTED AT THE MISSION PRESS,/1825.

দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ডঃ ঐ। ঐ। ঐ। ঐ। ঐ। ঐ। ঐ। ঐ।/VOL. II—PART II/ঐ। ঐ। ঐ। ঐ। ঐ। ঐ।

প্রথম খণ্ডের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬১৬; এর মধ্যে সংস্কৃত ধাতুর একটি তালিকা ৩৫ পৃষ্ঠা আছে। প্রথম খণ্ডে শুধু স্বরবর্ণে আরম্ভ হয়েছে এমন শব্দ সংকলন করা হয়েছে। ফেলিক্‌স কেরীর পর্যবেক্ষণ যে সত্য, তা বোঝা যায় 'অ' বর্ণ দিয়ে আরম্ভ শব্দসংখ্যার প্রাচুর্য দেখলেই; মোট ২৩৩ পৃষ্ঠা ব্যাপী 'অ' আদ্যক্ষরযুক্ত শব্দের সম্ভার।৩২ এইরকম 'এ'

আদ্যক্ষরযুক্ত শব্দ সংকলন করা হয়েছে ১২২ পৃষ্ঠা। তারপর 'আ' ৬৬ পৃষ্ঠা, 'উ' ৩৮ পৃষ্ঠা, 'ঊ' ২॥০ পৃষ্ঠা। 'ই' ৬, 'ঈ' ১½ পৃষ্ঠা। এমন কি '৯' আদ্যক্ষরযুক্ত শব্দসংকলনেও তিনি বিরত ছিলেন না, যা সহজেই অবান্তর ও অত্যুৎসাহের ক্ষেত্র বলে চিহ্নিত হবে।

দ্বিতীয় খণ্ডের দুই ভাগ। প্রথম ভাগে 'ক' বর্গ থেকে 'ত' বর্গ পর্যন্ত মোট ২০টি বর্ণ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে 'ক্ষ' আলাদা বর্ণ রূপে গৃহীত না হলেও 'ক্ষ' আদ্যক্ষর যুক্ত শব্দের সংস্থান ঘটানো হয়েছে 'ক' বর্ণ স্তম্ভে। 'ত' বর্ণ স্তম্ভে গৃহীত শব্দ সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, এই পর্যায় মোট ১১৭ পৃষ্ঠা বিস্তৃত। তারপরই সবচেয়ে বড় ভাগ 'ক' বর্ণের, তারপর পর্যায়ক্রমে 'দ', 'ন', 'গ', 'ধ' এবং 'জ'-র। লক্ষণীয় 'ঙ' 'ঞ' 'ণ' আদ্যক্ষর যুক্ত শব্দ সংকলনে তিনি ধরাবাঁধা নিষ্ঠাই মাত্র দেখিয়েছেন, কোন বৈশিষ্ট্য বা অপরিহার্যতা তাতে ফুটে ওঠে নি। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৯০। দ্বিতীয়ভাগে 'প' বর্গের বর্ণমালা এবং 'য', 'র', 'ল', 'শ', 'ষ', 'স', 'হ' স্থান পেয়েছে। 'ব' বর্ণের শব্দসংখ্যা সবচেয়ে বেশি, মোট ১৭৩ পৃষ্ঠা ব্যাপী সংকলিত। লক্ষণীয় অন্তস্থ 'ব'-র কোন স্বতন্ত্র স্তম্ভ কেরী রচনা করেন নি; বর্গীয় 'ব' স্তম্ভেই অন্তস্থ 'ব'-র সংস্থান করায় ঐ স্তম্ভ এত বিস্তৃত হয়ে থাকবে। তারপরেই শব্দসংখ্যার দিক থেকে সবচেয়ে বড় ভাগ যথাক্রমেঃ 'স', 'প', 'ম', 'শ', 'ভ' ইত্যাদির; 'ষ' বর্ণ আদ্যক্ষরযুক্ত শব্দের সংখ্যা সবচেয়ে কম, মাত্র ২ পৃষ্ঠায় সংকলিত। দ্বিতীয় ভাগের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৫৪। দুই ভাগে সম্পূর্ণ দ্বিতীয় খণ্ডের মোট পৃষ্ঠা ১৫৪৪।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬১৬+১৫৪৪=২১৬০।[৩৩] শব্দ সংখ্যার পরিমাণ আনুমানিক ৮০,০০০।[৩৪] শব্দ সংখ্যার পরিমাণ এত বেশি হওয়ার অন্যতম কারণ অবশ্যই সমাসবদ্ধ সমস্তপদ সংকলনে সংকলকের উৎসাহ। স্বতন্ত্র শব্দ রূপে নিষ্পন্ন সমস্তপদের প্রচুর সংকলন সবসময় অভিধানকারের বিবেচনার ও সংযমের পরিচয় বহন করে না সত্য; কিন্তু এতে যে তাঁর অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের পরিচয় খুবই স্পষ্ট, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেরী এই পরিশ্রমের পরিচয় সানন্দে এইভাবে দিয়েছেনঃ 'This is a work of three quarto volumes of close print, and has occupied all, and rather more than all, my leisure time for several years.'[৩৫] আবার, এই শব্দ-প্রাচুর্য পক্ষান্তরে যে ভাষার ঐশ্বর্য-প্রকাশক, তা-ও সত্য; কেরী বাংলা ভাষার ঐশ্বর্য সম্পর্কে নিঃসংশয়িত ছিলেন, এখানে তাঁর সেই বিশ্বাসেরই পরিপোষণা

H. H. Wilson এই বিষয়টির ওপর সঙ্গত আলোকপাত করেছেন। কেরী তাঁর অভিধানের মুখবন্ধে জানিয়েছেন যে, 'He has endeavoured to introduce every simple word used in the language, and all the compound terms which are in common use, or which are to be found in Bengali works whether published or unpublished.'৩৬ উইলসন মনে করেন পুথিগত শব্দাহরণে কেরী অধিক মনোযোগ দিয়েছিলেন, যার কার্যকর প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত নয়। যদিও কেরী প্রচুর পরিমাণে আহরণ করেছিলেন ও শব্দের অর্থ ও গঠনের ব্যাখ্যায় যত্নবান ছিলেন, তথাপি নিষ্পন্ন শব্দের সংকলনে বোধ হয় আরও নির্দিষ্ট হবার সুযোগ ছিল। এই পর্যবেক্ষণের পর কিন্তু উইলসন গ্রন্থের অতিকায় স্ফীতির কথা মনে রেখেও বলেন, তা (১) 'must have added materially to the trouble of the complier', (২) 'evinces his careful research, his conscientious exactitude, and his unwearied industry.'৩৭ উইলসন 'trouble'-কে 'industry' -রূপেই যে পরিণামে প্রতিষ্ঠা করেছেন, এই তথ্যটি এখানে লক্ষণীয়।

কেরীর বাংলা অভিধান চরিত্রে একখানি দোভাষা অভিধান। বাংলা অভিধান বললে যে অর্থ-প্রত্যয় ঘটে, এখানে তা হয় নাঃ বাংলা-ইংরেজি অভিধান-রূপেই গ্রন্থখানিকে দেখতে হয়। ফলে শব্দের গঠনের অংশ বাদ দিলে যে অপর প্রধান অংশ থাকে, অর্থাৎ তার অর্থ-নিষ্পত্তির অংশ, কেরী সেখানে ইংরেজি ভাষাকেই মাধ্যমরূপে ব্যবহার করেছেন। এমন কি পদ-প্রকরণ নিরূপণেও ইংরেজির নির্দেশ মেনে নিয়েছেন। এইসব কারণেই শব্দ, তার গঠন ও ব্যুৎপত্তি বাংলা অক্ষরনির্ভর হওয়া সত্ত্বেও দোভাষা অভিধানের পরিচয়েই গ্রন্থখানি চিহ্নিত। উইলসন বাংলা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ সংকলনে কেরীর যোগ্যতার কথা উল্লেখ করেছেন।৩৮ এমন কি এই তথ্যও তাঁর লক্ষ্য এড়িয়ে যায় নি যে, কেরী এমন অনেক শব্দ সংকলন করেছেন, যার অর্থ-নিষ্পত্তি স্থানীয় আচার-আচরণাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়েই সাধ্য হতে পারে।৩৯ কেরীও বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত এইরকম শব্দাবলীর অর্থ-নিষ্পত্তির সমস্যার কথা অভিধানের মুখবন্ধে উত্থাপন করেছিলেন।৪০ আমরা কেরীর অভিধানের শব্দ ও অর্থ-সমীক্ষা পরবর্তী একটি অংশে করেছি।

বাংলা শব্দভাণ্ডারে প্রকৃতিবিজ্ঞানের শব্দাহরণ কেরীর অভিধানের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। তিনি স্বয়ং প্রকৃতিবিজ্ঞানে উৎসাহী ছিলেন, উদ্ভিদ ও জীবজন্তু ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর মনোযোগও শব্দ সংকলনে বিশেষ প্রকাশিত। গৃহীত শব্দাবলীর মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগ সংস্কৃত বা তৎসম

শব্দ, অবশিষ্টাংশের মধ্যে তদ্ভব, অর্ধ-তৎসম, দেশী ও বিদেশী শব্দ আছে। বিদেশী শব্দের মধ্যে ফার্সী শব্দের ভাগ আবার খুবই বেশি। শব্দবিন্যাসে তিনি বর্ণানুক্রম পদ্ধতিই গ্রহণ করেছেন। বাংলা অভিধানে এই পাশ্চাত্যরীতি কেরীই প্রথম প্রবর্তন করেন; কেরীর পূর্বে ফরস্টার এই কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন, তারও আগে আস্সুম্পসাওঁ, কিন্তু তাঁরা দুজনেই শব্দ সংগ্রহ বা vocabulary মাত্র রচনা করেছিলেন, যদিও ফরস্টারের রচনায় অভিধান-লক্ষণ অংশতঃ বিদ্যমান আছে।

কেরীর এই বাংলা অভিধানের কোন সম্পূর্ণ সংস্করণ আর কখনো প্রকাশিত হয়নি। অবশ্য এই অভিধানের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল।৪১ ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের লঙের বিবরণীতে কেরীর অভিধানের মূল্য ১০০ টাকা ছিল বলে যে জানানো হয়েছিল,৪২ তা সম্পূর্ণ দুই খণ্ডে প্রকাশিত বাংলা অভিধানের মূল্য বলেই মনে করা যায়, যদিও লঙ্ সম্পূর্ণ বা সংক্ষিপ্ত কোন্ সংস্করণের মূল্য দিয়েছেন, তা স্পষ্ট করে জানান নি।

কেরীর মৃত্যুর পর Gentleman's Magazine-এ প্রকাশিত প্রবন্ধের সূত্রে জানা যায়, কেরীর অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮২৭-৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। সজনীকান্ত এই উক্তি ভুল বলে নির্দেশ করেছেন।৪৩ প্রকৃতপক্ষে কেরীর বাংলা অভিধানের (বাংলা-ইংরেজি) একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ জন ক্লার্ক মার্শম্যান প্রকাশ করেছিলেন ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে। এই গ্রন্থখানির একখানি কপি কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারে আছে। আখ্যাপত্রটি এইরকমঃ VOL.I/Bengalee and English/ABRIDGED FROM/DR. CAREY'S QUARTO DICTIONARY./SERAMPORE/1827.

এই সংস্করণ সম্পর্কে জন ক্লার্ক মার্শম্যানও লিখেছিলেনঃ

......'this work was an abridgement of Dr. Carey's valuable Dictionary in three volumes Quarto.'৪৪ এই গ্রন্থখানি কেরীর অভিধানের প্রথম খণ্ড বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, কিন্তু এতে সংগৃহীত শব্দ কেরীর সম্পূর্ণ বাংলা অভিধান থেকেই নির্বাচন করা হয়েছে মাত্র। মূলের দুই কলমে ছাপা কোয়ার্টো আয়তন ও ২১৬০ পৃষ্ঠা সংক্ষিপ্ত সংস্করণে দুই কলমে ছাপা অক্টেভো আয়তনের ৫৩১ পৃষ্ঠায় সংকুচিত হয়েছে। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্রঃ 'A/DICTIONARY/THE BENGALI LANGUAGE/VOL. I/Bengalee and English/ABRIDGED FROM/DR. CAREY'S QUARTO DICTIO-

NARY/SECOND EDITION/SERAMPORE/ ...... /1840
সংক্ষিপ্ত সংস্করণের গ্রন্থপরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে মূল সংস্করণের অনুরূপ নয়; এখানে অন্ততঃ শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের অংশটি বর্জন করা হয়েছে। শব্দার্থ ও সংজ্ঞার্থ নির্ণয়েও মূলের ব্যাপ্তি খর্ব করা হয়েছে। মূল সংস্করণে সমস্তপদ-সংকলনের যে অহেতুক প্রাচুর্য ছিল, এখানে সংকলনখানিকে সেই ত্রুটি থেকে মুক্ত করার প্রয়াস আছে। কেরী তখন জীবিত ও কর্মক্ষম ছিলেন বলেই মনে করা যেতে পারে যে তিনি এই রূপান্তরিত পরিকল্পনা অনুমোদন করেছিলেন। সংক্ষিপ্ত হওয়ার দরুনই এই সংস্করণ যে ব্যবহারিব প্রয়োজন অনেকখানি মেটাতে পেরেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই, গ্রন্থখানির সংস্করণান্তরের প্রকাশই তার প্রমাণ। দ্বিতীয় সংস্করণের শব্দসংখ্যা কমবেশি ২৯,০০০।৪৫

সংক্ষেপিত সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে। এই খণ্ডখানি ইংরেজি-বাংলা অভিধান। জন্ ক্লার্ক মার্শম্যানই গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন, এবং এ-কাজে কেরী স্বয়ং যে তাঁকে অনেকখানি সহায়তা করেছিলেন, জন ক্লার্ক মার্শম্যান তার উল্লেখ করেছেন: 'In the present volume, the Editor has simply to acknowledge the valuable assistance he has received from Dr. Carey in the revision of the sheets as they passed through the press.'৪৬ এই উক্তিতে কেরীর সহায়তার সঠিক রূপ কি ছিল, তা বোঝা যায় না; তবে যেহেতু কেরী ইংরেজি-বাংলা অভিধানের কোন পরিকল্পনা নিজে তৈরী করেন নি, তার জন্যই এক্ষেত্রে শুধু প্রুফ সংশোধনের মধ্যেই যে তাঁর সহায়তা বদ্ধ ছিল না, তা অনুমান করা সম্ভব। বস্তুতঃ, এই ইংরেজি বাংলা অভিধানের পরিকল্পনা জন ক্লার্ক মার্শম্যানের; কেরীর বাংলা-ইংরেজি মূল অভিধানের মধ্য থেকেই সম্ভবতঃ তিনি এই খণ্ডের শব্দাদি সংগ্রহ করে থাকবেন; এবং যেহেতু এটি নূতন অভিধান সেই জন্য এই খণ্ডের প্রকাশে কোন এক অনিশ্চিত আভিধানিকের ভূমিকাতেই যে কেরী ক্লার্ক মার্শম্যানের সহায়তা করেছিলেন, তা সহজেই বলা যেতে পারে। এই খণ্ড সম্পর্কে সবচেয়ে জরুরী কথা এই যে, (১) কেরীর নামে প্রচারিত সংক্ষেপিত অভিধানের ইংরেজি-বাংলা খণ্ড নির্দিষ্টভাবে কেরীর সংকলন বলে উল্লেখ করা সম্ভব নয়; (২) কেরী কোন মূল ইংরেজি-বাংলা অভিধান রচনা করেন নি, কাজেই বর্তমান খণ্ডকে তাঁর অভিধানের সংক্ষেপিত রূপ বলে উল্লেখ করা ভ্রমাত্মক।৪৭ জন ক্লার্ক মার্শম্যানও 'all responsibility and imperfections of the work' তাঁর নিজের বলেই ঘোষণা করেছেন,

যা থেকে মনে হওয়া সম্ভব যে গ্রন্থখানি জন ক্লার্ক মার্শম্যানের পরিকল্পিত, এবং তিনিই সংকলনকর্তা ও প্রকাশক। তবে কেরীর সংক্ষেপিত বাংলা অভিধানের Vice-Versa একখানি রূপই সম্ভবতঃ তিনি প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন, কেরী তাতে অনুমোদন ও সহায়তার হস্ত প্রসারিত করেছিলেন মাত্র।

এই খণ্ডখানির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৩৯ খৃীষ্টাব্দে। তৃতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র এইরকমঃ 'A/DICTIONARY OF/THE BENGALEE LANGUAGE/VOL. II/English and Bengalee/ THIRD EDITION/SERAMPORE/1839'. ১৮২৮-এ প্রথম সংস্করণ, ১৮৩৯-এ তৃতীয় সংস্করণ; দ্বিতীয় সংস্করণ মধ্যবর্তী দশ বৎসর কালের কোন এক সময় প্রকাশিত হয়ে থাকবে, তার নির্দিষ্ট তারিখ গ্রন্থখানি না দেখার জন্য বলা সম্ভব নয়। ইংরেজি বাংলা অভিধানের তৃতীয় সংস্করণের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩২; এর মধ্যে ৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী 'Irregular Verbs'-এর একটি তালিকা আছে। এতে আনুমানিক কম বেশি ২৭,০০০ শব্দ সংকলিত।৪৮

মারাঠিঃ

শ্রীরামপুর মিশন পত্তন এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কেরীর অধ্যাপক-রূপে যোগদানের মধ্যে সময়ের ব্যবধান খুবই কম। কেরীর ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান প্রণয়নের পশ্চাতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তাঁর অধ্যাপনা বৃত্তি সক্রিয় প্রেরণাস্বরূপ ছিল। মারাঠা ভাষার অধ্যাপক ছিলেন বলেই মারাঠা ব্যাকরণ ও অভিধান প্রণয়নে তাঁর উদ্যম এক অতি নির্দিষ্টতা দ্বারা চালিত হয়েছিল, যেখানে ছাত্রদের তাৎক্ষণিক উপযোগিতার বোধটি উপস্থিত। কিন্তু পাশাপাশি একথাও সত্য যে বাইবেল অনুবাদের ব্যাপারেই বাংলার মত মারাঠা ভাষার অধিষ্ঠানভূমিটি নিরূপণ করার আগ্রহও তাঁর মধ্যে সূচিত হয়েছিল। তবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যে তাঁর ভাষাবিষয়ক অনুসন্ধানের উদ্যমকে গতি ও সুযোগ দান করেছিল, একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই।

১৮০৫ খৃীষ্টাব্দে কেরীর মারাঠা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়; এর বৎসরকাল পূর্বে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে মারাঠা ভাষা শিক্ষাক্রম চালু হয়ে থাকবে।৪৯ কিন্তু ১৮০৩ খৃীষ্টাব্দে দেখা যাচ্ছে বাইবেল অনুবাদ প্রসঙ্গে মারাঠি ভাষার মাধ্যম গ্রহণ করায় কেরী উৎসাহিত, শ্রীরামপুরে একজন মারাঠি পণ্ডিতের অবস্থানের কথাও এই সময় তিনি জানান।৫০ এবং ১৮০৪ খৃীষ্টাব্দের মধ্যেই কেরী মারাঠি ভাষায় সামান্য জ্ঞান অর্জন করেছিলেন

বলে মনে হয়। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন তাঁর মারাঠা ব্যাকরণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, তার কিছু দিনের মধ্যেই তিনি সার্টক্লিফকে জানাচ্ছেন যে তিনি ইতিমধ্যে "collected materials for a Mahratta dictionary".৫১ কাজেই ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের আগেই তিনি মারাঠা অভিধান সংকলনে মনোযোগী হয়েছিলেন বলে মনে করা যেতে পারে। ১৮০৪ পর্যন্ত এই প্রয়াসের সূচনাকালকে পিছিয়ে দিলে বোধহয় অন্যায় হয় না, এবং ৬/৭ বৎসরের পরিশ্রমে মারাঠা ভাষার অভিধানখানি তিনি সংকলন করেছিলেন বলে মনে হয়।

কেরীর মারাঠা অভিধান সংকলনে প্রধান সহায়ক ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মারাঠা ভাষার পণ্ডিত বৈদ্যনাথ। কিন্তু কোন মুদ্রিত মারাঠা গ্রন্থাদি থেকে তিনি প্রত্যক্ষ কোন সহায়তা পাননি। এই প্রসঙ্গে কেরী স্পষ্টতঃই উল্লেখ করেছেন: 'As no printed work of this kind existed till Dr. Drummond of Bombay, very lately, published his grammar and Glossary of Mahratta and Gujerattee, which however was not published till this work was nearly printed off, there was no possibility of the writer's availing himself of any collateral helps therein.'৫২ কেরী তাঁর অভিধানে দেবনাগরী হরফও ব্যবহার করেন নি। যদিও মারাঠা ব্যাকরণ রচনা কালে দেবনাগরী হরফ ব্যবহারের যৌক্তিকতা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন,৫৩ তথাপি ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠি নিউ টেস্টামেন্ট প্রকাশ থেকে কেরী মারাঠি প্রকাশনায় দেবনাগরী হরফ ব্যবহার প্রত্যাহার করেন, পরিবর্তে প্রকাশনায় মোড়ি হরফের যে ব্যবহার প্রচলন করেন, অভিধান প্রণয়নেও তারই অনুসরণ করেছেন।

কেরীর মারাঠা অভিধানের আখ্যাপত্র এইরকম: A/DICTIONARY/ OF THE/MAHRATTA LANGUAGE/BY W. CAREY, D. D./PROFESSOR OF THE SUNGSKRITA, MAHRATTA, AND BENGALEE/LANGUAGES IN THE COLLEGE OF FORT WILLIAM./SERAMPORE/1810.

আখ্যাপত্র ছাড়া মুখবন্ধ ৫ পৃষ্ঠা ও মূল শব্দ-সংগ্রহ ৬৫২; মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৫৮। অভিধানে কমবেশি ১৯০০০ শব্দ সংকলিত হয়েছে।৫৪ গ্রন্থপরিকল্পনা সম্পর্কে মুখবন্ধে কেরী দুটি সূত্র উত্থাপন করেছেন: (ক) মারাঠা শব্দের অর্থ যতখানি সংক্ষেপে সম্ভব তিনি জ্ঞাপন করেছেন, এবং সদৃশশব্দ চয়নে যে তিনি মনোযোগ দেন নি, তার কারণ তিনি একখানি সংক্ষিপ্ত অভিধানই প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন; (খ) শব্দের পদপ্রকরণ (Parts of speech) নির্ণয়ে তিনি যত্নবান হয়েছেন।৫৫ 'For the sake of conciseness' কথাটা এই অভিধান সংকলনে কেরী যে

কখনোই ভোলেন নি, গ্রন্থখানির প্রতিটি পৃষ্ঠাই তার প্রমাণ। বাংলা অভিধানের পাশাপাশি দেখলে স্পষ্টতঃই কেরীর দুই পরিকল্পনার ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়। মারাঠা অভিধানে কেরী শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে প্রয়াসী হন নি, কিন্তু পদ-প্রকরণ নির্দিষ্ট করেছেন। নিছক শব্দকোষ থেকে যে যে উপাদানের ব্যবহার শব্দ সংগ্রহমূলক গ্রন্থকে অভিধানের মর্যাদায় উন্নীত করে, কেরী তার কোনটিই এখানে পালন করেন নি, কেবল পদ-প্রকরণের উত্থাপন ছাড়া। এবং অন্ততঃ এই একটি উপাদানের উপস্থিতিজনিত গৌরবই কেরীর মারাঠা অভিধানকে নিছক শব্দ সংগ্রহ গ্রন্থমাত্রতা থেকে উত্তীর্ণ করেছে।

ভুটানী :

কেরী ভুটান ভাষার অভিধান সংকলন করেন নি, তথাপি ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত ভুটান ভাষার অভিধানের সঙ্গে তাঁর নামটি অনিবার্যভাবে যুক্ত হয়ে আছে। কেরীর অভিধান সংকলনের পরিচয় গ্রহণ কালে তাই ভুটান ভাষার অভিধানের প্রসঙ্গ উত্থাপনযোগ্য। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই তারিখে ডক্টর রাইল্যান্ডকে লেখা চিঠির সূত্রে জানা যায় যে চার্চ মিশনারী সোসাইটির Mr. Schroeter-এর ভুটান ভাষার একটি পাণ্ডুলিপির সংশোধন ও মুদ্রণের কাজে তিনি নিযুক্ত আছেন। এই পাণ্ডুলিপির উপাদান হলো ভোট বা তিব্বত ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান। তাঁর এই কাজ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি লিখছেন: 'The Grammar I must write from his materials; and the interpretations of the words in the dictionary being in the Italian language, I shall have to translate.'[৫৬] কিন্তু, প্রায় এক বৎসর পরে ডক্টর রাইল্যান্ডকে লেখা আরেকটি চিঠির সূত্রে বোঝা যায় যে তিনি তখনো ভুটান ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান রচনার কাজ শুরু করেন নি, তখনো তা বাসনার পর্যায়েই আছে মাত্র।[৫৭]

উপরোক্ত দুটি চিঠির সাক্ষ্য থেকে অন্ততঃ দুটি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়: (ক) 'Bhote or Thibet language' কথাটির মধ্যে ভুটান ভাষা সম্পর্কে কেরীর কোন নির্দিষ্ট ধারণার অভাবই প্রতীত হয়, নতুবা ভুটান ও তিব্বতী ভাষাকে এক ভাষা বলে তিনি কখনোই উল্লেখ করতে পারতেন না। (খ) কেরী নিজেই ভুটান ভাষার অভিধান ও ব্যাকরণের কাজ সম্পন্ন করবেন বলে স্থির করেছেন।

ক। ভুটান ভাষা সম্পর্কে কেরীর ধারণা কতখানি স্পষ্ট ছিল, তা নির্ণয় করা কঠিন। তবে কেরী নিজেই স্বীকার করেছেন যে তাঁর 'knowledge of

the Boutan language is too slight.'৫৮ এবং তাঁর এই স্বীকারোক্তি অকপট বলেই শুধু বিশ্বাসযোগ্য নয়, ঐতিহাসিক সাক্ষ্য দ্বারাও তা অংশতঃ সমর্থিত। কেরী ভুটান গিয়েছিলেন ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চে; আধুনিককালে বাংলা দেশের ডুয়ার্সপ্রান্ত বলে যাকে আমরা জানি, হিমালয়-এর পাদদেশে অবস্থিত দেবরাজার কর্তৃত্বাধীন ভুটানের সেই অংশে; এবং হিমালয়ের বুকে বিস্তৃত যে ভুটান রাজ্য, তার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় নি। বস্তুতঃ, ভুটান সম্পর্কে ভৌগোলিক জ্ঞানও তাঁর সম্পূর্ণ ছিল না। রাইল্যাণ্ডের যে জিজ্ঞাসা ছিল ভুটান ও তিব্বত একই দেশ কিনা, অথবা ফুলার যে মনে করতেন ভুটান তিব্বতের একটি সীমান্ত মাত্র, কিংবা ভুটানে কেরীর সহযাত্রী হয়েও টমাসের যে ধারণা ছিল ভুটান তিব্বতেরই একটি প্রদেশমাত্র, কেরী এইসব জিজ্ঞাসা বা ধারণার কোন সদুত্তর দিতে পারেন নি। কিন্তু কেরীর বক্তব্যটিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়; তিনি বলছেনঃ 'I have not found that the people of Bootan know the name of Thibet, nor can I say anything certain about it. Bootan is a very large country.'৫৯ কেরীর এই মন্তব্য থেকে ভুটান দেশ সম্পর্কে তাঁর অনিশ্চিত ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে বাকি থাকে না যে ভুটানকে একটি স্বতন্ত্র দেশ রূপে দেখবার প্রবণতা তাঁর মধ্যে উপস্থিত। বোধহয় তাঁর মধ্যে এইরকম একটা অগঠিত বোধ ছিল বলেই মাত্র কয়েকদিনের সফরেই স্বতন্ত্র ভাষা হিসাবে ভুটান ভাষা তিনি লক্ষ্য করতে প্রয়াস পেয়েছেন। ভুটানীদের একটি লেখ্য ভাষা আছে, সেই ভাষার বর্ণমালা কিছু কিছু ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও অনেকাংশে বাংলার মত, বাংলা প্রতিবর্গে পাঁচটি অক্ষরের স্থলে সেই ভাষায় চারটি অক্ষরেব স্থান,—ইত্যাদি কতগুলি প্রাথমিক ভাষা-কৌতূহল তিনি যে তৎক্ষণাৎ চরিতার্থ করতে পেরেছিলেন, তার পেছনে ভুটান ভাষার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাসকেই চিনে নেওয়া যায়। যেখানে কেরী ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক নির্দিষ্টতায় ভুটানের পরিচয় গ্রহণ করতে পারেন না, সেখানেও ভাষা-মনোযোগে তিনি তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পর্কিত ভাবনার পরোক্ষ পরিচয় প্রকাশ করতে পারেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য, কেরী তথাপি আপন ভাবনায় আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে পারেন নি; ভাষার ভিতর লক্ষণের সমর্থনেই একমাত্র তা সম্ভব হতে পারে। তাই তিনি ভুটান ভাষা শিক্ষার জন্য একজন ভুটিয়া মুন্সীর প্রয়োজন বোধ করেন।৬০ তিনি কোন ভুটিয়া মুন্সী কখনো রেখেছিলেন কিনা, তা স্পষ্ট করে জানা যায় না; এবং মনে হয়, ভুটান ভাষা শিক্ষায় তিনি কৌতূহলের গণ্ডী অতিক্রম করতে পারেন নি। সম্ভবতঃ এই জন্যেই ১৮২৬ সালেও তিনি ভুটান ও তিব্বত ভাষা

স্বতন্ত্র ভাষা কিনা তা ভাষাতাত্ত্বিকের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত থেকে সুনিশ্চিত-ভাবে নির্ণয় করতে পারেন নি।

খ। কেরী নিজেই ভুটান ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধানের কাজ সম্পন্ন করবেন বলে ভেবেছিলেন। ভুটান ভাষা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ সঞ্চারিত হওয়ার প্রায় পঁচিশ বছর পরে, প্রায় অপ্রত্যাশিতভাবেই তাঁর কাছে ভুটান ভাষা সম্পর্কে কাজের একটি সুযোগ এসে উপস্থিত হয়। কেরীর কাছে Mr. Schroeter-এর মৃত্যুর পর তাঁর ভুটান ভাষার ওপর একটি পাণ্ডুলিপি পরীক্ষার জন্য আসে।৬১ কেরী গ্রন্থখানি অনুমোদন করেন, সম্ভবতঃ প্রাচীন আগ্রহের অনুশাসনেই; হতে পারে ভাষাতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসার দাবিতেও অংশতঃ। অপরের রচনাকে অবলম্বন করে কেরী খুবই বহিরঙ্গভাবে ভুটান ভাষার চর্চা করলেন মাত্র। যদিও এই সুযোগ তিনি একাই ব্যবহার করবেন বলে মনে করেছিলেন, এবং যদিও গ্রন্থখানির মুখবন্ধে গ্রন্থের সম্পাদকরূপে নিজেকেই উপস্থিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন তিনি, তথাপি গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি কিন্তু অন্যতর সাক্ষ্য বহন করে। গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি এইঃ 'A/DICTIONARY/OF THE/Bhotanta, or Boutan Language/PRINTED FROM A MANUSCRIPT COPY/ MADE BY/THE LATE REV. FREDERIC CHRISTIAN GOTTHELF SCHROETER,/EDITED BY JOHN MARSHMAN./TO WHICH IS PREFIXED/A GRAMMAR/OF THE/BHOTANTA LANGUAGE./BY FREDERIC CHRISTIAN GOTTHELF SCHROETER./EDITED BY W. CAREY, D. D. F. L. S. F. G. S./SERAMPORE:/1826.' প্রকৃতপক্ষে কেরীই গ্রন্থখানির সম্পাদক; জন মার্শম্যানকে অভিধান অংশের সম্পাদক বলে উল্লেখ করা হলেও গ্রন্থখানি প্রকাশের সামগ্রিক পরিকল্পনা কেরী নির্দেশিত। গ্রন্থের মুখবন্ধও কেরীই রচনা করেছেন। জন মার্শম্যানের অংশ এই গ্রন্থ সম্পাদনায় কতটা ছিল, মুখবন্ধে কেরী তা নির্দেশ করে দিয়েছেনঃ 'The Dictionary was originally written in Italian; and has been partly translated into English by Mr. Marshman.'৬২ দেখা যাচ্ছে ইতালীয় ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদের যে কাজ একদা তিনি নিজেই করবেন বলে ভেবেছিলেন, তা তিনি সম্পূর্ণভাবে করতে পারেন নি; জন মার্শম্যান সে-কাজে একটি নির্দিষ্ট কিন্তু অসম্পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। অনুবাদের একটি অংশে নিযুক্ত থাকা ছাড়া জন মার্শম্যান সম্পাদনার বৃহত্তর ক্ষেত্রে কতটা নিযুক্ত ছিলেন বা আদৌ যুক্ত ছিলেন কিনা সে-সম্পর্কে সন্দেহ আছে; কেননা, অভিধান অংশে সম্পাদকের নির্দেশাদির কথা কেরীই উল্লেখ করেছেন। এই

জন্য Schroeter-এর ভুটান ভাষার অভিধান সাধারণভাবে কেরীর সম্পাদনা বলেই উল্লেখ করা সমীচীন বলে মনে হয়; আখ্যাপত্রে সম্পাদকরূপে জন মার্শম্যানের নাম থাকা সত্ত্বেও একথা বলা যেতে পারে।

ভুটান ভাষার অভিধানখানির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৭৫। অক্টোভো আকারে মুখোমুখি দুই কলমে মুদ্রিত। মোট শব্দ সংখ্যা কম বেশি ২৭০০০। সরকারী অর্থানুকূল্যে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছিল।

অন্যান্য :

কেরীর সংস্কৃত ও বহুভাষিক অভিধান প্রকাশিত হয়নি। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই মার্চ শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে যে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড হয়, তা-ই এই গ্রন্থ দুখানির প্রকাশিত না হওয়ার প্রত্যক্ষ কারণ। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ তারিখে রাইল্যাণ্ডের কাছে লেখা চিঠিতে কেরী জানিয়েছেন যে সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত ভাষাসমূহের যে অভিধানখানি তিনি দীর্ঘকাল পরিশ্রমে তৈরী করেছিলেন, তার সমস্তটাই আগুনে নষ্ট হয়ে গেছে।৬৩ এই অভিধানই বহুভাষিক শব্দকোষ। এর পাণ্ডুলিপির সামান্য কিছু অংশ আগুনের হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছে, এখন তা ঐতিহাসিক কৌতূহলের সামগ্রীরূপে শ্রীরামপুরে রক্ষিত আছে। কেরীর তেলুগু ব্যাকরণের পাণ্ডুলিপিও এই আগুনে পুড়ে গিয়েছিল, তবু পরে ঐ ব্যাকরণ তিনি আবার প্রস্তুত করেছিলেন; কিন্তু বহুভাষিক অভিধান যে পরিকল্পনায় ও শ্রমে তিনি প্রস্তুত করেছিলেন, তা আর কোনদিন সম্পূর্ণ হয়নি, অর্থাৎ ওই উদ্যমটি অতঃপর পরিত্যক্ত হয়েছিল। ফলে ভাষাতাত্ত্বিক রূপে কেরীর ঐশ্বর্যের পরিচয়বাহী এই উদ্যম এইখানেই অবসিত হয়।

বহুভাষিক অভিধান সংকলনের কাজ কেরী কবে থেকে শুরু করেছিলেন, তা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। তবে ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই ডিসেম্বরের রাইল্যাণ্ডকে লেখা চিঠি থেকে বোঝা যায় যে তিনি এই কাজে দীর্ঘদিন যাবত নিযুক্ত আছেন, এবং এই কাজ ঐ সময় পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়নি।৬৪ এই কাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও ঐ চিঠিতে কেরী উচ্চারিত; তিনি বলছেন যে তাঁরা যখন থাকবেন না, তখন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত বাইবেলের সংশোধনে যাতে পরবর্তীদের অসুবিধা না হয়, সেই কারণেই তিনি এই উদ্যোগের আয়োজন করেছেন। শ্রীরামপুরে ভারতীয় ভাষায় বাইবেল অনুবাদের কর্মযজ্ঞে সমবেত বিভিন্ন ভাষাভাষী পণ্ডিতদের ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তাঁরা পদাধিকার বলে বিভিন্ন ভাষার পণ্ডিতদের সহায়তা এই কাজে তিনি গ্রহণ করেছিলেন বলেও ঐ চিঠির সূত্রে বোঝা

যায়। বাইবেলের মূল ভাষা, অর্থাৎ গ্রীক ও হিব্রুর সঙ্গে মিলিয়ে পরবর্তীরা ভারতীয় ভাষার বাইবেলের সংশোধন যাতে যথাযোগ্য করতে পারেন সেই জন্য এই শব্দকোষে তিনি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার সঙ্গে গ্রীক ও হিব্রু শব্দও সংকলন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সদিচ্ছা ও পরিণামে কিছু ব্যবধান সম্ভবতঃ সব সময়েই থেকে যায়, এবং কেরীও এই শব্দ-কোষে গ্রীক ও হিব্রু শব্দ সংকলন করে যেতে পারেন নি। হতে পারে কাজের ব্যাপকতা উপলব্ধি করে ওই বাসনা তিনি পরিত্যাগ করে-ছিলেন। এই শব্দকোষে তিনি মোট তেরটি ভারতীয় ভাষার৬৫ শব্দ সংকলন করেছেন; ভাষাগুলি এইঃ সংস্কৃত, কাশ্মীর, জালন্ধর, মধ্যদেশ, পার্বতী, মিথিলা, বাঙ্গলা, উৎকল, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, গুর্জর, তৈলঙ্গ, দ্রাবিড়। শব্দকোষের লিপি-মাধ্যম রূপে বাংলা ভাষার লিপিকেই গ্রহণ করা হয়েছে।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের আগুনের ক্ষতির পরিমাণ ও প্রকৃতি ঐ বৎসরের মার্চ মাসের Monthly circular letter-এ বিস্তৃতভাবে নির্ণয় করা হয়েছে।৬৬ ঐ বিবরণ থেকে জানা যায় যে কেরীর সংস্কৃত অভিধানের পাণ্ডুলিপি আগুনে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু শ্রীরামপুরে কেরীর সংস্কৃত অভিধানের অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাঁচটি খণ্ডে এখনো রক্ষিত আছে।

সংস্কৃত অভিধান তিনি কবে সংকলন করতে শুরু করেছিলেন, বলা যায় না। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন রাইল্যাণ্ডের কাছে লেখা কেরীর চিঠির সূত্রে জানা যায় যে ঐ সময়ের কয়েক বৎসর পূর্বেই তিনি সংস্কৃত অভিধান সংকলনে মনোযোগী হয়েছিলেন।৬৭ সজনীকান্ত দাস মনে করেছেন যে ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের পরেই তিনি এই অভিধান রচনা করতে থাকেন।৬৮ কিন্তু ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুন ফুলারকে লেখা চিঠিতে কেরী জানিয়েছেন যে তখনও তাঁর সংস্কৃতজ্ঞান অতি সামান্য।৬৯ কাজেই অভিধান সংকলনের সচেতনতায় তিনি ঐ সময় অভিধান সংকলনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন বলে মনে হয় না। সংস্কৃত ব্যাকরণও তিনি রচনা করেছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সংস্কৃতের শিক্ষক নিযুক্ত হওয়ার পরই। অনুমান করা যায়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সংস্কৃত শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণের পরই সংস্কৃত ব্যাকরণের মত সংস্কৃত অভিধান সঙ্কলনে তিনি সচেতন পরিকল্পনায় অগ্রসর হয়ে থাকবেন। ১৭৯৫ থেকে সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষার্থী রূপে ভাষাশিক্ষার সহায়িকা রূপে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তিনি সময় থেকে সময়ে ভাষার শব্দ-সংগ্রহ করে থাকতে পারেন, ইতিহাসের দিক থেকে তা অনুসন্ধানযোগ্য, কিন্তু অভিধান রচনার সচেতন মনস্কতার ফসলরূপে তা লক্ষ্য করা সম্ভবতঃ ঠিক হবে না।

আগুনে থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত তাঁর সংস্কৃত অভিধানের পাণ্ডুলিপি কেরীর অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের পরিচয় বহন করে।

বাংলা অভিধান সমীক্ষা

শব্দ ঃ

আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকগণ বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারকে প্রধানতঃ তিনটি পর্যায়ে লক্ষ্য করে থাকেনঃ ১। বাংলা ভাষার নিজস্ব শব্দ; ২। সংস্কৃত উপাদান; ৩। বিদেশী উপাদান। শব্দের এই বিভাগীকরণে একটি মনস্তত্ত্ব খুব স্পষ্টঃ বাংলা ভাষার নিজস্ব শব্দই বাংলা ভাষার শব্দ, সংস্কৃত বা বিদেশী শব্দ বাংলা ভাষার শাব্দ-উপাদান মাত্র। এই সব উপাদান বাংলা ভাষায় যতই ব্যবহৃত হোক না কেন, বাংলা ভাষার নিজস্ব শব্দ অপেক্ষা কোন কোন রচনা-অংশে এই সব উপাদানের আনুপাতিক হার যতই বেশি হোক না কেন, এগুলি মূলতঃ বাংলা শব্দ নয়, গৃহীত শব্দ মাত্র। কিন্তু তথাপি একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে এই সব গৃহীত শব্দ বাংলা শব্দ রূপেই বাংলা ভাষায় চরিতার্থ।

বাংলা ভাষায় নিজস্ব উপাদান বলতে প্রাকৃতজ বা তদ্ভব শব্দকেই বোঝায়। যে সব সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে এসে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষায় নব রূপ গ্রহণ করেছে, সেই সব রূপান্তরিত শব্দকেই তদ্ভব শব্দ বলা হয়ে থাকে। প্রত্যক্ষভাবে প্রাকৃত থেকে জাত বলে এই সব শব্দ প্রাকৃত-জ, আবার অপ্রত্যক্ষভাবে সংস্কৃত থেকেই উদ্ভূত বলে তা তদ্ভব। বাংলা ভাষার নিজস্ব শব্দ বলতে যদিও তদ্ভব শব্দই বোঝায়, তথাপি আমাদের ভাষায় যে সব শব্দ সচরাচর ব্যবহৃত হয়, তার শতকরা প্রায় ৪৫ ভাগ তদ্ভব শব্দ নয়। এই ৪৫ ভাগ শব্দ সংস্কৃত শব্দ, ভাষাতাত্ত্বিক পরিভাষায় যাকে আমরা তৎসম শব্দ বলে থাকি। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বাংলা শব্দ ভাণ্ডারের একটি বিরাট অংশ তৎসম শব্দের অংশ, যাকে আমরা মৌলিক বাংলা শব্দ বলি না। বাংলা মৌলিক শব্দ *চাঁদ, চন্দ্র* নয়; বাংলা সাধিত শব্দের নিষ্পত্তি ওই *'চাঁদ'*-কে অবলম্বন করেই করতে হয়। বিভিন্ন বিদেশী আগন্তুক জাতির সংস্পর্শে এসে বাংলা ভাষা যুগে যুগে বিভিন্ন বিদেশী ভাষার শব্দও আত্মসাৎ করেছে দেখা যায়। তুর্কী আক্রমণের পর থেকে বাংলা দেশে রাজনৈতিক শক্তিরূপে মুসলমানদের অভ্যুদয় ঘটে, এবং মুসলমানী ভাষার অনেক শব্দ নানাভাবে বাংলা ভাষার শরীরে মিশে যেতে থাকে। মুসলমানী ভাষা বলতে আরবী-ফারসী বোঝায়। আরবী, এমন কি কিছু কিছু তুর্কী শব্দও

যে বাংলায় গৃহীত হয়েছে, বাংলা ভাষা তা পেয়েছে ফারসীর মাধ্যমে; ফলে, বাংলায় বিদেশী মুসলমানী শব্দকে, আরবী, তুর্কী, ফারসী যাই হোক না কেন, ফারসী শব্দ বলেই সচরাচর নিরূপণ করা হয়। এমনি পর্তুগীজ, দিনেমার শব্দও বাংলা ভাষায় পাওয়া যায়, অবশ্যই এই সব বৈদেশিক জাতি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্যোগে বাংলা দেশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বলেই তা সম্ভব হয়েছে; অনেক ইংরেজি শব্দও যে বাংলায় অবলীলাক্রমে ব্যবহৃত হয়, তার কারণও ঐ। এই সব বৈদেশিক শব্দ যে বাংলায় গৃহীত হয়েছে, তার স্বাভাবিকতা ব্যাখ্যা করার হয়তো প্রয়োজন আছে, অর্থাৎ দেখা দরকার এই সব বৈদেশিক শব্দ যখন বাংলায় ব্যবহৃত হচ্ছে, তখন বা তার আগে সেই বিশেষ দেশের সঙ্গে বাংলা দেশ রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক বা সাংস্কৃতিক সংস্পর্শে এসেছিল কিনা। ঐতিহাসিক দিক থেকে অভিধানে সংকলিত শব্দ অনুসন্ধান করতে গেলে, এই পরীক্ষা আবশ্যিক হয়ে ওঠে। কিন্তু কেরী যখন বাংলা অভিধান রচনা করেন, অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায়, তখন এই সব সংস্পর্শের সত্য এত পরিষ্কার ছিল যে, কেরীর শব্দ-পরীক্ষায় এই রীতি অনুসরণের প্রয়োজন আর গুরুতর বলে মনে হয় না। কেরী যদি প্রাচীন বাংলা থেকে শব্দের ব্যবহারমূলক দৃষ্টান্ত সংকলন করতেন, তাহলে কোন কোন সংশয়ের স্থলে এই পরীক্ষার প্রয়োজন হতো; কিন্তু সেই পথে তিনি অগ্রসর হন নি। কাজেই কেরীর অভিধানে সংকলিত বিদেশী শব্দ সম্পর্কে বিশেষ কোন জিজ্ঞাসার বিষয় থাকে না।

বলা বাহুল্য, তৎসম, তদ্ভব বা বিদেশী, এমন কি অর্ধ-তৎসম শব্দও কেরী নির্বিচারে গ্রহণ করেছিলেন। কেরীর অভিধানের সংকলিত শব্দের পরিচয় গ্রহণ করতে গেলে প্রথমেই তাঁর সংগ্রহের পরিধি ও বিচিত্রতা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কেরী যখন সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ সংকলন করেন, তখন তিনি তাকে বাংলা ভাষার গৃহীত শাব্দ-উপাদান রূপে গ্রহণ করেন না, বরং তাকে বাংলা ভাষার নিজস্ব শব্দ রূপেই নিরূপণ করে থাকেন। বৈজ্ঞানিক দিক থেকে কেরীর এই বিবেচনা অভ্রান্ত বলে কখনোই মনে হবে না সত্য, কিন্তু কেরীর শব্দ-বিবেচনা একটি নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতে না দেখলে ভুল আরও বেড়ে যেতে পারে।

অভিধানের Preface-এ কেরী বাংলা শব্দ ভান্ডার সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, প্রসঙ্গতঃ এখানে তা উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রথমেই বলেছেন যে, বাংলা ভাষা সম্পূর্ণভাবেই সংস্কৃত জাত। তারপর ভাষার শব্দভান্ড বিশ্লেষণ করে বলেছেনঃ ১। বাংলা ভাষার তিন-চতুর্থাংশ শব্দই বিশুদ্ধ

রূপে সংস্কৃত শব্দ; ২। অবশিষ্ট এক-চতুর্থাংশের মধ্যে সবচেয়ে বড় অংশ কিছু কিছু বিকৃত শব্দ (corrupt) এবং এই শব্দের মূল অনুসন্ধান করা খুবই সহজ; ৩। ওই এক চতুর্থাংশের অবশিষ্ট অংশের খানিকটায় আছে কিন্তু আরবী বা ফারসী শব্দ; ৪। অল্পবিস্তর বিকৃত পর্তুগীজ ও ইংরেজি শব্দ-ও ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে গৃহীত হয়েছে; ৫। কিছু কিছু শব্দ আছে যার মূল সম্পর্কে সংশয়হীন হওয়া কঠিন। কেরীর পর্যালোচনাকে যে এই পাঁচ ভাগে ভাগ করে দেখা হলো, আলোচনার সুবিধার্থে এই পাঁচকে মোট তিনটি স্তরে নির্দিষ্ট করে নেওয়া যেতে পারে। ৫নং বিভাগটি সাধারণভাবে অস্পষ্ট, যদিও মূল সম্পর্কে সংশয় আছে এমন উল্লিখিত শব্দেরও মূল সাধারণভাবে সংস্কৃত বা আরবীতে পাওয়া যেতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। এবং এই অস্পষ্টতার জন্যই এই বিভাগটি কেরীর অভিধানে গুরুতর নয়। ১নং বিভাগকে তাঁর শব্দ পর্যবেক্ষণের প্রথম স্তর বলা যেতে পারে। এখানে কেরী বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দের উপাদান সম্পর্কেই আলোকপাত করেছেন; এবং এই তৎসম শব্দকে বাংলা ভাষার শব্দ হিসাবে নিরূপণ করেছেন, উপাদান শব্দরূপে দেখেন নি! ২নং বিভাগটিকে দ্বিতীয় স্তর বলা যায়। বিকৃত শব্দ (corrupted) বলে এখানে কেরী যেসব শব্দকে নির্দেশিত করেছেন, তার মধ্যে অবশ্যই অস্পষ্টতা আছে: তবে বিকৃত অর্থে বিকৃত সংস্কৃত শব্দকেই যে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাংলায় ব্যবহৃত বিকৃত সংস্কৃত শব্দের দু-রকমের রূপ আছেঃ (ক) অর্ধ-তৎসম; (খ) তদ্ভব। তৎসম ও অর্ধ-তৎসম শব্দের মধ্যে রূপান্তরের মধ্যবর্তী কোন স্তর নেই অবশ্য, তবু তৎসম ও তদ্ভব শব্দের মধ্যে রূপান্তরের একটি অতিনিরূপিত স্তর আছে, যাকে আমরা প্রাকৃতের স্তর বলে জানি, এবং কেরীর পর্যালোচনায় মনে হয় তিনি এই মধ্যবর্তী প্রাকৃতের স্তর সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। এবং তিনি এইসব শব্দকে অসহায়ভাবেই বিকৃত সংস্কৃত বলে লক্ষ্য করেছেন। অথচ আমরা জানি, অর্ধ-তৎসমের মত তদ্ভব শব্দকে কখনোই বিকৃত সংস্কৃত বলা উচিত হবে না, কেননা প্রাকৃত স্তর বৈজ্ঞানিক ভাষাবিজ্ঞান সমর্থিত, তা স্বেচ্ছাচারী রূপান্তরের পরিচয়স্থল নয়। তবু কেরীর পক্ষে অসম্ভব ছিল তদ্ভব শব্দকে তদ্ভব রূপে লক্ষ্য করা, তখন পর্যন্ত বাংলা ভাষার আবির্ভাবের স্তর-পারম্পর্য বৈজ্ঞানিক এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস সুপরিচিত ছিল না এবং কেরী যেহেতু ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে অভিধান রচনায় নিবিষ্ট হননি, প্রধানতঃ সেই কারণেই তদ্ভব শব্দের প্রকৃতি নিরূপণে তাঁর অক্ষমতা শান্ত মার্জনায়

দেখা যেতে পারে। ৩নং ও ৪নং বিভাগ এক সঙ্গে তৃতীয় স্তর বলে উল্লেখ করা যায়; আরবী, ফারসী, পর্তুগীজ, ইংরেজি, যে ভাষার শব্দই হোক না কেন, সবই অভারতীয় বৈদেশিক শব্দ। কাজেই বিদেশী শব্দ রূপেই তা লক্ষণীয়। প্রসঙ্গতঃ লক্ষণীয় ভারতীয় অবাংলা প্রাদেশিক শব্দ, যাকে বর্তমানে 'বিদেশী শব্দ' বলেই দেখা হয়, কেরী সেইসব শব্দ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেন নি, এবং সংকলনেও তার প্রতি মনোযোগ দেখান নি।

কেরীর শব্দ-পর্যালোচনার এই সাধারণ পরিচয় গ্রহণ করার পর, তাঁর বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতটি লক্ষ্য করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, এই পরিপ্রেক্ষিতে না দেখলে কেরী সম্পর্কে কিছু কিছু ভুল করবার আশংকা থাকে। আমরা জানি, যেকোনও গৃহীত শব্দ ভাষা-প্রকাশের পরিধিকে ব্যাপ্ত করে ও ভাষা-প্রকাশকে সক্ষমতর করে তোলে। কিন্তু তাকে মূল ভাষার অনুগত বা মূল ভাষার অধীনস্থ থাকতে হয়, নতুবা ভাষার বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের প্রচলিত বাংলায় এইরকম বিপর্যয় ঘটেছিল বলে ফরস্টার অনুযোগ করেছেন; তাঁর প্রধান আপত্তি ছিল আরবী ফারসী উপাদানের প্রাধান্য সম্পর্কে। আরবী-ফারসী প্রাধান্যের হানিকর প্রভাব থেকে বাংলা ভাষাকে তিনি মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, এবং সংস্কৃতকে উপাদান মাত্র রূপে কখনোই লক্ষ্য করেন নি। বরং ভদ্রভাষায় সংস্কৃত উপাদান সম্পর্কে যখন তিনি মন্তব্য করেন, তখন তার প্রতি তাঁর পরোক্ষ সমর্থনই লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতকে বাংলা ভাষায় উপাদান মাত্র রূপে তিনি কখনোই দেখতে চাননি, বরং বিশুদ্ধ বাংলার পরিচয়েই তার অধিষ্ঠান ঘটাতে প্রয়াসী হয়েছেন। হতে পারে, 'বিশুদ্ধ' বাংলা সম্পর্কে তাঁর মনোযোগ নিবিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও 'বিশুদ্ধ' বাংলা বলতে ঠিক কি বোঝায়, তা তিনি নির্দিষ্ট করে তুলতে পারেন নি; পক্ষান্তরে, সংস্কৃতানুসন্ধান 'বিশুদ্ধ' বাংলা অনুসন্ধানের প্রায় সমার্থক রূপেই তাঁর সমর্থন পেয়েছিল। কেরী সম্পর্কেও এই সূত্র প্রযোজ্য। কেরীও 'বিশুদ্ধ' বাংলা অর্থে ভাষার সংস্কৃতমতিই বুঝেছিলেন, হয়তো তাঁর পূর্ববর্তীদের চেয়ে অধিক রক্ষণশীল ভাবেই। এবং অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় বাংলা শব্দ সম্পদ সম্পর্কে আলোচনায় তৎকালীন বাংলা ভাষা বিষয়ক এই মনস্তত্ত্বের স্বাভাবিকতা স্বীকার করে নেওয়া দরকার। এই মনস্তত্ত্বের প্রধান লক্ষণ হলোঃ সংস্কৃত ভাষা-সম্পদকে 'বিশুদ্ধ' বাংলার পরিচয়ে স্বীকৃতি দান। অপর লক্ষণঃ আরবী-ফারসী উপাদানকে উপাদান মাত্র রূপে লক্ষ্য করা।

বস্তুতঃ কেরীর সংস্কৃতমনস্কতা সম্পর্কে কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয়; সংস্কৃত তথা তৎসম শব্দাবলীর প্রতি তাঁর নিবিষ্ট মনোযোগের পরিচয় অভিধানের প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে। তৎসম শব্দ তাঁর অভিধানে অপরিমাণ, মৌলিক শব্দ ছাড়া যৌগিক শব্দ এত বেশি সংগ্রহ করা হয়েছে যে তাতে শব্দ সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়েছে। তৎসম শব্দের ক্ষেত্রেই যৌগিক শব্দ রচনার আগ্রহ তাঁর অধিক ছিল বলে মনে হয়। একটি উদাহরণ গ্রহণ করা যাক। তৎসম 'দন্ত' মৌলিক শব্দ, এই মৌলিক শব্দ-যোগে রচিত মোট ৫২টি যৌগিক শব্দের রূপ দেখানো হয়েছে, এর মধ্যে মাত্র দুটি শব্দ আছে যেখানে 'দন্ত'র সঙ্গে অন্য তৎসম শব্দ যোগে সাধিত যৌগিক শব্দ তৈরী হয় নি। তাহলে দাঁড়াচ্ছে, একটি মৌলিক তৎসম শব্দের সঙ্গে অন্য এক বা একাধিক তৎসম শব্দ যুক্ত হয়ে মোট ৫০টি সাধিত যৌগিক শব্দের রূপ কেরী দেখিয়েছেন। অথচ তৎসম 'দন্ত'র তদ্ভব রূপ 'দাঁত' এই মৌলিক বাংলা শব্দটি অবলম্বনে মোট মাত্র ১২টি সাধিত ও যৌগিক শব্দ-রূপ দেখানো হয়েছে, এর মধ্যে আবার একটি ক্ষেত্রে তৎসম যোগ আছে (দাঁতশূল)। এই দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায়, কেরীর সংগৃহীত শব্দ সংখ্যা যে অগণিত হয়ে উঠেছিল, তার কারণ সাধিত ও যৌগিক শব্দরূপের সংকলনে তিনি অত্যুৎসাহী ছিলেন; এবং এই ধরনের শব্দ সংগ্রহেও তৎ-সমবৃত্তিই অধিক পরিমাণে চর্চা করেছিলেন। তিনি দন্তশূল ও দাঁতশূল এবং দাঁতশূলো তিনই নিয়েছেন, কিন্তু 'দন্তবেদনা' সংগ্রহ করেই ক্ষান্ত থেকেছেন, 'দাঁত ব্যথা' সংকলন করেন নি। আবার যখন 'দাঁতশূল' তিনি সংগ্রহ করেন তখন 'দাঁতবিশিষ্ট' শব্দ সংযোজনে তাঁর আগ্রহ নেই, তিনি 'দন্ত-বিশিষ্ট' শব্দে সন্তুষ্ট। এমনি 'দন্ত হানি' 'দন্তহীন' 'দন্তযুক্ত' শব্দ আছে, অনুরূপ 'দাঁত' অবলম্বনে সাধিত শব্দ নেই। কিন্তু কেরীর কাছে তৎসম ও তদ্ভব রূপের কোন বিশেষ সমস্যা ছিল না, যেটা ছিল তা হলো ভাষার বিশুদ্ধিকরণের সমস্যা, এবং তৎসম শব্দকে এই দিক থেকেই বাংলা শব্দের বিশুদ্ধ রূপ হিসাবে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। ফলে তৎসম শব্দাবলীকে তিনি অহেতুক প্রাধান্য দিয়েছেন বললে হয়তো সুবিবেচনার পরিচয় দেওয়া হবে না; বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাঁর চৈতন্যের অনুশাসনই এর কারণ।

আর এতেও কোন সন্দেহ নেই যে তৎসম শব্দও বাংলা ভাষারই শব্দ; কিছু কিছু শব্দের তৎসম ও তদ্ভব রূপ একই সঙ্গে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আবার কিছু কিছু শব্দ আছে যার তৎসম রূপের ব্যবহার বাংলায় খুবই কম, বরং তার তদ্ভব রূপেই বাংলার অধিক মনোযোগ। যেমনঃ কঙ্কতিকা, কণ্টকিফল, কঙ্কুর, ঘর্ষ, সর্ষপ। এইসব তৎসম

শব্দের বদলে আমরা যথাক্রমে তদ্ভব কাঁকই, কাঁটাল,/কাঁঠাল, কুকুর, ঘষা, সরিষা/সর্ষ্যা শব্দ ব্যবহারেই অভ্যস্ত। কেরী তাঁর অভিধানে একই শব্দের তৎসম ও তদ্ভব দুই রূপই এইরকম ভাবে সংকলন করেছেন। আবার কিছু কিছু শব্দের তৎসম ও তদ্ভব দুই রূপই বাংলায় সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত অবলীলাক্রমে ব্যবহৃত হতে দেখি, এবং এইরকম শব্দসংখ্যা পরিমাণে খুবই বেশি। কেরী এইসব শব্দ প্রচুর পরিমাণেই আহরণ করেছিলেন। কেরীর সংগ্রহ থেকে এইরকম শব্দের কিছু কিছু উদাহরণ নির্বিচারে গ্রহণ করা যেতে পারেঃ কঙ্কর/কাঁকর; কজ্জল/কাজল; কার্য্য/কাজ; কল্য/কাইল; কণ্টক/কাঁটা; কর্ণ/কাণ; কর্ম্ম/কাম; কর্ম্মকার/কামার; কুম্ভকার/কুমার; কাষ্ঠ/কাঠ; গৃহ/ঘর; গাত্র/গা; গুচ্ছ/গোচা (গোছা); গৃহিনী/ঘরনী; ঘর্ম্ম/ঘাম; ঘৃত/ঘি; চর্ম্ম/চাম; চন্দ্র/চাঁদ; ছত্র/ছাতা, ছাতি; জেষ্ঠতাত/জেঠতত; কর্পট/কাপড়; ঘট/ঘড়া; খট্বা/খাট; তন্তুবায়/তাঁতী; দন্ত/দাঁত; সন্ধ্যা/সাঁঝ; সর্প/সাপ; হস্ত/হাত; ইত্যাদি। কেরীর এই সংগ্রহ রীতি দেখলে মনে হবে না যে তিনি আধুনিক অর্থে বিশুদ্ধ বাংলা থেকে সরে গিয়েছিলেন। বাংলা শব্দ ভাণ্ডারের সামগ্রিক পরিচয়ই তিনি অভিধানে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন বলে মনে হয়; যে ভাষাকে তিনি 'copious' বলে মনে করেন, এই সংগ্রহ পদ্ধতির মাধ্যমে ভাষার সেই সম্পন্নতার পরিচয়ই পক্ষান্তরে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দেখা যাবে, শুধু এইরকম বিচিত্র শব্দ নয়, এমন কি সাধারণ গুণবাচক বিশেষণ, সংখ্যাবাচক শব্দ, সর্বনাম, সাধারণ অব্যয় ইত্যাদি সংকলনেও তিনি এই পদ্ধতি, অর্থাৎ দুই রূপ শব্দ সংকলন রীতিই অনুসরণ করেছেন। যেমনঃ ভদ্র/ভাল; হরিদ্রা/হলদী, হলিদা; মিথ্যা/মিছা; মিষ্ট/মিঠা; ত্রয়োবিংশতি/তেইশ; এতৎ/এ; অপর/আর; উত/ও; ইত্যাদি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লক্ষণীয় তাঁর সর্বনাম শব্দ সংগ্রহরীতি। এখানে তিনি প্রায়ই তৎসম শব্দ সংকলন করেন নি, বাংলা সর্বনামই তিনি মুখ্যতঃ সংকলন করেছেন। যখন তিনি 'এতৎ' ও 'এ' দুইই সংকলন করেন, তখন মনে রাখা দরকার "এতদ" বাংলায় যথেষ্ট রূপেই প্রচলিত; 'অস্মদ্'-ও পুরাতন বাংলায় অপ্রচলিত শব্দ নয়। কিন্তু মুখ্যতঃ বাংলা সর্বনামই সংগ্রহ করেছেনঃ আমি, মুই, তুই, তুমি, আপন, কোন ইত্যাদি। এখানে অনুরূপ তৎসম সর্বনাম রূপের সন্ধানে তিনি বিশেষ আগ্রহ দেখান নি। সর্বনাম যে কোন ভাষার অন্তরঙ্গ পরিচয় অনুধাবনে বিশেষ সহায়ক, বা সর্বনাম ভাষার অন্তরঙ্গ পরিচয়টি উদ্ভাসিত করে; কেরী যে বাংলা সর্বনামের সংগ্রহে ভাষার বিশুদ্ধ রূপের নিকটবর্তী ছিলেন, এখানে তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য এইরকম দৃষ্টান্তও

পাওয়া যাবে, যেখানে তিনি তৎসম শব্দ সংকলন করেছেন, কিন্তু তদ্ভব রূপ উপেক্ষিত হয়েছে; যেমনঃ 'চক্ষু' গৃহীত, 'চোখ' অগৃহীত। বস্তুতঃ তৎসম ও তদ্ভব শব্দকে বাংলা ভাষাব নিজস্ব শব্দ বলে নিরূপণ করেছিলেন বলেই উভয়ের প্রকৃতিগত ব্যবধান সম্পর্কিত সচেতনতা তাঁর মধ্যে অনুপস্থিত ছিল। কিছু কিছু অনার্য ও অজ্ঞাতমূল শব্দ, যাকে সচরাচর দেশী শব্দ বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে, তা-ও কেরী সংগ্রহ করেছেন বাংলা শব্দ হিসাবেই; যেমনঃ চঙ্গ, চাঙ্গা, ঝুল, কাতলা, ঢাক, হাঁক, চাউল, খোজ ইত্যাদি। আবার অর্ধ-তৎসম শব্দও সমানজ্ঞানেই তাঁর সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যেমনঃ 'গিন্নী'।

আরবী-ফারসী কবলিত বাংলা ভাষাকে শুদ্ধ পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত করবার আগ্রহ ফরস্টারের মত কেরীর মধ্যেও প্রধান ছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু একথাও পাশাপাশি সত্য যে আভিধানিকের দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত থেকে শব্দ বিবেচনা শক্তির যথেষ্ট পরিচয়ই তিনি দিতে পেরেছেন। বাংলা শব্দভাণ্ডারে আরবী ফারসী উপাদান বিশুদ্ধিকরণের নামে তিনি বাতিল করেন নি, বরং ভাষা প্রকাশে বিদেশী উপাদানের কার্যকর ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা প্রখর ছিল বলেই মনে হয়। তাঁর এই সচেতনতা প্রমাণিত হয় বাংলা অভিধানে আরবী-ফারসী শব্দের সংস্থান ঘটানোয়। এমন কি, বাংলা ভাষার সংস্কৃতকরণে প্রধান প্রবক্তা হয়েও তিনি আরবী ফারসী শব্দ সংকলন মাত্র করেন নি, বিদেশী প্রত্যয়নিষ্পন্ন পদও সংকলন করেছিলেন। অভিধানের প্রথম খণ্ডের ৪৫-২৭৭ পৃষ্ঠা, মোট ২৩৩ পৃষ্ঠা ব্যাপী 'অ' আদ্যক্ষর যুক্ত বিপুল সংখ্যক শব্দমালায় কেরী অন্ততঃ ৬০টি আরবী ফারসী শব্দ সংকলন করেছেন। এর মধ্যে মৌলিক শব্দ, প্রত্যয়ান্ত সাধিত শব্দ, এমন কি উপসর্গযুক্ত মিশ্র শব্দও আছে। আর এই বিদেশী শব্দ সংকলনে লক্ষ্য করা যাবে যে কেরী প্রধানতঃ সেই সব শব্দ সংগ্রহেই প্রয়াসী হয়েছেন. যেসব শব্দ বাংলা ভাষার অভিব্যক্তিধারায় প্রায় অপরিহার্য শব্দের মর্যাদা লাভ করেছে। বস্তুতঃ জীবন্ত ভাষা অনুসন্ধান করতে গেলে এইরকম না করে উপায় থাকে না; এবং এই সাক্ষ্যের সূত্রে বলা যায়, কেরী প্রচলিত ভাষারূপ সম্পর্কে যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন, এবং আভিধানিকের দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁর চেতনা জাগ্রত ছিল।

অভিধান শব্দ সংগ্রহ গ্রন্থ; বিভিন্ন ধ্বনির নিষ্পত্তিতেই শব্দ গঠিত হয়, এবং শব্দ মাত্রেই অর্থ-ব্যঞ্জক। আভিধানিক প্রধানতঃ এই সব অর্থ-ব্যঞ্জক শব্দ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু ভাষায় অনেক সময় এমন কিছু শব্দ থাকে, যা ধ্বনি-নিষ্পন্ন, কিন্তু অর্থসূচক নয়। এই সব শব্দ মূলতঃ সার্থক

নয়, কিন্তু ভাষায় প্রযুক্ত হলে তার ধ্বনিগৌরবে সার্থক হয়ে ওঠে। এই-রকমের শব্দকে 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' বলা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ বলছেনঃ 'যে সকল শব্দ ধ্বনিব্যঞ্জক, কোন অর্থসূচক ধাতু হইতে যাহাদের উৎপত্তি নহে, তাহাদিগকে ধ্বন্যাত্মক নাম দেওয়া গেছে।'৭০ অপর একটি প্রবন্ধে তিনি অভিযোগ করেছেনঃ 'বাংলা ভাষায় বর্ণনাসূচক বিশেষ এক শ্রেণীর শব্দ......অভিধানের মধ্যে স্থান পায় নাই।'৭১ এবং এই সব শব্দ 'রীতি-মতো শব্দশ্রেণীতে ভর্তি হইয়া অভিধানকারের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হয় নাই।'৭২ বস্তুতঃ অর্থবাচক শব্দই যেহেতু ভাষায় সবচেয়ে বড় অংশ, অভিধানকারের কাছে সেইজন্য সেই সব শব্দেরই গুরুত্ব। অথচ ভাষার অভিব্যক্তির ধারা অনুসরণ করতে গেলে কেবল অর্থবাচক শব্দের নির্দিষ্ট-তার মধ্যে আবদ্ধ থাকলে চলে না, ভাষায় যে সব ধ্বনাত্মক শব্দ প্রচলিত আছে, তা-ও সমান মনোযোগে লক্ষ্য করা দরকার; নতুবা ভাষার শক্তি যেমন অনেকখানি অগোচরে থেকে যায়, তেমনি তার অন্তরঙ্গ প্রকৃতিও সম্পূর্ণ উন্মোচিত হয় না। অর্থের নির্দিষ্টতা নয়, অনির্দেশ্যতার ইঙ্গিতেও যে ভাষা অভিব্যক্ত হয়, এবং তা যে ভাষার একটি প্রকৃতিগত বিশিষ্টতারই লক্ষণ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাংলা ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের যে বহুল ব্যবহার দেখা যায় তা তার প্রকাশযোগ্যতা নানাভাবেই সমৃদ্ধ করেছে। কেরীর গৌরব এই যে তিনি বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বন্যাত্মক শব্দকে অভিধানের শব্দ বলে নিরূপণ করতে কখনো দ্বিধা করেন নি। তাঁর সংকলনে ধ্বন্যাত্মক শব্দ অসংখ্য; এই সব শব্দধ্বনির পরিচয় দিয়েছেন সর্বত্রই 'imitative sound' বলে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন ধ্বনি ঠিক কিসের দ্যোতক, তাও ব্যাখ্যা করতে প্রয়াস পেয়েছেন। 'ট্যাঁ ট্যাঁ' এমন একটি ধ্বনিপ্রধান শব্দ, যা শিশু কাঁদলে শোনা যায়, বা ঐ ধ্বনিশব্দের সাহায্যে শিশুর ক্রন্দনধ্বনি বোঝান হয়, 'টপ টপ' এমন একটি শব্দ যা বৃষ্টিপতনের ধ্বনির অনুকারক; 'টগ বগ' শব্দধ্বনি 'express the violent agitation of liquids when stirred in a vessel'; বা 'গজর গজর' হলো 'a person's murmuring or complaining to himself when provoked or disappointed.' এইরকম প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যার মাধ্যমে কেরী যে প্রচুর ধ্বন্যাত্মক শব্দ আহরণ করেছেন, তার মধ্যে কয়েকটি মাত্র, দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যায়ঃ খট্; খট্ খট্; ঘট্ ঘট্; ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্; ঝাঁ ঝাঁ; ঝিম্ ঝিম্; ঝির ঝির; ঝুপ ঝুপ; ঝুমুর ঝুমুর; টগ্ বগ্; টগর বগর; টক টক; টপ্ টপ্; টল টল; ট্যাঁ; চোঁ চোঁ; ঢাপুস ঢুপুস্; ঢুপ ঢাপ; ঢুল ঢুল; ইত্যাদি। অভিধানকারদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের

অভিযোগ অন্তত কেরীর সম্পর্কে যে প্রযোজ্য হয় না, এই শব্দগুলির আভিধানিক স্বীকৃতিই তার প্রমাণ। ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রচুর পরিমাণে আহরণ করে বাংলা ভাষার অন্তরঙ্গ প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি যে অবহিত ও জাগ্রত ছিলেন, তার পরিচয়ই প্রকাশ করেছেন। কেরীর এই প্রয়াস জাতির অভিব্যক্তিধারার একটি বিশেষত্বকেই অনুসরণ করেছে; এবং অভিধানকার যে তাঁর উদ্যমে একটি জাতির পরিচয়কে ফুটিয়ে তোলেন, অতঃপর আর সন্দেহ থাকে না কেরী সেই নির্ধারিত দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন।

তাছাড়া কিছু কিছু শব্দ তিনি সংগ্রহ করেছেন, যা প্রমাণ করে বিশেষ-ভাবে বাঙালি অভিব্যক্তির ধারায় তাঁর মনোযোগ যথেষ্টই ছিল। যখন তিনি বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণমালার প্রথম দুই অক্ষরকে একসঙ্গে একটি শব্দ-রূপ দান করেন, তখন বুঝতে কষ্ট হয় না যে অক্ষরজ্ঞান বা ন্যূনতম জ্ঞান অর্থে 'বাংলা ভাষায়' 'ক খ' ব্যবহারের অন্তরঙ্গরীতি সম্পর্কে তিনি অবহিত। যখন তিনি 'গণ্ডমূর্খ' বা, 'কানপাতল' শব্দ সংগ্রহ করেন, তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে বাংলা বাগধারা অনুসরণে তাঁর সক্ষমতা। বস্তুতঃ এই সবই জাতির ভাষা অভিব্যক্তির বিশিষ্টতার প্রকাশ বলে কেরীর শব্দ-নির্বাচন শক্তি বা দৃষ্টি সহজেই আমাদের আকর্ষণ করে। তিনি যে বাঙালি সাংসারিকতা বা রান্নাঘরের দিকেও দৃষ্টিপাত করেছিলেন, তার পরিচয়ও কম নেই। তিনি যখন 'ঘণ্ট' শব্দ সংকলন করেন, তখন অভি-ধানকার হিসাবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা সম্পর্কে যেমন আমরা অবগত হই, তেমনি জানি যে এইরকম শব্দ-সংগ্রহ একটি জাতির পরিচয়ের অন্ততঃ ছোট্ট একটি দিক-কেও উন্মোচিত করে দেয়। কেরীর শব্দ নির্বাচনের দিকে তাকালে ভাষার মাধ্যমে সমগ্র একটি জাতির পরিচয়কে প্রতিষ্ঠিত করবার আগ্রহ সহজেই আমাদের চোখে পড়ে; অভিধানকার হিসাবে কেরীর গৌরব ও কৃতিত্ব প্রধানতঃ এইখানে।

পরিশেষে শব্দবিন্যাস পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু উল্লেখ প্রয়োজন। প্রাচীন-কালের কোষ গ্রন্থের সঙ্গে আধুনিক অভিধানের মূল ব্যবধান যে পদ্ধতি-জনিত, তা আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। শব্দবিন্যাসে বর্ণানুক্রম অনুসরণ করাই আধুনিক অভিধানকারদের সচরাচর গৃহীত রীতি। কেরীও তাঁর অভিধানে এই রীতিই গ্রহণ করেছিলেন। বাংলা দেশে য়ুরোপীয় উৎসাহীদের অভিধানপ্রণয়ন প্রচেষ্টার যে একটি ধারা কেরীর অভিধান রচিত হবার আগেই গড়ে উঠেছিল, তার মুখ্য বিশেষত্ব এইখানে। আস্‌সুম্পসাউ থেকে হাণ্টার পর্যন্ত বাংলা বা অবাংলা অভিধানের

ইতিহাস অনুসরণ করলে তা বোঝা যায়। কাজেই কেরীর অভিধানের বিন্যাসপদ্ধতি বাংলা দেশের পক্ষেও তখন সদ্যতম কোন অভিজ্ঞতা নয়; কেরী এ বিষয়ে তাঁর পূর্বসূরীদেরই অনুসরণ করেছিলেন মাত্র। অন্য-ভাবে বলা যায়, কেরী সহ য়ুরোপীয় অভিধানকারদের গৃহীত শব্দবিন্যাস-পদ্ধতি পাশ্চাত্যরীতিরই অনুকারক; এবং বাংলা দেশের অভিধানে এই রীতিই যে অতঃপর জয়ী হয়েছে, তা প্রমাণ করে পাশ্চাত্য রীতিই অভিধান রচনায় আমাদের কাছে অধিকতর গ্রাহ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। একথা বললেও এখানে বোধহয় অন্যায় হবে না, যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে পাশ্চাত্য প্রভাবের সুনির্দিষ্ট মুদ্রণ অভিধান পরিকল্পনাতেই প্রথম ধরা পড়েছিল।

কেরী বর্ণানুক্রমিক শব্দ বিন্যাস করেছেন। 'বর্ণানুক্রমিক' কথাটি আজ আর নূতন করে ব্যাখ্যার দরকার হয় না। 'অ' থেকে 'হ' পর্যন্ত বর্ণমালার ক্রম অনুসরণ করেছেন তিনি; প্রথমে স্বরবর্ণ ও পরে ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকাটি যেন তাঁর সম্মুখেই ছিল। শুধু পূর্ণ বর্ণ নয়, 'ফলা' ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ক্রমরীতি তিনি উপেক্ষা করেন নি; অর্থাৎ কোন মূল বর্ণের সঙ্গে ক্রমানুযায়ী া, ি, ী, ু, ূ, ে, ৈ, ো, ৌ, ং, ঃ, ँ—ইত্যাদি স্বর ফলার যোগ অনুসরণ করার পর 'ব্যঞ্জন ফলা' যুক্ত বর্ণের স্থান নির্দিষ্ট করেছেন। কিন্তু (রেফ্) যুক্ত বর্ণ 'র'-র অব্যবহিত পরেই স্থান পেয়েছে, এবং '্র' (র-ফলা) ফলা এসেছে ব্যঞ্জন ফলা-যুক্ত বর্ণের ক্রম অনুযায়ী। একটা উদাহরণ গ্রহণ করা যাক্। কেরী 'অকরুণত্ব' শব্দের পরই 'অকর্কশ' শব্দ বিন্যস্ত করেছেন। তৃতীয় বর্ণ 'র্ক'-র পর তৃতীয় বর্ণ 'র্জ', যেমন 'অকর্জ', তারপর 'অকর্ণ' ইত্যাদি। মনে হয় উচ্চারণের অনুশাসনেই কেরী এই-রকম করেছেন, এবং উচ্চারণ অনুযায়ী শব্দ বিন্যাস নিষ্পত্তি করা বর্ণানু-ক্রমবিধি সমর্থিত। (রেফ্)-যুক্ত বর্ণের 'র'-র উচ্চারণ মূল বর্ণ উচ্চারণের আগে হয়; কিন্তু মূল কোন বর্ণের সঙ্গে '্র' (র-ফলা) যুক্ত হলে, সেই ফলার উচ্চারণ মূল বর্ণের উচ্চারণের পরে হয়। স্বর ফলা যুক্ত বর্ণের শেষে ব্যঞ্জন ফলা যুক্ত বর্ণের সংস্থান তিনি ঘটিয়েছেন। এবং কেরী র্ (রেফ)-ফলাযুক্ত বর্ণকে ব্যঞ্জন ফলা যুক্ত বর্ণ রূপেই মনে করেন।৭৩ উচ্চারণের অনুশাসন গ্রহণ না করলে কেরী র্ (রেফ) যুক্ত বর্ণের সংকুলান 'র'-ফলা যুক্ত বর্ণের এত আগে কখনোই করতেন না বলেই মনে হয়। এখন তিনি কিভাবে শব্দ সাজিয়েছেন তা দেখা যেতে পারে। আমরা 'অ' বর্ণ আদ্যক্ষরযুক্ত অংশ অবলম্বন করে তা অনুসরণ করছিঃ

১ ১২ ১২ ১২ ১১
অ। অই। অখা। অও। অং।

১২ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩
অক। ট। ঠ। ণ। থ। দ। ন। প. ব। ম। র। ল। ষ। স

১২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
অকা। কি। কী। কু কূ। কৃ। কে। কৈ। কো। কৌ

১২
অকৃত।

১২ ২ ২ ২ ২ ২
অক্র। ক্রি। ক্রী। ক্রু। ক্রে। ক্রো।

এইভাবেই অতঃপর ব্যঞ্জনযুক্ত বর্ণ স্থাপন করা হয়েছে ও প্রয়োজনানুযায়ী তার সঙ্গে স্বরফলা যুক্ত করার সময় ক্রমানুসরণ করেছেন। 'অক'-র পর 'অখ', তারপর 'অগ'—বিন্যাসপদ্ধতির ক্রম এই। কিন্তু 'ক্ষ' সম্পর্কে লক্ষণীয় যে কেরী 'অক্ষ' ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকানুসারে সংস্থাপন করেন নি; 'অক'-র পর এবং 'অখ'-র আগে 'অক্ষ' স্থাপন করা হয়েছে। এখানেও উচ্চারণের অনুশাসনই কার্যকর হয়েছে; ক্+ষ্=ক্ষ, এই নিষ্পত্তি অনুসারে 'ক্ষ'-কে 'ক'-র যুক্তবর্ণ রূপেই কেরী লক্ষ্য করতে চেয়েছেন বলে মনে হয়। বলা বাহুল্য, কেরীর এই পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপেই বৈজ্ঞানিক, এবং আধুনিককাল পর্যন্ত অভিধানের শব্দবিন্যাসে এই ধারা অনুসৃত।

অর্থ:

প্রত্যেক শব্দেরই একটি অর্থ আছে, আবার অন্যতর কোন শব্দের সঙ্গে তার অর্থ সাদৃশ্যও আছে। অভিধানে সচরাচর শব্দার্থ প্রকাশকে গুরুতর ভূমিকা দান করা হয়, অবশ্য সদৃশ-শব্দের অর্থের সঙ্গে যোগাযোগ লক্ষ্য করাও আভিধানিকের কৃত্যের মধ্যেই পড়ে।৭৪ কলিঙ্‌উড্‌ শব্দের অর্থ-নিষ্পত্তি আভিধানিকের দায়িত্বরূপে উল্লেখ করার পর বলেন যে, কতগুলি শব্দের সাহায্যেই যেহেতু আভিধানিক অর্থ-নিষ্পত্তি করে থাকেন, সেই জন্য সমার্থক শব্দ-সন্ধান বা সমার্থক শব্দপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই তা তাঁর সাধ্য হয়।৭৫

প্রকৃতপক্ষে শব্দের অর্থ-নিষ্পত্তি খুবই দুরূহ বিষয়। হতে পারে স্মরণাতীত কোন সময়ে একটি শব্দের একটি মাত্র অর্থই ছিল, কিন্তু তা

আমাদের অভিজ্ঞতার সীমার বাইরে। বরং আমরা জানি যে সংস্কৃতে, বা গ্রীক-ল্যাটিনের মত অনাধুনিক অপ্রচলিত ভাষাতেও এমন প্রচুর শব্দ আছে. যার অর্থ একাধিক, কখনো কখনো বা বহুতর। আধুনিককালে ভাষার শব্দ সম্পর্কে তো কথাই নেই। আধুনিক কোন ভাষার একই শব্দ এত বিচিত্র অর্থে ব্যবহৃত হয় যে তা বিস্ময়কর। এই 'ব্যবহৃত' শব্দটিই বিশেষ জরুরি। শব্দের বিচিত্র প্রয়োগই অর্থ-বিচিত্রতার কারক। সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নূতন বিষয় মানুষের আয়ত্ত হয়, এবং এই নতুন বিষয় প্রকাশ করবার জন্য নূতন শব্দ তৈরী হয়; আবার মানুষের অভিব্যক্তির ধারাও পরিবর্তিত হয় বলে ভাষা প্রকাশে নবীনতা প্রতিশ্রুত হয়। একদিকে নূতন শব্দ তৈরী করা, অপরদিকে পরিচিত শব্দকেই নূতন অভিব্যক্তির সংলগ্ন করে নেওয়া বা নূতনভাবে ব্যবহার করা,—এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই দেখা যায় একটি শব্দ বহুতর অর্থ সামর্থ্যে আত্মপ্রকাশ করে।

কিন্তু এই অর্থ-প্রকাশ শব্দের বিশিষ্ট প্রয়োগের ওপরই নির্ভরশীল। অনেক সময় আমরা দেখি যে একই শব্দ বিচিত্র ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে, অথচ তা যে বিভিন্ন ও বিচিত্র অর্থায়োজনেই প্রযুক্ত হচ্ছে, সে সম্পর্কে অভ্যস্ত চেতনা সব সময় সতর্ক থাকে না। এই যে একই শব্দের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ, তা কতগুলি নির্দিষ্ট অবস্থার দাবিতেই সম্ভব হয়। 'অকার্য্য' শব্দটিকে নির্দিষ্ট যে অর্থে আমরা দেখতে অভ্যস্ত, তা হলোঃ কার্য্যের অনুপযুক্ত। কেরীও অকার্য্য অর্থে বলতে চেয়েছেন (অ। কার্য্য), useless বা unfit to be done এবং 'অকার্য্য' শব্দকে useless অর্থে তিনি দেখেছেন মোট ১২টি ক্ষেত্রে,—শব্দের মূল অর্থ প্রকাশে ও ১১ বার এই শব্দ সহযোগে নিষ্পন্ন যৌগিক শব্দের ক্ষেত্রে (compound word)। কিন্তু দেখা যাবে, এই শব্দ সহযোগে নিষ্পন্ন যৌগিক শব্দের অন্ততঃ আরও ৫৭টি ক্ষেত্রে, তিনি 'অকার্য্য' শব্দের অর্থ নিরূপণ করেছেন। unlawful বা an improper action, অসিদ্ধ বা অনুচিত কার্য্য অর্থে 'অকার্য্য' শব্দের ব্যবহারকে তিনি বিশেষ গুরুতর ভাবেই দেখেছিলেন বলে মনে হয়। যেমন 'অকার্য্যদ্যোগ'—'a zealous effort to commit improper or unlawful action'। এমন কি, যেখানে অকার্য্যচিন্তা-কে তিনি 'the contriving of useless schemes' অর্থে ব্যাখ্যা করেন সেখানেও তিনি 'the contriving of evils' অর্থেও শব্দটিকে লক্ষ্য না করে পারেন নি। বস্তুতঃ 'unfit to be done' বা কার্য্যের অনুপযুক্ত অর্থে যে শব্দের অর্থ নির্দিষ্টতা প্রতীত হয়, তাকে evil, unlawful, improper action রূপে তিনি লক্ষ্য করছেন কিসের সমর্থনে? এই যে অর্থের পরিধি ব্যাপ্ত

হওয়া, ভাষার আন্তর লক্ষণে অবশ্যই তার যোগ আছে, কিন্তু তা সাধ্য হতে পারে শব্দের ব্যবহার বিশিষ্টতার ফলেই। তাহলে একথাই মানতে হয়, কেরী বাংলায় অকার্য্য শব্দের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু বাক্যে অকার্য্য শব্দ বিভিন্ন অর্থে কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা যতক্ষণ পর্যন্ত না বিশিষ্টার্থক প্রয়োগে দেখানো হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত শব্দের সেই অর্থ প্রতিষ্ঠিত হয় না। unlawful বা improper action অর্থে অকার্য্য শব্দের নিষ্পন্ন অর্থ যদি নিছক অর্থ হিসাবে গ্রহণযোগ্যও বিবেচনা করা হয়, তখনও অকার্য্য চিন্তা-র তিনি যে অন্যতম অর্থ করেছেন 'the building of castles in the air' তা কখনোই প্রয়োগ দৃষ্টান্তের অভাবে সহজ স্বীকৃতির অংশীভূত হয় না। এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাও গ্রাহ্য যে ঐ অর্থে ঐ শব্দের ব্যবহার থাকতেও পারে। এইরকম ক্ষেত্রে শব্দার্থ সহায়িকা রূপেই দৃষ্টান্ত ব্যবহার আবশ্যকীয় বিষয় হয়ে ওঠে। শব্দের নির্দিষ্ট নিষ্পন্ন অর্থই দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণযোগ্য; অন্যতর অর্থ দৃষ্টান্ত যোগে লক্ষ্য না করা হলে ভুল না হয়েও বিভ্রান্তিকর হতে পারে। অবশ্য কেরী তাঁর অভিধানে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন নি;৭৬ তার কতগুলি বিশ্বাসযোগ্য কারণও ছিল। অথচ তিনি, জনসনের অভিধানের অভিজ্ঞতার কথা না তুলেও বলা যায়, অভিধান প্রণয়নে ডক্টর হাণ্টারের অভিধানের ঋণ স্বীকার করেছেন। তাঁর হিন্দুস্থানী-ইংরেজী অভিধানে হাণ্টারের পক্ষেও সম্ভব ছিল না অনায়াসে অবলীলাক্রমে প্রতিটি শব্দের প্রতিটি অর্থ দৃষ্টান্ত সহযোগে ব্যাখ্যা করা, কিন্তু হাণ্টারের অভিধান থেকে অন্ততঃ এই অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় যে, কোন শব্দের বিভিন্ন অর্থের মধ্যে যখন কোন একটি অর্থ পাওয়া যায় যা অন্যান্য অর্থের নিকটবর্তী নয় এবং যা খুবই বিশিষ্ট, তখনই তিনি সেই বিশিষ্ট অর্থে শব্দের সাহিত্যিক প্রয়োগ দৃষ্টান্ত মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। উদাহরণঃ হিন্দুস্থানী bunana (বনানা) শব্দ। এর অর্থ to do, to make, to prepare থেকে to mock পর্যন্ত হতে পারে; কিন্তু স্পষ্টতঃই প্রথম তিনটি অর্থের সঙ্গে to mock-কে কোন সামান্য সাদৃশ্যেও মেলানো যায় না। হাণ্টারের রীতি অনুযায়ীঃ ওই বিশিষ্ট অর্থে শব্দের সাহিত্যিক প্রয়োগ লক্ষ্য করা; এক্ষেত্রে Jan Tupish-এর একটি শ্লোক উদ্ধার করে তা দেখানো হয়েছে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে কেরী বহু শব্দেরই বহুতর অর্থ ইংরেজিতে নির্দেশ করেছেন; সব অর্থই যে ইংরেজি পারিভাষিক শব্দে ধারণ করা হয়েছে এমন নয়, ভাষা শিক্ষার্থী শব্দের অর্থ অনুধাবনে যাতে উপকৃত হয়, অনেক সময়েই তিনি সেদিকে লক্ষ্য রেখেছেন; যেমন 'ব্যবসা'র অর্থ যেমন তিনি

'trade' বলেছেন; তেমনি, 'the following of a profession or occupation' বলে অর্থকে একদিকে বিস্তারিত, ও অপরদিকে ব্যাখ্যা করবার প্রয়াস পেয়েছেন। আবার, একই শব্দের বিভিন্ন অর্থের দিকেও প্রায়ই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 'ভেক' যে শুধু 'a frog' নয়, প্রয়োগ বিশিষ্টতায় তা যে 'a disguise', 'a false appearance'-এর অর্থও ধারণ করে, তা তাঁর লক্ষ্য এড়ায় নি; 'রতি' যে শুধু coition নয়, তা যে একই সঙ্গে স্বর্ণকারের একটি মাপ, তা যে, 'a small quantity', 'little'-ও বটে, তিনি তা সহজেই নিরূপণ করতে পেরেছেন। বস্তুতঃ, শব্দ মুখ্য অর্থ ছাড়াও যে কতগুলি ব্যবহারিক অর্থে ভাষায় নিজের অধিকারকে বিস্তৃত করে থাকে, যা অনুসন্ধান করা যে কোন আভিধানিকের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে, কেরী তা প্রায়শঃই যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদন করেছেন। কিন্তু এমন দৃষ্টান্তও অপ্রতুল নয়, যেখানে কেরী শব্দকে মুখ্য অর্থই মাত্র লক্ষ্য করেছেন; প্রয়োগ বিশিষ্টতায় বা ব্যবহার ঐতিহ্যে তার অর্থের যে পরিধি-বিস্তার ঘটে, তা তিনি অনেক সময়েই লক্ষ্য করেন নি। যেমনঃ 'বঁধু' শব্দ। 'বঁধু' কেরীর নিষ্পত্তি অনুযায়ী 'a relation', 'friend'. বন্ধু শব্দজাত শব্দ বলে মুখ্য-অর্থেই কেরী এই অর্থনিষ্পত্তি করেছেন। কিন্তু মধ্য-যুগে বৈষ্ণব কবিতামালায় 'বঁধু'৭৭ শব্দের এমন একটি প্রয়োগ-ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দী সেই সাহিত্যিক ঐতিহ্যসূত্রেই 'বঁধু' শব্দের মধ্যে যে প্রেম-সম্পর্কের অতিরিক্ত এক আবেগ সঞ্চারিত, সেই অর্থানুভূতি লাভ করেছিল। কিন্তু কেরী এইরকম, অনেকগুলি ক্ষেত্রেই আবার শব্দার্থ নিষ্পত্তিতে যথেষ্ট মনোযোগের পরিচয় দিতে পারেন নি।

অভিধানে অর্থ-নিষ্পত্তির আরেকটি ধারা আছে, যেখানে আভিধানিককে সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করতে হয়। সচরাচর শব্দের মুখ্য অর্থ থেকেই অন্যতর বিচিত্র অর্থে তার পরিধি বিস্তৃত হয়, কিন্তু কিছু কিছু শব্দ থাকে যার অর্থ বৈচিত্র্য নয়, সেই শব্দের মধ্যে যে একটি অর্থ পরিমণ্ডল বিশিষ্টভাবে গড়ে ওঠে, তার ব্যাখ্যা করা দরকার। কিছু কিছু শব্দ যে প্রত্যেক ভাষায় থাকে, যার সঙ্গে কোন না কোন রকমের allusiveness থাকে, যা শুধু মুখ্য অর্থ নিরূপণে সুস্পষ্ট হয় না, সে অভিজ্ঞতা প্রায় আমাদের প্রত্যেকেরই আছে। যেমন 'সংস্কৃত' শব্দ। মুখ্য অর্থে বা ব্যুৎপত্তিগত ও অনেকাংশে ব্যবহারিক অর্থে সংস্কৃত বলতে বোঝায় 'perfected'. কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা অবশ্যই এই অর্থ নিষ্পত্তিতে পরিতৃপ্ত হয় না। সংস্কৃত ভারতবর্ষীয় চেতনায় তার অতিরিক্ত কিছু;—একটা ভাষা, সচরাচর যাকে আমরা দেবভাষা বলে থাকি,

ও যার সঙ্গে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার উত্তরাধিকার-সম্বন্ধ নিরূপিত। কাজেই দেখা যায় 'সংস্কৃত' শব্দের অর্থ নিষ্পত্তি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হয়ে ওঠে। 'অভ্যুদয়' শব্দ থেকে যে 'আভ্যুদয়িক' শব্দের উৎপত্তি, ব্যুৎপত্তিগত অর্থে তার অর্থ-সম্পূর্ণতা প্রতিশ্রুত হয় না, হিন্দু শাস্ত্রাচরণে একটি আনুষ্ঠানিকরূপে না দেখলে শব্দটির পরিচয়গত অসম্পূর্ণতা থাকতে বাধ্য। এইরকম কতকগুলি শব্দ আছে যাকে ব্যাখ্যা করে না দেখালে অর্থ পরিচয় কখনোই অভ্রান্ত হয় না। সচরাচর এইসব ক্ষেত্রগুলিকে অভিধানে সংজ্ঞার্থ নিরূপণের ক্ষেত্র বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

এইরকম ক্ষেত্রে কেরী প্রায়শঃই বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। একটি শব্দের অস্পষ্টতাহীন পরিষ্কার ব্যাখ্যার মাধ্যমে তার বিশিষ্টার্থ নিরূপণ করা বিশেষ দুঃসাধ্য কাজ, তথাপি যে কেরী সংজ্ঞার্থ নিরূপণে সাধারণভাবে সফল হতে পেরেছেন, তা তাঁর অধিকার ও সক্ষমতারই পরিচায়ক। আভ্যুদয়িক-এর সংজ্ঞার্থ তিনি এইভাবে নিরূপণ করেছেনঃ 'the name of a particular Shraddha or offering to departed ancestors, made on special occasions as the weaning of a child, a marriage, or the like'. 'আত্মা'র অর্থ শুধু spirit, the soul নয়, তার অন্য পরিচয় self : 'It is the opinion of the Vedantic philosophers that there is but one real substance, viz., spirit, which being variously modified forms all the different productions in the world. Matter with which spirit is associated in its different modifications being esteemed as a thing of no value in forming an estimate of the individual, true knowledge consists in discriminating spirit ; consequently, according to them the true idea of self is that of one's own identity with this one spirit, hence this word signifies self.' এমনি, 'তন্ত্র' শুধু 'a thread', 'the string of a musical instrument', বা, 'a weaver's loom' নয়, তার অন্যতর পরিচয়ও আছেঃ 'A class of books held sacred by the Hindoos which teach peculiar and mystical formulas and rites for the worship of the gods or the attainment of super human power. A branch of Veda which teaches mystical ceremonies or incantations, a charm considered as producing medical effects.'

উপরোক্ত তিনটি ক্ষেত্রে সংজ্ঞার্থ নিরূপণে কেরীর যোগ্যতার কিছু কিছু পরিমাপ করা সম্ভব। 'আভ্যুদয়িক'-এর সংজ্ঞার্থক নিরূপণে কেরী যে প্রায় সফল আভিধানিকের দায়িত্ব পালন করেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই;

এখানে অত্যল্প পরিসরে একটি আনুষ্ঠানিক রূপে আভ্যুদয়িক যে জাতীয় পরিচয়ে চিহ্নিত, খুবই সুস্পষ্টতার সঙ্গে তিনি তার পরিচয় দিতে পেরেছেন। কিন্তু 'আত্মা'র ব্যাখ্যায় তিনি যে আভিধানিকের মাত্রা রক্ষা করতে পেরেছেন, তা মনে হয় না। অভিধানে শব্দ ব্যাখ্যার মাপ কতটুকু হবে, তা আভিধানিকেরই বিবেচনার বিষয় বটে, কিন্তু বিশ্বকোষ (Encyclopaedia) জাতীয় গ্রন্থের শব্দ ব্যাখ্যা ও অভিধানের শব্দ ব্যাখ্যার মধ্যে মাপ ও মাত্রার যে ব্যবধান আছেই, তা-ও অস্বীকার করার উপায় নেই। কেরীর 'আত্মা' শব্দের ব্যাখ্যা মনে হয়, বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থের ব্যাখ্যার মত আয়তন ও বিস্তার লাভ করেছে। আবার 'তন্ত্র' শব্দের ব্যাখ্যার মধ্যে সুস্পষ্টতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। 'peculiar and mystical formulas' বলে কেরী তন্ত্রের পরিচয়কে আদৌ স্পষ্ট করতে পারেন নি; 'peculiar' শব্দটি এতই অনির্দিষ্ট যে তাদ্বারা নির্দিষ্টতা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। অথচ 'আগ্রহায়ণ' শব্দের ব্যাখ্যায় যখন তিনি বলেন, 'the name of Hindoo month containing part of November and part of December. It begins when the sun enters Scorpio. Formerly this was reckoned the first month of the year.' তখন সংজ্ঞার্থের সুস্পষ্টতা যেমন প্রতিশ্রুত, তেমনি ব্যাখ্যার পরিমাপ ও মাত্রাও যে সুরক্ষিত, তা বোঝা যায়। এইরকম সফল সংজ্ঞার্থ নিরূপণের পরিচয় কেরীর অভিধানে অসংখ্য, এমন কি, ব্যাকরণ পরিভাষা 'আত্মনেপদ' জাতীয় শব্দ ব্যাখ্যায়ও সংক্ষিপ্ততা ও স্পষ্টতায় শব্দের প্রায় সামগ্রিক পরিচয় উদ্ঘাটিত করবার প্রয়াস তাঁর প্রশংসনীয়। কিন্তু সংজ্ঞার্থ নিরূপণে তিনি যে কখনো কখনো প্রায় ব্যর্থ, তার পরিচয়ও পাশাপাশি লক্ষ্য করা যাবে। তিনি যখন 'বঙ্গ দেশ' 'the country of Bengal' লেখেন, তখন তার অর্থগত দিকটিই মাত্র প্রকাশ পায়, কিন্তু তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা উপেক্ষিত হওয়ায়, আভিধানিক কেরীর ভূমিকা এখানে আহত। এইরকম ক্ষেত্রে ভৌগোলিক পরিচয় উল্লেখ করা আবশ্যিক; এই জাতীয় পরিচয়ে কেরীর অভিজ্ঞতা অন্যতর ক্ষেত্রে অনেক সময়ই প্রকাশিত, তবু কেন যে তিনি এই দায়িত্ব এখানে উপেক্ষা করলেন, তা বোঝা যায় না। আবার 'বাঙ্গলা', 'বাঙ্গালা', 'বাঙ্গালী' শব্দ তিনটির ব্যাখ্যায় যথাক্রমে একই কথা বলেছেন; যেমন, 'Bengalee, pertaining to Bengal;' 'belonging to Bengal, Bengalee;' 'belonging to Bengal, Bengalee'. এবং বলাবাহুল্য, এই শব্দ-ব্যাখ্যা খুবই ত্রুটিপূর্ণ কেননা প্রতিটি ব্যাখ্যা অস্পষ্টতা ভারাক্রান্ত। আমরা কোন ব্যাখ্যা থেকেই বুঝতে পারি না কোন

শব্দ জাতি বা ভাষাকে সমর্থন করছে। 'Bengalee' শব্দ জাতি এবং ভাষা দুই অর্থেই কেরী ইতিপূর্বে প্রয়োগ করেছেন, ফলে জাতি বা ভাষাকে সুনির্দিষ্টভাবে এখানে লক্ষ্য করা হয়নি বলেই 'Bengalee' শব্দের মাধ্যমে অভিধানকার তাঁর দায়িত্ব পালনে নিষ্ফল হয়েছেন। কিন্তু পাশাপাশি এমন দৃষ্টান্তও আছে যেখানে তিনি দায়িত্বপালনে যথেষ্ট মনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন, যেমন, 'কটক' শব্দের অন্যান্য অর্থের সঙ্গে তিনি লিখতে ভোলেন নি, 'also in Geography, the name of the part of Ootkula or Oorissa, the name of a city in Oorissa.' এখানে 'the name of a city' অংশটি স্পষ্টতাদ্যোতক। বাংলা অভিধানে 'কটক' শব্দের ব্যাখ্যা ঠিক যতটা হলে চলে, এখানে স্পষ্টতার সঙ্গে তাই করা হয়েছে; কিন্তু 'গৌড়' বোঝাতে কেরীর পর্যালোচনায় ভৌগোলিক ব্যাখ্যা স্পষ্টভাবে নির্ণীত হলেও, বাংলা ভাষার অভিধানে, 'গৌড়' যে জাতীয় সংস্কৃতির দিক থেকে একটি মুখ্য প্রসঙ্গ, তা উপেক্ষিত হওয়া উচিত হয়নি বলেই মনে হয়। অথবা 'গৌড়ীয়' বলতে 'belonging to the province of Gour' এতই অস্পষ্টতাদুষ্ট যে সঙ্গে সঙ্গে শব্দের অর্থ নিষ্পত্তিতে কোথাও যে ত্রুটি থেকে গেছে, তা বোঝা যায়। বস্তুতঃ সংজ্ঞার্থ নির্ণয়ে কেরী অনেক সময়ই একধরনের অনিশ্চয়তা বোধের পরিচয় রেখে গেছেন, বিবেচনা সর্বত্র প্রয়োজনভিত্তিক হয়নি বলেই এইরকম হয়েছে।

তথাপি শব্দের সংজ্ঞার্থ নিরূপণের ক্ষেত্রটিতে কেরীর আত্মপ্রকাশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোন কোন শব্দ তার ব্যুৎপত্তিগত শব্দার্থ, বিশিষ্টার্থ ইত্যাদি অতিক্রম করে দেশ, জাতি, সমাজ, ধর্ম ও সাহিত্য সংস্কৃতির সত্যকে এমনভাবে ধারণ করে থাকে যে, সেই পরিমণ্ডলটি অব্যাখ্যাত থাকলে তার অর্থ পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। এইরকম শব্দচিন্তায় কেরী যে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন, তাঁর অভিধানের সর্বত্রই তার সাক্ষ্য আছে। এই মনস্কতার ফলে কেরীর অভিধান বাঙালি সংস্কৃতির পরিচয়টিকে সহজেই ধারণ করতে পেয়েছে বলে মনে হয়। তিনি যেমন 'টপ্পা' বা 'তরজা' ব্যাখ্যায় প্রয়াসী, তেমনি হিন্দু দেবদেবীর পূজোয় যে 'টাট' ব্যবহৃত হয়, তার প্রতিও মনোযোগী। এমনকি 'জন্মস্থ' শব্দ যে ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের একটি পরিভাষা, তিনি তা-ও চিহ্নিত করতে ভোলেন নি। একটি অভিধানে শব্দার্থ পরিচয়ের মধ্য দিয়ে সেই ভাষাভাষীর সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটটি উন্মোচিত করা সৎ অভিধানকারের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে; কেরী অভিধানকার হিসাবে সেই যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন, এবং এর মধ্য দিয়ে বাংলা-পথিক কেরীর পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বানান ঃ

'It must be confessed, that their writing is shockingly incorrect, and the mis-spelling of words is often so glaring, as to make it almost impossible to determine what word the writer intended to use."৭৮ বাংলা বানানের ত্রুটি ও বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে কেরী যে বিশেষভাবেই সচেতন ছিলেন, উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি তারই সমর্থন বহন করে। প্রকৃতপক্ষে বানান সম্পর্কে এমন কি মধ্যযুগীয় বাঙালি লেখকরাও বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না।৭৯ বাংলা বানানের বিভ্রান্তি সম্পর্কে হ্যালহেডও মন্তব্য করেছেন।৮০ ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর অভিধানের ভূমিকা লিখতে গিয়ে ফরস্টার লক্ষ্য করছেন ঃ "....being current over an extensive country, and amongst an illiterate people, almost every word has been, and continues in one district or other, to be variously spelt, and not unfrequently is so disguised, as to render it difficult to recognize it, when met in its genuine form in the Songskrit. In such cases, I have not scrupled to adopt the Songskrit Orthography."৮১

দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই বাংলা বানানে সংস্কৃতের প্রভাব পড়েছিল, মধ্য বাংলাতেও সেই প্রভাব খুব হ্রাস পায়নি। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বাংলা বানানের ক্ষেত্রে সংস্কৃতানুসরণ এক দীর্ঘকালীন ঐতিহ্য, তথাপি অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত পুঁথিকার ও লিপিকারদের মধ্যে সবসময় এ-বিষয়ে সচেতনতা ছিল না। এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় পাশ্চাত্য উৎসাহীদের উদ্‌যোগে বাংলা বানান সম্পর্কে সম্ভবতঃ প্রথম একটি বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা জাগে, এবং তাঁরা তাঁদের বাংলা ভাষা বিষয়ক বিবেচনা থেকেই বানানে সংস্কৃতানুসরণ যথোচিত বলে মনে করেন। এই কাজে কেরী উদ্যোগীর ভূমিকা নিয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু কেরীর পূর্বেই হ্যালহেড ও ফরস্টার এই বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন, এবং ইতিহাসক্রমে অভিধান-রচয়িতা বলেই প্রধানতঃ ফরস্টারকে স্মরণ করা এখানে প্রায় আবশ্যিক হয়ে ওঠে। বানান সম্পর্কে কেরী তাঁর গৃহীত রীতি বিষয়ে কোন স্পষ্ট মন্তব্য করেন নি,৮২ ফরস্টার করেছেন। কেরীর অভিধান দৃষ্টে স্বভাবতঃই বোঝা যাবে বাংলা বানানে তিনি ফরস্টার কথিত সংস্কৃতানুসরণই করতে চেয়েছেন।

সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত বানানে লেখাই সমীচীন, কিন্তু সব বাংলা শব্দ তৎসম শব্দ নয়। তদ্ভব শব্দের বানান সংস্কৃতানুযায়ী হওয়ার কোন কারণ নেই, কেননা এইসব শব্দ সাক্ষাৎ প্রাকৃত জাত। 'কার্য্য' তৎসম শব্দ

রূপে এই সংস্কৃত বানানেই লেখা হবে, কিন্তু বাংলা তদ্ভব 'কাজ' এসেছে অব্যবহিত 'কজ্জ' থেকে; কাজেই বাংলা বানানে 'কাজ'-ই শুদ্ধ, সংস্কৃতানুযায়ী 'কায' লেখা হলে তাকে বিশুদ্ধ বলা উচিত হবে না। কেরী তাঁর অভিধানে তদ্ভব শব্দ সাধারণভাবে এই রীতিতেই লিখতে চেয়েছেন, যেমনঃ সংস্কৃত 'চর্ব্বণ' থেকে বাংলা 'চাবান' লিখতে তিনি মূর্ধণ্য 'ণ'-র বদলে 'ন'-ই প্রয়োগ করেছেন; কার্য্য > 'কাজ' লিখতেও বর্গীয় 'জ'-ই ব্যবহৃত। কিন্তু কখনো কখনো তিনি যে এই স্বাভাবিকতার সীমা ও অনুশাসন লঙ্ঘন করেছেন, তার দৃষ্টান্তও খুব কম নয়। সংস্কৃত 'রাজ্ঞী' থেকে বাংলা 'রানী'। কিন্তু কেরী সংস্কৃত নিষ্পত্তি অনুযায়ী বাংলা বানান স্থির করবার প্রয়াস পেয়েছেন, তিনি মূর্ধণ্য 'ণ'-ই রাখলেন। তাঁর হাতে হলোঃ রাজ্ঞী > রাণী; কিম্বা, কর্ণ > কাণ। এর মধ্যে বানান রীতি নিষ্পত্তিতে কেরীর সংস্কৃতমনস্কতার প্রাধান্যই প্রমাণিত হয়।

আবার বানান নিষ্পত্তিতে জাতির উচ্চারণরীতির প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। বাংলা উচ্চারণে, আমরা ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছি, কতগুলি বর্ণের মধ্যে উচ্চারণ বিভেদ প্রায় অনুপস্থিত। উ, ঊ, ই, ঈ, ব, ৰ, জ, য, ন, ণ; শ, ষ, স ইত্যাদি। কেরী সাধারণভাবে উচ্চারণরীতি অনুযায়ী এইসব বর্ণযুক্ত শব্দের বানানের নিষ্পত্তি করতে চাননি। আস্‌সুম্পসাঁওর রোমান লিপ্যন্তরেও উচ্চারণরীতি অনুযায়ী শব্দের বানান নিষ্পত্তি পরিচয় আছে, কিন্তু কেরী উচ্চারণরীতি অনুযায়ী যে বাংলা বানানের নিষ্পত্তি করেন নি, তার কারণ অবশ্যই বাংলা বানানকে একটি নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক রূপ দান করবার ইচ্ছা, যা সংস্কৃত-মনস্কতা প্রভাবিত। প্রধানতঃ ব্যুৎপত্তির দিকে লক্ষ্য রেখেই এইরকম করতে তিনি পেরেছিলেন। তাই যদিও 'জ' ও 'য'-র উচ্চারণে বাংলায় কোন ভেদ নেই, তথাপি ব্যুৎপত্তির কথা মনে রেখেই তিনি 'যে', 'যত', 'যিনি', 'যাওয়া' ইত্যাদি বানানকে সুনির্দিষ্ট করে তোলেন; অথচ বাংলায় 'জে', 'জত', 'জিনি' 'জাওয়া' এইরকম উচ্চারণেই আমরা অভ্যস্ত। কেরী বর্গীয় ব ও অন্তস্থ 'ব'-র উচ্চারণে বিভিন্নতা নেই বলে স্বীকার করেও বানান নিষ্পত্তিতে অন্তস্থ 'ব'-র অধিকার নিরূপিত করেছেন। আমাদের লিখনে অন্তস্থ 'ব'র কোন ভূমিকা নেই, উচ্চারণশুদ্ধির দাবিতেই তিনি একাজ করেছেন বলে মনে হয়। 'V' বা 'W'-র উচ্চারণকে নির্দিষ্ট করতে গিয়ে তিনি বাংলা বানানে নূতন আয়োজন করলেনঃ 'ব'-র ত্রিকোণের অভ্যন্তরে একটি বিন্দু স্থাপন করে নূতন লিপির পরিচয় দিলেন। কেরীর এই প্রবর্তনা পরবর্তীকালে গ্রাহ্য হয়নি।

শব্দের বানান নিষ্পত্তিতে, 'ওয়া' যোগে প্রধানতঃ ক্রিয়াবাচক শব্দ রচনার রীতি কেরীও গ্রহণ করেছিলেন। যেমন যাওয়া, চাওয়া, দেওয়া ইত্যাদি।৮৩ ফরস্টার অভিধানকাররূপে এ বিষয়ে তাঁর পূর্বসূরী ছিলেন। কিন্তু এইরকম নিষ্পত্তিতেও সব সময় যে একটি নির্দিষ্টতা প্রতিশ্রুত হতে পেরেছে, তা কখনো মনে হয় না। কেরী পুরনো 'ওআ' যুক্ত শব্দ-বানানও রক্ষা করতে প্রয়াস পেয়েছেন, যেমনঃ পাওআ, সাঁজোআ।৮৪ এইরকম কতগুলি ক্ষেত্রে বাংলা বানান যে অনেক সময়েই নির্দিষ্ট হয়ে ওঠে নি বলে সুনীতিকুমার অভিযোগ করেছেন, কেরীর অভিধান সূত্রে সেই ধারণাই প্রত্যয়িত হয়। আবার 'য়'-র ব্যবহারে কেরী যে অনেক সময় সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন, তার উদাহরণও আছে। যেমন 'য়ার', 'য়ারকী'। য়=ই+অ, এই শব্দধ্বনির অনুশাসনেই তিনি 'ইয়ার'-কে 'য়ার' লিখেছেন বলে মনে হয়, কিন্তু ফার্সী শব্দের উচ্চারণে 'ইয়া'র ক্ষেত্রে যে সংক্ষিপ্ত বল প্রয়োজন, হতে পারে সেদিকে মনস্ক ছিলেন বলেই ই+অ-র মাধ্যমে ধ্বনিকে বিবৃত হতে দিতে তিনি চাননি এবং 'য়',—এই একটি বর্ণের সহায়তায় মূল উচ্চারণের ঈপ্সিত ফললাভ করতে চেয়েছিলেন।

বানান নিষ্পত্তিতে কেরী সাধারণভাবে ব্যুৎপত্তির অনুশাসনই অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছেন, সর্বত্র সফল হননি, একথাও সত্য, এবং জাতির উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য যে বানানের ক্ষেত্রে তিনি নির্দেশরূপে গ্রহণ করেন নি, এই তথ্যও উপস্থিত আছে। তবে কেরী যে সাধারণভাবে একটি নির্দিষ্ট-রূপে বানানকে উপস্থিত দেখতে চেয়েছিলেন, বা বানানকে নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছিলেন, তাঁর সেই উদ্যমের কৃতিত্ব কোন দিক থেকেই অগ্রাহ্য হবে না। সুনীতিকুমারের একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারেঃ "when the modern literary style was established for prose (and when printing was introduced), a rigid adherence to the correct orthography for Sanskrit words naturally came in, and brought in a needed uniformity for *tatsama* words, in the place of chaos which reigned before."৮৫

কেরী অ-তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে বানান নিষ্পত্তিতে কতখানি সার্থক সে-সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে; কিন্তু তৎসম শব্দের (বাংলা ভাষার ৭৫ ভাগ যার অংশ বলে তিনি মনে করতেন) বানানকে মধ্যযুগীয় মনোযোগ-হীন অনির্দিষ্টতার হাত থেকে মুক্ত করবার প্রয়াসে যে তিনি অনেকখানি সফল হয়েছেন, তাঁর অভিধানই তার সাক্ষ্য বহন করছে।

উচ্চারণ ঃ

কেরী তাঁর অভিধানে শব্দের উচ্চারণ নির্দেশ করেন নি। অথচ সৎ অভিধানকার উচ্চারণ নির্দেশের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন না। যে কোন অভিধানকারের পক্ষেই সম্ভবতঃ শব্দের উচ্চারণ নির্দেশে পরিপূর্ণ সফলতা অর্জন করা কঠিন, তাঁরা শুধুই সামান্য কিছু লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। তথাপি যত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই হোক, অভিধানকার উচ্চারণবিধির ওপর কিছু না কিছু আলোকপাত করেই থাকেন। প্রতি শব্দের ক্ষেত্রে উচ্চারণ নির্দেশের রীতি যখন অভিধানকার অনুসরণ করেন না, তখনও দেখা যায় অভিধানের ভূমিকাংশে এই সম্পর্কে কিছু বক্তব্য লেখক উপস্থিত করেন। যেমনঃ ফরস্টারের অভিধান। কেরীর অব্যবহিত পূর্ববর্তী এই অভিধানে উচ্চারণবিধি সম্পর্কে আলোকপাত করবার সীমাবদ্ধ প্রয়াস আছে, যা লক্ষণ হিসাবে বিশেষ প্রশংসনীয়।৮৬ বর্ণমালার উচ্চারণ নির্দেশ করলেই শব্দের উচ্চারণ নিষ্পত্তি হয় না; ফরস্টার কখনো কখনো যুক্তাক্ষরের উচ্চারণ শব্দ সহযোগে ব্যাখ্যা করে যখন তার বিশিষ্টতা লক্ষ্য করেন তখন তাতে অভিধানের ক্ষেত্রে উপযোগীরীতিরই তিনি নিকটবর্তী হতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়। 'স্মরণ' শব্দ বাঙালি কখনোই মৌলিকভাবে উচ্চারণ করে না; যদি-ও ফরস্টার যখন বাঙালির এই উচ্চারণরীতিকে সমর্থন করেন না, তখনো বাংলা অভিধান বলেই বাঙালির উচ্চারণ রীতিকে উপেক্ষা করতে পারেন নি; লিখেছেনঃ বাঙালিরা 'স্‌মরণ' (smoran) উচ্চারণ করে shworon (স্বরন) বা shoron (সর'ন)। এমনি, 'হ্রাস' শব্দ; 'হ+র'-র বাঙালি উচ্চারণে 'হ'-র স্থান পূর্বে নয়, 'র'-র পরে অবস্থান সূত্রেই তার উচ্চারণের নিষ্পত্তি হয়; যেমনঃ 'হ্রাস' (hrash) = রাহ্‌স্‌ (rhash)। কাজেই যুক্তবর্ণ-উচ্চারণ ব্যাখ্যা অভিধানের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে, বলা যায়। এই রীতি আংশিকতা দুষ্ট হলেও, বিশেষ উপযোগী। অথবা, মুখবন্ধে ফরস্টার খুবই সংক্ষিপ্তভাবে উচ্চারণ সম্পর্কে যে 'General Rules' উল্লেখ করেছেন, বাঙালি উচ্চারণ অনুসরণে তার গুরুত্ব অনেকখানি।

ফরস্টার অনুসৃত এই রীতি বাংলা অভিধানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, বাংলা বানানের সংগে বাঙালি উচ্চারণ রীতির অনেক সময়েই কোন সাম্য নেই। বাংলা বানান উচ্চারণের দিক থেকে সাধারণভাবে প্রতারক। এর কারণও সম্ভবতঃ বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার, যেখানে তৎসম শব্দের ভাগ অনেকখানি। তদ্ভব শব্দের বানান সব সময় খাঁটি উচ্চারণ নির্দেশক, এমন কথা যদিও জোর করে বলা যাবে না, তথাপি ঐ জাতীয় শব্দের

বানানের বিকৃতিতে অনেক সময়েই উচ্চারণ ধরা পড়ে। কিন্তু তৎসম শব্দের বানানে বাংলা উচ্চারণধর্ম উপেক্ষিত। মনোয়েল দা আস্‌সুম্পসাউ'র ব্যাকরণ-শব্দকোষের রোমান লিপ্যন্তর অনুসরণ করে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে হয় যে, তৎসম শব্দের উচ্চারণ বাংলার অনেকক্ষেত্রেই বিপর্যস্ত যদিও বাংলা বানানে তা প্রকাশিত নয়।৮৭ ফরস্টার অনেক সময়েই তৎসম শব্দের বাংলা উচ্চারণ সমর্থন করেন নি, তবু বাংলা উচ্চারণ উপেক্ষাও করেন নি। কেরী বাংলা শব্দের, বিশেষতঃ তৎসম শব্দের বানান ও বাংলা উচ্চারণের মধ্যে যে বিভেদটি আছে, তার প্রতি মনস্ক হন নি।

অবশ্য অন্যতম ক্ষেত্রেও উচ্চারণ নির্দেশে তিনি কোন ভূমিকা নেন নি। একমাত্র বর্ণ পরিচয়ের স্তম্ভে ইংরেজি শব্দের সাদৃশ্যে বর্ণের উচ্চারণ দেখাবার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু বর্ণের উচ্চারণ নির্দেশে অভিধানের অন্যতম আবশ্যিক ধর্ম—শব্দের উচ্চারণ নিষ্পত্তি—প্রতিষ্ঠিত হয় না। অভিধানের মুখবন্ধেও বাংলা উচ্চারণ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেন নি। একটি মাত্র ক্ষেত্রে, বাংলা একটি বিশেষ বর্ণ 'ব' সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করেছেন মাত্র।৮৮ তাও বাংলা বর্ণলিপির ত্রুটি ব্যাখ্যা করতে গিয়েই প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করেছেন। 'v' বা 'w' ও 'b'-র মধ্যে বাঙালিরা উচ্চারণে বা লিপিতে কোন প্রভেদ করে না—কেরী যখন এই কথা 'ব' বর্ণ পরিচয় দিতে গিয়ে অভিধানে বলেন, তখন বোঝা যায় অভিধানে বাঙালি উচ্চারণ সম্পর্কেই তিনি কোন মন্তব্য করছেন। আর একবার, এই পরিচয় দিতে গিয়েই 'শ'-র স্তম্ভে তিনি জানিয়েছেন: 'The natives of Bengal, however, make no distinction in the pronunciation of the three sibilants.' শ, ষ, স-র মধ্যে বাঙালি উচ্চারণ যে কোন বিভিন্নতা রাখে না, তা স্বভাবতই তিনি লক্ষ্য করেছিলেন।

এবং সমস্তটাই লক্ষ্য করার অতিরিক্ত কিছু নয়। বাংলায় অন্তস্থ 'ব'-র কোন উচ্চারণ ও সাধারণভাবে কোন ব্যবহার নেই বলে অন্তস্থ 'ব' পর্যায়ে কোন শব্দ সংকলন করেন নি আলাদাভাবে সত্য, কিন্তু বর্গীয় 'ব' পর্যায়ের শব্দে অন্তস্থ 'ব'-র উচ্চারণ নির্দিষ্ট করবার প্রয়াস পেয়েছেন স্বতন্ত্র লিপি উদ্ভাবনার মাধ্যমে। ই, ঈ, উ, ঊ, ন, ণ-র উচ্চারণ ভেদ বাংলায় যে খুব নির্দিষ্ট নয়, তাও তিনি লক্ষ্য করতে চান নি। এ সবই প্রমাণ করে, বাংলা উচ্চারণে তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না; তিনি সংস্কৃত প্রভাবিত বানান ও উচ্চারণের মধ্যে সমতা চেয়েছিলেন। 'কাজ' শব্দ সংকলন কালে তিনি মন্তব্য করেছেন: 'According to the etymology, this word ought to be written কার্য, but as that word has

another meaning, corrupt spelling is here retained'. এই মন্তব্যে স্পষ্টতঃই বোঝা যায় 'জ' ও 'য'-র মধ্যে বাঙালি উচ্চারণের কোন বিভিন্নতা সাধারণভাবে রক্ষা না করলেও, তিনি তা রক্ষা করবার পক্ষপাতী, এবং 'য'-র স্থলে 'জ' লেখা corrupt spelling-এর নিদর্শন অর্থে ভ্রান্ত উচ্চারণের দৃষ্টান্তও বটে। এই সব থেকে উচ্চারণ সম্পর্কে কেরীর মনোভাব ধরা পড়ে, তিনি বানান সংস্কার করেছিলেন সংস্কৃতের অনুশাসনে, উচ্চারণ চেয়েছিলেন বানান অনুযায়ী। তাঁর এই মনোভাব কতখানি ভ্রমাত্মক তা আলাদা প্রসঙ্গ, কিন্তু কেরী সৎ ছিলেন তাঁর নির্দিষ্ট বিশ্বাসে। তিনি চেয়েছিলেন অস্থির ভাষাকে নির্দিষ্ট নিয়মে স্থিতিশীল করতে।

ব্যুৎপত্তি:

'The etymology of words is given, except in a very few instances. It must, however, be freely acknowledged, that there are some cases in which it is extremely doubtful whether the one given be the true one; the progressively increasing cultivation of the language will probably remove many of these doubts, and in many instances rectify the mistakes which insceperabcly attend the first publication of a work of this nature'.৮১ তাঁর বাংলা অভিধানে শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের যে প্রয়াস পেয়েছেন, সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়েই কেরী উপরোক্ত কথাগুলি বলেছিলেন। এই উদ্ধৃতি থেকে যে দুটি তথ্য আমরা সংকলন করতে পারি, তা হলো: (ক) তিনি বাংলা অভিধানে শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছেন; (খ) বাংলা অভিধানে শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টা এই প্রথম। প্রকৃতপক্ষে কেরীর বাংলা অভিধানেই আমরা প্রথম শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টা লক্ষ্য করি, এবং এই তথ্য ইতিহাসের দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম প্রয়াস বলেই, তাঁর এই উদ্যমে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা খুব স্বাভাবিক; বিশেষতঃ যে ভাষার বৈজ্ঞানিক চর্চা তখন পর্যন্ত খুব গুরুতর মনোযোগের বিষয় হয়ে ওঠে নি। এবং কেরী এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কেরীর প্রধান গৌরব এই যে, আধুনিক অভিধান-প্রকরণের প্রতি তিনি কখনোই উদাসীন থাকতে পারেন নি, এবং বাংলা অভিধান রচনাকে আধুনিক মনস্কতায় একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দান করতে চেষ্টা করেছেন।

ভাষার সম্পূর্ণ অভিধান রচনায় ব্যুৎপত্তি নির্ণয় একটি অত্যাবশ্যক উপাদান। আভিধানিকের পক্ষে এই দায়িত্ব উপেক্ষা করা কঠিন।

সাধারণভাবে ব্যবহারিক অভিধানে ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা খুবই কম সন্দেহ নেই, কিন্তু যে অভিধান একটি ভাষার সামগ্রিক পরিচয় উদ্ঘাটন করে, সেখানে এই উপাদানের উপস্থিতি প্রায় আবশ্যিক হয়ে ওঠে। বস্তুতঃ, একটি শব্দের পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভে শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে সজ্ঞান হওয়া জরুরি; কেননা ব্যুৎপত্তি জানার মধ্য দিয়ে শুধু শব্দের উৎসই আলোকিত হয় না, শব্দার্থের গতি ও পরিণাম সম্পর্কেও অবহিত হওয়া যায়। অধিকন্তু, শব্দের উৎস সম্পর্কিত জ্ঞান, শব্দার্থের প্রকৃতি সন্ধানের মধ্য দিয়ে সেই ভাষাভাষী জাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাস প্রকাশিত হয়ে যায়। বাংলা শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে প্রধান যে দুই সম্ভাবনা আত্মপ্রকাশ করে, তা হলোঃ (ক) ভাষার প্রধান উৎস সংস্কৃতের সঙ্গে তার সম্পৃক্ততার পরিমাণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে অবধানতা; (খ) বিভিন্ন বিদেশীভাষার শব্দই যেখানে ভাষার মৌলিক বা সাধিত শব্দের উৎস বা গঠনমূলক উপাদান-স্বরূপ, সেখানে সেই সব বিদেশী জাতির সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের স্বরূপ পরিচয় আবিষ্কার করা। একটি ভাষা-অভিধানে সেই জাতির যে এক সামগ্রিক পরিচয় বিধৃত থাকে, ব্যুৎপত্তি অনুসন্ধান এইভাবে তার সহায়তা করে থাকে। অভিধানে ব্যাকরণ-চিন্তার যে এক নির্দিষ্ট প্রয়োজন আছে, তার বাইরেও শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের প্রয়াসকে যথোচিত গুরুতর বলে এই কারণেই মনে করা হয়ে থাকে। কেরী এই অভিধান-উপাদান সম্পর্কে সচেতন থেকে জাতি-দর্পণ রূপে বাংলা-অভিধানের গৌরব এই প্রথম প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথা প্রথমেই উল্লেখযোগ্য যে, কেরী শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় বিষয়ক অভিধান-উপকরণকে তাঁর পরিকল্পনার বাইরে রাখতে চান নি; এবং ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি যে কতখানি অসহায় বোধ করেছেন, তাঁর অভিধানের প্রতিটি পৃষ্ঠায় তার সাক্ষ্য আছে। যদিও তিনি অকপটেই স্বীকার করেছেন যে তিনি যে শব্দ উৎস নির্ণয় করেছেন, তা সব সময় অভ্রান্ত নয়, তথাপি তাঁর অভিধানের সাক্ষ্য থেকে মনে হতে পারে যে প্রমাদ ও অসম্পূর্ণতা ভারাক্রান্ত এই প্রয়াস থেকে তাঁর বিরত থাকাই উচিত ছিল। যে সব তৎকালীন পণ্ডিতদের সংযোগে এসেছিলেন তিনি, মনে হয় সময় থেকে সময়ান্তরে তাঁরা কেরীকে ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে যা বুঝিয়েছেন, তাই তিনি নির্বিচারে গ্রহণ করেছেন; ফলে ভুল পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠেছে। ধরা যাক, 'গৃহ' শব্দ; 'গৃহ'-র ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করেছেন তিনি 'from গ, a name of Ganesha, and ঈহ, to desire.' এই নির্ণয় সম্পূর্ণই ভুল।১০ কিংবা যখন তিনি 'চাউল'

শব্দের উৎস খুঁজতে গিয়ে বলছেনঃ 'from চালনী a sieve' তখনও আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে তিনি অসহায়ভাবে ভুল করেছেন, তিনি সম্ভাব্য অনুসন্ধানে খুঁজে পান নি যে এই দেশি শব্দটির উৎস অনার্য কোল ভাষায়। এইরকম ভাবেই তিনি বুঝতে পারেন নি যে 'ওঝা' শব্দটি সমকালীন বাংলায় যে অর্থ ধারণ করে আছে, তাতে পণ্ডিত থেকে সাপের পণ্ডিতে অর্থাবনতিই ঘটেছে মাত্র, এবং এই শব্দের ব্যুৎপত্তি খুঁজতে সংস্কৃত উপাধ্যায় শব্দের উল্লেখ অনিবার্য, এবং from ওজ্ to abandon লিখলে তা শুধু জোর করে মেলানোর একটি চেষ্টা রূপেই লক্ষণীয় হয়। বস্তুতঃ, শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়বিষয়ক ব্যাপারটি কখনোই স্বেচ্ছাচারমূলক হতে পারে না; অজ্ঞানতা বশতঃ যদি কোন ত্রুটি থাকেও, তখনও অভিধান-কারের কাছে দাবি করা যায় উৎস শব্দের সঙ্গে আলোচ্য শব্দের অর্থসঙ্গতি তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন কিনা। কেরী যে সাধারণভাবেও এই অর্থ-সঙ্গতির ব্যাপারটির প্রতি বিশেষ মনোযোগী হয়েছিলেন, এমন মনে হয় না। উদাহরণ স্বরূপ যেমন পূর্বোদ্ধৃত 'ওঝা' শব্দটির কথা বলা যায়, তেমনি প্রভাত অর্থে 'বিহান' শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়েও এই প্রমাদ লক্ষণীয়। কেরী লিখেছেনঃ 'from বি prep and হা to relinquish'. বিহান শব্দের সঙ্গে উৎসের ধাতুর অর্থসঙ্গতি অবশ্যই এখানে স্পষ্ট নয়, এবং ভানু অর্থে সংস্কৃত 'ভান' শব্দের সঙ্গেই যে আলোচ্য শব্দের অর্থ সঙ্গতি লক্ষ্য করা সম্ভব, তা তিনি যে কারণেই হোক নিষ্পন্ন করতে পারেন নি। অথবা, 'আধখেচড়া' শব্দের কথাও তোলা যেতে পারে। কেরীর নির্ণয়ঃ 'from অর্ধ half, and খেচড়া vile.' কিন্তু শব্দার্থের সঙ্গে vile-এর অর্থসঙ্গতি স্থাপন করা কঠিন। বরং 'to draw' অর্থেই শব্দাঙ্গটিকে লক্ষ্য করলে অর্থসঙ্গতি প্রতিষ্ঠিত হতো বলে মনে হয়। এইরকম ভাবে অসংখ্য ক্ষেত্রে দেখা যাবে, কেরী ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে সক্ষমতা দেখাতে পারেন নি। যেমন কোথাও কোথাও তিনি নিশ্চিত প্রমাদ ঘটিয়েছেন, তেমনি কোথাও কোথাও তাঁর অনুসন্ধান অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ ও সংশয়জনক বলেও মনে হবে। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই, কয়েকটি নির্বাচিত প্রসঙ্গ মাত্র এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে। যেমনঃ (ক) কল্পনা। কেরীর নিষ্পত্তিঃ 'from কৃপ to contrive'; এখানে 'কৃপ' ধাতুর উল্লেখ ভুল। হওয়া উচিতঃ 'কৢপ', যা থেকে কল্প এসেছে। (খ) কন্দল। কেরীর নিষ্পত্তিঃ 'from কন্দ a root, and লা to take.' এখানে উল্লেখযোগ্য যে কন্দ-এর আত্মনেপদী রূপ কন্দতে-এর অর্থ 'to be confounded' এবং এর সঙ্গে কন্দল শব্দের অর্থগত মিল অবশ্য অংশতঃ আছে, কিন্তু 'a

root' অর্থে ম্লানুসন্ধান সংশয়জনক। (গ) কান্ড। কেরীর নিষ্পত্তিঃ 'from কণ্ to shine.' সংস্কৃতে 'কন্' to shine অর্থে থাকলেও, কান্ড সেখানে স্বতন্ত্র শব্দ রূপেই অধিষ্ঠিত। মনিয়র উইলিয়মস্-ও তার কোন মূল দেখান নি। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, সংস্কৃতে "কণ্ডে' 'to seperate the chaff from the grave' অর্থে স্বতন্ত্র ধাতু আছে। 'কণ্' ধাতুর সংস্কৃতে অর্থ to become small, to sound, to cry, to go ইত্যাদি। (ঘ) এবং। কেরীর নিষ্পত্তিঃ 'from ই, to go.' এখানে কেরী মূল ধাতুর সন্ধান দিতে পেয়েছেন। কিন্তু অস্পষ্টতা এই জন্য যে, তিনি 'ই'-র 'এ'-তে 'গুণ'-ভাবগত পরিবর্তন লক্ষ্য করেন নি। (ঙ) ঐশ্বর্য্য। কেরীর নিষ্পত্তিঃ 'from ঈশ্বর a lord.' এখানে লক্ষণীয় যে তিনি ধাতু অনুসন্ধান করেন নি; 'ঈশ্বর' ধাতু নয়, একটি শব্দ, যার অর্থ a lord হতে পারে। কিন্তু 'ঈশ্বর' থেকে হয় 'ঐশ্বর', এবং 'ঐশ্বর্য', যার অর্থ the state of being a mighty lord, super-human power.' (চ) ব্যুৎপত্তি। কেরীর নিষ্পত্তিঃ 'from বি prep. উৎ prep and পদ্ to move.' কেরীর এই নিষ্পত্তি সঠিক হয়েও অসম্পূর্ণ কেননা 'তি' প্রত্যয়ের যোগ তিনি লক্ষ্য করেন নি।

কেরী ব্যুৎপত্তি শব্দের অর্থ নির্দেশ করেছেন এইভাবেঃ the etymology of a word, derivation, the formation of words. ইত্যাদি। কেরী তাঁর বাংলা অভিধানে আলোচ্য শব্দের উৎসমূল যেমন সন্ধান করেছেন, তেমনি শব্দগঠন সূত্র লক্ষ্য করতে চেয়েছেন। তা প্রধানতঃ মৌলিক শব্দের ক্ষেত্রেই। সাধিত শব্দ বা সমস্ত পদ ব্যাখ্যার আবার একটি সুন্দর কিন্তু অনতিপ্রয়োজনীয় রীতির প্রবর্তনা করেছেন, এটা তাঁর পক্ষে করণীয় ছিল কেননা তাঁর অভিধানে সমস্তপদের সংখ্যা অত্যধিক। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করে তাঁর সমস্তপদ ব্যাখ্যার রীতি লক্ষ্য করা যেতে পারে; যেমন 'দেব' a god,
and,

বাণী=দেববাণী
যজ্ঞ=দেবযজ্ঞ
যান=দেবযান
ঋষি=দেবর্ষি
সভা=দেবসভা
সেবা=দেবসেবা
ইত্যাদি।

দেবসভা

and,

মধ্য=দেবসভামধ্য

দেব সেবা

and,

করণ=দেবসেবাকরণ
আকাঙ্ক্ষা=দেবসেবাকাঙ্ক্ষা
কারক=দেবসেবাকারক
ইত্যাদি।

দেবসভামধ্য

and,

বর্ত্তিন=দেবসভামধ্যবর্তী
স্থা=দেবসভামধ্যস্থ
স্থিত=দেবসভামধ্যস্থিত
ইত্যাদি।

প্রকৃতপক্ষে কেরীর অভিধানে ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের অংশে বিভ্রান্তি বেশি, সঠিক নিষ্পত্তির উদাহরণও অবশ্য কম নয়। তথাপি তাঁর অভিধানে এই উপাদানের উপস্থিতিকে আধুনিক মনস্কতার লক্ষণমাত্রিক উপস্থিতি রূপেই দেখা সমীচীন; প্রচুর ভুল থাকা সত্ত্বেও এই লক্ষণধর্মে কেরীর বাংলা অভিধানের একটি বিশেষত্বই আত্মপ্রকাশ করে।

কেরী: অভিধানকার

অভিধান সম্পর্কিত আলোচনায় প্রথমেই অভিধানকারের অভিধান সংকলনের দৃষ্টিভঙ্গিটি পর্যালোচনা করা দরকার, কেননা এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গড়ে ওঠে, এবং তার ওপরই নির্ভর করে তাঁর শব্দ সংকলন ও শব্দ নির্বাচন পদ্ধতি।

অভিধানকারের এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করতে গেলে সবার আগে যে প্রশ্নটি জরুরী হয়ে ওঠে, তা হলো, সংকলক কাদের জন্য এই অভিধানের পরিকল্পনা করেছেন। আমরা জানি, অভিধান রচনার পশ্চাতে প্রায়ই কোন না কোন রকমের প্রয়োজনবোধ উপস্থিত থাকে; এমন কি জনসন প্রকৃত জ্ঞানচর্চার আনন্দে আপন ভূমিকা যখন ব্যাখ্যা করেন, তখনো তো আমাদের কাছে এই তথ্য উপস্থিত যে তিনি অনিয়ন্ত্রিত ইংরেজি ভাষার

নিয়ন্ত্রিতরূপ ও ভাষার বিশুদ্ধতা প্রতিশ্রুত করতে চেয়েছিলেন। বস্তুতঃ অভিধান সংকলনের পশ্চাতে এই দুই শক্তির ক্রিয়াশীলতাই লক্ষ্য করা যায়: এক, কোন ব্যবহারিক প্রয়োজনবোধ; দুই, প্রকৃত জ্ঞানচর্চার আগ্রহ।

এই ব্যবহারিক প্রয়োজনবোধের সঙ্গেই অভিধানকার কাদের জন্য সংকলন করেছেন, সেই প্রশ্নটি সংশ্লিষ্ট আছে। প্রকৃতপক্ষে কেরী কাদের জন্য অভিধান সংকলন করেছিলেন? কেরীর গ্রন্থের নামঃ 'A Dictionary of the Bengalee Language.' নামকরণের মধ্যে কোন অস্পষ্টতা নেই, তিনি স্পষ্টতঃই বাংলা অভিধান সংকলন করেছিলেন। বাংলা অভিধান যেখানে সংকলিত হচ্ছে, সেখানে সঙ্গতকারণেই সংকলনের মূল লক্ষ্য বাঙালিরা বলে মনে হবে, যে বাংলা ভাষাভাষীদের কোন সুনির্দিষ্ট অভিধান ঐতিহ্য এখন পর্যন্ত গড়ে ওঠে নি। অথচ কেরীর বাংলা অভিধান সম্পর্কে প্রথম অভিজ্ঞতা এই যে. অভিধানখানি নির্দিষ্টভাবে বাঙালিদের জন্য রচিত হয় নি। কেননা, এই অভিধান বাংলা অভিধান নয়, দোভাষা অভিধান, অর্থাৎ বাংলা-ইংরেজি অভিধান। কেরী অভিধান রচনায় এই যে দ্বিতীয় ভাষার সংস্থান করলেন, তা থেকেই তাঁর পরিকল্পনাটি অতিশয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইংরেজি ভাষাভাষীদের মধ্যে যাঁরা বাংলা ভাষায় আগ্রহী, এই গ্রন্থ প্রাথমিকভাবে তাঁদের জন্যই পরিকল্পিত।

কেরীও এই মনোভাব কখনো গোপন রাখেন নি। তাঁর বাংলা অভিধানের Preface থেকে প্রাসঙ্গিক দুটি উদ্ধৃতি এখানে উল্লেখ করা যায়ঃ ১। "Since the institution of the college of Fort William......The Bengalee language has become an object of study, a good number of the Civil Servants of Honourable Company, and many other persons resident in India, have made it the object of their attention."[১১] ২। "The want of a Dictionary of the Bengalee language has been long felt, especially by the students in the college of Fort William."[১২]

উদ্ধৃতি দুটি থেকে স্পষ্টতঃই বোঝা যাচ্ছে, কেরী অভিধান সংকলন করেছিলেন, কারণ (১) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা থেকে বাংলা ভাষা সিভিলিয়নদের শিক্ষণীয় ভারতীয় ভাষার অন্যতম বলে স্বীকৃতি পাওয়ার ফলে যেসব শিক্ষার্থীরা, কলেজে বাংলায় পাঠ গ্রহণ করতেন তাঁরা একখানি বাংলা অভিধানের অভাব বোধ করতেন; (২) অনেক ইংরেজ যাঁরা কলেজে শিক্ষার্থী নন, অথচ বিভিন্ন কাজে এদেশে অবস্থান করছেন, তাঁদের অনেকেরই বাংলা ভাষা শিক্ষায় আগ্রহ জন্মায়, এবং তাঁদেরও বাংলা ভাষা

শিক্ষার অন্যতম অপরিহার্য সহায়িকা একখানি অভিধানের প্রয়োজন বোধ করা স্বাভাবিক।

বস্তুতঃ শিক্ষার সহায়িকা রূপেই কেরী অভিধানের গুরুত্ব বিবেচনা করেছিলেন। এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্র ও ছাত্রশিক্ষা তাঁর অভিধান রচনার অব্যবহিত কারণ ছিল বলে অনুমান করা চলে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে একজন বিদেশী হিসাবে বাংলা ভাষা চর্চায় আত্মনিয়োগ করতে গিয়েই তিনি বাংলা শব্দকোষের প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। বাইবেল অনুবাদের কাজে ব্যাপৃত থাকার সময় এই প্রয়োজনের তাগিদেই হয়তো ধীরে ধীরে একটি অসম্পূর্ণ শব্দ-কোষের খসড়া গড়ে উঠেছিল; আবার অনূদিত বাইবেল যাতে ইংরেজভাষী অনুধাবন করতে পারেন, তার জন্যও তিনি সহায়িকা অর্থে বাংলা শব্দভাণ্ড সংগ্রহ করেছিলেন। প্রয়োজনবোধ দ্বারাই যে কেরী ভাষা শিক্ষার দুই উপকরণ—ব্যাকরণ ও শব্দসংগ্রহকে আবশ্যকীয় বলে বিবেচনা করেছেন, ঐ দুটি বিষয়ে কেরীর প্রাথমিক উদ্যমগুলি তারই প্রকাশক। কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন উদ্যম যে একসময় সংহত হয়ে উঠেছিল, তার কারণ অবশ্যই একটি বহিরঙ্গ দাবী, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রশিক্ষা। কাজেই কেরী যখন বলেন, "Induced by this acknowledged want, and by the official situation which he holds in that college, and which indeed seemed to require it of him, the author of this work engaged there in".১৩ তখন তিনি অকপটভাবেই অভিধানকার হিসাবে তাঁর আবির্ভাবের পটভূমিটি ব্যাখ্যা করে দেন। এখানেও দেখা যায়, এক সময় বাইবেল অনুবাদকরূপে তিনি যে প্রয়োজন বোধ করেছিলেন, আজ শিক্ষক হিসাবেও অভিধানের সেই প্রয়োজনই বোধ করেন; এর মধ্যে মাত্রাগত ব্যবধান যে-টুকু আছে, তারই অনুশাসনে এককালের শব্দসংগ্রহের প্রয়াস অভিধান চিন্তার বৈজ্ঞানিক মনস্কতায় সমর্পিত হয়েছে।

যে বহিরঙ্গ প্রয়োজন কেরীর আভিধানিক পরিচয়টিকে দাবী করেছিল, তার পটভূমিটি অন্যতর দিক থেকেও দেখা দরকার। আমরা জানি যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদের বাংলা ভাষা চর্চায় কেরী বাইবেল অনুবাদেই আত্মসমর্পিত; বাইবেল অনুবাদই তাঁর মনোযোগের কেন্দ্রভূমি, ব্যাকরণ অভিধানের ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত প্রয়াস এখানে তাঁর গুরুতর নয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদেই কর্ণওয়ালিশের প্রয়াস দেশীয় ভাষা শিক্ষা বিষয়কে গুরুতর করে তোলে, ওয়েলেসলি গভর্ণর জেনারেল রূপে এলে ঐ প্রয়াস তৎপরতা পায়ঃ গিলখ্রীষ্টের সেমিনারী এবং ফোর্ট উইলিয়ম

কলেজের প্রতিষ্ঠাতেই তার পরিচয়। এবং দেখা যায়, কম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত প্রয়াসে অথবা সরকারী প্রয়াসে শিক্ষাদানকালেই গিলখ্রীষ্ট হিন্দুস্থানী ভাষা বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করেন এবং প্রধানতঃ গিলখ্রীস্টের মেধাবী প্রচেষ্টায় দেশীয় ভাষায় হিন্দুস্থানী অভিধান রচিত হয়। ফরস্টারও ইংরেজি-বাংলা ও বাংলা-ইংরেজি অভিধান রচনা করেন কম্পানীর কর্মচারীদের বাংলা ভাষা শিক্ষার সহায়িকারূপেই। ফরস্টার তাঁর শব্দকোষ সংকলনের পশ্চাতে যে প্রেরণা ক্রিয়াশীল ছিল, তার কথা স্পষ্টতঃই উল্লেখ করেছেনঃ১৪ (১) "It might prove of utility;" (২) "Judicious Resolutions relative to the study of the languages", ইতিমধ্যেই সরকারীভাবে গৃহীত হয়েছিল। এই উপযোগিতার বোধ সংগ্রাহকের মনে সর্বদা উপস্থিত ছিল বলেই তাঁকে ইংরেজি-বাংলা দোভাষা শব্দকোষ প্রণয়ন করতে হয়েছিল গিলখ্রীস্টের মতই। গিলখ্রীস্টও ইংরেজি-হিন্দুস্থানী অভিধান রচনা করেছিলেন। ফরস্টার আরেকটু এগিয়ে এসে বাংলা-ইংরেজির আরেকটি খণ্ডও প্রকাশ করেন। গিলখ্রীষ্ট ও ফরস্টার উপযোগিতার দিক থেকে প্রণীত অভিধানের দোভাষা রীতি বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করলেন একই ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে; কম্পানীর কর্মচারীদের দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের সহায়িকা রচনার বোধ থেকে। এর পর ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে হাণ্টার যখন হিন্দুস্থানী-ইংরেজি অভিধান প্রণয়ন করলেন, তখনও দেখা যায় সেই একই বোধ সেখানেও উপস্থিত। ক্যাপ্টেন টেলারের অভিধান ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতরা সংশোধন করেন ও সেই সংশোধিত হিন্দুস্থানী-ইংরেজি অভিধান হাণ্টারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সেই কারণে যাকে সে যুগের এক সামান্য লক্ষণ বলা যেতে পারে; সম্পাদক এই গ্রন্থকে বলতে চেয়েছেন, "Attempt to facilitate the study of the Hindoostanee Language."১৫ কোলব্রুকও অমরকোষ সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পরেই, এবং এই কলেজীয় পটভূমিকায়ই বোধ হয় "It was....thought advisable to print, in Sanskrit and English". ১৬ এই অভিধানখানি শ্রীরামপুর থেকে ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদ থেকে বাংলা দেশে, কেরীর পরিচিত পরিধির মধ্যেই দেশীয় ভাষার অভিধান রচনার একটি উল্লেখযোগ্য আয়োজন ঘটেছিল। অধিকাংশ অভিধান রচনার দুইটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়ঃ (১) ইংরেজদের দেশীয় ভাষা শিক্ষা-সহায়িকা রূপে সংকলনের পরিকল্পনা (২) দোভাষা রচনা। তথাপি দেখা যাচ্ছে যে, গিলখ্রীস্টের মেধাবী ইংরেজি-

হিন্দুস্থানী অভিধান থাকা সত্ত্বেও একই কারণে হাণ্টার হিন্দুস্থানী-ইংরেজি অভিধান আরেকখানি সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছেন। ফরস্টারের বাংলা-ইংরেজি, ইংরেজি-বাংলা অভিধান থাকা সত্ত্বেও কেরী ছাত্রদের মধ্যে অভিধান সম্পর্কে অভাববোধের কথা উল্লেখ করেছেন। এই তথ্যগুলি আমাদের সহজেই গোচরে আসে বলে মনে হয় প্রয়োজনবোধ ও তদনুসারী দোভাষা পরিকল্পনার কথা যাই থাকুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে অভিধান সংকলন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েকটি বৎসরের মধ্যে বিদ্যোৎসাহের লক্ষণ নিয়েই আত্মপ্রকাশ করতে সুরু করেছিল, এবং কেরী যেহেতু সেই সমারোহময় অভ্যুদয়-এর নিকট আবাসিক ছিলেন, সেইজন্য অনিবার্য ছিল তাঁর পক্ষে সেই আলোয় নিজেকে সমর্পণ করা। সমকালীন অভিধানের সমস্ত সামান্য লক্ষণই তাঁর অভিধানেরও সামান্য লক্ষণ, ছাত্রদের প্রয়োজন, দেশীয় ভাষার অভিধান ইংরেজিতে প্রণয়ন করাঃ তথাপি তাই যেন সবটা নয়, তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা ও প্রয়াসের পিছনে বিদ্যাযোগ বর্তমান ছিল।

বস্তুতঃ আধুনিক অভিধানচিন্তা এই সময়কার ইংরেজ অভিধানকারদের মধ্যে অনেকখানি প্রতিফলিত হয়েছিল। শুধু কেরী নন, গিলখ্রীস্ট, ফরস্টার এমন কি হাণ্টারের উদ্যমেও তার পরিচয় আছে। সাধারণভাবে শব্দ-সংগ্রহ যে কোন একটি ব্যাকরণের সহযোগে ভাষাশিক্ষার জরুরি প্রয়োজন মেটাতে পারে; কিন্তু অভিধান যেমন ভাষাশিক্ষার অন্যতম গুরুতর উপকরণ, তেমনি অপরদিকে তা আবার ভাষার স্বরূপ ও শক্তির পরিচয় গ্রন্থও। তাই অভিধানে ভাষার শব্দ সংগ্রহ মাত্র নয়, সংগৃহীত শব্দ অবলম্বনে ভাষাতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা বা ব্যাকরণ নিষ্পত্তির উপাদানটিও উপেক্ষিত হলে চলে না। শুধুই শব্দার্থ নয়, লিঙ্গ, বিভক্তি, পদ-প্রকরণ, ব্যুৎপত্তি নির্ণয় আভিধানিকের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। স্যামুয়েল জনসন তো তাঁর অভিধানে ইংরেজি ভাষার ইতিহাস ও ব্যাকরণ স্বতন্ত্রভাবেই সংশ্লিষ্ট করেছেন। অবশ্য জনসনের এই আচরণ অভিধানকারের একটি অতিরিক্ত উৎসহে বলেই বিবেচিত হবে, অভিধানের অনিবার্য লক্ষণ হিসাবে তা দেখবার দরকার নেই। কিন্তু ব্যাকরণ নিষ্পত্তির ব্যাপারটিও মূল অভিধান-দেহে তিনি স্বভাবতঃই বাদ দিতে পারেন নি।

ফলে, ভাষাচিন্তা অভিধানচিন্তার মৌলিক ভিত্তি। কেরী এই চিন্তায় মনস্ক হয়েই অভিধান সংকলনে অগ্রসর হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, কেরীর বাংলা অভিধান তথাপি ত্রুটি ভারাক্রান্ত, পরিশ্রমের চিহ্ন সর্বত্র থাকা সত্ত্বেও

বিবেচনার সংযম প্রায়ই অনুপস্থিত। কিন্তু তিনি যে বাংলা ভাষা সম্পর্কিত মনোযোগ থেকেই এই সংকলনে প্রয়াসী হয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ভাষার অধিকার সম্পর্কে কেরী যে নিশ্চিত বিশ্বাস লালন করতেন, বাংলা ভাষাচিন্তায় তিনি সেই বিশ্বাসের দ্বারাই চালিত। তাঁর অভিধানের Preface-এ কেরী প্রথমেই ভারতবর্ষে সংস্কৃত-ভাষার গৌরবময় অধিষ্ঠান সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তাঁর অভিমত এই যেঃ 'the present languages of India, especially those of the northern provinces, are almost wholly derived from the Sungskrita.'৯৭ তারপরই তিনি বলেছেনঃ 'The Bengalee language, of which the following is a dictionary, is almost entirely derived from the Sungskrita: considerable more than three-fourths of the words are pure Sungskrita, and those composing the greatest part of the remainder are so little corrupted, that their origin may be traced without difficulty.'৯৮ ইতিপূর্বে তিনি বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন; সেখানেও তিনি মন্তব্য করেছিলেনঃ 'The Bengalee may be considered as more nearly allied to the Sungskrit than any of the other languages of India, for though it contains many words of Persian and Arabic origin, yet the far greater number are pure Sungskrit.'৯৯

এখানে দেখা যাচ্ছে ব্যাকরণের ভূমিকায় বাংলা ভাষার ওপর সংস্কৃতের অধিকার সম্পর্কে তাঁর ভাবনার মধ্যে সুস্পস্ট ঘোষণার আংশিক অভাব আছে, কিন্তু অভিধানের ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে বাংলা ও সংস্কৃতের যোগা-যোগ সম্পর্কে তাঁর প্রত্যায়িত কণ্ঠস্বর শোনা যায়। অভিধানে তিনি যে সব শব্দ সংকলন করেছেন, তার অধিকাংশেরই তিনি ব্যুৎপত্তি নির্দেশের প্রয়াস পেয়েছেন; এটা সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে তাঁর অধিকাংশ সংগৃহীত শব্দই ছিল সংস্কৃত বা সংস্কৃতজ।১০০ আমরা জানি যে বাংলা ও সংস্কৃতের ঘনিষ্ঠতার কথা তথা বাংলা শিক্ষায় সংস্কৃতজ্ঞানের অপরিহার্যতার কথা হ্যালহেডও ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছেন। তিনি 'close and intimate connexion between the two' লক্ষ্য করেই 'learning the Bengali dia-lect without a general and comprehensive idea of the Sanscrit' অসম্ভব বলে বিবেচনা করেছিলেন।১০১ ফরস্টারও বাংলা ভাষাকে বলতে চেয়েছেন 'perhaps the purest dialect of the venerable Songskrit now spoken in any part of India.'১০২ বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের অধিকার সম্পর্কে বিভিন্ন য়ুরোপীয়দের যে ভাবনা উচ্চারিত হয়েছিল

অষ্টাদশ শতাব্দীতেই, কেরী সেই মনোভাবেরই পরিপোষক, অভিধানের মুখবন্ধে তিনি তাঁর সেই প্রত্যয়ই ঘোষণা করেছেন মাত্র। শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশে যেমন অধিকাংশ সংস্কৃত শব্দ বলেই তাঁর কোন অসুবিধে হয় নি, তেমনি এমন কি বাংলা উচ্চারণ সম্পর্কে নির্দেশ দিতে গিয়েও তিনি সংস্কৃত অক্ষরের উচ্চারণের সাদৃশ্যে কখনো কখনো তা ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। বাংলা ব্যাকরণের তৃতীয় সংস্করণে (১৮১৫) ক্রিয়াপদ সম্পর্কে আলোচনার সূচনাতে তিনি সুস্পষ্টভাবে বললেন, 'The Bengalee verbs, with a few exceptions, are formed from the Sungskrit dhatoos or roots.'১০৩ এখানে সংস্কৃত মূলের সঙ্গে বাংলা ক্রিয়াপদের যোগাযোগ তিনি যত্ন সহকারে লক্ষ্য করেছেন। এবং অভিধান সংকলনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় 'The Sungskrita root, or dhatoos, has been chosen for the radix of the verb.'১০৪ শুধু তাই নয়, অভিধানের গোড়াতে ৩৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী 'List of Dhatoos or Sungskrita Roots'-এর একটি অংশও তিনি সংযোজন করেছেন, এবং ভূমিকায় জানিয়ে দিয়েছেনঃ যে সমস্ত সংস্কৃত ধাতু বাংলা শব্দগঠনে ব্যবহৃত হয় বা প্রযুক্ত হয়, সেগুলি তিনি এই তালিকায় বিশেষভাবে তারকা চিহ্নিত করেছেন।

এই সমস্তই বাংলা ভাষার সংস্কৃত ভাষার ওপর নির্ভরশীলতা সম্পর্কে কেরীর সংশয়হীন মনোভাবের সমর্থক। এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে আর অস্পষ্ট থাকে না যে তিনি বাংলা অভিধান রচনার মাধ্যমে বাংলা ভাষাচিন্তার যে পরিচয় দিয়েছেন বা ভাষার ভিতর স্বরূপ ও শক্তি যেভাবে নিরূপণ করতে চেষ্টা করেছেন, সেখানে সংস্কৃতমনস্কতারই প্রাধান্য।

বস্তুতঃ বাংলা ভাষার সংস্কৃত-করণে কেরী যে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। অভিধান সংকলনের ক্ষেত্রেও তাঁর এই একই পরিচয়। কেরীর এই সংস্কৃতমনস্কতা বাংলা ভাষার পক্ষে শুভযোগ হয়েছিল কিনা, সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র, কিন্তু কেরীর পক্ষে অনিবার্য ছিল এই ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করা।

কেননা, বাংলা ভাষাকে তিনি ভালোবেসেছিলেন। অনেক আধুনিক ভারতীয় ভাষা সম্পর্কে তিনি উচ্চাশা পোষণ করতেন বটে, কিন্তু বাংলা ভাষা, তাঁর কর্মযোগের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য হলেও, কেরীর হৃদয় হরণ করেছিল। কিন্তু কেরী যে বাংলা ভাষাকে পেলেন, সেই ভাষা তখন দীনতাক্লিষ্ট। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে এমন কি বিভিন্ন কর্মধারায় নিযুক্ত য়ুরোপীয়রাও বাংলা ভাষার প্রতি বিরূপ ছিলেন 'under the idea of its being mere jargon, only used by the lower order of

people'.১০৫ এর কারণ প্রধানতঃ 'supposition that Hindoosthanee is the language universally prevailing'.১০৬ এই ধারণার পূর্ণ পোষকতা করে গিয়েছেন জন গিলখ্রীস্ট. কিন্তু কেরী এই মনোভাবকে ভ্রমাত্মক বলে মনে করেছেন।

বাংলা দেশে অন্ততঃ হিন্দুস্থানী কখনোই প্রধান ভাষা নয়, বাংলাই প্রধান। ফরস্টারও এই ধারণারই বশবর্তী ছিলেন; তিনি 'the importance of the study of Bongalee, and the propriety of its adoption, as the only official language in the province of Bengal'১০৭ দেখাতে প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি দেখেছেন বাঙালিদের ভাষা বাংলা, এই প্রদেশের পুরো লোকসংখ্যার অন্ততঃ ছয়-দশমাংশ শুধুই বাংলাতে কথা বলে; এবং ফার্সীভাষার সঙ্গে বাঙালিদের পরিচয়ও সামান্য। তিনি তো স্পষ্টতঃই ফার্সীভাষা সম্পর্কে বলেছেনঃ 'a language foreign to them.'১০৮ বস্তুতঃ এই পরিপ্রেক্ষিতেও, বাংলা ভাষার প্রতি মমতা থেকেই ফরস্টার শব্দকোষ রচনা করেছিলেন কিনা, তা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন; তবে বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাঁর অনুভূতি যে খুবই প্রখর ছিল, সে সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা উচিত হবে না। তিনি যখন শব্দকোষ সংকলন করেন, বাংলা ভাষার অবস্থা তখন আদৌ সন্তোষজনক ছিল না, এবং বাংলা ভাষার বিশুদ্ধতার অভাব সম্পর্কিত অভিযোগও তিনি অস্বীকার করেন নি; কিন্তু তাঁর মতে, বিশুদ্ধতার এই অভাবের কারণ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত 'revenue and judicial terms', যা প্রধানতঃ হিন্দুস্থানী অর্থাৎ আরবী ফার্সী শব্দ। অবশ্য কলকাতা মুর্শিদাবাদ বা ঢাকা শহর ও শহরতলীর আশে-পাশে ব্যবহৃত বাংলায় অবাংলা উপাদান বেশি থাকতে পারে; এইরকম স্থলে বিভিন্ন দেশ ও জাতির শাসনকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল, যার ফলে এইসব অঞ্চলের বাংলায় বিশুদ্ধতার অংশ কম হতে পারে। তথাপি বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে সুদীর্ঘ ষোল বৎসরের অভিজ্ঞতা সূত্রে তিনি লিখতে পেরেছেনঃ 'I never experienced so much as one solitary instance, in which a knowledge of the Persian was at all necessary.'১০৯

কিন্তু যে ছয় দশমাংশ বাংলায় কথা বলে, যাদের সঙ্গে কথোপকথনে ফরস্টারের ফার্সী শব্দের প্রায় প্রয়োজন হয় না, সেই বাংলা ভাষার প্রকৃত রূপ তখন কি ছিল? ফরস্টার বাংলা ভাষার দুটো ভাগ করেছেনঃ 'the polite and vulgar';—বাংলায় আমরা ভদ্র ও ইতর বলতে পারি। ইতর ভাষা জীবনের নীচু স্তরের লোকদের মধ্যেই সচরাচর ব্যবহৃত হতো; এবং ভদ্র ভাষার মধ্যে বহু সংস্কৃত উপাদান উপস্থিত, এই ভাষায় অনেক

সংস্কৃত গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে। মনে হয় ফরস্টার ভদ্র ভাষা বলতে লিখিতভাষা বা তথাকথিত সাধুভাষাই মনে করেছেন। ভদ্র বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাঁর প্রত্যাশা উচ্চ ছিল, তিনি ভদ্র ভাষার শক্তি সম্পর্কে প্রায় নিঃসংশয় ছিলেন। তাঁর কাছে ধরা পড়েছিলঃ 'richness of the language', 'its capability of being applied to every species of composition, and of expressing every idea of the mind, without the use of Persian or Arabick pedantism.'১১০ বাংলা ভাষা সম্পর্কে ফরস্টারের সচেতনতা এইসব থেকে প্রকাশ পায়, এবং এই সংকলনের মাধ্যমে এই ভাষাকে বিশুদ্ধতন্ত্রে স্থাপন করবার চেষ্টা তিনি করে গেছেন।

ফরস্টারের বাংলা ভাষা বিষয়ক ভাবনার এই প্রস্তাবনা কেরীকে অনুসরণ করবার জন্যই দরকার। কেরী যখন বাংলা ভাষা শিক্ষার উপযোগিতার কথা বলেন, তখন কোন ভাষা শিক্ষার জন্যে তিনি সুপারিশ করেছেন? যেখানে 'every possible corruption of words, every false pronunciation, and every violation of the rules of Grammar'১১১ লোকের সঙ্গে কথা বলতে গেলে আয়ত্ত করা প্রয়োজন? কেরী 'language of common conversation among people of the lower classes' সম্পর্কে অতঃপর আলোকপাত করতে চেষ্টা করেছেন। নিম্নশ্রেণীর লোকদের ভাষায় সাধু শব্দের ব্যবহার সবদেশেই নগণ্য; এদের উচ্চারণ, শব্দ-ব্যবহার ইত্যাদি অনেক সময়ই ত্রুটিপূর্ণ হয়, এদের কথোপকথনে দেশীয় বা স্থানীয় বিশিষ্টতার ছাপ থাকে নানভাবে, একথা সত্য; কিন্তু বাংলা ভাষা সম্পর্কে, কেরীর অভিমত অনুযায়ী, এই অভিযোগ করা চলে না। সাধারণ বাঙালিরা যে ভাষায় কথা বলে থাকে, তার পরিধি ও উদারতা হয়তো ব্যাপক নয়, কিন্তু তারা ব্যাকরণ সম্মত ভাষা ব্যবহারে অক্ষম একথা সত্য নয়। তাদের ব্যবহৃত ভাষায় অবশ্যই উচ্চাদর্শের অভাব আছে, প্রায়শঃই উচ্চ ভাবপ্রকাশে তারা অক্ষম, কিন্তু অন্যান্য দেশের অনুচ্চ স্তরের লোকদের ব্যবহৃত ভাষার চেয়ে এদের ভাষা অনেক বেশি শুদ্ধ বলেই তাঁর ধারণা। তথাপি, কেরী সুস্পষ্টভাবেই বলতে চেয়েছেন, 'there are, however, but few persons in any country of Europe who would form their language upon the model of that dialect which is spoken by ploughmen, menial servants, and labouring mechanics.'১১২ কাজেই নিম্নস্তরে যে বাংলা ভাষার প্রচলন দেখা যায়, তার পরিচয়ে বাংলা ভাষার নিম্নমান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ভ্রমাত্মক

হবে, বাংলা ভাষার গৌরবময় যথার্থ পরিচয় অবশ্যই সেখানে পাওয়া যাবে না।

কিন্তু কেরী, ফরস্টারের মত, বাংলা ভাষার দুই রূপ সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট উল্লেখ করেন নি। তিনিও যে প্রচলিত রূপ ছাড়া আরেকটি ভাষারূপ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, এই সত্য কিন্তু তথাপি আড়াল থাকে না। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের সামান্যতাই যে সমৃদ্ধভাষা সৃষ্টির পক্ষে অন্তরায় স্বরূপ হয়েছে, প্রসঙ্গতঃ তাও তিনি লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু তা যাই হোক, তিনি যে উচ্চতর সূক্ষ্ম ভাবপ্রকাশে সক্ষম ভাষার অস্তিত্বের কথা বলতে চেয়েছেন, অনুমান করতে বাধা নেই, তা ফরস্টার কথিত সেই ভদ্র ভাষা, যার মধ্যে সংস্কৃতানুগত্য লক্ষণীয়। কেরী এই আদর্শভাষারই রূপসন্ধান করেছেন এবং তার রূপনির্মাণ করতে চেয়েছেন।

এই কাজে সবচেয়ে জরুরী হয়ে ওঠে ভাষার বিশুদ্ধতা-সন্ধান। বাংলা ভাষার বিশুদ্ধতা সন্ধানের উদ্যমকে সংস্কৃতকরণ প্রয়াসের পরিচয়ে আমরা সচরাচর দেখতে অভ্যস্ত। ওয়ারেন হেস্টিংসের উৎসাহে ফ্রান্সিস্ গ্ল্যাডউইন ইংরেজি-ফার্সী যে শব্দকোষখানি সংকলন করেছিলেন, তাতে তিনি যে 'Traces of the Shanskrit Language in the Bengal Dialect' দেখাবার প্রয়াস পেয়েছিলেন,১১৩ সেখানে বাংলা ভাষা সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট চিন্তাই যে সংকলককে এই কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিল, সে কথা অক্লেশে বলা যাবে না; কিন্তু সেই প্রাথমিক উদ্যমেই বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের স্থান সম্পর্কে লেখকের অবধানতা লক্ষণীয়। বস্তুতঃ বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের অধিকার সম্পর্কিত বিবেচনা কোন নূতনত্ব বহন করে না, বরং তা স্বাভাবিকতা ও সত্যকে অনুসরণ করে মাত্র; তথাপি সংস্কৃতমনস্কতা যে এই সময় একটা বড় রকমের লক্ষণরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তার কারণ অভারতীয় ভাষার উৎপাত। হ্যালহেড তো স্পষ্টই বলেছিলেন, 'the modern Bengalese have been forced to debase the purity of their native dialect.'১১৪ এই যে 'Purity'র অভাব, প্রচলিত বাংলা ভাষায় তখন যা একটি দুর্মর লক্ষণরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল; তার হাত থেকে ভাষাকে উদ্ধার করাই সমকালীন বাংলাভাষা চিন্তার প্রধান উপাদান। ফরস্টার তাঁর শব্দ নির্বাচনের মনোভাব প্রকাশ করেছেন এই ভাবেঃ 'as far as my limited knowledge has enabled me, I have studiously endeavoured to avoid (আরবী-ফারসী), while I have been solicitious to restore to their proper rank, the pure Bengalee terms, whose place they had usurped.' ১১৫ ফরস্টারের এই উদ্ধৃতির মধ্যে 'pure Bengalee' এবং 'to restore' অংশ দুটি বিশেষ লক্ষণীয়, কেননা

ঐ অংশ দুটিতে বাংলা ভাষাচিন্তার যে পরিচয় প্রকাশ পায়, তাতেই বাংলা ভাষার বিশুদ্ধতা সন্ধানের পরিচয় নিহিত আছে। অবশ্য 'বিশুদ্ধ বাংলা' অর্থে কোন সংজ্ঞার্থ নির্ণয় করা তখন সম্ভব ছিল না; অস্ত্যর্থক ভাবে বিশুদ্ধ বাংলা অর্থে সংস্কৃত ও সংস্কৃতজই তাঁদের কাছে গ্রাহ্য হয়েছিল; নঙর্থকভাবে যা আরবী ফারসী নয় বা অন্য কোন বিদেশীয় নয় তাই বিশুদ্ধ বাংলা রূপে দেখা হতো। ফরস্টার 'সায়ং', 'সাঁজবেলা', বা 'চন্দ্রাতপ', 'চাঁদোয়া' একই অর্থে সংস্কৃত বা সাধু এবং প্রচলিত বা গ্রাম্য শব্দ নির্বাচন করেছেন বিশুদ্ধ অর্থেই। তৎসম ও প্রাকৃতের মাধ্যমে প্রাপ্ত তদ্ভব, যা বিশুদ্ধ বাংলা—দুইই ফরস্টার গ্রহণ করেছেন ঐ অর্থেই। সংস্কৃত ও সংস্কৃতজ দুইই বিশুদ্ধ বাংলা রূপে গ্রহণ করার ফলে সংস্কৃতকরণ প্রয়াস কথাটা এই ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অর্থে অবশ্যই প্রযুক্ত হতে পারে না. অথচ আমাদের কাছে একথাও খুব স্পষ্ট যে তৎসম-করণই তথাকথিত সংস্কৃতকরণ প্রয়াসের মৌলিক লক্ষ্য ছিল না। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ ও বিকৃত সংস্কৃত শব্দ দুইই বিশুদ্ধ বাংলার পরিচয়ে গৃহীত হয়েছে।

কেরী ভাষার বিশুদ্ধতার কথা পরোক্ষেই বলেছেন মাত্র। এই বিশুদ্ধতা প্রচলিত অর্থেই তিনি গ্রহণ করেছেন অবশ্য; কিন্তু ইতিপূর্বে বাংলার ওপর সংস্কৃতের অধিকার সম্পর্কে তাঁর যে মনোভাবের পরিচয় আমরা গ্রহণ করেছি, তার সূত্রে একথা বলতেই হবে যে, কেরী বিশুদ্ধতা অর্থে তৎসম-করণেই অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না; ভাষাকে অধঃপতিত বা অনির্দিষ্ট অবস্থা থেকে উদ্ধার করার বাসনা যে তাঁর মধ্যে উপস্থিত ছিল, 'বিশুদ্ধ' রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি যে নিষ্ঠাবান ছিলেন, এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। ভাষার বিশুদ্ধতা নিরূপণ করার এই ঐকান্তিকতা কেরীর মধ্যে এক স্মরণীয় প্রকাশ লাভ করেছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই তথ্যটিও আমাদের স্মরণ্য যে হ্যালহেড্ ও ফরস্টারের মধ্যে যে ভাবনা বিকশিত হচ্ছিল, অর্থাৎ বাংলা ভাষা সম্পর্কে সমকালীন যে মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল, কেরী সেই ভাবনারই অনুবর্তন করেছেন। তাঁর গৌরব এই যে, অপরিমেয় উদ্যম ও অধ্যবসায়ে সমকালীন ভাবনাকে তিনি বাংলা ভাষার নিয়ামক শক্তিরূপে অনন্য প্রতিষ্ঠা দান করতে পেরেছিলেন।

রেভারেন্ড টড জনসনের অভিধান সম্পাদনা করতে গিয়ে বলেছিলেন: অভিধান রচনার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য হলো: 'to fix the standard and preserve the purity of the....language.'[১১৬] ভাষার বিশুদ্ধতা-

রক্ষার সমস্যা সম্পর্কে আভিধানিকের অসুবিধাগুলি যখন জনমনের চেতনায় প্রায় সবসময়েই জাগ্রত ছিল, ভাষার পরিবর্তনশীলতা ভাষার সদগুণ রূপেই যখন তিনি মনে করেছেন, তখনও কিন্তু তিনি ভাষার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে বিশেষ সতর্ক হতে চেয়েছিলেন। বস্তুতঃ কেরী ও অব্যবহিত পূর্ববর্তীরা আভিধানিকের দায়িত্ববোধে যে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ থাকে না; উপযোগিতাবোধের বহিরঙ্গতা এই দায়িত্ব-বোধের কাছে পরাভূত হয়েছে। কেরীর আভিধানিক ভূমিকাটি দেখতে গিয়েও লক্ষ্য করা যায় বিশুদ্ধ ভাষাসন্ধান বস্তুতঃ আদর্শ ভাষারূপ-প্রতিষ্ঠারই বাসনা সঞ্জাত। তিনি আদর্শ বাংলা ভাষার রূপই নিরূপণ করতে চেয়েছিলেন, সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ভাষা কাঠামোর ওপরে যার স্থান, যার দ্বারা সমৃদ্ধ ও সূক্ষ্ম ভাবপ্রকাশ সাধ্য হতে পারে। মনে হয়, এই অতিরিক্ত সচেতনতার অনুশাসনে তিনি বিশুদ্ধভাষা নিরূপণে সংস্কৃত-মনস্কতাকে বেশি কার্যকর হতে দিয়েছিলেন; এবং এইভাবে পূর্বসূরীদের বলয়ভুক্ত থেকেও তাঁদের অতিক্রম করে গেলেন।

৪। খ্রীষ্টসঙ্গীত

খ্রীষ্টসংগীত বাংলা সাহিত্য ঐতিহ্যের অংগীভূত হয় নি। অথচ ধর্ম-সম্প্রদায়ের গীতমালা বাংলা সাহিত্যের ঐশ্বর্যের উপাদান রূপে চিরকালই গৃহীত, যেমন বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী অথবা ব্রহ্মসংগীত। খ্রীষ্ট-সংগীত এই মর্যাদায় বঞ্চিত। এর কারণ স্পষ্টতঃই সংগীতগুলির ধর্মবিশ্বাসের বৈদেশিকতা।

তথাপি বাংলা ভাষায় খ্রীষ্টসংগীত রচনার একটি ধারা প্রবাহিত আছে। ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখতে গেলে খ্রীষ্টানদের বাংলা দেশে আগমনের পূর্বে এর সূচনা সম্ভবপর নয়। আবার খ্রীষ্টানদের এদেশে আগমনের কালকে খ্রীষ্টসংগীত রচনার ইতিহাসের সম্ভাব্য সূচনাকাল বলে নির্দেশ করাও অনুচিত হবে বলে মনে হয়। যতদিন পর্যন্ত এখানে স্থানীয় অধিবাসীদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার কাজ সুরু হয় নি, ততদিন পর্যন্ত বাংলা ভাষায় খ্রীষ্টসংগীত রচনার কোন সামাজিক প্রেরণা ও পটভূমি খুঁজে পাওয়া যায় না। বাঙালিদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার কাজে ক্যাথলিক পর্তুগীজরাই প্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন, ফলে কার্যকারণ সম্পর্কে তাঁদের হাতেই বাংলা ভাষার প্রথম খ্রীষ্টসংগীত রচিত হওয়া স্বাভাবিক বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে, বাংলা খ্রীষ্টসংগীতের যে সামান্য ইতিহাস অনুসন্ধানসাধ্য, তাতে দেখা যায় যে এ কাজে পর্তুগীজরাই প্রথম আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ফাদার হস্টেনের প্রবন্ধের সূত্রে[১] জানা যায় যে ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পর্তুগীজ পাদ্রীরা বাংলা ভাষায় অন্যান্য কাজের সংগে প্রার্থনামালাও রচনা করেছিলেন। ১৭৬৫ বা তার পরবর্তী কোনও সময়ে বেস্টো ডি সেলভেস্ত্রের 'প্রার্থনামালা' লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এই রচনা অনুবাদমূলক ও রোমান অক্ষরে মুদ্রিত বলে জানা যায়।[২] এই দুই তথ্যসূত্রের মাঝখানে বাংলা খ্রীষ্টসংগীতের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটির অবস্থানঃ ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত মনোএল দা আসসুম্পসাউ-র 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ' গ্রন্থে সংকলিত খ্রীষ্টসংগীতের প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া গেল। অন্য দুই ক্ষেত্র নিতান্তই ঐতিহাসিক কৌতূহলের সূত্র মাত্র, কেননা সেই সমস্ত রচনার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নি। মনোএলের গ্রন্থের সংকলিত সঙ্গীত

মনোএলের নিজের বা অন্য কারও রচনা হতে পারে, রচনাকাল ১৭৩৪-৩৫-এর মধ্যে বা তৎপূর্ববর্তীও হতে পারে, এ-সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা কঠিন। তবে এই রচনাগুলিও রোমান লিপ্যন্তরেই ধৃত।

এই সংগীতগুলির মধ্যে কয়েকটিতে মেরীর শরণ নেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ মাতা মেরীই বিষয়-প্রসংগ।৩ মেরীকে 'পরমেশ্বরের মাতা' রূপে এবং 'কৃপয় পূর্ণিত' 'করুণাময়ী মাতা' রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ পাপী; তাই তার বর্তমান কালে এবং মৃত্যু কালে, যিনি তাঁর উদরে 'ধর্ম ফল' যীশুকে ধারণ করেছেন, সেই 'ধর্মী' ও 'সিদ্ধা' মেরীর কৃপা প্রার্থনা করা হয়েছে 'প্রণাম মারিয়া' অংশে। 'নিস্তার রানী' অংশে রোদনপর, স্থানভ্রষ্ট, অসহায় মানুষের একমাত্র সহায়রূপে, নিস্তারকারিণীরূপে তাঁকে লক্ষ্য করা হয়েছে। তাঁর কাছে প্রার্থনা করা হয়েছেঃ 'যেন আমরা যোগ্য হই। খ্রীষ্টর আজ্ঞাধনের'।

অন্য গানগুলিতে যীশু মাহাত্ম্য কীর্তিত।৪ 'মানি সত্য নিরঞ্জন' অংশে যীশুকে স্বর্গমর্ত সৃষ্টিকারী সত্যস্বরূপের সন্তানরূপে দেখা হয়েছে, যিনি মাতা মেরীর গর্ভে জন্মেছিলেন। যেখানে যীশু সর্বময় প্রসংগ, সেখানেও মেরীর প্রসঙ্গের উপস্থিতি ক্যাথলিক মনোলোকেরই স্মারক। 'ভাই, শুন, বুঝাই' অংশে কৃপার শাস্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যার আয়োজনই প্রধান। 'হে বাবা জিশাস্' অংশে যীশুকে প্রতি স্তবকান্তে 'আমার দয়ার জিশাস্' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানেও 'বিবি মারিয়ার উদরে/সিদ্ধি ধর্ম্মফল' রূপে 'আমার-দিগের কারণ' যীশুর আবির্ভাব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ক্যাথলিক চেতনায় মেরীর সর্বাত্মকতার পরিচয় এইসব গানে প্রায় সর্বত্রই মুদ্রিত। বিশেষতঃ এই গানটিতে আবেগময় মগ্নতা সহজেই ধরা পড়ে। 'হে বাবা জিশাস্' বলে সংগীতকার অবশ্যই 'পিতা যীশু' বোঝাতে চেয়েছেন, কিন্তু ওই 'বাবা' শব্দটি ব্যবহারের দ্বারা মহান পুরুষের ক্লাসিক্যাল দূরত্ব অপসারিত হয়ে হৃদয়সামীপ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই প্রার্থনাসংগীতগুলি 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ ভেদ'এ নিরালায় পাঠ্য শাস্ত্র রূপে উদ্ধৃত হয়েছে। খ্রীষ্টান ধর্মীয় অনুষ্ঠানে খ্রীষ্টসংগীত আনুষ্ঠানিক একটি উপাদান; এই গানগুলি এইরকম কোন চেতনার ফসল কিনা, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। হতে পারে গদ্যের ব্যাখ্যাধর্মী রূপের বাইরে কৃপার শাস্ত্রের বিশ্বাসসিদ্ধ আবেগময় উচ্চারণ, যা কাব্যরূপে গাঢ়-তরভাবে ধরা পড়ে, তারই জন্য এই রচনাগুলির স্বতন্ত্রভাবে আস্বাদন-যোগ্যতা নির্দেশিত হয়েছে। অবশ্য একথা সত্য যে অন্ততঃ 'হে বাবা

জিশাস্' রচনাটি খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে গীত হতো বলে তথ্য পাওয়া গেছে।৫

তথাপি লক্ষ্য করা যাবে যে ইংরেজ মিশনারীদের হাতে পরবর্তীকালে যেসব খ্রীষ্টসঙ্গীত সংকলিত হয়েছে, তাতে পর্তুগীজদের এইসব রচনা স্থান পায় নি। এর প্রধান কারণ সম্ভবতঃ পরস্পরের গোষ্ঠীস্বাতন্ত্র্য; প্রোটেস্টান্টদের সংকলনে ক্যাথলিকদের রচনা অগ্রাহ্য করা হয়েছে মাত্র। অবশ্য, এইসব রচনার সঙ্গে ইংরেজ মিশনারী গোষ্ঠীর পরিচয় না থাকারই সম্ভাবনা, কেননা এইসব রচনার পরিচয় বর্তমান শতাব্দীর আগে পর্যন্ত উন্মোচিত হয় নি। এই ক্ষেত্রে ইংরেজ মিশনারীদের সংকলনে 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ ভেদ'-এর গান সংকলিত না-হওয়াকে শুধু গোষ্ঠী-স্বাতন্ত্র্যের দিক থেকে না দেখে, অজ্ঞতা-প্রসূত বললেও অন্যায় হয় না।

২

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন থেকে 'য়িশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে গেয় গীত' নামে খ্রীষ্টসঙ্গীতের একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বেও শ্রীরামপুর খ্রীষ্টসঙ্গীতের সংকলন প্রকাশ করেছে।৬ কিন্তু ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত জন চেম্বারলেনের "গীত"-গ্রন্থের আগেকার কোন খ্রীষ্ট-সঙ্গীত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। চেম্বারলেনের গ্রন্থের এই গানগুলি আবার ১৮১৮-এর 'য়িশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে গেয় গীত'-এর দ্বিতীয় ভাগে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। 'য়িশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে গেয় গীত'-এর আখ্যাপত্র এইরকমঃ "য়িশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে গেয় গীত।—তাহার তিন ভাগ। প্রথম ইংগ্লণ্ডীয় স্বর। দ্বিতীয় চম্বর্লিন সাহেবের রচিত। তৃতীয় বাঙ্গালি স্বর।—আমি মনের সহিত আত্মাতে গীত গাইব। প্রথম করিন্তী ১৪ পর্ব ১৫ পদ। শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। ১৮১৮।" এই আখ্যাপত্রটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এই গ্রন্থে একই সঙ্গে ইংরেজ রচিত ও বাঙ্গালি রচিত খ্রীষ্টসঙ্গীত সংকলিত হয়েছে। ইংরেজ রচিত গানগুলির লেখক মোট পাঁচ, জন টমাস, উইলিয়ম কেরী, জশুয়া মার্শম্যান, উইলিয়ম ওয়ার্ড ও জন চেম্বারলেন। চেম্বারলেনের গানগুলি দ্বিতীয়-ভাগে আলাদাভাবে অন্তর্ভুক্ত, অপর চারজনের পদসমূহ মোট কুড়িটি প্রথম ভাগে, অর্থাৎ ইংলণ্ডীয় স্বরের অংশগত। এই কুড়িটি পদের মধ্যে জন টমাস ও উইলিয়ম ওয়ার্ডের একটি করে পদ, এবং উইলিয়ম কেরী ও জশুয়া মার্শম্যানের নটি করে পদ। প্রকৃতপক্ষে এই নটি পদের ওপর

নির্ভর করেই খ্রীষ্টসংগীত রচনার ইতিহাসে কেরীর অংশভাগ নির্দিষ্ট হয়েছে। কেরী আর কোন গান লিখেছিলেন কিনা, লিখে থাকলে তার পরিচয় কি, ইত্যাদি প্রশ্নের কোন সিদ্ধান্ত আর সম্ভব নয়। পরবর্তী-কালের খ্রীষ্টসঙ্গীতের সংকলনে৭ গীতকারদের নাম উল্লেখিত হয় নি; সেই-সব সংকলনে কেরীর ওই ন'টি গানের কোনও কোনটি সংশোধিত আকারে গৃহীত হয়েছে দেখা যায়, এবং ১৮১৮-র সংকলনের সাক্ষ্যে ওই পদগুলির রচয়িতা কেরী বলে নির্ধারিত হয়ে থাকে। ওই সব সংকলনে গৃহীত অন্য কোনও গান কেরীর রচনা কিনা, কোনও পূর্বতন বা সমকালীন সাক্ষ্যের অভাবে তা আর নির্ধারণ করবার উপায় নেই। আরও পরে, কলকাতার চার্চ মিশনারী সোসাইটির 'বঙ্গের খ্রীষ্টমণ্ডলীর ব্যবহারার্থ পুরাতন ও নূতন ধর্মগীত'-এর ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩য় সংস্করণে (১ম সংস্করণঃ ১৮৮৪) বা ঐ গ্রন্থের ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের সপ্তম মুদ্রণে উইলিয়ম কেরীর নামাংকিত ছয়টি গানের উল্লেখ আছে। এই উল্লেখ থেকে কেরীর রচিত খ্রীষ্টসংগীতের সংখ্যা ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে এক ধরনের বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু গানগুলির ভাষা ও রীতির সাক্ষ্যে সহজেই বলা যায় যে এগুলি শ্রীরামপুরের ডক্টর কেরীর রচনা নয়। এই গানগুলির দুইটি নির্বাচিত অংশ এখানে উদ্ধার করা যায়—

১। আমি যীশুর ছোট মেষ;
প্রতি দিন মোর সুখ অশেষ;
তিনি রক্ষা করেন বেশ—
তাঁর ছোট মেষ।

২। শান্তির যে সৌরভ, তাহা কিসে হয়?
যীশুতে হয়, যীশুতে হয়;
শান্তির যে সৌরভ, আজ করি বিনয়—
দাও মম মনে, হে নাথ।

এইসব রচনা ডক্টর কেরীর রচনা বলে মনে করবার যুক্তিসংগত কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না। এর প্রধান কারণ প্রাসঙ্গিক একটি তথ্য। ঐসব গ্রন্থে উইলিয়ম কেরীর নামে চিহ্নিত 'উজ্জ্বল জ্যোতিঃ হই—যীশুর অন্তরেতে। প্রদীপ যেমন জ্বলে ঘরে রাত্রিতে', গানটি ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে Bengal Conference, Methodist Episcopal Church প্রকাশিত 'ঐশিক সংগীত' পুস্তিকাতেও গৃহীত হয়েছে দেখা যায়। এটি পুস্তিকাটির ৫৫ সংখ্যক গান। এখান থেকে জানা যায়, এমিলি এইচ মিলারের মূল

রচনা থেকে উইলিয়ম কেরী এই গানটি অনুবাদ করেন। এই তথ্যানুযায়ী স্পষ্টতঃই বোঝা যাচ্ছে এই গানগুলি অন্য কোন উইলিয়ম কেরীর৮ রচনা, ডক্টর কেরীর নয়। ফলে বাংলা খ্রীষ্টসঙ্গীতে কেরীর অংশ 'য়িশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে গেয় গীত' (১৮১৮)-এর মোট নয়টি রচনার ওপরই একান্তভাবে নির্ভরশীল।

৩

'য়িশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে গেয় গীত'-এর প্রথম ভাগে. অর্থাৎ ইংলণ্ডীয় স্বর অংশে কেরীর মোট নয়টি গান সংকলিত হয়েছে। গানগুলির নীচে W.C. লেখা থেকে রচনাকার রূপে কেরীকে নির্ধারিত করা হয়ে থাকে। এই গানগুলি গ্রন্থের ঐ অংশের প্রথম, পঞ্চম, নবম, দশম, দশম(একাদশ ?), দ্বাদশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ ও অষ্টাদশ সংখ্যক। গানগুলি দুষ্প্রাপ্য বলে এখানে পর পর উদ্ধার করা হলোঃ

১ (প্রথম)।

তারণ আনন্দ দায়ক রব।
মোর কর্ণে বাজন যে।
সমস্ত পীড়ার প্রতীকার।
ও ত্রাসের নাশক সে।

পাপ অন্ধকারে ডুবিয়া।
পড়িলাম নর্কে প্রায়।
অনুগ্রহেতে উত্থিত হই।
দেখিতে সুখ অক্ষয়।

ত্রাণ জীবনদায়ক শব্দ যাউক।
সর্ব্ব পৃথিবীতে।
স্বর্গীয় লোকও যেন সব।
তম্মত গান করে।

হালিলুয়া স্তব ঈশ্বরে।

২ (পঞ্চম)।

দয়া কর আমার উপর।
ওহে য়িশু দয়াবান।

তুমি নরের নিস্তারকর্ত্তা।
শুন আমার নিবেদন।
শুন য়িশু শুন য়িশু
শুন আমার নিবেদন।

আমি বড় অপরাধী।
আমার পাপের বড় ভার।
মর্ত্ত্যে কারো শক্তি নহে।
আমার নিস্তার করিবার।
য়িশু ছাড়া কারো নহে।
শক্তি নিস্তার করিবার।

পাপের বিষেতে মন নষ্ট।
ধর্ম্মজ্ঞান ও কিছু নহে।
ধর্ম্ম ধ্বস্ত, সকল পামর।
স্বর্গযোগ্য কেমনে।
পাপের নাশে এমন নষ্ট।
স্বর্গযোগ্য কেমনে।

শুনিয়াছি মঙ্গলাখ্যান।
শুনিয়াছি তোমার নাম।
তুমি কত দুঃখ পাইয়া।
করিয়াছ পরিত্রাণ।
বিশ্বের নাশ নিবারণার্থে
করিয়াছ পরিত্রাণ।

এখন মঙ্গল সংবাদ চলে।
সর্ব্বসৃষ্টি ভরসা পায়।
আমি আইসি অন্য ডাকি।
খ্রীষ্টের কৃপায় রক্ষা হয়।
খ্রীষ্টের নামে।
নিবেদিলে রক্ষা হয়।

শুন ওরে সর্ব্ব পাপী।
শুন ২ উদ্ধার হও।
কিছু কর না বিলম্ব।
এখন ভক্তি করিও।
কাল যাইতেছে কাল যাইতেছে
এখন ভক্তি করিও।

তখন তোমরা তখন আমি।
কৃপা পাইয়া পাইয়া ত্রাণ।
সভা হইয়া স্বর্গস্থানে।
করিব তাঁর স্তবের গান।
আমরা গাইব হালিলুয়া।
য়িশু করেন পরিত্রাণ।

৩ (নবম)।

আইস তোমরা সর্ব্ব পাপী
য়িশু খ্রীষ্টকে কর সার।
তিনি ইচ্ছা করেন তোরদের।
সত্য ভক্তি জন্মাইবার।

য়িশু বিনা পাপির রক্ষক নাহি আর।

য়িশু দিলেন আপন রক্ত।
এবং পাইলেন মহা দুঃখ।
যেন মানুষ পূর্ণ মুক্ত
স্বর্গে পাইবে অক্ষয় সুখ।
য়িশু খ্রীষ্ট।
পাপি লোককে তরাইলেন।

যদি তোমরা মান নহ।
যদি খ্রীষ্ট না কর সার।
তবে হইতে পারে নহে।
তোরদের পাপেতে উদ্ধার।

য়িশু বিনা
আর নাহি তরাইবার।

৪ (দশম)।

কি কারণে করিব নিরর্থক কায।
কিম্বা তাহারদের সেবা যে করে বিনাশ।
আমি শুনিলাম কেমন এ জগতের নাথ।
অবতার হইয়া করিলেন পাপের উৎপাত।

পূর্ব্বকালে মোর প্রাণ ছিল সব অন্ধকার।
আমি চলিলাম যেমতে সব পাপি নর।
পাপের সাগরে ডুবিয়া মরিলাম প্রায়।
এবং জগতে উপায় না দেখা যায়।

শিব দুর্গা ও কালীর অসাধ্য মোর ত্রাণ।
কোন দেবতা না দেবী না নর পুণ্যবান।
কোন যাজক না যজ্ঞ না ধর্ম্ম না দান।
উদ্ধার করিতে পারে মোর বঞ্চিত প্রাণ।

সকল নিরর্থক এ সব কিছু নয়।
খ্রীষ্ট য়িশুর মরণে ভরসা পাই।
স্বর্গ পৃথিবী আর সকল তাহার নির্ম্মাণ।
তিনি সব রক্ষা করেন ও সকলের প্রাণ।

মোর পুণ্য মোর পাপ আমি করিব ত্যাগ।
মোর সম্ভ্রম মোর নাম আমার ইচ্ছা মোর রাগ।
আমি ফেলিব সব খ্রীষ্টের চরণের কাছে।
এবং য়িশুর মরণে করি বিশ্বাস।

সব পাপি লোক শুন এই সুসমাচার।
এ ধর্ম্ম এ নিস্তার এ ত্রাণকর্ত্তা ধর।
যা ২ তাঁহার আজ্ঞা তা হউক তোমার কাজ।
তবে জীবনে মরণে হয় তোমার যশ।

৫ (একাদশ)।

আমি যদি সর্ব্ব প্রাপ্তি
যত লোকে করে চায়।
ধন ও কীর্তি নিত্য ২
যদি বাড়ে অতিশয়।

তীর্থে ২ যদি বেড়াই
ধর্ম্ম স্থানে করি বাস।
ঘর কুটুম্ব যদি ছাড়ি
ঠাকুর ঠাকুরাণীর দাস।

সর্ব্ব শাস্ত্র যদি পড়ি
গুরু পায়ে করি পান।
বড় বিতরণ করি
তাহে হইতে নারি ত্রাণ।

পাপ বিমোচন পুণ্য আশা
তাহাতে উৎপন্ন নয়।
স্বর্গগমন করার ভর্সা
আমি ইহা বিনা পাই।

য়িশু তারক তোমাব মরণ
আমার জীবনে উপায়।
তোমার ধর্ম্ম পূর্ণ করণ
আমার নিশ্চিত আশ্রয়।

জাইত কুটুম্ব সকল ছাড়ি,
খ্রীষ্টের নিন্দা বুঝি মান।
তিনি যদি মোরে তারেন
হবে যশ তার অনুপম।

৬ (দ্বাদশ)।

অন্ধকারের পর্ব্বত দিয়া
দৃষ্টি কর হে মোর মন।

সব প্রতিজ্ঞা গাবিন আছে
    প্রসবিতে কালের ধন।
মহাসময়
    কখন হইবে স্বদ্দয়।

হিন্দ্ কাফর ম্লেচ্ছ সকল।
    দেখ্ক তাহার মহাজয়।
মহাযুদ্ধ সাঙ্গ হইয়া
    কাল্বরিতে পূর্ণ হয়।
মঙ্গলাখ্যান
    সংসার দিয়া জানা যাউক।

যারা অন্ধকারে বসে।
    দেখ্ক তাহার মহাভোর।
ইস্তক পূর্ব্ব লাগাদ পশ্চিম।
    প্রাতঃ খেদ্ক অন্ধকার।
ক্লীত উদ্ধার
    হউক একালে তোমার জয়।

মহাকালের দেখা শীঘ্র।
    আইস্ক ছাড়ি অনাদি ঘোর।
মঙ্গলাখ্যান সত্য বাক্য।
    চল্ক তোমার সমাচার।
যতদূরে
    খ্রীষ্টের রাজ্যের সীমা হয়।

মহামঙ্গলাখ্যান চল।
    জীন ২ ত্যাগ না।
সভার পর কর্ত্তৃত্ব কর।
    রাজ্য বাড়ুক ছাড়ুক না।
সর্ব্বজগৎ
    স্বেচ্ছাতে হউক তোমার বশ।

সাত (পঞ্চদশ)।

হে স্বর্গের স্তব্য প্রভু খ্রীষ্ট।
    অবিরাম তোমার গুণের তেজ।
স্বর্গ ও মর্ত্য লোকের রাজ।
    নাম তোমার লইতে কেন লাজ।
খ্রীষ্টনামে লজ্জা জন্মিলে।
    হউক সন্ধ্যার তারা দর্শনে।
অমৃত কিরণ তেজে তার।
    মোর মনস্তম তাড়িবার।

খ্রীষ্টার্থে লজ্জা জন্মিলে।
    হউক রাত্রির লাজ মধ্যাহ্নেতে।
য়িশু পোহাতি তেজোময়।
    দর্শনে মনস্তম যায়।
কি লাজ সে প্রিয় বন্ধুতে।
    যার কষ্টে পূর্ণ মুক্তি হয়।
নয় লজ্জিত হইলে লজ্জা এই।
    মোর অধিক প্রেম না হওনেতে।

খ্রীষ্টার্থে লজ্জা উচিত হয়।
মোর দোষে আপদ যদি নয়।
অভাব ভয় ক্রন্দন অপমান।
ও কাম্য মঙ্গল প্রাণের ত্রাণ।
তা নহিলে হত্যা তারক নাম।
মোর দর্প হবে অনুপাম।
মোর বড় আহ্লাদ তুষ্টি এই।
মোরার্থে য়িশু লজ্জিত নহে।

তাঁর বিধিতে প্রবৃত্ত হই।
তাঁর দুস্থ লজ্জা সর্ব্ব লই।
তাঁর বাক্য বলি সর্ব্ব ঠাঁই।
তাঁর আজ্ঞা মাননে নির্ভয়।

আট (ষোড়শ)।

য়িশু বলেন কহ যাইয়া।
সকল পাপি লোকের ঠাঁই।
খ্রীষ্ট যাকে করেন দয়া।
তাকে ডুবাইতে জুয়ায়।
য়িশু বলেন।
ভক্তেরদিগের মুক্তি হয়।

য়িশু এমন ডুবিত ছিলেন।
য়র্দন নদীর স্রোতেতে।
জগতে দেখাইবার কারণ।
আপনার নিয়ত উদয়।
ঈশ্বর আপনি
মহাদুঃখে ডুবিবে।

অদ্য তিনি বলিতেছেন।
আর না কর দেবের কায।
অদ্য মুক্ত হইয়া আইস।
প্রভু খ্রীষ্টের হও প্রকাশ।
খ্রীষ্টের আজ্ঞা
পালনেতে হইও বশ।

য়িশু তারক যাহা বলেন
তাহা নিত্য করিও।
লোকে বলে করে কেমন
কেন প্রিয় ভাবিও।
খ্রীষ্টের কারণ
লজ্জিত হইতে নারিব।

খ্রীষ্টের মরণ পূর্ণ হইলে।
পুনঃ তিনি উঠিলেন।
উত্থিত হইয়া কিছু পরে।
স্বর্গে করিলেন গমন।
অতএব
আমরা তাঁহার শরণ লই।

৯ (অষ্টাদশ)।

বিচার দিনে মহাশ্চর্য্য।
তূরী বাজন অতিশয়।
হাজার সন্ধ্যাগর্জ্জন মত।
সৃষ্টি কম্পমান করায়।
পাপী লোকের
মনের হইবে বড় ভয়।

মহাবিচারকর্তা দেখ।
মানুষরূপে ঈশ্বর হয়।
যারা তাঁরে আশা করে।
তাকে করিবে আশ্রয়।
ও হে তারক।
তখন তুমি আমার হও।

তাঁহার ডাকে মরা জীবে।
সিন্ধুমৃত্যু ত্যজিয়া।
সৃষ্টি শুদ্ধ কাঁপে ২।
তাঁহার দর্শনে পলায়।
নির্ভয় পাপী।
তখন তোমার হইবে কি।

ত্রাস অত্যন্ত ভয় অসংখ্যা।
ধরিবে তোর কম্পিত মন।
যখন শুনিবা তার বাক্য।
দূর শাপগ্রস্ত এই ক্ষণ।
যথায় শয়তান।
তথায় তোমার অপমান।

প্রভুর স্বীকার প্রেম ও সেবা।
যারা করে ক্ষিতিতে।
তিনি কবেন ধন্য তোমরা।
রাজ্য লও যা আমি দেই।
সর্ব্বক্ষণে।
ক্ষমা প্রেম জানিবে।

দুঃখে ও বিপক্ষতাতে।
ইহাতে আনন্দভাব।
প্রভুর দিবস আসিতেছে।
তখন ক্রন্দন হইবে স্তব।
জগৎ দগ্ধে।
আমারদের আনন্দলাভ।

৪

কেরীর এই গানগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি পরবর্তীকালের খ্রীষ্টগীত সংগ্রহে স্থান পেয়েছে। মোট নয়টি গানের মধ্যে অন্তত ছয়টি পরবর্তী-কালের স্বীকৃতি পেয়েছে, অন্তত তিনটি গান একাধিক সংকলনে গৃহীত হয়েছে, যেমনঃ 'দয়া কর আমার উপর', 'আইস তোমরা সর্ব্ব পাপী', এবং 'বিচার দিনে মহাশ্চর্য্য'। অন্যান্য গৃহীত গানের মধ্যে আছে, 'আমি যদি সর্ব্ব প্রাপ্তি; 'অন্ধকারের পর্ব্বত দিয়া' এবং 'হে স্বর্গের স্তব্য প্রভু খ্রীষ্ট'।

পরবর্তীকালে কেরীর এই গানগুলি গৃহীত হবার সময় কোনও না কোনও ভাবে সংশোধিত এবং সম্পাদিত হয়েছে। প্রথমেই কলকাতার ক্রিশ্চিয়ান ট্র্যাক্ট এ্যাণ্ড বুক সোসাইটির 'ধর্ম্মগীতে'র৯ ভাষ্য অবলম্বনে এই সংশোধন ও সম্পাদনার প্রকৃতি লক্ষ্য করা যেতে পারে। এই গ্রন্থে গানগুলিকে প্রথমেই বিষয় অনুযায়ী ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। 'খ্রীষ্টের বিষয়' অংশে কেরীর দুটি গান 'আইস তোমরা সর্ব্ব পাপী' ও 'দয়া কর আমার উপর' যথাক্রমে ২২ সংখ্যক ও ৩২ সংখ্যক গান রূপে সংকলিত। এবং 'বিচার দিনে মহাশ্চর্য্য' গানটি 'মরণ, পুনরুত্থান ও বিচারদিনের বিষয়' অংশে গ্রন্থের ১৩৫ সংখ্যক গান রূপে স্থান পেয়েছে। কিন্তু এই তিনটির কোনও ক্ষেত্রেই 'য়িশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে গেয় গীত'-এর মূল ভাষ্য পুরোপুরি রক্ষা করা হয় নি। এই সংগ্রহ-গ্রন্থে ৩২ সংখ্যক গান 'দয়া কর আমার উপর' খ্রীষ্টের প্রতি প্রার্থনার গান; মূলের সাতটি স্তবক এখানে চারটি স্তবকে সম্পাদিত হয়েছে। মূলের তৃতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম স্তবক বর্জিত; প্রথম দুটি স্তবক হুবহু গৃহীত। মূলের চতুর্থ স্তবক আমূল পরিবর্তিতঃ

শুনিয়াছি মঙ্গলাখ্যান
শুনিয়াছি তোমার নাম
পাইয়া নানা দুঃখ অপমান
করিয়াছ পরিত্রাণ

বিশ্বের রক্ষা করণার্থে
করিয়াছ পরিত্রাণ।

মূলের 'দুস্থ' 'দুঃখে' পরিবর্তিত হওয়ার সংশোধন ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে পরিবর্তিত পাঠ মূলের চেয়ে উৎকৃষ্ট না হওয়াতে সংশোধনের উপযোগিতা এখানে প্রমাণিত হয় নি। 'নাশ নিবারণ'-এর অর্থের অস্তিবাচকতা 'রক্ষা করণ'-এর প্রত্যক্ষতায় পরিবর্তিত হওয়া লক্ষণীয়, তবে এই পরিবর্তন সংশোধনে কোন উৎকর্ষের মাত্রা এনে দিতে পেরেছে বলে মনে হয় না। মূলের পঞ্চম স্তবকের পঞ্চম পংক্তিতে 'খ্রীষ্টের নামে' একবার আছে, বর্তমান সংগ্রহে তা পরিবর্তিত হয়েছে 'খ্রীষ্টের নামে ২'। 'খ্রীষ্টের নামে' দুবার পর পর উচ্চারণ করলে নাম মাহাত্ম্য কিছুটা অতিরিক্ত আবেগের স্পর্শ পায় অবশ্য, তথাপি চতুর্থ পংক্তিতে 'খ্রীষ্টের কৃপায়' থাকার জন্য মূলের পাঠেই যে সঙ্গতি সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে এই অতিরিক্ত সংযোজন খুব একটা গুরুতর প্রয়োজন চরিতার্থ করে বলে মনে হয় না। বর্তমান গ্রন্থের ২২ সংখ্যক গান 'আইস আইস সর্ব্ব পাপী' 'ত্রাণ পাইবার উপায়'-এর গান, মূলের তিনটি স্তবক এখানে দুটি স্তবকে সম্পাদিত; মূলের তৃতীয় বা শেষ স্তবকটি বর্জিত হয়েছে। গৃহীত দুটি স্তবকও নানা-ভাবেই সংশোধিত, এমন কি প্রথম পংক্তিটি পর্যন্ত সংশোধিত হওয়ার প্রথমে গানটির মূল অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে। গানটি প্রকৃতপক্ষে কেরীর গানেরই সংশোধিত ও সম্পাদিত রূপমাত্র। গৃহীত দুই স্তবকের সংশোধিত রূপ এইঃ

আইস আইস সর্ব্বপাপী
য়িশু খ্রীষ্টকে কর সার
তিনি চাহেন ওরে তাপী
তোদের ভক্তি জন্মাইবার।
য়িশু বিনা
পাপে রক্ষা নাহি আর।

য়িশু দিলেন আপন রক্ত
পাইলেন কত শত দুঃখ
তাতে মানুষ হইয়া মুক্ত
স্বর্গে পাইবে নিত্য সুখ।
য়িশু খ্রীষ্ট
পাপি লোককে তরাইবেন।

এই পাঠের 'তিনি চাহেন ওরে তাপী/তোদের ভক্তি জন্মাইবার'/বা, 'তাতে মানুষ হইয়া মুক্ত' অংশ মূলের ভাষা-ঘটিত কৃত্রিমতা ও অর্থঘটিত অস্পষ্টতার হাত থেকে অনেক মুক্ত। এখানকার 'খ্রিশু বিনা/পাপে রক্ষা নাহি আর'. মূলের চেয়ে অর্থের পরিধিকে অধিক তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে। মূলের 'তরাইলেন'-কে 'তরাইবেন'-এ পরিবর্তিত করে ক্রিয়ার কাল ও ভাবের সঙ্গতিই প্রতিশ্রুত করবার চেষ্টা করা হয়েছে। এই গানটির সংশোধন অবশ্যই মূলের চেয়ে গানটির আস্বাদন-যোগ্যতা অনেকখানি বাড়িয়েছে। এই সংকলনের ১৩৫ সংখ্যক গান 'বিচার দিনে মহাশ্চর্য্য' 'মহাবিচার দিন'-এর গান। এই গানটি মূলের পাঠকে প্রায় অবিকল অনুসরণ করেছে। শুধু প্রথম স্তবকের 'কম্পমান' শব্দ এখানে 'কম্পবান'. এই পরিবর্তন বরং ভুলেরই সূচক হয়েছে; আর অন্তিম স্তবকের 'আমারদের' এখানে 'আমাদের', —এই পরিবর্তন ভাষাঘটিত উন্নতির যোগ বহন করে। আরও একটি পরিবর্তনের কথা এখানে বলা দরকার। দ্বিতীয় স্তবকের 'মানুষরূপে ঈশ্বর হয়' এখানে হয়েছে 'মানুষ রূপে ঈশ্বরময়'। এই পরিবর্তন স্বাভাবিক ভাবেই যোগ্য বলে মনে হবে। এ ছাড়া গানটিতে সংশোধন বা সম্পাদনার আর কোনও চিহ্ন নেই। কোনও অংশ এখানে বর্জিতও হয় নি। এর প্রধান কারণ সম্ভবতঃ গানটির বিষয় ও ভাবগাম্ভীর্য। প্রথম দুটি গানে বার্জিত অংশ কম নয়, বোধহয় গানের আয়তনের ও সংহতির বিবেচনাতেই সংকলকরা এই অধিকার প্রয়োগ করেছিলেন।

এই গানগুলি চার্চ মিশনারী সোসাইটির ১৮৫২ (?)-র একটি গীত সংগ্রহেও স্থান পেয়েছে। সেখানেও পাঠ পরিবর্তন ও সম্পাদনার পরিচয় স্পষ্ট। ক্রিশ্চিয়ান ট্র্যাক্ট এ্যান্ড বুক সোসাইটির সংকলনের সঙ্গে এই পরিবর্তন ও সম্পাদনার কোন মিল নেই। এখানকার পরিবর্তনগুলি সাধারণভাবে ভাব ও ভাষার সাবলীলতার দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয়েছে।১০ এইসব পরিবর্তনের ভিত্তি বোধহয় ছন্দ ও গদ্যময় তরঙ্গহীনতার হাত থেকে উদ্ধারের সদিচ্ছা। এইসব পরিবর্তন কেরীর সময়কালের অনেক পরে হয়েছিল, সংকলকের অভিপ্রায় ও প্রয়োজনবোধে তা সংশোধিত ও সম্পাদিত। বোধহয় এই ধরনের সম্পাদকীয় হস্তক্ষেপ লিখিত ও মুদ্রিত মূল যেখানে পাওয়া যায়, সেখানে সমর্থিত হবে না। ক্রিশ্চিয়ান ট্র্যাক্ট এ্যান্ড বুক সোসাইটির সংকলনেও পরিবর্তন, সংযোজন ও বর্জন আছে, কিন্তু এই সময় কেরী অন্তত জীবিত ছিলেন। কোন বিপরীত তথ্যের অভাবে মনে করা যায় যে ঐ সংস্করণের পাঠ সংস্কারে কেরীর অনুমোদন

ছিল।১১ না থাকলে এই রীতি সংকলকের ইতিহাস-চৈতন্যের অভাব সূচিত করে। ,

যাই হোক, এইসব তথ্য থেকে অন্তত এই কথাটা বোঝা যাচ্ছে যে বাংলা খ্রীষ্টসঙ্গীতে কেরীর অবদান ঐতিহাসিক স্বীকৃতি পেয়েছে। পর্তুগীজদের আদি উদ্যমের কথা বাদ দিলে, বাংলা খ্রীষ্টসঙ্গীতের রচনায় শ্রীরামপুর মিশনারী গোষ্ঠীর আত্মনিয়োগ থেকেই এই রচনা-ধারার গতিপথটি মুক্ত হয়ে যায়, এবং এই কাজে শ্রীরামপুর তথা উইলিয়ম কেরীর ওপর বাংলা গানের একটি নূতন প্রশাখার স্থায়ী সূচনার কৃতিত্ব অবশ্যই বর্তায়।

৫

সজনীকান্ত দাস অনুমান করেছেন কেরীর অনেকগুলি খ্রীষ্টসঙ্গীতই শ্রীরামপুর-পর্ব সূচিত হবার পূর্ববর্তী রচনা। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দেব মধ্যে সেগুলি রচিত হয়েছিল।১২ শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে খ্রীষ্ট-সঙ্গীত সম্বলিত একটি পুস্তিকা যখন প্রথম মুদ্রিতের তালিকায় পড়ে, তখনই এই অনুমান গ্রাহ্য। তাছাড়া এই অনুমানের পিছনে পিরিয়ডিক্যাল এ্যাকাউণ্টসের বিবরণের ভিত্তি অংশতঃ থাকতে পারে। কিন্তু কোন গানগুলি তিনি এই সময় রচনা করেছিলেন, অথবা এর পরে তিনি আর কোনও গান লিখেছিলেন কিনা ও লিখে থাকলে সেই গানগুলি কি, তথ্যাভাবে সে সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে এখন আর পৌঁছানো সম্ভব নয়। আমাদের হাতে কেরীর যে নয়টি গান আছে, সেগুলি ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ঃ উপস্থিত এই তথ্যের ভিত্তিতে এইটুকু মাত্র বলা যায় যে কেরী ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গানগুলি রচনা করেছিলেন। তবে কেরীর এই গানগুলির পাঠ থেকে দেখা যায় যে তিনি যিশু-কে 'য়িশু' লিখেছেন। বাংলা বাইবেলের প্রথম সংস্করণে-এ (১৮০১) লেখা হয়েছে 'য়েশু'। দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮০৬) 'য়েশু' 'য়িশু' হয়েছে। এথেকে মনে হতে পারে, কেরী গানগুলি ১৮০১-এর পর লিখে থাকবেন: অথবা পূর্বে লিখিত হলেও পরে কেরী গানগুলির সংস্কার করেছিলেন। দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি অধিক-তর গ্রাহ্য বলে মনে হয়। তা হলেও কেরীর এই সংস্কার-সংশোধনের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় গ্রহণের কোন সুযোগ আমাদের নেই। তবে আপন রচনার বারংবার সংস্কারে অক্লান্ত কেরীর যে চরিত্র সম্বন্ধে আমরা প্রত্যয়িত, এখানেও তাঁর ব্যক্তিত্বের বিশিষ্ট এই উপাদান সক্রিয় ছিল বলে মনে করা যায়।

আমরা যাকে খ্রীষ্টসঙ্গীত বলেছি, খ্রীষ্টানরা তাকে সচরাচর Hymn

বলে থাকে। এবং hymn বা গান খ্রীষ্টান উপাসনার একটি অপরিহার্য উপাদান। খ্রীষ্টান উপাসনার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে সেখানে সমবেত উপাসনার একটি বাঞ্ছিত ঐতিহ্য আছে। এবং এই উপাসনায় প্রধান চারটি অঙ্গঃ (১) Hymns; (২) Prayer; (৩) Scripture Reading; (৪) Sermon. প্রথমেই গান; তারপর প্রার্থনা;১৩ তারপর শাস্ত্রপাঠ—সাধারণতঃ বাইবেলের কোন অংশ; এবং সবার শেষে উপদেশাত্মক বক্তৃতা, যার ভিত্তি বাইবেলের কোন একটি বাক্য বা প্রসঙ্গ,—এই বক্তৃতা সচরাচর শাস্ত্রপাঠ অংশের অনুসারী হয়। কাজেই খ্রীষ্টসংগীত প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টান উপাসনার একটি আনুষ্ঠানিক উপাদান। এইসব সংগীতের মূল প্রসঙ্গ খ্রীষ্ট এবং গানগুলি সাধারণভাবে স্তুতিমূলক। স্তুতি সব সময় প্রার্থনা নয়; খ্রীষ্টসংগীতের কোনও কোনওটিতে যদিও প্রার্থনার মনোভাব খুবই প্রকাশ্য। কিন্তু তথাপি সাধারণ লক্ষণে খ্রীষ্টসংগীত খ্রীষ্টের প্রশংসাসূচক সংগীতমাত্র।

যে কোনও ধর্ম্মসংগীতের বৈশিষ্ট্য সেই ধর্মের বোধে অবিচল বিশ্বাস ও নিষ্ঠা। ফলে যে কোনও ধর্ম্মসংগীতে একধরনের সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা অবশ্যম্ভাবী এক পরিণামের মত উপস্থিত থাকে। চর্যাগীত, বৈষ্ণব গান, শাক্তগান বা ব্রহ্মসংগীতের দিকে তাকালে এই অভিজ্ঞতা হয়। প্রকৃতপক্ষে, বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নিজস্ব চৈতন্যে যদি তাদের গানগুলি সমর্পিত না হয়, তাহলে সেই সব গানের নিজস্ব প্রেরণা ও ভিত্তি মিথ্যে হয়ে যায়। তথাপি বিশিষ্ট ধর্ম্মস্প্রদায়ের ধর্মসংগীত যে অনেক সময় সাম্প্রদায়িক বিশ্বাস ও বোধের সংকীর্ণতা অতিক্রম করে এক ধরনের সর্বজনীন আস্বাদনযোগ্যতা লাভ করে, তার কারণ সব সময় ধর্মনিরপেক্ষতা নয়। বস্তুতঃ, বিশিষ্ট ধর্মসাপেক্ষতা ও ধর্ম-নিরপেক্ষতা বিষম দুই গুণ। কোনও ধর্ম্মসংগীতের সার্বজনীনতাকে ধর্মনিরপেক্ষতা বলে লক্ষ্য করা ভ্রমাত্মক হবে। সর্বমানবিক বোধের পরিপ্রেক্ষিতেই সচরাচর সার্বজনীনতার ভিত্তি রচিত হয়। মানব-বোধ সম্প্রদায়-গণ্ডীর ঊর্ধে। বৈষ্ণব গান বা শাক্তগান যেই অংশে মানবভাবনা ও মানবরসে সিঞ্চিত, সেইখানেই তা বৈষ্ণবধর্ম ও শক্তিসাধনার পরিধিকে অতিক্রম করে গেছে। আবার, এই তথ্যকেই অন্য ভাবে বলা যায় যে, যেহেতু মানবপ্রসঙ্গই সাহিত্যরসের ভিত্তি, সেইজন্য সাহিত্যরস প্রতিষ্ঠাই ধর্মসংগীতকে ধর্মীয় গণ্ডীর সীমাবদ্ধতার হাত থেকে মুক্তি দেয়; অর্থাৎ সাহিত্যরস তথা কাব্যরসই এমন কি ধর্ম-সংগীতেরও সার্বজনীনতার ভিত্তি।

কেরী রচিত গানগুলিতে কাব্যরসের অভাব প্রায় দৃষ্টিগ্রাহ্য। ছন্দ বা

চিত্রকল্প রচনায় তাঁর অক্ষমতাই এর প্রধান কারণ। গদ্যধর্মী শব্দ প্রয়োগ, সমাস ও সন্ধি কণ্টকিত শব্দের অসংকুচিত ব্যবহারও গানগুলির কাব্যধর্মী উচ্চারণের পক্ষে হানিকর হয়েছে। 'বিশ্বের নাশ নিবারণার্থে', 'খ্রীষ্টার্থে লজ্জা জন্মিলে', ইত্যাদি অংশ প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা যায়। কিংবা 'তিনি ইচ্ছা করেন তোরদের/সত্য ভক্তি জন্মাইবার'-এর মধ্যে যে গদ্যময় প্রত্যক্ষতা, তা কতখানি কাব্যরস প্রতিষ্ঠায় সহায়ক প্রকরণগত উপাদান রূপে গ্রাহ্য হতে পারে, সে-সংশয়ও স্বাভাবিকভাবেই থাকে। তাছাড়া বাংলা ভাষার নিজস্ব প্রকৃতিতে তাঁর অধিকারের অসম্পূর্ণতাও তাঁর উচ্চারণকে অনেকখানি খর্ব করেছে। যেমনঃ 'ত্রাণ জীবনদায়ক **শব্দ যাউক**। সর্ব্ব পৃথিবীতে'।; '**সভা হইয়া** স্বর্গস্থানে।'; 'য়িশু **পোহাতি** তেজোময়।' ইত্যাদি। কোন কোন অংশে আবার অর্থনিষ্পত্তিতে অসুবিধা ঘটে দেখা যায়; এক ধরনের অস্পষ্টতায় এইসব অংশগুলি আচ্ছন্ন। মনে হয় তিনি যা বলতে চান এবং যা বলেন, এই দুয়ের মধ্যে সঙ্গতি প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এর কারণও স্বভাবতই বাংলা ভাষায় তাঁর অধিকারের সীমাবদ্ধতা বলে মনে হয়। যেমনঃ 'আমি আইসি অন্য ডাকি। খ্রীষ্টের কৃপায় রক্ষা হয়।', '**যেন মানুষ পূর্ণ মুক্ত**। স্বর্গে পাইবে অক্ষয় সুখ।' আরও দেখা যাবে যে কেরী নঞর্থক শব্দ প্রয়োগ বা অন্বয়ের সাধনে প্রায়ই বিভ্রান্তির পরিচয় দিয়েছেন; যেমনঃ 'যদি তোমরা **মান নহ**', 'তবে হইতে **পারে নহে**'; কিংবাঃ 'নয় লজ্জিত হইলে লজ্জা এই। মোর অধিক প্রেম না হওনেতে।'

তথাপি কেরীর গানগুলির মধ্যে ধর্মবিশ্বাসের অবিচল গাঢ়তা প্রতিষ্ঠিত। এই জাতীয় প্রশংসামূলক ধর্মীয় সঙ্গীতে বিশ্বাসের অকৃত্রিমতাই সার্থকতার প্রধান ভিত্তি। এই বিশ্বাস অন্তরের ভিতর-কেন্দ্র থেকে উৎসারিত, ফলে তা আন্তরিক। বিশ্বাসধর্মী অনুভূতির এই অকৃত্রিম আন্তরিকতাতেই এইসব গানের আবেদন নিরূপিত হয়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে এই বিশ্বাসময় অনুভূতিই যেহেতু গানগুলির প্রেরণাভূমি ও পরিণাম, সেইজন্য এর উচ্চারণ অনেকসময় উচ্ছ্বাসপূর্ণ হয়ে থাকে। এই অতিরেক প্রকাশ পায় নানা ভাবে। কেরীর গানগুলি সাধারণভাবে গাঢ় ও সংযত; তথাপি তাঁর গানে কোথাও কোথাও যে ভারতবর্ষীয় ধর্মবিশ্বাসের তুলনায় খ্রীষ্টমাহাত্ম্যের উৎকর্ষ ব্যাখ্যার প্রবণতা দেখা যায়, তাকে পরধর্ম-সহিষ্ণুতার অভাবজাত সংকীর্ণতা রূপে না দেখে, খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীর আবেগের অতিরেকের উদাহরণস্থল বলে লক্ষ্য করা যায় কিনা, সেই প্রস্তাব উত্থাপন করা চলে। মার্শম্যানের গান সম্পর্কে এই প্রস্তাব

করা সম্ভবতঃ উচিত হবে না, কেননা মার্শম্যানের গানে হিন্দুধর্মের প্রতি আক্রমণাত্মক মনোভাব অতিশয় প্রকট। মার্শম্যান যখন লেখেনঃ

কেন দুরাচার দেবের নাম।
হিন্দুরা নিত্য লয়।
হে প্রভু কর নাশ।
তার গর্হনীয় নাম।
পাপিষ্ঠ দুষ্ট দেবতা যে।
কি হবে তোমার সম।

তখন ওই 'দুরাচার', 'গর্হনীয়', 'পাপিষ্ঠ দুষ্ট' শব্দ বা শব্দবন্ধ ব্যবহারের পিছনে সঙ্গীতকারের মনস্তত্ব সহজেই ধরা পড়ে। কিন্তু কেরীর গানে এই আক্রমণাত্মক মনোভাব নেইঃ

হিন্দু কাফর ম্লেচ্ছ সকল।
দেখুক তাহার মহাজয়।

অথবা,

অদ্য তিনি বলিতেছেন।
আর না কর দেবের কাথ।

কেরীর এইরকম কথাগুলিতে ভারতবর্ষীয় ধর্মসাধনার তুলনায় খ্রীষ্ট ধর্মের মহনীয়তা ঘোষণা ও খ্রীষ্টমতিত্বের প্রতি আহ্বান উচ্চারিত হয়েছে। খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকের ভূমি থেকেই কেরী এই কথাগুলি লিখেছিলেন।১৪ কেরী হিন্দু ধর্ম শাস্ত্র সম্বন্ধে কখনো অসহিষ্ণুতার নিন্দনীয় পরিচয় অবশ্যই দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর গানগুলিতে অন্তত সেই জ্বালা ও সংকীর্ণতা ছিল না। কেরীর আরেকটি গানের একটি অংশ প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়ঃ

শিব দুর্গা ও কালীর অসাধ্য মোর ত্রাণ।
কোন দেবতা না দেবী না নর পুণ্যবান।
কোন যাজক না যজ্ঞ না ধর্ম্ম না দান।
উদ্ধার করিতে পারে মোর বঞ্চিত প্রাণ।

এখানে শিব, দুর্গা, কালী ইত্যাদি হিন্দু দেবদেবীর উল্লেখ প্রকৃত পক্ষে হিন্দু ধর্মের প্রতি গীতকারের কোন কটাক্ষ বহন করছে না; কোনও ধর্ম্মই যে পরিত্রাণ দিতে পারে না, ত্রাণস্বরূপ খ্রীষ্টের শরণেই যে তা সাধ্যঃ এই অনুভূতিময় বিশ্বাসের কণ্ঠস্বরই উদ্ধৃতাংশে বিশেষভাবে উচ্চারিত। বিশেষ কোন ধর্ম্ম বিশ্বাসের মধ্যে যেটুকু সংকীর্ণতা থাকা স্বাভাবিক,

এখানে তার চেয়ে বেশি কিছু নেই। এবং রচয়িতার মনোভাবে যে পরধর্মের প্রতি আক্রমণাত্মক অসহিষ্ণুতার বদলে আপন ধর্মবিশ্বাসের প্রগাঢ়তাই অধিক প্রাধান্য পেয়েছে, এই অভিজ্ঞতা আনন্দজনক।

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ কেরীর নামে প্রচলিত রচনা

১। কথোপকথন

'কথোপকথন' কেরীর নামে প্রচলিত একখানি গ্রন্থ। গ্রন্থখানির আখ্যা-পত্র এই রকম: 'Dialogues/intended/to facilitate the acquiring/of/The Bengalee Language./Serampore./Printed at the Mission Press/1801.' আখ্যাপত্রে সবচেয়ে লক্ষণীয় হলো: এখানে কোথাও কেরীর নাম ব্যবহৃত হয় নি। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে; তার আখ্যাপত্রেও কেরীর নাম নেই। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ব্যাকরণের চতুর্থ সংস্করণের সঙ্গে একত্রে 'কথোপকথন' প্রকাশিত হলে১ ব্যাকরণকারের নামের সঙ্গে কথোপকথনের লেখকের নামের অভিন্নতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তথাপি, আখ্যাপত্রে তাঁর নাম না থাকা সত্ত্বেও যে গোড়া থেকেই গ্রন্থখানি কেরীর নামে প্রচলিত হয়েছে, তার প্রধান কারণ গ্রন্থের ভূমিকায় কেরী সংকলকরূপে ও ইংরেজি অনুবাদক রূপে আত্ম-পরিচয় নিবেদন করেছেন।

কেরীর বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গে এইচ· এইচ· উইলসনের একটি মন্তব্য কথোপকথন সম্পর্কে আলোচনায় প্রথমেই উল্লেখ করা উচিত। তিনি লিখেছেন, কেরীর বাংলা ব্যাকরণে 'The Syntax is the least satis-factorily illustrated ; but this defect was fully remedied by a separate publication, printed also in 1801, of Dialogues in Bengali, with a translation into English.'২ এই বক্তব্য থেকে মনে হয়, উইলসন কথোপকথনকে কেরীর বাংলা ব্যাকরণের Syntax-অধ্যায়ের পরিশিষ্ট বা পরিপূরক রূপেই দেখতে চেয়েছেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ব্যাকরণ ও কথোপকথনের একত্রে প্রকাশও এই ধারণাকেই সমর্থন করে। কেরী এখানে বাংলা অন্বয় সম্বন্ধে বিশেষ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন, কোন সন্দেহ নেই, ভাষার প্রকৃতি নিরূপণেও তাঁর মনোযোগ বিশেষভাবে চোখে পড়ে। কেরীর ভাষা ভাবনার আলোকে কথোপকথনের গুরুত্বও অনেকখানি বেড়ে গেছে। এখানে তিনি যে ফ্রেজ ও ইডিয়মে পরিপূর্ণ বাঙালির মুখের ভাষাতেই শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তুলবার পরিকল্পনা করেছিলেন, তা স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে। ব্যাকরণের সঙ্গে ভাষার কথোপকথনরীতি শিক্ষা ভাষাশিক্ষার পরস্পর পরিপূরক পথ বলে তিনি মনে করতেন, এটা তাঁর

পরিকল্পনার একটি বিশেষত্ব; তাঁর মারাঠিভাষার ব্যাকরণেও এই জন্যই তিনি একটি কথোপকথন অংশ যুক্ত করেছিলেন। বিশেষ ধরনের শিক্ষার্থীর বিশেষ ধরনের প্রয়োজনের বোধ থেকেই বোধহয় এই ধরনের পরিকল্পনার সূচনা। এবং কেরী কথোপকথনকে ভাষাশিক্ষার্থীদের জন্য একটি পাঠ্য-পুস্তক রূপেই নিরূপণ করতে চেয়েছিলেন।

কথোপকথন সংকলনের পিছনে বাংলা ভাষা সম্পর্কে কেরীর বিশেষ প্রীতি ও কলেজের শিক্ষকরূপে তাঁর ওপর ন্যস্ত দায়িত্ববোধ বিশেষভাবে উপস্থিত ছিল। বাংলা ভাষা শিক্ষায় পাঠ্যপুস্তকের অভাববোধ থেকেই কেরী কথোপকথন সংকলন করেছিলেন, অর্থাৎ কথোপকথনকে তিনি প্রধানতঃ পাঠ্যপুস্তক রূপেই দেখেছেন। গ্রন্থের ভূমিকাতেই তাঁর এই মনোভাব ধরা পড়ে। তিনি স্বাধীনভাবে কথোপকথনের ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন যাতে তা ছাত্রদের কথোপকথনের ভাষা-প্রকৃতি অনুধাবনে আংশিকভাবে সহায়তা করতে পারে। তাঁর প্রস্তাবঃ শিক্ষার্থীরা মূল গ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদ করবেন, এবং আক্ষরিক অনুবাদে মূল ভাষ্যের ব্যাকরণ-সম্মত সদর্থক রূপ কখনোই ধরা পড়বে না; তখন শিক্ষার্থীরা সংকলকের স্বাধীন অনুবাদের সহায়তায় তাঁদের অনুবাদকে সঙ্গত করে তুলতে প্রয়াস পাবেন। কথোপকথনে ব্যবহৃত ভাষা ভাষার ব্যাকরণ সাধারণভাবে অমান্য না করেও অনেক সময়েই অন্যরকমের চেহারা নেয়, ভাষার প্রবাদ প্রচলনাদি কখনো কখনো বহিরঙ্গ দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি করে; কেরী মনে করেন, এ সবই বহিরঙ্গ, মনোযোগী অনুশীলনে বাইরের এই আপাত প্রতিবন্ধকতা সহজেই অতিক্রম করা যায়; এবং এই কাজে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবার জন্য তিনি কথোপকথনের ভাষার কয়েকটি ব্যাকরণগত বিশেষত্বের কথা মুখবন্ধে উল্লেখ করেছেন। কথোপকথন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তকরূপে কতটা সার্থক হয়েছিল, বা কেরীর প্রস্তাব ও প্রত্যাশা অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক রূপে এই গ্রন্থের যোগ্যতা কতখানি প্রমাণিত হয়েছিল, আজ এতদিন পরে আর সে কথা জানবার উপায় নেই। তবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে এই সংকলনটি কেরীর অবিস্মরণীয় অবদান রূপে যে অতঃপর বিবেচিত হয়েছে, তা দ্বারা কোনও মতেই পাঠ্যপুস্তক রূপে এই গ্রন্থের যোগ্যতা সম্বন্ধে কেরীর ভাবনার সমীচীনতা অস্বীকৃত হয় না।

ইতিহাসের দিক থেকে দেখতে গেলে কথোপকথন পাঠ্যপুস্তকের সীমাবন্ধন অতিক্রম করে গিয়েছিল।[৩] বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে কথোপকথনের গুরুত্ব প্রায় প্রত্যেক সমালোচকই আলোচনা করেছেন। বাঙালী জনসাধা-রণের বিভিন্ন স্তরের জীবনযাত্রার বাস্তবধর্মী পরিচয় কথোপকথনে

বিশ্বাসযোগ্যভাবে ফুটে উঠেছে। সামাজিক ইতিহাসের উপাদান রূপে ফলতঃ এই গ্রন্থের উপযোগিতা স্বীকৃত হতে বাধ্য। এই গ্রন্থে কথোপকথনের মাধ্যমে চরিত্রচিত্র রচনার যে রীতি গৃহীত হয়েছে, তার মধ্যে এক ধরনের নাটকীয়তা আছে; উপন্যাস বা নাটকে এই পদ্ধতিতেই সচরাচর চরিত্র উন্মীলিত হয়। এইদিক থেকে দেখতে গেলেও কথোপকথনের রীতির মধ্যে সৃষ্টিশীল গদ্যসাহিত্যের উপাদান-চর্চার সাক্ষ্য খুঁজে পাওয়া যাবে। এখানে যে চলিত ভাষার ব্যবহার করা হয়েছে, তার দ্বারা বিশুদ্ধ সাধু গদ্যরীতির প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম চলিত রীতির আবির্ভাব সূচিত হয়।৪ সাধু ও চলিত রীতির মধ্যে এক ধরনের অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব পরবর্তী বাংলা গদ্যের ইতিহাসে দীর্ঘকাল লক্ষ্য করা গেছে। এই সমস্ত বিভিন্ন দিক থেকে কথোপকথনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও সার্থকতা সচরাচর নির্ণীত হয়ে থাকে। এবং এই সমস্তই কথোপকথন রচনার তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্যের বাইরে তার অতিরিক্ত সার্থকতা সম্পর্কিত বিবেচনা।

২

গ্রন্থের মুখবন্ধের সূচনায় কেরী যা লিখেছিলেন, কথোপকথনের আলোচনায় তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে। তিনি লিখেছেন, 'When the following Dialogues were first begun, I did not intend to add a Translation; but I soon perceived, that if they were so extended as to include the most common conversations of the country people, it would be necessary to translate them, and to add a few observations.'৫ এই উক্তির মধ্যে দুই ভাগ: এক। কথোপকথনের ইংরেজি অনুবাদ সম্পর্কিত, যা থেকে মূল রচনায় কেরীর অংশ সম্পর্কে বিতর্কের সূচনা হতে পারে; দুই। কথোপকথনের প্রকৃতি ও ভাষা সম্বন্ধে কেরীর সমীক্ষা বিষয়ক।

'When the following Dialogues were first begun'—কথাটার মধ্যে এক ধরনের অস্পষ্টতা আছে, সন্দেহ নেই। কথোপকথন রচনার সূচনা সম্পর্কে এখানে অবহিত হওয়া গেলেও তার রচয়িতা সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না। পরে যখন তিনি লেখেন, 'if they were so extended as to include the most common conversations of the country people', তখন বোঝা যায় গ্রামীণ মানুষের কথোপকথন সংকলন একটি পরবর্তী ও পরিবর্তিত পরিকল্পনা। পরিকল্পনার এই পরিবর্তনের কারণ

সম্ভবতঃ 'that the work might be as complete as possible.'৬ সংকলনের পূর্ণাঙ্গতার জন্যই যে মূল পরিকল্পনাকে তিনি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করেছিলেন, স্বভাবতই এখানে তা মনে হতে পারে। এবং সংকলনের এই পূর্ণতার জন্য, কেরী লিখছেনঃ 'I have employed some sensible natives to compose dialogues up on subjects of a domestic nature.'৭ এই উক্তির সূত্রে তাহলে ধরা পড়ে যে, পরিবর্তিত পরিকল্পনায় 'most common conversations of the country people' এবং 'dialogues up on subjects of a domestic nature' যুক্ত হয়েছিল। তাহলে কথোপকথনের সামগ্রিক পরিকল্পনাকে তিনভাগে লক্ষ্য করা যায়ঃ ১। প্রাথমিক পরিকল্পনার অধীন যে কথোপকথন সংকলিত হয়, এর পরিচয় বা প্রকৃতি সম্বন্ধে অবশ্য কিছু জানা যায় না, তবে সাধারণ গ্রাম্যলোকের বা গৃহস্থালী সম্পর্কিত কথোপকথন থেকে এগুলি আলাদা হওয়া সম্ভব; ২। নিতান্ত সাধারণ গ্রাম্যলোকের কথোপকথন; ৩। গৃহ-স্থালীর বা সাধারণ সাংসারিক জীবনের কথোপকথন। তৃতীয় স্তরের মধ্যে স্বভাবতই স্ত্রীলোকের কথোপকথন পড়ে; কিন্তু কেরীর ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই স্তরের পরিধি আরও বিস্তৃত হয়ে যায়। যেসব কথোপকথনে 'considerable idea of the domestic Oeconomy of the country'৮ পাওয়া যায়, তা-ও এই স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ স্ত্রীলোকদের কথোপ-কথন ছাড়াও ভূমির কথা থেকে শুরু করে জমিদার-রাইয়ত স্তরের কথোপ-কথনও এই স্তরের অংতর্ভুক্ত হয়ে যায়। এই সমস্ত রচনায় সমাজ-অর্থনীতি ও সাংসারিকতার প্রসঙ্গ এমন পরস্পর যে এগুলিকে আলাদা করা সম্ভব নয়। ফলে দ্বিতীয় স্তর ও তৃতীয় স্তর বিষয়প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ একাকার হয়ে যায়। কেরী তৃতীয় স্তরের অনির্দিষ্ট লেখকদের সম্পর্কে স্পষ্টভাবেই আলোকপাত করেছেন, দ্বিতীয় স্তরের রচনা ও তৃতীয় স্তরের রচনার সংলগ্নতার কথা মনে রাখলে দ্বিতীয় স্তরের কথোপকথনের লেখক রূপেও সেই 'sensible natives'-এর কথাই উল্লেখ করা চলে। তাহলে প্রথম স্তরের রচনার লেখক সম্পর্কেই সমস্ত দ্বিধা ঘনীভূত হয়, কেননা এ-সম্পর্কে কেরী কখনোই স্পষ্টভাবে কিছু বলেন নি। এই স্তরের রচনায় কেরীর নিজস্ব অংশভাগ থাকতে পারে, না-ও থাকতে পারে; অপর কেউ এইগুলি রচনা করতে পারেন, না-ও পারেন। কাজেই চাকর ভাড়াকরণ থেকে পরিচয় পর্যন্ত অংশের রচয়িতা কেবল অনির্দিষ্ট নয়, তিনি বা তাঁরা সম্পূর্ণভাবেই অন্তরালবর্তী ও প্রচ্ছন্ন।

তথাপি কথোপকথনের প্রথম অংশের, অর্থাৎ য়ুরোপীয় ও বাঙালীর মধ্যে কথাবার্তা অংশের রচয়িতা রূপে কেরীকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত

করবার প্রয়াস দেখা গেছে।৯ এই প্রয়াস শুধু অনুসন্ধানের সীমায় আবদ্ধ থাকে নি, প্রত্যয়িত সিদ্ধান্তে পরিণাম পেয়েছে। এই অংশের রচয়িতা রূপে কেরীকে নির্দিষ্ট করার পক্ষে দুইটি সূত্র নির্ধারণ করা হয়েছেঃ এক, এই অংশের বাংলা সাবলীল ও স্বাভাবিক নয়, কাজেই ধরে নিতে হবে কেরী ক্লাশের জন্য আপন অভিজ্ঞতা থেকে এই কথোপকথনগুলি প্রথমে ইংরাজীতে লিখেছিলেন এবং পরে তার বঙ্গানুবাদ করেছিলেন, যার ফলে এই অংশের বাংলায় স্বাভাবিকতার অভাব ঘটেছিল; দুই, কেরী অনূদিত বাংলা বাইবেলের সঙ্গে এই অংশের ভাষারীতিগত কতগুলি সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

কেরী ইংরেজি থেকে এই অংশ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন, একথা সমকালীন সাক্ষ্যের অভাবে আজ এতদিনের ব্যবধানে নিশ্চয় করে বলা সম্ভবতঃ উচিত হবে না। এটা অনুমান মাত্র হতে পারে। তাছাড়া গ্রন্থের মুখবন্ধে কেরীর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কথোপকথন রচনা আরম্ভ হবার পরে পরিবর্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি ইংরেজি অনুবাদ যোগ করার কথা ভেবেছিলেন, এবং কেরীর এই বক্তব্যের সততায় অবিশ্বাস করবার কোন কারণ দেখা যায় না। এই অংশের রচনা যে 'affected', তার কারণ তার অনুবাদ-প্রকৃতি না-ও হতে পারে, কেরীর নিজের মৌলিক রচনাও এই ধরনের 'affected' হওয়া অসম্ভব নয়। কথোপকথনের এই অংশের ভাষারীতির সঙ্গে তাঁর বাংলা বাইবেলের সাদৃশ্যও প্রমাণ করে না যে এইগুলির রচয়িতা অভ্রান্তভাবেই কেরী। এতে কোন সন্দেহ নেই যে এই অংশের ভাষারীতি বাংলা ভাষার নিজস্ব প্রকৃতির দিক থেকে অনেকগুলি ক্ষেত্রেই অসঙ্গত, ফলে অস্বাভাবিক, এবং এই রীতি অনেক ক্ষেত্রেই স্পষ্টতঃ ইংরেজি-বাকরীতি অনুসারী; কিন্তু বাংলা ভাষারীতিতে ইংরেজির প্রভাবকে এই সময়কার এক সাধারণ লক্ষণ রূপেই সচরাচর দেখা হয়ে থাকে।১০ কাজেই এই অংশের রচয়িতা রূপে কেরীকে অভ্রান্তভাবে নির্ণয় করার সমীচীনতা সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে।

ডক্টর শিশিরকুমার দাশের একটি পর্যবেক্ষণ এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়ঃ 'It is not surprising that Carey's Bengali has an English flavour in respect of both its word collocations and sentence-structures. It must be remembered that there was no prose at that time and it is therefore not to be wondered at that Rām Rām Basu and the others tended to take Carey's Bengali translation as their own model.'১১ এই পর্যবেক্ষণটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে কেরী ও রামরাম বসুর ভাষারীতির সাদৃশ্য ব্যাখ্যার

পরিপ্রেক্ষিতে।১২ কাজেই এখানে সঙ্গত কারণেই এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কথোপকথনের য়ুরোপীয় ও বাঙালীর কথাবার্তা অংশের ভাষারীতির সঙ্গে কেরীর বাংলা বাইবেলের ভাষারীতির সাদৃশ্য আছে বলেই কেরীকে এই অংশের রচয়িতা বলে নির্ণয় করা সমীচীন কিনা। কেরীর বাংলা অনুবাদে রামরাম বসুর সহযোগিতার পরিমাণ কম ছিল না, বাংলা বাইবেলের ভাষারীতি ও রামরাম বসুর ভাষা-রীতির মধ্যে সাদৃশ্যও অতিশয় স্পষ্ট, ফলে কথোপকথনের এই অংশ রচনায় রামরাম বসুর সম্ভাব্যতার কথাও স্বাভাবিকভাবেই উঠতে পারে বলে মনে হয়। তাছাড়া এই অংশে ফার্সী শব্দ ব্যবহারের যে প্রাচুর্য দেখা যায়, তা যদিও প্রমাণ করে না যে এই অংশ রচনায় রামরাম বসুর হাত ছিল, তথাপি রামরাম বসু যে ফার্সীতে পটু ছিলেন, এই কথাটা অন্তত পাশাপাশি স্মরণযোগ্য। ডক্টর দাশ প্রতাপাদিত্য চরিত্রের প্রথম সাত পৃষ্ঠায় ও কথোপকথনে প্রথম দুটি কথোপকথনে ব্যবহৃত ফার্সী শব্দের অনুপাত কষেছেন; ফার্সী শব্দ প্রতাপাদিত্য চরিত্রের ঐ অংশে যেখানে ৮·৬৭%, সেখানে কথোপকথনের ঐ অংশে ৩৮·১৬%।১৩ তিনি প্রতাপাদিত্য চরিত্রে প্রসঙ্গ অনুযায়ী ফার্সী শব্দ ব্যবহারের কথাও তুলেছেন, 'If the choice of vocabulary in Pratapaditya Caritra is judged by its distribution by contexts it becomes quite clear that the choice of Persian words in this book is governed by the context.'১৪ এ থেকে স্পষ্টতঃই বোঝা যায় যে প্রসঙ্গ অনুযায়ী ফার্সী শব্দ ব্যবহারের বিবেচনা ও যোগ্যতা রামরাম বসু অর্জন করেছিলেন। কথোপকথনে য়ুরোপীয় ও খানসামা ইত্যাদির কথা-বার্তা অংশে ফার্সী শব্দের প্রাচুর্য যে 'context' অনুযায়ী স্বাভাবিক, একথা কেরীও লক্ষ্য করেছেন।১৫ 'context' অনুযায়ী ফার্সী শব্দের ব্যবহারে রামরামের দক্ষতা ও এই অংশে 'context' অনুযায়ী ফার্সী শব্দ ব্যবহারের তথ্য স্বাভাবিক ভাবেই এই অংশ রচনায় রামরাম বসুর যোগাযোগ সম্পর্কে একটি অনুমানকে জাগ্রত করে তোলে।

প্রকৃতপক্ষে, য়ুরোপীয় ও খানসামা প্রভৃতির কথোপকথন অংশ কার রচনা হতে পারে, এ নিয়ে অনুমান করা চলে মাত্র। এই অংশ কেরীর বা রামরাম বসুর—যে কোনও ব্যক্তির রচনা হওয়া সম্ভব, অন্য কোনও অপরিচিতের হলেও আজ এই কালব্যবধানে সে সম্পর্কে কোন প্রত্যায়িত ঘোষণা সম্ভবপর নয় বলেই মনে হয়।

৩

কথোপকথনে কেরীর অংশভাগ নিশ্চিত রূপে নিরূপণের একটি মাত্র সূত্র আছে। প্রথম সংস্করণ থেকে সংস্করণান্তরে তিনি যে পরিবর্তন করেছিলেন, তার সূত্রেই কথোপকথনে কেরীর যথার্থ ভূমিকা নির্ণয় করা চলে। তিনি নিজেকে কথোপকথনের সংকলকমাত্র বলেছেন, কিন্তু সম্পাদকরূপেও তিনি এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, সংস্করণান্তরের পরিবর্তনগুলিই তার প্রমাণ। এই পরিবর্তন প্রকৃতি ও প্রকারে বিচিত্র, কিন্তু এরই মধ্য থেকে ধরা পড়ে যে তিনি ভাষাচিন্তায় অন্বয়ের বিশুদ্ধিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। প্রথম সংস্করণে বাক্যরীতিতে অন্বয়ের যে অশুদ্ধি আছে, যাকে কেন্দ্র করে বাংলা প্রকরণে ইংরেজি প্রভাবের কথা গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হয়ে উঠেছে, দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি তা থেকে সুস্পষ্টভাবে মুক্ত হতে চেষ্টা করেছেন। প্রথম সংস্করণে অন্বয় অশুদ্ধির মূল কারণ প্রধানতঃ ক্রিয়াপদের সঠিক অবস্থানের বিপর্যয়; দ্বিতীয় সংস্করণে ক্রিয়াপদকে তিনি যথাস্থানে স্থাপন করে বাংলা অন্বয়ের শুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের প্রাসঙ্গিক পাঠ পাশাপাশি উদ্ধার করলে কেরীর ভাষামনস্কতার এই পরিচয়টি স্পষ্ট হতে পারে। এখানে কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধার করা হলো:

প্রথম সংস্করণ, ১৮০১	দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮০৬
১। কল্য সরকারকে হুকুম দেহ আব একটার কারণ (চাকর ভাড়া করণ, পৃঃ ২৮)	১। কল্য আর একটা কিনিতে সরকারকে হুকুম দেহ (পৃঃ ২৮)
২। মুনসি আসিয়া সাহেবের হুজুর নজর দিয়া দেখা করিলে সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাকে (সাহেব ও মুনসি, পৃঃ ৩০)	২। মুনসি আসিয়া সাহেবের হুজুর নজর দিয়া দেখা করিলে সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন (পৃঃ ৩০)
৩। তুমি আমার চাকর থাকিয়া শিক্ষা করাইবা আমাকে (ঐ। পৃঃ ৩২)	৩। তুমি আমার চাকর থাকিয়া আমাকে শিক্ষা করাইবা (পৃঃ ৩২)
৪। আমি আইলাম রাজমহল হইতে (যাত্রা। পৃঃ ৪৬)	৪। আমি রাজমহল হইতে আইলাম (পৃঃ ৪৬)
৫। আমি বাঙ্গালায় পোঁছিলাম আর বৎসর শ্রাবণ মাসে (পরিচয়। পৃঃ ৫০)	৫। আমি আর বৎসর শ্রাবণ মাসে বাঙ্গালায় পোঁছিলাম (পৃঃ ৫০)

ক্রিয়াকে যথার্থ স্থানে স্থাপন করাতেই অন্বয়ের বিশুদ্ধি প্রতিশ্রুত হয় না, বিভিন্ন পদের যথাস্থান স্থাপনও বিশুদ্ধ অন্বয়ের অন্যতম শর্ত। কেরী সাধারণভাবে এই ক্ষেত্রে যে সচেতনতার পরিচয় দিতে পেরেছেন, উপরের উদ্ধৃতি থেকেই তা বোঝা যায়; তথাপি কখনো কখনো এ ক্ষেত্রে তিনি যে বিভ্রান্ত হয়েছেন, তার পরিচয়ও আছে। যেমনঃ প্রথম সংস্করণেঃ 'মুই আগাম টাকা দিব তাকে' (মজুরের কথাবার্তা, পৃঃ ৯০), দ্বিতীয় সংস্করণেঃ 'মুই আগাম তাকে টাকা দিব'। এখানে ক্রিয়াপদের যথার্থ সংস্থানও বাক্যের অন্বয়কে বিশুদ্ধ করতে পারে নি। আবার এই সময়ের বাংলায় অনেক সময় দেখা যায়, নঙর্থক ক্রিয়াপদের অনিশ্চিত রূপ ব্যবহারের ফলে বাক্যের অর্থসংগতি বিপর্যস্ত হয়, কেরী কথোপকথনের এইরকম ত্রুটি সংশোধনেও মনোযোগ দিয়েছিলেন। যেমনঃ

প্রথম সংস্করণ	দ্বিতীয় সংস্করণ
১। রাত্রে থাকিবার জায়গা নহে (যাত্রা। পৃঃ ৪৮)	১। রাত্রে থাকিবার জাগা নাই (পৃঃ ৪৮)
২। এখানে আক্ষের ক্ষেত্র নহে (ভূমির কথা। পৃঃ ৫৪)	২। এখানে আক্ষের ক্ষেত নাই (পৃঃ ৫৪)

এছাড়া ক্রিয়াপদের শেষে 'ক' বা 'হ' যুক্তি প্রত্যাহার করার প্রবণতার মধ্যে কেরীর সংস্কারমুক্তির মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম সংস্করণের পারিবেক, আসিবেক, খাবেক, দিবেক, যাবেক, হবেক, জানহ, রাখহ ইত্যাদি দ্বিতীয় সংস্করণে পারিবে, আসিবে, খাবে, দেবে, যাবে, হবে, জান, রাখ-তে পরিবর্তিত হয়েছে।

ব্যক্তিবাচক সর্বনাম শব্দ বাংলায় অনেকগুলি; যেমন, আমি, মুই; তুই, তুমি, আপনি; সে, তিনি। এর মধ্যে 'মুই' শব্দ উত্তমপুরুষ বাচক সর্বনাম, গ্রাম্য অঞ্চলে কোথাও কোথাও এর ব্যবহার প্রচলিত, শিষ্ট সমাজে এর ব্যবহার প্রায় নেই। কথোপকথনে 'মুই' শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় এবং যে সমাজ স্তরে এর প্রয়োগ স্বাভাবিক, সেই স্তরের লোকের মুখেই এই শব্দের প্রয়োগে বাস্তবতা ও সংগতির শর্ত পালিত হয়েছে। দৃষ্টান্তরূপে মজুরের কথাবার্তায় 'মুই আগাম টাকা দিব তাকে' (১ম সং) উল্লেখ করা যায়। কিন্তু মধ্যম পুরুষবাচক সর্বনাম 'তুই'-র ব্যবহার সমাজের শ্রেণী ও স্তরের অনুযায়ী ঘটে না, এর ব্যবহার ঘনিষ্ঠতা বা তুচ্ছতা দ্যোতক। তেমনি 'তুমি' শব্দ। তেমনি সম্মান বা গৌরবার্থে 'আপনি' শব্দ। কিন্তু সর্বত্রই তুই, তুমি বা আপনি যে শব্দই ব্যবহৃত হোক না কেন,

ক্রিয়াপদের রূপ সর্বনাম রূপ অনুসরণ করে; অর্থাৎ 'তুই'-র পর 'যা', কিন্তু 'যাও' বা 'যান' নয়, 'তুমি'র পর 'যাও', কখনোই 'যা' বা 'যান' নয়। গ্রাম্য অঞ্চলে কখনো কখনো সর্বনাম শব্দের স্তর অনুযায়ী ক্রিয়াপদ ব্যবহারের স্বাভাবিক রীতি লঙ্ঘিত হতে দেখা যায়; ব্যাকরণগত ত্রুটি বা শুদ্ধির অভাব থাকা সত্ত্বেও এই বিপর্যয়ে গ্রাম্য বাস্তবতার স্বাদ পাওয়া যায়; যেমন 'শুন তুই অমার টাকা ফের দেও সুদ সুধা তাহা না দিলে পেয়াদা দিব তোকে' (১ম সংঃ মহাজন-আসামি। পৃঃ ৬০), বা, 'তোর কথা শুনিব না আজি অর্দ্ধ টাকা দেও' (ঐ।ঐ)। কিন্তু কেরী দ্বিতীয় সংস্করণে এইসব ব্যাকরণগত অশুদ্ধি সংশোধন করতে চেষ্টা করেছেন; যেমনঃ 'শুন তুই সুদ সুদ্ধা আমার টাকা ফের দে না দিলে তোকে পেয়াদা দিব', বা, 'তোর কথা শুনিব না আজি অর্দ্ধ টাকা দে।' কেরীর এই সংস্কার বিশুদ্ধ ভাষারূপ অনুসন্ধানে তাঁর মনোযোগের পরিচয়ই বহন করে। কিন্তু কখনো কখনো তিনি যে তুই, তুমি, ব্যবহারের সঙ্গত রীতি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহ দেখান নি, তার দৃষ্টান্তও আছেঃ 'মহাশয় তুই মা বাপ তোমার চরণ ছাড়িমু না মহাশয় আপনি বিচার করুন হাল গরু বিক্রি করিলে চাস চলিবে কেমন করিয়া।' (১ম সংঃ মহাজন-আসামি। পৃঃ ৬০)। দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি একই ব্যক্তিকে তুই, তুমি, সম্বন্ধে উত্থাপন অংশটুকুকে বহাল রেখে ব্যাকরণগত শুদ্ধিকরণে উদাসীনতা দেখিয়েছেন সম্ভবতঃ গ্রাম্য আসামীর অসহায় আর্তি ও বাস্তবতার সত্য প্রতিষ্ঠার আগ্রহে।

কথোপকথনে বানানের শুদ্ধিকরণে কেরীর মনোযোগ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একদিক থেকে দেখতে গেলে একে বিশুদ্ধ ভাষারূপ সন্ধানেরই অন্যতম প্রবণতা বলা যায়। বাংলা বাইবেলে বা কথোপকথনের প্রথম সংস্করণে বানানের অশুদ্ধ রূপের প্রাচুর্য বিশেষ দৃষ্টিকটু, বোঝা যায় বানান তখন পর্যন্ত স্থিরতা অর্জন করতে পারেনি। ভাষারূপের শুদ্ধ-স্থিরতা প্রতিষ্ঠায় কেরীর অনলস প্রয়াসের দৃষ্টান্ত কথোপকথনের দ্বিতীয় সংস্করণে দেখা যায়। একথা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে সত্য যে প্রযত্ন সত্ত্বেও দ্বিতীয় সংস্করণে কেরী সর্বত্র এই ক্ষেত্রে সফল হন নি, অর্থাৎ বাংলা বানান এই সময় পর্যন্ত স্থিরতা অর্জন করতে পারে নি; কিন্তু কেরীর এই মানসিকতাটি বাংলা ভাষার বিশুদ্ধরূপ সন্ধানে তাঁর ভূমিকাকে আলোকিত করে তোলে। অবশেষে ইতিহাসমালা-তে এসে লক্ষ্য করা যায় যে বাংলা বানান মোটামুটি স্থির ও শুদ্ধরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। প্রথম সংস্করণের অশুদ্ধ শব্দরূপ কথোপকথনের দ্বিতীয় সংস্করণে কিরূপ বিশুদ্ধ করা হয়েছে, তার কয়েকটি উদাহরণ এখানে উদ্ধার করা যায়ঃ কায়স্ত/কায়স্থ;

সোধ/শোধ; সান্তনা/সান্ত্বনা; অতীথি/অতিথি; বিষিষ্ট/বিশিষ্ট; মিষ্টান্ব/মিষ্টান্ন; নির্ম্ময়/নির্ণয়; স্ত্রিলোক/স্ত্রীলোক; জর/জ্বর; স্বন্দ/স্বচ্ছ; সাখ্যাত/সাক্ষাৎ; ইত্যাদি। আবার কেরীর এই বিশুদ্ধি সন্ধান কিছু কিছু শব্দের পরিবর্তন সাধনের মধ্যেও ধরা পড়ে। যেমনঃ প্রথম সংস্করণের 'হেন্দোস্থানি'; 'ইংরেজি' 'কায', 'আসহে' 'একত্তর', 'আন্তে', 'ধুলো' ইত্যাদি দ্বিতীয় সংস্করণে যথাক্রমে 'হিন্দুস্থানি', ইংরাজি', 'কার্য্য', 'আইসহে', 'একত্র', 'আনিতে', 'ধুলা'-য় পরিবর্তিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই শুদ্ধি-করণের প্রকৃতি আলাদা; এর মধ্যে ভাষার সাধুরূপের প্রতি সমর্থন প্রস্তাবিত হয়েছে। কখনো কখনো অবশ্য মনে হতে পারে কেরীর সংস্কৃত-মনস্কতা এই পরিবর্ত্তনে ধরা পড়ে, যেমন, 'কায'-কে 'কার্য্য', 'ধুলো'-কে 'ধুলো' লেখায়, কিন্তু সাধুরূপে সংস্কৃত রূপানুসরণ একটি সাধারণ প্রবণতা। সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে কথোপকথনে কেরী কোথাও কোথাও এমনভাবে শব্দ পরিবর্তন বা সংস্কার করেছেন, যা থেকে চলিত ভাষারূপের প্রতি তাঁর পক্ষপাত প্রমাণিত হয়। যেমনঃ প্রথম সংস্করণের 'কহ', 'দেহ', 'চাহি', 'কেহ', 'নাহি', 'দেখিয়াছিস', ইত্যাদি দ্বিতীয় সংস্করণে যথাক্রমে 'কও', 'দেও', 'চাই', 'কেউ', 'নাই', 'দেখেছিস',-এ পরিবর্তিত হয়েছে। এই দৃষ্টান্তগুলিতে অধিকাংশই ক্রিয়াপদ, এবং চলিতরূপ সাধুরূপ থেকে সচরাচর ক্রিয়াপদের ও সর্বনামের রূপ ভেদেই সনাক্ত করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে কোন কোন পরিবর্তিত রূপ অনায়াসে সাধুরীতিতেও ব্যবহৃত হতে পারে, এবং এর আগের দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে কিছু কিছু শব্দ সহজেই চলিত রীতিতেও ব্যবহারযোগ্য। ভাষা রীতিতে এইসব শব্দের অনেক-গুলিরই সাধু ও চলিত এই উভয়ধর্ম আছে সত্য, তথাপি দুইটি ক্ষেত্র আলাদাভাবে নিরূপণ করা হয়েছে সংস্কারকের প্রবণতার আলোকে। কথোপকথনে সাধু ভাষারূপের প্রতি কেরীর মনস্কতার পরিচয় খুবই স্পষ্ট, তথাপি চলিত রূপের প্রতি তিনি উদাসীন থাকতে যে পারেন নি তার প্রধান কারণ গ্রন্থের বিষয় পরিকল্পনা। কথোপকথনের ভাষা-বাস্তবতা চলিত রূপেই যথার্থরূপে প্রতিশ্রুত হতে পারে, ভাষা সম্পর্কিত বিবেচনায় এই বাস্তবজ্ঞান থেকে কেরী যে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিলেন না, এই তথ্য স্বভাবতই এখানে ধরা পড়ে।

৪

কেরী কথোপকথনের সংকলক ও সম্পাদক। সম্পাদকরূপে এই গ্রন্থে তাঁর উপস্থিতি দুইভাবে লক্ষ্য করা যায়ঃ এক, মূল পাঠ-অংশের সংস্কার

সাধনে; দুই, মুখবন্ধে গ্রন্থের ভাষারীতি বিষয়ে সমীক্ষায়। ভাষা সংস্কারক কেরীকে ইতিপূর্বে লক্ষ্য করা হয়েছে; ভাষার বিশুদ্ধি প্রতিষ্ঠায় তাঁর আগ্রহ সেখানে স্পষ্ট। এই বিশুদ্ধি শুদ্ধ 'অন্বয়, শুদ্ধ বানান ও সাধু রূপের অনুসন্ধানে তিনি প্রত্যয়িত করতে চেষ্টা করেছেন। আবার মৌখিক ভাষার চলিত রূপের প্রতিও তিনি উদাসীন থাকতে পারেন নি প্রাসঙ্গিক কারণেই।

মুখবন্ধেও তিনি কথোপকথনের ভাষারীতির প্রকৃতিগত বিভিন্নতা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তাঁর এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের শ্রেণীভেদ অনুযায়ী তাদের কথোপকথনের ভাষার যে ভাষাভেদ হয় বা হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে তিনি বিশেষ সচেতন ছিলেন। দেশীয়দের তিনি যখন বিচিত্র কথোপকথন রচনায় নিযুক্ত করেন, তখন তাঁদের রচনায় 'natural stile of the persons supposed to be speakers'১৬ প্রতিশ্রুত দেখতে চেয়েছিলেন। কাজেই এ বিষয়ে কেরীর চৈতন্য রচিত কথোপকথনের ভাষাবিবেচনা করতে গিয়ে উদ্বুদ্ধ হয়নি, তার আগেই তা উন্মীলিত হয়েছিল। মুখবন্ধে তিনি স্পষ্টতই ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে য়ুরোপীয়র সঙ্গে যখন কোন খানাসামা কথা বলে তখন তার উক্তিতে কিছু বিকৃত ইংরেজি ও পর্তুগীজ শব্দের সঙ্গে প্রচুর আরবি-ফার্সী শব্দ ব্যবহৃত হয়, চরিত্র ও কথোপকথনের বিষয় প্রসঙ্গের দিক থেকে দেখলে এই ভাষা-সঙ্করত্ব স্বাভাবিক বলেই মনে হবে। 'যাত্রা', 'পরিচয়' ইত্যাদি অংশে ভাষারীতিকে কেরী 'grave stile' বলেছেন সম্ভবতঃ এই কারণে যে এখানে ভাষাসঙ্করের পরিচয় নেই, এবং এই অংশে সাধুরীতির প্রাধান্য সহজেই লক্ষ্য করা যায়। ভূমিজীবীর কথোপকথনের ভাষা যে এই ধরনের ভাষারীতি থেকে কিছুটা আলাদা অতঃপর তিনি তা-ও লক্ষ্য করেছেন। পুরুষের ভাষা ও মেয়েদের ভাষার মধ্যে যে একটা ভেদ আছে, কেরী তা স্পষ্টরূপেই উল্লেখ করেছেন; মেয়েদের সাধারণ কথোপকথনে ও কোন্দলে যে ভাষা প্রয়োগের তারতম্য ঘটে তাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। মৎস্যজীবীর ভাষার মধ্যে যতই ত্রুটি থাক, তা সেই শ্রেণীস্তরের পরিপ্রেক্ষিতেই লক্ষ্য করা উচিত বলে তিনি মনে করেন।১৭

ভাষার প্রকৃতি-ভেদ সম্পর্কে কেরীর সচেতনতার পরিচয় এই তথ্যগুলি থেকে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ, ব্যক্তির শ্রেণীভেদে ও প্রসঙ্গ ও উক্তির বিষয় ভেদে ভাষার ভেদ সাহিত্য-সঙ্গতি সম্পর্কিত বিবেচনারই একটি গুরুতর সূত্র; দীনবন্ধুর নাটকের ভাষাসঙ্গতি এই সূত্রেই নিরূপিত হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাসঙ্গতি বিষয়ক বিবেচনায় এই সূত্রই প্রধানতঃ

চরিতার্থ। কেরীর সাহিত্য-ভাষা-সঙ্গতি সম্পর্কিত এই চেতনা উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক অভিজ্ঞতাঃ ভাষার সংস্কৃতধর্মী সাধু নিরূপণ যেখানে তিনি চান, সেখানে তাঁর ভাষার শোধনচিন্তার বা বিশুদ্ধিকরণ-প্রবৃত্তির সক্রিয়তা; কিন্তু সেই প্রাথমিক দায়িত্বের ক্ষেত্র উত্তীর্ণ হয়ে এলে, সৃষ্টিশীল সাহিত্যের ভাষার ক্ষেত্রে যে অন্যতর বিবেচনার স্থানও অনেকখানি, তিনি অন্তত এ-সম্পর্কে বিশেষ সচেতনতার পরিচয় দিতে পেরেছেন।

২। ইতিহাসমালা

কেরীর নামে প্রচারিত আর একটি গ্রন্থের নাম 'ইতিহাসমালা'। গ্রন্থখানির আখ্যাপত্র এইরকমঃ 'ইতিহাসমালা। /OR/A COLLECTION OF/STORIES/IN/THE BENGALEE LANGUAGE./COLLECTED FROM VARIOUS SOURCES./BY W. CAREY, D. D./Teacher of the Sungskrit, Bengalee, and Mahratta Languages,/in the College of Fort William/SERAMPORE :/ Printed at the Mission Press../1812.'

ইতিহাসমালার প্রকাশকাল ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দ। এই তারিখ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করবার কোন কারণ নেই; তথাপি আখ্যাপত্রটির মধ্যে যে অসংগতি আছে তাকে উপেক্ষা করা উচিত কিনা তা-ও ভেবে দেখা দরকার। গ্রন্থখানি সংকলিত হয়েছে 'By W. Carey, D. D.' তিনি এখানে 'Teacher of the Sungskrit, Bengalee, and Mahratta Languages.' কেরীর এই পদাধিকার ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী, এবং ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাংলা ও সংস্কৃতের অধ্যাপক (Professor)। আমেরিকার ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টর অব ডিভিনিটি' (D.D.) উপাধি তিনি পান ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে। আখ্যাপত্রে বর্ণিত কেরীর পদাধিকার থেকে মনে হতে পারে যে গ্রন্থখানি ১৮০৭-এর পূর্বে সংকলিত হয়েছিল, কিন্তু কেরীর উপাধি অনুযায়ী বোঝা যায় ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের আগে তা সংকলিত হওয়া সম্ভব নয়। ১৮১২-তে পাঞ্জাবী ব্যাকরণ; ১৮১৫-তে ও ১৮১৮-তে যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়, তাতে সর্বত্রই কেরী 'প্রোফেসর' ও 'ডি·ডি·'। প্রকৃতপক্ষে ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে গ্রন্থকারের পরিচয় জ্ঞাপনের এটাই ছিল সাধারণভাবে গৃহীত রীতি; ফলে ইতিহাসমালায় কেরী যখন ডি·ডি·, তখন তাঁর পদাধিকার 'টিচার' লেখা খুবই বিস্ময়কর। একে শুধু ভুল বললেও বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে না। তাছাড়া ইতিহাসমালার প্রকাশকাল ১৮১২ সম্পর্কেও সন্দেহ করবার কোন তথ্য উপস্থিত নেই। সব মিলে ইতিহাসমালার প্রকাশনার কাল সম্বন্ধে একটা অমীমাংসিত সংশয় থেকে যাচ্ছে।

ইতিহাসমালা সম্বন্ধে সাহিত্যের ইতিহাসে অবশ্য আরও সংশয় দেখা গেছে। সমসাময়িক প্রকাশনার তথ্য যেসব সূত্র থেকে সাধারণভাবে গৃহীত হয়ে থাকে, যেমন রোবাকের গ্রন্থ,১ লং-এর তালিকা বা শ্রীরামপুর মেময়ার্স,

তার কোনটিতেই ইতিহাসমালার নাম নেই। ইতিহাসমালার যে খণ্ডখানি জাতীয় গ্রন্থাগারে আছে, তা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বই। এর আখ্যা-পত্রের পৃষ্ঠায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের নাম হস্তাক্ষরে লিখিত আছে, এবং তার উল্টা পৃষ্ঠায় ত্রিভাষায় 'পুস্তক কালেজ ফোর্ট উলিয়ম' ছাপ মারা আছে। কাজেই এই গ্রন্থখানি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে গিয়েছিল। এবং এই গ্রন্থ প্রকাশনায় কলেজের কোন আর্থিক আনুকূল্য ছিল কিনা তা জানা না গেলেও, কলেজের 'শিক্ষক' যে এর রচয়িতা বা সংকলক, তা স্পষ্টতঃই জানা যায়। কাজেই কলেজের আনুকূল্যে বা কলেজের শিক্ষক-পণ্ডিত-মুন্‌সি দ্বারা রচিত পুস্তকাবলীর তালিকা যখন রোবাক উল্লেখ করেন, তখন তাতে এই গ্রন্থের নাম না থাকা বিস্ময়কর বলেই মনে হওয়া স্বাভাবিক। সজনীকান্ত দাস সমকালীন সূত্রে ইতিহাসমালা সম্পর্কে এই নীরবতার কারণ সম্বন্ধে অনুমান করেছেন, "১১ই মার্চের অগ্নিকাণ্ডে 'ইতিহাসমালা'র অধিকাংশ কপি পুড়িয়া যায়।"২ কিন্তু এই অনুমানও বিশ্বাসযোগ্য নয়। ডীল তাঁর গ্রন্থে Monthly Circular letter of the Serampore Missionaries (March 1812) থেকে অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত ও ক্ষতিগ্রস্ত গ্রন্থের ও পাণ্ডুলিপির যে তালিকা উদ্ধৃত করেছেন,৩ তাতে-ও কোথাও ইতিহাসমালার নাম নেই। হতে পারে মার্চের আগে গ্রন্থটি ছাপা হয়নি, অথবা তার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়ে প্রেসে যায় নি। কিন্তু তখনও পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়ে প্রেসে না গেলে ১৮১২-তে গ্রন্থখানির ছাপা হওয়া অসম্ভব ব্যাপার, কেননা অগ্নিকাণ্ডের পর দীর্ঘ-দিন প্রেসে কাজ হতে পারে নি। আবার গ্রন্থের আখ্যাপত্র থেকে গণনা শুরু করলে ইতিহাসমালার পৃষ্ঠাসংখ্যা দাঁড়ায় ৩২০। আখ্যাপত্র থেকে পৃষ্ঠা গণনার রীতি কথোপকথনেও দেখা যায়। এই ক্ষেত্রে স্পষ্ট বোঝা যায় যে ইতিহাসমালায় কোন ভূমিকা সংযোজিত হয় নি। কেরীর নামে প্রচারিত কোন গ্রন্থের ভূমিকা না থাকা বিস্ময়কর সন্দেহ নেই। কাজেই ইতিহাসমালার প্রকাশনা ও আনুষঙ্গিক সম্বন্ধে অস্পষ্টতার আড়াল এখন পর্যন্ত অপসারিত হয়নি।

ইতিহাসমালা কেরীর নামে প্রচারিত গ্রন্থ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে গ্রন্থগুলির সঙ্গে কেরীর যোগাযোগ নির্দিষ্ট হয়েছে, তার মধ্যে বাংলা ব্যাকরণ, বাংলা-ইংরেজি অভিধান ও ইতিহাসমালায় কেরীর নাম মুদ্রিত হয়েছে, ধর্মপুস্তক ও কথোপকথনে তাঁর নাম নেই। এই থেকে স্বভাবতঃই মনে হতে পারে যে ইতিহাসমালার রচনায় কেরীর অংশভাগ আছে। কিন্তু ইতিহাসমালা আদৌ কেরীর রচনা নয় বলে প্রায় প্রত্যেক সমালোচকই

অনুমান করেছেন।৪ এর কারণ প্রধানতঃ এই যে ধর্মপুস্তকের কেরীর ভাষার সংগে ইতিহাসমালার ভাষার কোন মিল নেই। এখানে ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের নিউটেস্টামেণ্টের ও ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ইতিহাসমালার ভাষা-দৃষ্টান্ত তুলনামূলক পর্যবেক্ষণের জন্য উদ্ধার করা যেতে পারেঃ

নিউ টেস্টামেণ্ট ১৮১১ঃ

ক। কিন্তু য়োহন একথা কহিয়া তাহাকে মানা করিল তোমার হাতে ডুবিত হওন আবশ্যক আমার আছে এবং তুমি কি আমার কাছে আসিতেছ?
খ। এবং দেখ স্বর্গ হইতে এক রব হইয়া বলিল এ আমার প্রিয় পুত্র যাহাতে আমার বড় তুষ্টি।

ইতিহাসমালা ১৮১২ঃ

ক। তুমি এখন যৌবনহীনা ও বয়োধিকা খুল্লনা পরম সুন্দরী তাহার রূপ লাবণ্যে সওদাগর বশ হইবে তোমাকে চাহিবে না।
খ। তাহার পর রাজার মরণানন্তর পাত্র সভাসদ প্রভৃতিরা বিচার করিয়া রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন।
এই দুইরকমের ভাষার মধ্যে ইতিহাসমালার ভাষার উৎকর্ষ সহজেই প্রতীত হয়। এই অংশের ভাষার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বাক্যগঠনরীতির স্পষ্টতায়। সমসাময়িক দুই ভাষার এই ব্যবধানই ইতিহাসমালার উৎকৃষ্ট রচয়িতা রূপে কেরীকে লক্ষ্য করার পক্ষে প্রধান অন্তরায়।
এবং কেরীও ইতিহাসমালায় তাঁর ভূমিকাটি স্পষ্টভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন আখ্যা পত্রে। তিনি জানিয়েছেন, 'Collected from various sources/by/ W. Carey.' অর্থাৎ কেরী নিজেকে গ্রন্থের সংকলক রূপেই চিহ্নিত করেছেন। কথোপকথনের আখ্যাপত্রে এইরকম কোন সূত্র না পেলেও, তাঁর ভূমিকাসূত্রে কেরীকে কথোপকথনের সংকলক রূপেই আত্মপরিচয় দিতে দেখা গেছে। কিন্তু কথোপকথনে কেরী সংকলকমাত্র নন, তিনি সম্পাদকও বটে। পরবর্তী সংস্করণে ভাষা সংস্কারের পরিচয় থেকেই তাঁর এই সম্পাদকের ভূমিকাটিই প্রত্যায়িত হয়। কিন্তু, ইতিহাসমালার কোন পরবর্তী সংস্করণের অভাবে এবং মুখবন্ধের অভাবে এখানে সম্পাদক রূপে কেরীর ভূমিকা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। পাণ্ডুলিপির অভাবে প্রথম

সংস্করণেও সম্পাদনার কোন নির্দিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না। কাজেই কেরীকে ইতিহাসমালার সংকলন-কর্তা রূপে লক্ষ্য করাই সমীচীন।

ইতিহাসমালা একখানি গল্প-সংকলন, এতে মোট ১৫০টি গল্প সংকলিত হয়েছে। কিন্তু এই সংকলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। কথোপকথন সংকলনের একটি অব্যবহিত উদ্দেশ্য ছিল; প্রকৃতপক্ষে সেই সময়কালে উদ্দেশ্যহীন প্রকাশনার দৃষ্টান্ত প্রায় নেই বললেই চলে। ইতিহাসমালা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বা অন্যত্র পাঠ্য পুস্তক রূপে কখনো ব্যবহৃত হয় নি, ভারতীয় ভাষা-সাহিত্যের ঐশ্বর্য-প্রকাশক কোন উদ্যম রূপেও একে দেখা যায় না; এখানকার গল্পগুলি গল্পরসে, কিছুটা তির্যকতায় সাধারণভাবে আকর্ষণীয় বলা চলে। অর্থাৎ কোন উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে ইতিহাসমালা বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক গল্প-সংগ্রহ।[৫] মৌলিক এই অর্থে যে গল্পগুলি অনুবাদমাত্র নয়, যদিও প্রায় সবগুলি গল্পেরই পূর্বসূত্র আছে। সজনীকান্ত দাস অবশ্য সব গল্পই অনুবাদ বলে উল্লেখ করেছেন,[৬] এবং সুশীলকুমার দে-ও এর অনেকগুলি গল্পই অনুবাদ বলে মনে করেন।[৭] ইতিহাসমালার সব গল্প যে অনুবাদ নয় তার প্রমাণ ১১২ সংখ্যক গল্প। ধনপতি সদাগরের দুই পত্নী লহনা ও খুল্লনার কথা এই গল্পে বর্ণনা করা হয়েছে। এই গল্পকে বোধ হয় কোনও অর্থেই অনুবাদ বলা যায় না। যে গল্পগুলির উৎসসূত্র হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্রে নিহিত, সুশীলকুমার দে সম্ভবতঃ সেই গল্পগুলিকে অনুবাদ বলতে চেয়েছেন। কিন্তু গোলোকনাথ বা মৃত্যুঞ্জয়ের হিতোপদেশের অনুবাদ ও ইতিহাসমালার এই ধরনের গল্পগুলি পাশাপাশি মিলিয়ে দেখলেই দুয়ের প্রকৃতি ও ধর্ম যে স্বতন্ত্র, তা বোঝা যায়। বস্তুতঃ 'tales re-told' বললে যা বোঝায় ইতিহাসমালার গল্পগুলি তাই। একে অনুবাদ বললেও তার সীমাবন্ধন সম্পর্কে সচেতন থাকা দরকার বলে মনে হয়।

ইতিহাসমালার গল্পগুলি বিভিন্ন সূত্র থেকে আহরিত। হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র ইত্যাদির সঙ্গে চোর-চক্রবর্তী, আকবরের ব্রাহ্মণমন্ত্রী বীরবর বা লহনা-খুল্লনার গল্প-সূত্রও এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। গল্পের উৎসের যেমন বিভিন্নতা, গল্পের লেখকেরও তেমনি বিভিন্নতা অনুমান করা যায়। এই অনুমানের কারণ অবশ্য গল্পের রচনারীতির বিভিন্নতা। এখানে সাধারণভাবে ইতিহাসমালার গদ্যরীতির কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যাচ্ছেঃ

১। এক দিবস তিনি রাজাকে কহিলেন যে হে মহারাজ আমি অনেক

কাল পর্য্যন্ত তোমার নিকটে আছি কিন্তু আপনি আমার বিদ্যা বিবেচনা করিয়া কিছু ধনাদি দিলেন না একারণ আমার দীনত্ব দূর হয় না যদি আপনি আজ্ঞা দেন তবে আমি একবার অন্য দেশে যাই। (প্রথম কথা। পৃঃ ৩)

২। কোন সাধু লোক ব্যবসায়ের নিমিত্তে সাধুপুর নামে এক নগরে যাইতেছিলেন পথের মধ্যে অতিশয় তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কাতর হইলেন নিকটে লোকালয় নাই কেবল এক নিবিড় বন ছিল তাহার মধ্যে জলের অন্বেষণে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে তথাতে এক মনুষ্য একাকী রহিয়াছে। (দ্বিতীয় কথা। পৃঃ ৫)

৩। চতুর্থ জীব দান করা মাত্রে হস্তী জীবিত পাইয়া সে চারিজনকে শুণ্ডে ধরিয়া শিলাতে আচ্ছাড়িল। (পঞ্চম কথা। পৃঃ ১৩)

এই তিনটি অংশের রচনারীতিতে স্পষ্টতা ও প্রাঞ্জলতা প্রধান গুণ। এখানে বিশুদ্ধ বাংলা বাক্যরীতি সতর্কতার সঙ্গে অনুসৃত, সংস্কৃত-মনস্কতায় রচনাকে অযথা ভারাক্রান্ত করা হয় নি। অন্বয়ের এই বিশুদ্ধি ইতিহাসমালার গল্পগুলির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ৩ সংখ্যক দৃষ্টান্তে জীবন অর্থে 'জীব' শব্দের প্রয়োগ, জীবন পাইয়া অর্থে 'জীবিত পাইয়া'র ব্যবহারের ত্রুটি লেখকের দুর্বলতার পরিচায়ক; এবং 'আচ্ছাড়িল' নাম ধাতুর প্রয়োগও পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তের তুলনায় রচনারীতির প্রসাদ-গুণের পক্ষে হানিকর বলে বিবেচিত হবে। ৩ সংখ্যক দৃষ্টান্তের সূত্রে এই জন্য অনুমান করা যায় যে এই অংশের লেখক পূর্ববর্তী অংশের লেখক থেকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হওয়াই স্বাভাবিক।

ইতিহাসমালায় অন্য রকমের রচনারীতির সঙ্গেও পরিচয় হয়। এখানে সেই রকম কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যায়ঃ

১। এই কথোপকথনের পর গ্রামোপান্তে গিয়া বৃক্ষমূলোপবিষ্ট এক উদাসীনকে মনুষ্যরূপী দেখিয়া তাহার স্থানে কিঞ্চিৎ ধন যাচ্ঞা করিলে উদাসীন কহিলেন (তৃতীয় কথা। পৃঃ ৮)

২। ধনহীন জ্যোতির্বিৎ কোন ব্যক্তি দুঃখী হইয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে নিত্য ব্রহ্মরূপ পরমৈশ্বর্য্য আর মণি মুক্তা প্রবাল স্বর্ণ রূপ্যাদি এতাদৃশ মহারত্নদ্বয়ের অন্যতরাবলম্বন ব্যতিরেকে পৃথিবীস্থ লোকেরদের উপায়ান্তর নাই কিন্তু কাল স্বভাবেতে প্রবৃত্তির ন্যূনতা আর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বহুতর ক্লেশসাধ্য আদ্যরত্নে মনঃসংযোগ হওয়া দুর্ঘট (চতুর্থ কথা। পৃঃ ৯)

৩। কোন এক মহারণ্যে এক সিংহ সস্ত্রীক হইয়া বসতি করেন কিন্তু সন্তানহীনতাপ্রযুক্ত সর্বদা উদ্বিগ্ন দৈবাৎ সগর্ভা এক কুকুরী ঐ বনে

উপস্থিত হইয়া সিংহপত্নীর সহিত সাহিত্য করিয়া বাস করিলেক। (অষ্টম কথা। পৃঃ ১৮)

উদ্ধৃত অংশগুলিতে সংস্কৃতানুসরণ খুবই স্পষ্ট। একে প্রধানতঃ সংস্কৃতানুসারী গদ্যরীতি বলা যায়। সংস্কৃতানুসরণ এখানে তৎসম শব্দ প্রয়োগের প্রাচুর্যে নয়, সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদের প্রয়োগে লেখকের উৎসাহই এই প্রবণতাকে স্পষ্ট করে তুলেছে। ১ সংখ্যক দৃষ্টান্তে সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদের প্রয়োগ অন্বয়ের বিশুদ্ধি ও ভাষার স্পষ্টতাকে বিশেষ ক্ষুণ্ণ করে নি; কিন্তু ২ সংখ্যক দৃষ্টান্তে এই প্রবণতা রচনারীতিকে যে যথেষ্ট পরিমাণে আড়ষ্ট করেছে, তাতে সন্দেহ নেই। ৩ সংখ্যক দৃষ্টান্তে 'সাহিত্য করিয়া বাস' প্রয়োগে যথেষ্ট পরিশ্রম আছে,৮ কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যের প্রভাবে 'উপস্থিতা হইয়া' লিখে লেখক তাঁর অসহায় সংস্কৃতানু-গত্যেরই পরিচয় দিয়েছেন। একসঙ্গে দেখলে তিনটি দৃষ্টান্তই সংস্কৃতঘনিষ্ঠ রচনারীতির পরিচয়স্থল, এবং আলাদাভাবে দেখলে তিনটির রচনাভঙ্গির মধ্যেই স্বাতন্ত্র্য আছে। ১ সংখ্যকের অন্বয়বিশুদ্ধি ২ সংখ্যকে নেই, এবং তিন সংখ্যকের অদ্ভুত ধরনের প্রয়োগ ও রীতি ১ সংখ্যকে বা ২ সংখ্যকে নেই। প্রকৃতপক্ষে, ২ সংখ্যক ও ৩ সংখ্যকের রচয়িতা যে অভিন্ন ব্যক্তি নয়, তা সহজেই অনুমান করা চলে।

আবার ইতিহাসমালার কোথাও কোথাও বাংলা ভাষার সাধারণ প্রকরণও লঙ্ঘিত হয়েছে দেখা যায়। যেমন ১১২ সংখ্যক গল্পে সওদাগরের জাল চিঠিতে খুল্লনার সঙ্গে আচরণ বিষয়ে লহনার প্রতি নির্দেশ: 'অতএব দিবা তারে অন্নকষ্ট করিবা যৌবন নষ্ট রাখাইবা তাহারে ছাগল।' এখানে সর্বনামের সাধু ও চলিত রূপ ব্যবহারে সঙ্গতিরক্ষার প্রতি অমনোযোগের চেয়ে ক্রিয়াপদের স্থানবিপর্যয়ই শুদ্ধ রচনারীতিকে বেশি ক্ষুণ্ণ করেছে। কেরী বিশুদ্ধ অন্বয়বিধি প্রতিশ্রুত করতে কতখানি যত্নবান ছিলেন, কথোপকথনের সংস্কারে তার পরিচয় পাওয়া যায়, তিনিই যে এই ত্রুটিপূর্ণ রচনা ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা হতে দিয়েছিলেন, তাতে মনে হয় তিনি ইতিহাসমালায় সম্পাদকের ভূমিকায় নিজেকে স্থাপন করতে চান নি বা করেন নি। এখানকার রচনারীতিতে যে বৈদেশিক প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তা থেকে মনে হতে পারে যে এই অংশের রচয়িতা পূর্ববর্তী অংশ-গুলির রচয়িতা থেকে আলাদা। যাই হোক ইতিহাসমালার গল্পগুলির উৎসসূত্রের বিভিন্নতার মত তার লেখকদের বিভিন্নতা সম্পর্কেও কোন সন্দেহ থাকে না।

ইতিহাসমালার ভাষার উৎকর্ষ সম্বন্ধে কোন মতান্তর নেই। বাংলা

ভাষার উন্নয়নে কেরীর উদ্দীপনা ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ও শ্রীরামপুর মিশনে এই বিষয়ে যে মনস্কতার সূচনা হয়েছিল, ইতিহাসমালার ভাষা সম্ভবতঃ তারই পরিণামফল। সুশীলকুমার দে ইতিহাসমালার ভাষারীতি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, 'best example of a chaste and simple style, more dignified than the colloquial prose of the Dialogues, more pure and correct than the prose of Ram Ram Basu, or Candi Charan, yet less affected than the ornate and laboured style of Mrityunjay.'১

কেরীর ভাষা চিন্তায় সংস্কৃতমনস্কতার সত্য স্বীকার করেও বলা যায় তিনি বাংলা ভাষার একটি বিশুদ্ধ রূপ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন; সংস্কৃত-মনস্কতা তাঁর বিশুদ্ধিসন্ধানেরই ফল মাত্র। ইতিহাসমালায় সংস্কৃত-মনস্কতার পরিচয় আছে, এবং এই মানসিকতার ভিত্তিতেই বৈদেশিক শব্দপ্রভাব অতিক্রমী সাধু গদ্যের বিশুদ্ধধর্ম এখানে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সাহিত্যে বিষয় ও প্রসঙ্গ অনুযায়ী ভাষার প্রকৃতি নিরূপিত হওয়া উচিত, এই বিষয়ে কথোপকথনে কেরী যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয়ও দিয়েছেন। কিন্তু ইতিহাসমালায় বিষয়, প্রসঙ্গ বা চরিত্রের স্তর অনুযায়ী ভাষার প্রকৃতি নিরূপিত নয়। ফলে ইতিহাসমালার ভাষার মধ্যে এক ধরনের নিস্তরঙ্গ একচারিতা অনুভব করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়ঃ

রাজকন্যাঃ 'হে রাজপুত্র আমাকে স্পর্শ করিও না তোমার মস্তক ছেদন হইবে।' (পৃঃ ২৭)

পণ্ডিতের স্ত্রীঃ 'হে নাথ দেখ চন্দ্রের ঐত্যাশ্বর্য্য শোভা হইয়াছে।' (পৃঃ ২৭৮)

দোবলা দাসীঃ 'তুমি এখন যৌবনহীনা ও বয়োধিকা খুল্লনা পরম সুন্দরী তাহার রূপ লাবণ্যে সওদাগর বশ হইবে।' (পৃঃ ২৪১)

প্রতিমা বিক্রেতাঃ 'এ প্রতিমা যে স্থানে থাকেন সে স্থানে লক্ষ্মী কদাচ থাকেন না ইহার এই গুণ আর ইহার মূল্য সহস্র মুদ্রা।' (পৃঃ ২১১)

শৃগালঃ 'এ মত কর্ম্ম কখনও করিও না যাহার দুষ্ট স্বভাব তাহার প্রসন্নতাও ভয়ঙ্কর তুমি কি জান না।' (পৃঃ ৩১)

এখানে পাঁচটি বিভিন্ন স্তরের চরিত্রের সংলাপে ব্যবহৃত ভাষা প্রায় এক-রকম; রাজকন্যা বা দোবলা দাসী একই ভাষায় কথা বলে, প্রতিমাবিক্রেতা বা শৃগালের মুখের ঐ ভাষাও সঙ্গতিপূর্ণ হয় নি। এমন কি তির্যক বা ব্যঙ্গ সৃষ্টিতেও ভাষাকে লঘু হতে দেওয়া হয় নি। এই সব কারণেই ইতিহাসমালার ভাষার সাধু প্রকৃতি সমকালীন রচনার ইতিহাসে যখন

বিশিষ্ট ও উল্লেখযোগ্য তখনও সৃষ্টিশীল সাহিত্যের ভাষাবিবেচনায় যে আরও সূক্ষ্মতা ও বৈচিত্র্য প্রত্যাশিত, তার অভাব দেখা যায়।

ইতিহাসমালার গল্পগুলি সাধারণভাবে নীতিকথামূলক। অধিকাংশ গল্পের শেষেই গল্প থেকে পাওয়া নীতিকথা হিতোপদেশের মত করে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। কোথাও তা গল্পারম্ভে বা গল্পের মাঝ-খানে উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে স্পষ্টভাবে হিতোপদেশ দান করা হয় নি সেখানেও গল্পগুলির উপদেশাত্মক চরিত্র মোটামুটি ধরা পড়ে। এরই মধ্যে দুয়েকটি গল্প নীতিকথার ধর্ম বা উপদেশাত্মকতা অতিক্রম করে গেছে, সেখানে গল্প কৌতূহলই প্রধান সামগ্রী। যেমন ৩২ সংখ্যক গল্প। এখানে রাজরাণীর যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, গল্প ও চরিত্রের মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যায় তার আধুনিকতা ধরা পড়ে। গল্পটি এখানে উদ্ধার করা হলোঃ

এক রাজা ছিলেন তাঁহার রাণীর মন্ত্রির সঙ্গে আত্যন্তিকী প্রীতি ছিল। এক দিবস মন্ত্রী রাণীকে কহিল হে রাণি আমারদের গোপনভাবে এ প্রীতি রাজা জ্ঞাত হইলে প্রাণে বধিবেন অতএব চল এ স্থান হইতে দেশান্তরে যাই অদ্য নিশাভাগে এই নগরের অন্তে পুষ্করিণীর তটে বৃক্ষের মূলে আমি বসিয়া থাকিব তুমি কিছু অমূল্য রত্ন লইয়া আমার নিকটে যাইবা পরে দুই-জনে একত্র হইয়া সুখে গমন করিব এই সঙ্কেত করিয়া মন্ত্রী আপন ঘরে গেল। রাত্রি হইলে মন্ত্রী সেই বৃক্ষের মূলে বসিবামাত্র সর্পাঘাতে তাহার মৃত্যু হইল। পরে রাণী নিশাশেষে রাজাকে নিদ্রিত দেখিয়া রাজার গলদেশে অস্ত্রাঘাত করিয়া কিছু অমূল্য রত্ন লইয়া সেই স্থানে গিয়া দেখিল যে উপ-পতি মরিয়াছে তাহাতে উদ্বিগ্না হইয়া দেশান্তরে যাইয়া বেশ্যা ধর্ম্ম আশ্রয় করিল। তাহার পর রাজার মরণান্তর পাত্র সভাসদ প্রভৃতিরা বিচার করিয়া রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে রাজপুত যুবাবস্থাপ্রাপ্ত হইল ও মহামত্ত হইয়া বেশ্য গমন করিতে লাগিল ও দেশ দেশান্তরে গমন করিয়া যেখানে ভাল বেশ্যা পায় সেই স্থানে যায় ইতিমধ্যে যে স্থানে তাহার মাতা বেশ্যা হইয়াছে সে স্থানে গিয়া তাহার সঙ্গে অভিগমন করিল কিন্তু রাণী আপন পুত্র বলিয়া জানিল। তারপর সে পুত্র মরিলে তাহাকে দাহ করিবার সময় রাণী চিতা প্রবেশ করিতে গেল তাহাতে ভয়ানক অগ্নি দেখিয়া পলাইয়া এক গোপগৃহে যাইয়া রহিল রাজরাণী ছিল বেশ্যাধর্ম করিল দুঃখ জানে না গোপগৃহে কতদিন বসিয়া খাইবে। এক দিবস গোপ কহিল বসিয়া কি করিতেছিস ঘোল বিক্রয় করিতে যা। ইহা কহিয়া ঘোলের হাঁড়ি মাথায় তুলিয়া দিল। রাজরাণী মাথায় ঘোলের হাঁড়ি লইয়া দুইতিন পাদ গমন করিবামাত্র মস্তক হইতে

ঘোলের হাঁড়ি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল রাণী হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল সকলে দেখিয়া কহিল তোর লজ্জা নাহি ঘোলের হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া হাসিতেছিস। তখন রাণী কহিল আমি রাজাকে মারিয়াছি উপতিকে সর্পাঘাত হইল তাহা দেখিয়া বেশ্যা ধর্ম্ম করিলাম তাহাতে পুত্রেতে রত হইয়া চিতা প্রবেশ করিতে গেলাম সেখান হইতে পলাইয়া গোপ গৃহিনী হইলাম আজি কিঞ্চিৎ ঘোল নষ্ট হইল এজন্য শোক করিব।

উপসংহার

বাংলা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করে কেরী বাংলা বাইবেলের প্রবাহমুখ খুলে দিয়েছিলেন; তাঁর অনুবাদের যথার্থতা ও সার্থকতা যতই সীমাবদ্ধ হোক, তিনিই বাংলা বাইবেলের কৃত্তিবাস। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এই নূতন বিষয় সংযোজনার কৃতিত্ব অবশ্যই তাঁর ওপর বর্তাবে। সাধারণভাবে সাহিত্যের ইতিহাসে কেরীর বাংলা বাইবেলের গুরুত্ব গদ্য-রচনার সাহিত্যিক ধারার উৎসমুখ উন্মোচনে বলে দেখা হয়; কিন্তু এখানে খুব স্পষ্টভাবেই মনে রাখা দরকার যে বাইবেলের গদ্য কোন রীতিসচেতনতার ফসল নয়, ইংরেজি বাইবেলের পাঠে গদ্যরীতির ব্যবহার তাঁর কাছে বাইবেল অনুবাদ-ভাষারীতির শিক্ষা স্বরূপ উপস্থিত ছিল। অনুবাদ কবিতায় হবে না গদ্যে হবে, বাংলা ভাষায় কবিতা আছে গদ্য নেই—তথাপি গদ্যভাষা বাইবেলের জন্য তৈরী করে নিতে হবে, কেরীর মধ্যে এইরকম সচেতন বিবেচনার পরিচয় অন্তত ছিল না। হালহেড কবিতায় ভাষার শক্তি ও শ্রী অধিক ধরা পড়ে বলে তাঁর ব্যাকরণে বাংলা কবিতার দৃষ্টান্ত ব্যবহার করলেও, কেরীর পক্ষে বাংলা ভাষার প্রাথমিক অসম্পূর্ণ জ্ঞান নিয়ে কবিতার পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর ছিল না; অথবা গদ্যও যে ভাষার সামর্থ্য সমানভাবে ধারণ করে, এই বোধে গদ্যপথে পদচারণার সংকল্প গ্রহণ করার মত বিবেচনাও তাঁর মধ্যে দেখা যায় না। ফলে, কেরী যে গদ্যে বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন, তাকে আকস্মিক একটা ব্যাপার না বললেও একটা ঘটনা মাত্র বলাই ভালো; গদ্যরীতি-চৈতন্যের অনুশাসন যেখানে অনুপস্থিত, সেখানে তাঁকে গদ্যভাষারীতির প্রবর্তয়িতা রূপে লক্ষ্য করার সমীচীনতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। কেরী বাংলা গদ্যের প্রতি সচেতনভাবে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন বাইবেল অনুবাদের সময়কালের আরও পরে, প্রায় তাৎক্ষণিক একটা প্রয়োজনবোধের প্রতিক্রিয়ায়, যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষক-রূপে তিনি কাজে যোগ দেন। পাঠ্যপুস্তক রূপে গদ্যগ্রন্থের উপযোগিতা সম্বন্ধে এখানে তাঁর বিবেচনার পরিচয় আছে। তাঁর এই বিবেচনা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গদ্যে রচিত পাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে জয়ী হয়েছিল। তাঁর এই বিবেচনার অনুশাসনেই রামরাম বসু প্রতাপাদিত্য চরিত্র রচনা করেছিলেন, নতুবা রামরাম বসু পদ্যরীতির অভিব্যক্তিতে যে অধিক সাবলীল ছিলেন, তার

প্রমাণ 'খ্রীষ্টবিবরণামৃতং'। কেরী তাঁর পণ্ডিতগোষ্ঠী দিয়ে বাংলা গদ্য-গ্রন্থ লিখিয়ে নিয়েছিলেন; অনেকে এই ধারায় কলেজ-পরিধির বাইরেও গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেমন মৃত্যুঞ্জয়। এ থেকে বোঝা যায় গদ্যরীতি সম্বন্ধে তাঁর বিবেচনা তার পরিপ্রেক্ষিত ও পরিধিকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে গদ্যরীতির প্রচলনে কেরীর এই ভূমিকাটি লক্ষণীয় বটে; তবু দেখা যাবে কেরী স্বয়ং গদ্যরচনায় সচেতনভাবে অংশগ্রহণ করেন নি। বাইবেলের অনুবাদের পরিপ্রেক্ষিত আলাদা, তার বাইরে এই পথে কেরীর আত্মপ্রকাশের কোন অভ্রান্ত পরিচয় নেই। প্রকৃতপক্ষে, খ্রীষ্টসংগীতের বাইরে বাংলা রচনায় কেরীর প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের উদাহরণ নেই বললেই চলে; বাইবেল বা খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ক প্রচারধর্মী পুস্তিকায় ছাড়া, অর্থাৎ তাঁর ধর্মপ্রচারক ভূমিকার বাইরে, বাংলা গদ্য সাহিত্য প্রচেষ্টায় তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। এমন কি অন্যদের স্বনামে রচিত গ্রন্থেও ভাষা বা রীতিতে কোন হস্তক্ষেপ তিনি করেছিলেন বলে জানা যায় না। বিভিন্ন লেখক তাঁর ক্ষমতা ও পরিপ্রেক্ষিতগত প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রন্থ রচনা করেছেন, এবং তাঁদের রচনার ভাষা ও রীতিও স্বাভাবিকভাবেই স্বতন্ত্র। রামরাম বা চণ্ডীচরণের ভাষার স্বতন্ত্রতাও অনায়াসলক্ষ্য। বোঝা যায়, কেরীর নায়কত্বে প্রত্যেকেই গ্রন্থরচনা করলেও, প্রত্যেকেই গ্রন্থরচনায় স্বাধীনতা ভোগ করেছেন; এবং কেরী তাঁর পদমর্যাদায় ও বাংলা ভাষা প্রীতির প্রসন্নতায় তার পোষকতা করে গেছেন। কাজেই এই সময় বাংলা গদ্যের যে আত্মপ্রকাশ ঘটে তা সম্পূর্ণভাবেই বাঙালি লেখকদের দান।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে কেরীর প্রধান উপহার তাঁর ভাষা সম্পর্কিত চিন্তা। ভাষাদর্শের তাত্ত্বিক প্রবক্তা রূপেই তাঁর ভূমিকার গুরুত্ব। ব্যাকরণ রচনা, অভিধান সংকলন এবং বাইবেল ও কথোপকথনের ভাষা সংস্কারে তাঁর এই পরিচর্যাটি বিধৃত। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের যে দুই ভাগের কথা বলেছিলেন--জ্ঞানের সাহিত্য ও ভাবের সাহিত্য,—তার প্রথম ভাগে তিনি আপন পরিশ্রম নিবেদন করেছিলেন; তিনি ব্যাকরণ রচনা করেছেন, অভিধান সংকলন করেছেন। বাংলা ব্যাকরণ ও অভিধানের ইতিহাসে তাঁর স্থানটি স্বভাবতঃই বিশিষ্ট। কিন্তু ব্যাকরণকার বা অভিধানকার তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ীই কাজে অগ্রসর হয়ে থাকেন। এই পরিকল্পনার একটি বড় অংশ অবশ্যই আলোচ্য ভাষা সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা অনুশাসিত। ফলে প্রণীত ব্যাকরণের বা অভিধানের গ্রন্থমূল্য স্বীকার করেও গ্রন্থকারের ভাষাচিন্তাকে গুরুত্ব দিতে হয়, কেননা এই সূত্রেই গ্রন্থকারের ভূমিকা নির্ণীত হয়ে থাকে।

কেরী প্রকৃতপক্ষে কোন ভাষা নিয়ে চিন্তা করেছিলেন? গদ্যভাষা না কাব্যভাষা? এই সম্পর্কে কেরীর মুখবন্ধগুলি বা চিঠি ও জার্নাল থেকে কোন স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায় না। তিনি যতটা বাংলা লিখেছেন বা সহকর্মীদের দিয়ে লিখিয়েছেন, তার প্রধান অংশ গদ্যে রচিত; এই থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তাঁর ভাষাচিন্তা গদ্যভিত্তিক। কিন্তু তিনি বাংলা ভাষা সম্পর্কেই সাধারণভাবে তাঁর আদর্শ চিন্তা নিবেদন করেছিলেন; বস্তুতঃ ভাষা বিষয়ক চিন্তা শাখানুসারী হওয়া সম্ভব নয়। বাংলা ভাষার আদর্শ রূপ অনুসন্ধানে তিনি যে সংস্কৃতমনস্কতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা গদ্য ও পদ্য উভয় শাখার ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য বলে মনে করাই সঙ্গত। তিনি যে খ্রীষ্টসঙ্গীতগুলি রচনা করেছিলেন, তাতেও তৎসম শব্দ বা সন্ধিকণ্টকিত শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা যথেষ্ট। তবু কেরীর বাংলা ভাষা শিক্ষা, রামরাম বসুর সহায়তার কথা মনে রেখেও বলা যায়, লোক-মুখের জীবন্তভাষা অনুসরণের মাধ্যমেই অগ্রসর হয়েছিল। সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার মধ্যে এক ধরনের সংকীর্ণতা থাকেই, উপভাষিক লক্ষণে এই ভাষার সীমাবদ্ধতা। সাধারণ চাষী, হাটুরে বা অশিক্ষিতের ভাষার মধ্যে শব্দ ও রীতিগত দিক থেকে বিকৃতি থাকেই। এইসব সংকীর্ণতা ও বিকৃতি নিয়েই তথাপি সাধারণের মধ্যে প্রচলিত মুখের ভাষা জীবন্ত ভাষা। মানুষের মুখের কথা গদ্যেই প্রকাশ পায়, এবং যে কোনও ভাষাশিক্ষা গদ্যরূপ অবলম্বনে যথার্থভাবে অগ্রসর হয়ে থাকে বলে (কেরীও তাই বিশ্বাস করতেন) কেরীর বাংলা ভাষা শিক্ষা সাধারণ মানুষের মুখের গদ্যভাষা অবলম্বন করেই প্রধানভাবে অগ্রসর হয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু তিনি চাষী ও নিম্নশ্রেণীর মুখের ভাষা যে সাহিত্যের ভাষার উপযোগী নয়, এইরকমের বিশ্বাসেরও বশবর্তী ছিলেন; আপন ভাষা-সাহিত্যের অভিজ্ঞতা তাঁর এই বিশ্বাসের ভিত্তি। বাংলাদেশের উচ্চশ্রেণী, তথা শিক্ষিত ও পণ্ডিতদের (ব্রাহ্মণ?) ভাষার প্রকৃতি সাধারণ লোকমুখের ভাষা থেকে যে অংশতঃ স্বতন্ত্র, অতঃপর তাও তিনি লক্ষ্য করে থাকবেন। এই ব্যবধানের মূল কারণ সম্ভবতঃ প্রথম পক্ষের সংস্কৃত চেতনা। বাংলা সংস্কৃত থেকে জাত; সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় অগ্রসর হয়ে বাংলা ভাষার আদর্শ প্রকৃতি নির্ণয়ে এই সংস্কার তিনি কার্যকর হতে দিয়েছিলেন। সংস্কৃত থেকে জাত বাংলা ভাষা আপন প্রকৃতি অনেকখানি বিকৃত করে ফেলেছিল নানা পারিপার্শ্বিক কারণেও, আরবি ফারসী প্রভৃতি বিজাতীয় ভাষার অত্যাচারে এই বিকৃতি সাধিত হয়েছিল। কাজেই বাংলা ভাষার প্রকৃত রূপ সন্ধানে কেরীর চৈতন্য দুই দিক থেকে সক্রিয় হতে চেয়েছিল;

প্রথমতঃ বিজাতীয় ভাষার প্রভাবজাত বিকৃতি থেকে সংস্কৃতজাত ভাষার আপন প্রকৃতি প্রতিষ্ঠায়; দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ লোকমুখের ভাষা থেকে সাহিত্যিক ভাষার উচ্চতর স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায়। সংস্কার ও নির্মাণের এই উভয়ক্ষেত্রেই সংস্কৃত-চৈতন্যকে মানদণ্ড রূপে ব্যবহার করা হয়েছিল।

কিন্তু ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে পদার্পণের পর তিনি যখন বাংলা ভাষা শিখছেন, সেই শিক্ষানবিশীর কালে বাংলা ভাষা সম্পর্কে এইভাবে সচেতন আগ্রহ ও উদ্যমের পরিচয় দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। বস্তুতঃ, অসম্পূর্ণ ভাষাজ্ঞান নিয়ে যখন তিনি বাইবেল অনুবাদ করতে শুরু করেছেন, তখনও বাংলা ভাষা যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাষা এই সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত ছিলেন না। বলা বাহুল্য, বাংলা ভাষা সম্পর্কিত তাঁর ভাবনাগুলি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের; অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই হয়তো তার সূচনা, কিন্তু সংস্কৃতভাষা শিক্ষায় অগ্রসর হবার পূর্ববর্তী নয়। হালহেডের ব্যাকরণ ও দেশীয় পণ্ডিতদের সান্নিধ্যেই তিনি সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলা ভাষার ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন বলে মনে করা যায়। এইরকম ক্ষেত্রে পণ্ডিতগোষ্ঠীর আপন অভিমানও অংশতঃ কেরীর বাংলা ভাষাচিন্তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকতে পারে।

বাংলা ভাষার আদর্শ রূপ অনুসন্ধানে কেরীর দৃষ্টিভঙ্গিতে সংস্কৃত-মনস্কতার প্রাধান্য। সংস্কৃতানুগত বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠায় তাঁর এই প্রবণতাটি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাংলা বাইবেলের প্রথম সংস্করণের ভাষা, এমন কি দ্বিতীয় সংস্করণের ভাষার চেয়ে পরবর্তী সংস্করণের ভাষা অধিক সংস্কৃতঘনিষ্ঠ। প্রথম বা দ্বিতীয় সংস্করণের চেয়ে তাঁর বাংলা ব্যাকরণ তৃতীয় সংস্করণে এসে অধিক সংস্কৃতমনস্ক। কথোপকথনের ভাষা পরবর্তী সংস্কারে কখনো কখনো তাঁর এই বিশেষ মানসিকতা দ্বারা প্রভাবিত। তাঁর বাংলা অভিধানে বাংলা ভাষার সংস্কৃত ঘনিষ্ঠতার পরিচয়টি প্রতিষ্ঠিত; এবং তাঁর বাংলা অভিধানের কাল উনিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক। চতুর্থ দশকে (১৮৩২) বাইবেলের অন্তিম সংস্করণে সংস্কৃতঘনিষ্ঠ বাংলা ভাষার রূপটি বিশেষভাবে নিরূপিত। কেরীর এই মানসিকতার রচনায় তাঁর আপন বিবেচনার অংশভাগ স্বীকার করে নিয়েও কোন কোন প্রভাবের কথা মনে আসে। সমকালীন য়ুরোপীয়-দের বাংলা চর্চায় প্রায় অনুরূপ মনোভাবের উপস্থিতি, সংস্কৃত ভাষায় তাঁর নিজস্ব অধিকারের প্রতিষ্ঠা, সংস্কৃত পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়ের রচনায় সমকালীন বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ আদর্শের আত্মপ্রকাশ, এইগুলি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে

প্রভাবিত করে থাকতে পারে। বাংলার সংস্কৃতানুগত্য সম্পর্কে এই বিশ্বাস এই সময় এতখানি প্রবল হয়েছিল যে, বাংলা বিভাগে পণ্ডিত নিয়োগের ক্ষেত্রে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রার্থীর সংস্কৃতজ্ঞান একটি আবশ্যিক যোগ্যতা বলে মনে করা হতো।

কিন্তু কেরীর এই সংস্কৃতমনস্কতা ঋজুভাবে তার নির্দিষ্ট অর্থেই গ্রহণ করা সম্ভবতঃ ঠিক হবে না। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত প্রকৃতি নির্ধারণে তাঁর আগ্রহ অবশ্যই বেশি, কিন্তু ভাষা পরিবর্তনের ধারায় সংস্কৃত থেকে পাবিবর্তিত অবস্থায় বাংলা ভাষার নিজস্ব যে উপাদানগুলি জাত হয়েছিল, কেরী সেগুলিকে আলাদাভাবে বাংলার নিজস্ব প্রকৃতির তথ্যরূপে উদঘাটন করতে পারেন নি, সেই ঐতিহাসিক চেতনায় তিনি আলোকিত ছিলেন বলে মনে হয় না। নতুবা বাংলা ভাষার নিজস্ব উপাদানের পরিচয়ও তাঁর রচনায় যথেষ্টরূপে উপস্থিত ছিল। ভাষার সংস্কৃতানুগত্য সম্বন্ধে যখন তিনি সচেতন, ভাষার নিজস্ব প্রবৃত্তি সম্বন্ধে তখন তিনি সেই সচেতন নিরূপণের পরিচয় দেন নি। ফলতঃ তাঁর সংস্কৃতমনস্কতা খানিকটা সীমাবদ্ধ অর্থেই গ্রহণ করা উচিত।

কেরীর ভাষাচিন্তায় বাংলার সংস্কৃতগোষ্ঠী রূপাদর্শ সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ বিশেষ স্পষ্ট। তথাপি ভাষায় বিদেশী শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে তিনি যে সংকীর্ণতা দেখান নি, তা ভাষার সত্য ও ভাষার ইতিহাস বিষয়ে তাঁর সচেতনতাই প্রমাণ করে। বিষয় ও প্রসঙ্গ অনুযায়ী ভাষা ও রীতির ভেদের স্বাভাবিকতাও তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। তাহলে তাঁর ভাষা চিন্তাকে প্রধান দুই ভাবে লক্ষ্য করা যায়; প্রথমতঃ, তিনি বাংলা ভাষাকে বিকৃত ও অধঃপতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করাকেই আদর্শ মনে কবেছেন, বিদেশী ভাষার প্রভাব ও উপভাষিক প্রভাব থেকে ভাষাকে মুক্ত করার আগ্রহও ওই আদর্শ-চিন্তায় চরিতার্থ; দ্বিতীয়তঃ, বিষয় ও প্রসঙ্গ অনুযায়ী ভাষা ও রীতির নিরূপণকে ভাষারীতিগত আদর্শ রূপে তিনি বিবেচনা করেছেন এবং অভিব্যক্তির যথার্থতা ও সঙ্গতির প্রয়োজনে এমন কি বিদেশী শব্দের ব্যবহারও অনুমোদিত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, তাঁর এই ভাষাদর্শ বিষয়ক চিন্তাতেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে কেরীর গুরুত্ব। তাঁর এই আদর্শ বাংলা ভাষার সাহিত্য চর্চায় পরবর্তীকালে প্রত্যাখ্যাত হয় নি; তা কতখানি জয়ী হয়েছিল, তা স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয়বস্তু।